মাওলানা সাঈদী

রচনাবলী

৩

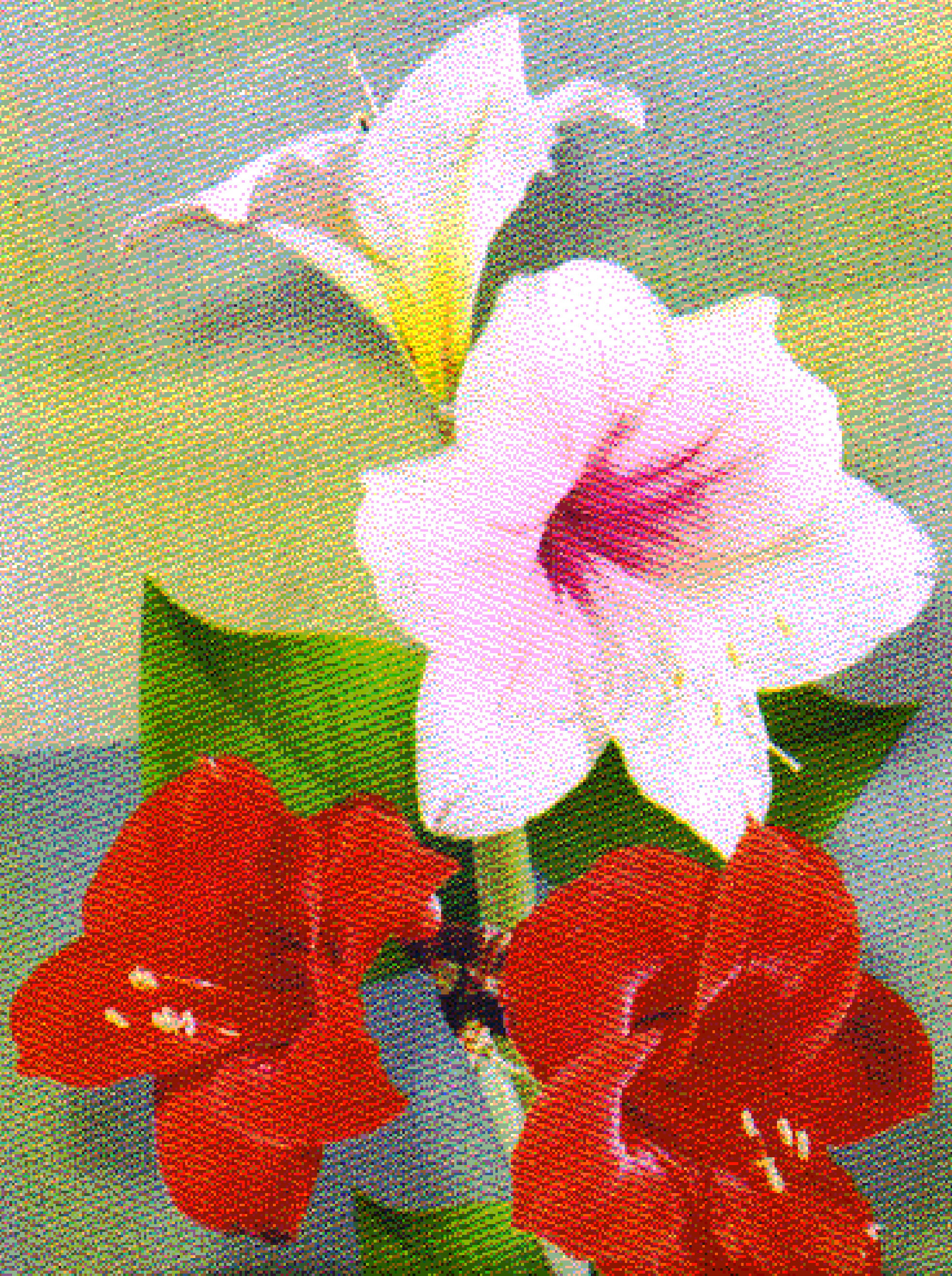

মাওলানা সাঈদী রচনাবলী

৩

প্রকাশক

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯

www.pathagar.com

মওলানা সাঈদী রচনাবলী- ৩

প্রকাশক ঃ	রাফীক বিন সাঈদী ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক ৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৭৬৪৭৯
অনুলেখক ঃ	আব্দুস সালাম মিতুল
প্রথম প্রকাশ ঃ	নভেম্বর-২০০৮
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ	নাবিল কম্পিউটার ৫৩/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, ০১৭১৪-৩৮৮২৫৪
প্রচ্ছদ ঃ	মশিউর রহমান
মুদ্রণ ঃ	আল আকাবা প্রিন্টার্স ৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার-ঢাকা-১১০০
শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ	৩০০ টাকা মাত্র।

Maulana Sayedee Rachonabolee-3rd Part, Co-operated by Rafeeq bin Sayedee. Managing Director of Global publishing Network, Copyist : Abdus Salam Mitul. Published by Global publishing Network, Dhaka. 1st Edition: November 2008. Price: 300 TK, Only in BD. 12 Doller in USA. 8 Pound in UK.

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

চট্টগ্রাম নিবাসী আরব আমিরাতের দুবাই প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী

জনাব মঞ্জুরুল হক চৌধুরী

তাঁর মরহুম পিতা

জনাব আলহাজ্জ নওশা মিয়া চৌধুরী'র

রুহের মাগফিরাত ও রা'ফি দারাজাত কামনায়

মাওলানা সাঈদী রচনাবলী- ৩

নামক গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য সহযোগিতা করেছেন।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নেক নিয়ত কবুল করুন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْمٰنُ- عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ- خَلَقَ الْاِنْسَانِ- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ-

প্রকাশকের কথা

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আলীশানে শতকোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি একান্তই দয়া করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জীবন বিধান হিসাবে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তিদূত সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী **হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের** প্রতি, যাঁর মাধ্যমে দিশেহারা মানবতা পেয়েছে সঠিক পথের দিশা। চির অবহেলিতা নারী জাতি পেয়েছে তাদের ন্যায্য অধিকার। যিনি বর্ণ-বৈষম্য দূরীকরণের পথিকৃৎ, শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়েছেন, এক কথায় অদ্বিতীয় সফল রাষ্ট্র নায়ক ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হিসেবে সমগ্র বিশ্বে তিনি অতুলনীয়।

আজকের পৃথিবী ও তার অধিবাসীরা যদি সত্যকার অর্থে শান্তি পেতে চায়, ভীতিহীন নিরাপত্তাপূর্ণ, ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত বিশ্ব দেখতে চায় তাহলে মানব রচিত সকল মতবাদ দু'পায়ে দলে ফিরে আসতে হবে রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিথ পথে। বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে এ পথের বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ও বক্তব্যের মাধ্যমে জন সমক্ষে সার্থকভাবে যাঁরা ফুটিয়ে তুলেছেন আল্লামা সাঈদী তাঁদেরই অন্যতম।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী মুক্তি পাগল জনতার কাছে শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত একটি নাম, একটি আন্দোলন, একটি প্রতিষ্ঠান। সমগ্র বিশ্বে যাঁরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে একটি শান্তিময় পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখেন তাঁদের অনেকের নিকট সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব তিনি। আল্লাহর কোরআনের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান মুসলিম বিশ্বের গন্ডী অতিক্রম করে অমুসলিম বিশ্ব তথা পাশ্চাত্য জগতেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি আল কোরআনের খাদেম ও অসাধারণ বাগ্মী হিসেবে এ দেশের সকল স্তরের মানুষের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত।

এদেশের মুসলমানদের জন্য তাঁর দ্বীনি খেদমত গণমানুষের মনের মনিকোঠায় দীর্ঘকাল জাগরুক থাকবে ইনশাআল্লাহ্। বাংলাদেশের মুসলমানদের চরম দুর্দিনে

www.pathagar.com

তিনি মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বিপ্লবী আহ্বান নিয়ে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পবিত্র কোরআনের সে আওয়াজে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিলো আশাহত দিশাহারা জাতি। বাংলাদেশে আল কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি যে জাগরণ সৃষ্টি করেছেন- আল হাম্‌দুলিল্লাহ্‌, এমন কোনো শক্তির অস্তিত্ব বর্তমানে নেই, সে ইসলামী জাগরণকে অবদমিত করতে পারে। জনপ্রিয়তার যে কোনো মানদন্ডে উত্তীর্ণ আল্লামা সাঈদী গোটা জাতির কাছে যেন এক জীবন্ত কিংবদন্তী। আমরা মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে তাঁর সুস্বাস্থ্য, ঈমান দীপ্ত দীর্ঘ জীবন এবং মানসিক স্বস্তি কামনা করি।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সবকটি মহাদেশের বহুসংখ্যক দেশেই অডিও, ভিডিও, সিডি, ভিসিডি, ডিভিডি, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাঁর আকর্ষণীয় কণ্ঠ যেমন ধ্বনিত হচ্ছে তেমনি ওয়েবসাইটেও পঠিত হচ্ছে তাঁর রচিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থসমূহ। তাঁর রচিত গবেষণাধর্মী ছোট-বড় গ্রন্থের সংখ্যা বর্তমানে ষাটের উর্ধ্বে। তাঁর কোরআন-হাদীস ও বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তব্য শুনে দেশ- বিদেশে এ পর্যন্ত প্রায় ছয় শতাধিক অমুসলিম ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে আমেরিকার নিউইয়র্কের এ্যাটর্নি অব ল' যোশেফ গ্রোয়ে অন্যতম।

বহু সংখ্যক নাস্তিক ও চরম ইসলাম বিদ্বেষী বামপন্থী তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত পবিত্র কোরআনের তাফসীর শুনে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন। বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য বিভ্রান্ত নারী-পুরুষ সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন। যারা নামাযের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতো, জীবনে কখনো মসজিদ মুখী হতেন না, তাঁরা নিয়মিত নামায আদায় করছেন। পবিত্র কোরআন যারা পাঠ করতে জানতেন না, আরবী অক্ষর যাদের কাছে বিরক্তি সৃষ্টি করতো, তাঁরা কষ্ট স্বীকার করে আরবী ভাষায় কোরআন পাঠের যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

তাঁর মাহফিল শোনার পূর্বে এদেশের জনগণের কাছে এ কথা অজানা ছিল যে, ওয়াজ-তাফসীর আধুনিক বিজ্ঞান সমৃদ্ধ একটি শিল্পসৌকর্য বা ওয়াজ-বক্তৃতা একটি মনোমুগ্ধকর আর্ট। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর কণ্ঠসৌকর্য দিয়ে ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন, বক্তৃতা একটি শিল্প বা একটি চমৎকার আর্ট। তিনি ওয়াজের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন তা অকল্পনীয়। বর্তমানে শুধু ওয়াজের মাহফিলেই নয়–প্রতি জুম্‌য়া'বারে সম্মানিত খতিব সাহেবগণ যে আলোচনা করেন, সে আলোচনাও হয় অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। আল্লামা সাঈদী যে ধারায় এবং যে বিপ্লবী চেতনা নিয়ে বক্তৃতা করেন, বর্তমানেও বহুসংখ্যক সম্মানিত ওয়ায়েজীন ও

www.pathagar.com

খতিবগণ সে চেতনা তাঁদের বক্তৃতায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। আল্লাহর দ্বীনকে সহজবোধ্য করার জন্য নিঃসন্দেহে এ পদ্ধতি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এক বড় নিয়ামত। কারণ আধুনিক শিক্ষিত শ্রোতাবৃন্দের রুচিরও পরিবর্তন এসেছে, তারা আগের মতো শুধু কিচ্ছা-কাহিনী নির্ভর ওয়াজ শুনতে চান না, তাঁরা চান কোরআন-হাদীস সমৃদ্ধ ও জীবন সম্পৃক্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি নির্ভর আলোচনা। সে ক্ষেত্রে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

শহর নগর বন্দর অতিক্রম করে বাংলার নিভৃত পল্লীর জীর্ণ কুটিরেও আল্লামা সাঈদীর কন্ঠ অনুরণিত হচ্ছে। তাঁর কন্ঠ নিসৃত পবিত্র কোরআনের শব্দাবলীর ঐন্দ্রজালিক সুর মানুষকে এমনভাবে তাফসীর মাহফিলের দিকে টেনে নিয়ে আসে, যেমন চম্বুক টেনে নিয়ে আসে লৌহ্ খন্ডকে। তিনি শুধু সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তিমাত্র নন, তিনি একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান। তাঁকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে বহুমাত্রিক পরিবেশ। তাঁকে কেন্দ্র করেই জনতার সাগরে জেগে ওঠে ঊর্মিমালা। মুসলিম নামক ঘুমন্ত নরশার্দুলদের ঘুম ভাঙ্গানোর অন্যতম হাতিয়ার আল্লামা সাঈদী কর্তৃক পরিবেশিত কোরআন তাফসীর। আল হাম্‌দুলিল্লাহ্- এটি মহান আল্লাহর কোরআনের অন্যতম মুজিযা। আল্লাহ তা'য়ালা ঘূণে ধরা সমাজ তথা শির্‌ক- বিদয়াত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম মিল্লাতকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য যুগ- জামানায় সময়ের ব্যবধানে তাঁর একনিষ্ঠ গোলামদের মধ্য থেকে কাউকে না কাউকে এ বিষয়ে সুযোগ দিয়ে ধন্য করেন।

১৯৭১ সন পরবর্তী বাংলার অন্ধকার অমানিশায় আল্লামা সাঈদী কোরআনের প্রদীপ জ্বালাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। নিজ প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে সেই থেকে অদ্যাবধি পবিত্র কোরআনের রঙে রাঙিয়ে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশে ও বিদেশে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে তিনি নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আল্লাহর কোরআনের সৈনিক বেরিয়ে আসছে। অমুসলিম দেশসমূহেও তিনি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে মহাসত্যের আলো কুফুরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত অমুসলিম জাতির ভেতরে ছড়িয়ে পড়ছে।

অমিত সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মন্ডিত বাংলাদেশ, গোড়া থেকেই দেশটি ছিলো সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদীদের কু-নজরে। ইউরোপ- আমেরিকার প্রচেষ্টা দেশটিকে গোলাম বানানোর, রাশিয়ার প্রচেষ্টা ছিলো এদেশের মানুষকে নাস্তিকে পরিণত করার আর ভারত এদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ বানানোর নিত্য- নতুন চক্রান্ত

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রে কখনো বিরতি দেয়নি। দেশ ও জাতিসত্তা বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের বহুমুখী চক্রান্তে যখন হারিয়ে যাচ্ছিলো মুসলমানদের স্বর্ণালী ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ডুবে যাচ্ছিলো তারা শির্ক- বিদয়াত ও কুসংস্কারের অন্ধকার গহ্বরে।

পুজিবাদ, নাস্তিক্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ, শির্ক ও বিদয়াতের প্রলয়ঙ্করী ঝড়ো বাতাসে উপমহাদেশে মুসলিম উম্মাহ্ এ ঝড়ো বাতাসের প্রচন্ডতায় যেনো ঈমানী তথা ইসলামী চেতনা না হারায় সে লক্ষ্যে তৎকালীন ওলামা- মাশায়েখ ও প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবীদগণ তাঁদের ক্ষুরধার লিখনী, যুক্তি-নির্ভর শানিত বক্তব্য ও যৌক্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী চেতনাকে মুসলিম উম্মাহ্র হৃদয় কোটরে জীবিত রাখার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। চরম প্রতিকুল পরিবেশে ভারতীয় উপমহাদেশে যে কয়জন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফাঁসির রশিকে ফুলের মালা হিসেবে মনে করে দিশাহারা জাতিকে কোরআন- হাদীস ও বিজ্ঞানভিত্তিক সাহসী বক্তব্য এবং লেখনীর মাধ্যমে পথের দিশা দেখিয়েছেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসীম অনুগ্রহে আল্লামা সাঈদী তাঁদেরই একজন।

তাঁর সাহসী কণ্ঠস্বর বন্ধ করে দেয়ার জন্যে স্বৈরশাসকরা কিছু দিনের জন্য তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিলো, ৮০'র দশকে দেশব্যাপী অসংখ্য হরতাল ও অগণিত বার ১৪৪ ধারা জারি করেছিলো। আল্লামা সাঈদীর তাফসীর মাহ্ফিল বন্ধের অপচেষ্টায় ষড়যন্ত্রকারীরা মাত্র এক বছরেই ৫৬ বার হরতাল করেছিলো। পক্ষান্তরে কোরআন প্রেমিক অগণিত নারী-পুরুষ ইসলাম বিদ্বেষীদের একটি হরতাল এবং ১৪৪ ধারা কোথাও কার্যকর হতে দেয়নি। দেশবাসী সাক্ষী, নির্ধারিত সকল তাফসীর মাহ্ফিল ১০০% সফল হয়েছে। কোনো একক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এত বার ব্যর্থ হরতালের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

গন্তব্যে তাঁর যাত্রা পথে বহু সংখ্যক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলো। তাফসীর মাহফিলে তিনি পবিত্র কোরআনের তাফসীর পেশ করার জন্যে ঢাকা থেকে আকাশ পথে সিলেট গিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে বিমান থেকে নামতে না দিয়েই ঢাকায় ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। সর্বোপরি আমাদের জানা মতে এ পর্যন্ত দেশের পাঁচটি স্থানে বিভিন্ন সময় তাঁকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়ার নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রও করা হয়েছিলো। মাহফিলে তাফসীর পেশ করা অবস্থায় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছোড়া হয়েছে। কিন্তু মহান রাহ্মানুর রাহীম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনন্ত অসীম অফুরন্ত দয়া ও গণমানুষের হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসায় তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ অবস্থায় এখনো আমাদের মাঝে পবিত্র কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখে যাচ্ছেন-

www.pathagar.com

আল হাম্‌দু লিল্লাহ্‌। যদিও দেশে জরুরী অবস্থার কারণে তিনি তাফসীর মাহফিলে বক্তব্য রাখতে পারছেন না, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে আর তাঁর ক্ষুরধার কলম ছুটে চলেছে অবিরাম গতিতে।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, নমরুদ যেখানে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলার চেষ্টা করেছে ইবরাহীম (আঃ) সেখানে আবির্ভূত হয়ে নমরুদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। যেখানেই ফেরাউন জনগণের ওপরে খড়্গ হস্ত হয়েছে সেখানেই মূসা (আঃ) গর্জে উঠে তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন। যেখানেই আবু জেহেল- আবু লাহাবরা ইসলামের বিরুদ্ধে ফণা বিস্তার করার চেষ্টা করেছে সেখানেই আবু বকর- ওমর (রাঃ) সে ফণা দলিত মথিত করেছেন– এটাই চিরন্তন ইতিহাস।

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় এ জাতি নিজের স্বকীয় আদর্শের ভিত্তিতে একটি সুন্দর, সুখী-সমৃদ্ধশালী জীবন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিল। শাহাদাতের স্বপ্ন বুকে ধারণ করে মহান আল্লাহর পবিত্র নামে মরণ-পণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু জাতির কুসুমাস্তীর্ণ পথ ষড়যন্ত্রের দানব সৃষ্ট প্রবল ভূমিকম্পে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বসে পড়লো। গোটা জাতি যেন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢেকে গেল। মহাঅমানিশা নেমে এলো জাতীয় জীবনে। কোথাও সামান্যতম আলোর রেখাটুকু বাকি রইলো না। জাতীয় জীবনের স্বপ্ন স্বৈরাচারের উদ্ভট নানাবিধ চেতনার পদতলে নিষ্প্রভ হয়ে পড়লো। ব্রাহ্মণ্যবাদ বাংলার মুসলিম তরুণ-যুবকদের সমগ্র বোধশক্তির ওপরে, ইসলামী সংস্কৃতির পরিবর্তে বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও ইসলামের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতার আস্তরণে চিরতরে মহাবিস্মৃতির কৃষ্ণকালো অন্ধকারের যবনিকা টেনে দেয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করলো। জাতীয় জীবনের যেখানে শুরু সেখানেই নামিয়ে দেয়া হলো অভিশাপের সর্বগ্রাসী অনল প্রবাহ। ইতিহাস সাক্ষী, দেশের সেই ক্রান্তিলগ্নে তওহীদী জনতার বিপ্লবী কণ্ঠস্বর হিসেবে আল্লামা সাঈদী অকুতোভয়ে সিংহ গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নিরাশার সাগরে নিমজ্জিত ও হতাশাগ্রস্ত জাতিকে শুনিয়েছিলেন আশার বাণী। সাহসী আঙ্গুল তুলে দেখিয়েছিলেন তৎকালীন নিন্দিত বিশ্বের নন্দিত গন্তব্য।

মহাকালের ঘূর্ণয়মান চক্রের আবর্তনে ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অমোঘ অলংঘনিয় নিয়মে আল্লামা সাঈদী একদিন অবশ্য অবশ্যই চিরকালের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে যাবেন- এ সত্যের মৃত্যু নেই। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ও লিখনী যেনো সহসাই হারিয়ে না যায় এ জন্যে গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে আমরা নিয়েছি কতিপয় সাহসী পদক্ষেপ। এ পর্যন্ত আমরা তাঁর লিখিত দুই সহাস্রাধিক পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ চার খন্ড তাফসীরে সাঈদীসহ

www.pathagar.com

বিভিন্ন বিষয়ে অর্ধশত ছোট-বড় গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে সুলিখিত তাঁর রচনাবলী আমরা গ্রন্থাকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। উদ্যোগ নিয়েছি ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাংলাভাষী মুসলমান নর-নারী বিশ্বের যেখানেই থাকুন, তাঁরা যেনো আল্লামা সাঈদীর কণ্ঠ নিঃসৃত তাফসীর শুনতে পারেন এবং তাঁর লেখা গ্রন্থসমূহ পড়তে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা Islam.Net.bd উক্ত উদ্যোগের অংশ হিসেবে তৃতীয় বারের মতো তাঁর লিখিত তিনটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও একটি পুস্তিকার সমন্বয়ে **মাওলানা সাঈদী রচনাবলী-৩** নামে প্রকাশ করা হলো। যে পুস্তিকাটি বক্ষমান গ্রন্থে সংযোজন করা হলো তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মাওলানার নিজ পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশ্যে লিখা হলেও তা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য। আর ঠিক এ কারণেই আমরা উক্ত পুস্তিকাটি অত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। বক্ষমান গ্রন্থে তাঁর রচিত যে সকল গ্রন্থ ও পুস্তিকার সমন্বয় ঘটেছে তার শিরোণাম নিম্নরূপঃ–

১। পবিত্র কোরআনের মু'জিজা

The Scientific Miracles in the Holy Qur'an

২। সুন্নাতে রাসূল (সাঃ)- অনুসরণের সঠিক পদ্ধতি

৩। জিহাদ ঈমানের অপরিহার্য দাবী

৪। নিজ পরিবারবর্গের প্রতি আমার অসিয়্যত

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্কের পক্ষে

বিনয়াবনত

আব্দুস সালাম মিতুল

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা	আলোচিত বিষয়

১৭ পবিত্র কোরআনের মু'জিজা

The Scientific Miracles in the Holy Qur'an

১৯ মহাবিশ্বের চির বিস্ময় আল কোরআন
২৩ অবিশ্বাসীদের প্রতি পবিত্র কোরআনের চ্যালেঞ্জ
২৭ অভ্রান্ত জ্ঞানের উৎস আল কোরআন
৩০ কোরআনকে বুঝার জন্য সহজ করা হয়েছে
৩৪ কোরআন বিজ্ঞানকে পথ দেখায়
৩৪ কোরআন ও বিজ্ঞান
৩৯ কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪০ বিজ্ঞান আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর ওপরে নির্ভরশীল
৪২ আল কোরআনে পৃথিবীর বর্ণনা
৪৫ পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশল ও কোরআন
৪৭ জীব বসবাসের উপযোগী গ্রহ
৪৯ পৃথিবীর আকৃতি কেমন
৫০ পৃথিবীর বায়ু মন্ডল
৫২ বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প
৫৪ আল কোরআন ও পানিচক্র
৫৬ মহাকাশের মেঘমালা
৬০ মহাকাশে অদৃশ্য ছাকনি
৬২ মেঘমালা থেকে বজ্রপাত
৬৩ পানির দুটো ধারা তথা পানি প্রাচীর
৬৫ পানির তলদেশ, আল কোরআন ও বিজ্ঞান
৬৭ পানি থেকেই জীবন্ত বস্তুর উদ্ভব
৭০ মাটির মৌলিক উপাদান

www.pathagar.com

৭১ মাটি চারটি পর্বে বিভক্ত
৭৩ মাটি নিয়ন্ত্রণসাধ্য
৭৪ ভূ-পৃষ্ঠের আবরণ
৭৫ ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে
৭৬ ভূপৃষ্ঠের কম্পন
৭৮ একই মোহনায় মিলন
৮০ বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের দেহ গঠন
৮৭ মাতৃদুগ্ধ শিশুর সর্বোত্তম ওষুধ
৮৯ পৃথিবীর সৃষ্টি–দুর্ঘটনার ফসল নয়
৯০ পাহাড়-পর্বতসমূহের উৎপত্তি
৯৩ আল কোরআন, মহাকাশ ও সাধারণ বিজ্ঞান
১০৫ সুরক্ষিত মহাকাশ
১০৭ উর্ধ্বজগতে ক্ষতিকর রশ্মি
১০৭ মহাকাশে শৃঙ্খলা
১১০ মহাশূন্যে বাতাসের ঘনস্তর
১১০ মহাকাশে পাথরের সাম্রাজ্য
১১২ মহাকাশে বায়ুমন্ডলীয় অদৃশ্য ছাতা
১১৩ গ্রহসমূহ কক্ষপথে সন্তরণশীল
১১৬ ছায়াপথই সমগ্র সৃষ্টিজগৎ নয়
১১৭ আকাশ একটি ছাদ বিশেষ
১১৮ আকাশের কোলে বিরাটায়তন প্রদীপরাশি
১১৯ মহাকাশে চাঁদ-সূর্যের দুরত্ব
১২১ সূর্যের আলোয় আলোকিত চাঁদ
১২৩ সৌরজগতের পঁচাশি ভাগই সূর্যের দখলে
১২৪ মহাকাশে সূর্যের পরিণতি
১২৬ মহাকাশে ব্লাকহোল

www.pathagar.com

১২৭ মহাকাশে কোয়াসার
১২৭ আদিতে আকাশ ও পৃথিবী সংযুক্ত ছিল
১২৮ বহুমাত্রিক জগতের ধারণা
১৩১ দিন-রাতের আবর্তন ও বিবর্তন
১৩৩ সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব
১৩৭ সম্প্রসারণশীল মহাজগৎ
১৩৮ গ্যালাক্সিসমূহের পশ্চাদপসরণ
১৩৯ সৃষ্টি জগতের নির্দিষ্ট পরিণতি
১৪০ সকল প্রশংসা একমাত্র সেই মহাবৈজ্ঞানিকের
১৪৫ যাবতীয় সৃষ্টিতেই রয়েছে সুন্দরের ছোঁয়া
১৪৭ স্রষ্টার শৈল্পিক ও নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ
১৫০ মানুষের নান্দনিক দেহ সৌষ্ঠব
১৫২ উদ্ভিদ মাটি দীর্ণ করেই বেরিয়ে আসে
১৫৩ উপসংহার

১৫৭ সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) অনুসরণের সঠিক পদ্ধতি

১৫৯ ইত্তেবা-ই সুন্নাতের ব্যাখ্যা
১৬৪ সুন্নাতের অনুসরণ অপরিহার্য
১৭১ কেন নবুয়্যতের প্রয়োজন
১৭৬ নবী ও রাসূল সম্পর্কে ধারণা
১৮০ কেন নবী ও রাসুলের আনুগত্য করতে হবে
১৮৩ নবীর প্রদর্শিত পথই একমাত্র সত্য পথ
১৮৬ নবুয়্যাত ও রেসালাতের সূচনা
১৯১ নবী ও রাসুলগণই একমাত্র অনুসরণযোগ্য নেতা
১৯৫ নবী-রাসূলগণের সাথে বিরোধিতা
১৯৭ মানুষের প্রতি নবী ও রাসূলদের দাওয়াত

www.pathagar.com

২০৪ মানব জাতির মুক্তির জন্যই নবীদের আগমন
২০৭ নবুয়্যাত লাভের পূর্বে নবীগণ কেমন ছিলেন
২১৮ নবী ও রাসূলদের মানবিক সত্তা
২২৭ বিশ্বনবীই হলেন একমাত্র আদর্শ নেতা
২৩০ খন্ডিতভাবে রাসুলের আদর্শ অনুসরণের অবকাশ নেই

২৩৫ জিহাদ ঈমানের অপরিহার্য দাবী

২৩৭ জিহাদ ঈমানের অনিবার্য দাবী
২৪২ মুমিনের জিন্দেগী ও জিহাদ
২৪৮ জিহাদই ঈমানের কষ্টি পাথর
২৫৩ জিহাদ-আল্লাহর প্রদর্শিত পথে
২৫৪ জিহাদ সম্পর্কিত ভ্রান্তি নিরসন
২৫৯ জিহাদ ও যুদ্ধ সমান্তরাল নয়
২৬২ সশস্ত্র জিহাদ ও যুদ্ধের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য
২৭০ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই সশস্ত্র জিহাদের উদ্দেশ্য
২৭৫ রাসূল প্রদর্শিত সশস্ত্র জিহাদের পদ্ধতি
২৮৪ ইসলামে জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
২৮৬ জিহাদে নিয়োজিত হবার শর্তাবলী
২৮৮ জিহাদের স্তরসমূহ
২৯২ ঐক্যবদ্ধভাবে জিহাদ করতে হবে
২৯৩ জিহাদ মৃত্যু ভীতি দূর করে
৩০৯ জিহাদের সম্মান ও মর্যাদা
৩১১ জিহাদকারীর জিম্মাদারী স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেন
৩১২ জিহাদকারী সর্বোত্তম জীবনের অধিকারী
৩১৫ জিহাদে ধন-সম্পদ ও প্রাণ নিয়োগ করতে হবে
৩১৯ জিহাদ বাস্তবায়নে দান করার মর্যাদা

www.pathagar.com

৩২১ জিহাদী কর্মকান্ডে ব্যয় না করার পরিণতি
৩২২ জিহাদী কর্মকান্ডে ব্যয়কারী উত্তম বিনিময় লাভ করবে
৩২৬ জিহাদই জান্নাত লাভের একমাত্র মাধ্যম
৩২৭ জান্নাত লাভের সহজ পথ শাহাদাত
৩২৮ নির্ভীক মুজাহিদদের জন্যই আল্লাহর জান্নাত
৩২৯ শাহাদাত আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার
৩৩৩ শহীদগণ আল্লাহর রহমতের অধিকারী
৩৩৪ জিহাদকারীর অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ
৩৩৭ আল্লাহর পথে জীবন দান–জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ
৩৩৯ জান্নাতে শহীদের কামনা
৩৪০ জান্নাতে শহীদগণ উড়ে বেড়াবে
৩৪১ শহিদী মৃত্যুর পূর্বক্ষণে জান্নাত দেখানো হবে
৩৪৩ শহীদগণ নবী-রাসূলদের কাতারে অবস্থান করবেন
৩৪৪ শহীদগণ মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্ত
৩৪৬ জিহাদ করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির মৃত্যু হবে মুনাফিকী স্বভাবের ওপরে
৩৪৭ জিহাদকারীকে সহযোগিতা করার সম্মান ও মর্যাদা
৩৫১ নারীর জিহাদ

৩৫৭ নিজ পরিবারবর্গের প্রতি আমার অসিয়্যত

৩৫৯ যে কারণে লেখা এই অসিয়্যত
৩৬৪ আমার পক্ষ থেকে যাদের জন্য লেখা এ অসিয়্যত
৩৬৫ পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়
৩৬৭ পার্থিব জীবন ছায়ার মতোই ক্ষণস্থায়ী
৩৬৯ মৃত্যু এক মহাসত্য- এ থেকে কেউ পালাতে পারবে না
৩৬৯ মৃত্যুর সময় এলে কেউ কাউকে বাঁচাতে পারবে না
৩৭০ দুনিয়া পূজারী লোকেরা মৃত্যুর সময় আফসোস করবে

www.pathagar.com

৩৭১ মৃত্যুযন্ত্রণা অসহনীয় অবর্ণনীয়
৩৭২ মৃত ব্যক্তির পরকাল যাত্রা
৩৭৫ পরকালের প্রস্তুতির জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার প্রয়োজন
৩৭৬ আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের করণীয়
৩৭৭ ধৈর্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে
৩৮০ জান্নাতে আমরা মিলিত হবো
৩৮৩ মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়ার চাইতে শ্রেষ্ঠ হাদীয়া নেই
৩৮৪ পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর সন্তানদের করণীয়
৩৮৬ মায়ের প্রতি সদাচারণ করবে
৩৮৮ পরিবারভুক্তদের সাথে ভালোবাসার বন্ধন অটুট রাখবে
৩৮৮ চরিত্রহীন লোকদের বন্ধু বানাবে না
৩৯০ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির হক আদায় করবে
৩৯৩ সন্তানদের চরিত্র গঠনে কোরআনিক ফর্মূলা
৩৯৮ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলবে
৪০০ তওবা করা অভ্যাসে পরিণত করবে
৪০২ হালাল পন্থায় রুজি উপার্জন করবে
৪০৪ সুন্দর জীবন গড়ার লক্ষ্যে কোরআন বুঝে তিলাওয়াত করবে
৪০৫ নামাজকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ইবাদাত বানাবে
৪০৭ মহিলাদের পর্দার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে
৪০৭ সাংগঠনিক জীবনের প্রতি গুরুত্ব দিবে
৪০৯ আমার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি নসিহত
৪১১ অচেনা গন্তব্যের যাত্রী আমি
৪১৩ জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) এর দোয়া
৪১৪ আক্ষেপ!
৪১৫ ফরিয়াদ

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনের মু'জিজা

THE SCIENTIFIC MIRACLES
IN
THE HOLY QUR'AN

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহাবিশ্বের চির বিস্ময় আল কোরআন

মহাপবিত্র আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে ১৩৯৮ বছর অর্থাৎ প্রায় ১৪০০ শত বছর পূর্বে ৬১০ খৃষ্টাব্দে। এ মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হবার সময়কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গবেষক, চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে পবিত্র কোরআন নিয়ে কৌতুহলের শেষ তো হয়ইনি, বরং পবিত্র কোরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কুল-কিনারাহীন অগাধ জ্ঞান-সমুদ্রের সন্ধান পেয়ে অজানাকে জানার কৌতুহল ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাচ্ছে। সেই সাথে এ কথা এখানে উল্লেখ করাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কোরআন অবতীর্ণ হবার যুগ থেকে বর্তমান শতাব্দীর চলমান যুগ পর্যন্ত মহাগ্রন্থ আল কোরআন নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে যে গবেষণা ও বিশ্লেষণ হয়েছে, এ পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ নিয়ে এর শতভাগের একভাগও গবেষণা হয়নি এবং হবার মতো কোনো গ্রন্থের অস্তিত্বও এই পৃথিবীতে নেই। কোরআন নিয়ে গবেষণার সমাপ্তি নেই এবং পৃথিবী ও মানব সভ্যতার অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত গবেষণা চলতেই থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ্। আর মানুষ লাভ করতে থাকবে নিত্য নতুন তথ্য ও তত্ত্ব।

পৃথিবীর সর্বকালের, সকল শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ যে মহামানবের মাধ্যমে মানব সভ্যতা জীবন বিধান ও জ্ঞান সমুদ্রের অতুলনীয় মহাবিস্ময়কর গ্রন্থ আল কোরআন লাভ করেছে, সেই মহামানবকে জানার প্রচেষ্টা ও তাঁকে নিয়ে গবেষণারও সমাপ্তি নেই। বিশেষ করে বর্তমান এই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে পৃথিবীর সকল স্থানেই সেই মহামানবের পবিত্র নামটিই সর্বাধিক শ্রদ্ধাভরে গবেষক ও চিন্তানায়কদের মুখে বার বার উচ্চারিত হচ্ছে। তিনি ছিলেন নিরক্ষর, কোনো একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন তাঁর ছিলো না। পৃথিবীর কোনো শিক্ষাঙ্গন তাঁর পবিত্র চরণ ধূলির স্পর্শে ধন্য হয়নি এবং কোনো চিন্তাবিদ বা শিক্ষাবিদও তাঁর শিক্ষক ছিলেন না, তিনি কোনো গবেষণাগারে গবেষণাও করেননি। অক্ষর জ্ঞানের সাথেও তিনি পরিচিত ছিলেন না। তিনি সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী মানবতার বন্ধু ও শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।

এমন এক সমাজে ও পরিবেশে তিনি মাতৃগর্ভে থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে পবিত্র কোরআন লাভ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০টি বছর প্রতিপালিত হয়েছিলেন, যে সমাজ ও পরিবেশকে ঐতিহাসিকগণ অন্ধকারাচ্ছন্ন, বর্বর ও মূর্খতার যুগ বলে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত সমাজে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামান্যতম ছোঁয়াও ছিলো না। মানব সভ্যতা ও আরব সম্রাজ্যের ইতিহাস সম্পর্কে যারা সম্যক জ্ঞান রাখেন, তাঁরা অবগত আছেন মানব মন্ডলীর কোন্ ক্রান্তি লগ্নে

www.pathagar.com

মহামানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পৃথিবীতে আগমন করে পাপ-পংকিলতার আবর্তে নিমজ্জিত তদানীন্তন আরব সমাজকে তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজে পরিণত করেছিলেন। সমাজের যে মানুষগুলো ছিল চোর-ডাকাত, তারা হয়ে গেল মানুষের সম্পদের আমানতদার। যারা ছিল নারীর সতীত্ব হরনকারী, তারা হয়ে গেল নারীর সতীত্বের প্রহরী। যারা মানুষকে শোষণ করতো, তারাই নিজেদের সঞ্চিত ধনরাশি উন্মুক্ত হস্তে বিতরণ করে দিতে লাগলো দরিদ্র জনসাধারণের জন্যে। তাদের আদর্শ, চরিত্র ও আমানতদারিতার আমূল পরিবর্তন যে পরশ পাথরের ছোঁয়ায় সাধিত হলো, যে দর্শন দিয়ে তিনি সেই অধঃপতিত সমাজকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাজে পরিণত করলেন তার নাম মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় আল-কোরআন।

পবিত্র কোরআন হচ্ছে পরশ পাথর। কোরআন নামক পরশ পাথরের ছোঁয়া লাগলো লৌহসদৃশ মানব হযরত উমার (রাঃ) এর শরীরে। তিনি নবী করীম (সাঃ) কে হত্যা করতে এসেছিলেন। এ কোরআন নামক জীবন কাঠির ছোঁয়ায় তিনিই হয়ে গেলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর সম্পর্কে বললেন, 'আমার পরে কেউ নবী হবে না। যদি কেউ নবী হতো তাহলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা উমারকে নবী বানিয়ে দিতেন।' মৃতপ্রায়- ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে নবজীবন দান করলো এ পবিত্র কোরআন। এ মহাগ্রন্থ আল কোরআন মরুচারী রাখালদের দিগ্বিজয়ী সেনাপতি বানিয়ে দিলো, বেদুঈনদের ন্যায় বিচারক শাসক বানিয়ে দিলো, উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে পরিণত করলো শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী জাতিতে।

সুতরাং ভাবতে অবাক লাগে, একজন নিরক্ষর মানুষের মুখ থেকে প্রায় ১৪০০ শত বছর পূর্বে মহাবিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান- বিজ্ঞান সম্পর্কে যে কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছিলো, সে কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি করছে বর্তমানের আধুনিক জ্ঞান গবেষণাগারের গবেষক, চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীগণ। যাঁরা বিজ্ঞানের নানা দিক সম্পর্কিত নিত্য- নতুন তথ্য ও তত্ত্ব মানব সভ্যতার সম্মুখে পরিবেশন করে মানব জাতিকে বিস্মিত করছেন, সেই তাঁরাই যখন পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন, বিস্ময়ের ধাক্কায় কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছেন। অঢেল অর্থ, ধন-সম্পদ ব্যয় করে শতাব্দী ব্যাপী গবেষণাগারে গবেষণা করে মহাবিশ্ব, প্রাণী জগৎ ও অন্যান্য সৃষ্টিসমূহ সম্পর্কিত যে সকল তথ্য ও তত্ত্ব তাঁরা জানতে পারছেন, সেই কথাগুলোই অধিক ও অকাট্য সত্যাকারে, অখন্ডনীয় বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে এবং সর্বাধিক নির্ভরশীলতায় বিগত প্রায় ১৪০০ শত বছর পূর্বে মরুচারী নিরক্ষর একজন মানুষের মুখ থেকে কিভাবে উচ্চারিত হয়েছিলো!

www.pathagar.com

সে যুগে ছিলো না কোনো গবেষণাগার এবং জ্ঞান গবেষণার আধুনিক উপকরণ, যে মানুষটি ছিলেন অক্ষর জ্ঞানহীন, যাঁর পক্ষে কোনো কিছু লিখা বা সৃষ্টি সম্পর্কে আবিষ্কার করার সামান্যতম সুযোগ ছিলো না, কোনো চিন্তাবিদ, জ্ঞানী, গবেষক বা শিক্ষাবিদের সাথেও তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেনি। তাহলে সেই মানুষটির মুখ থেকে কিভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুদ্ঘাটিত তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছিলো?

এ ধরণের অগণিত প্রশ্ন মনের গহীনে উদিত হবার সাথে সাথে জ্ঞান-গবেষকদের মন-মস্তিষ্কে আরেকটি প্রশ্ন আলোড়ন তুলেছে, সে প্রশ্নটি হলো 'তাহলে কোরআন কি? মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস অনুযায়ী কোরআন কি শুধুই ধর্মগ্রন্থ? কোরআন যদি শুধু ধর্মগ্রন্থ হয়ে থাকে, তাহলে এর বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বই বা কি?'

এসব চিন্তা সত্যানুসন্ধিৎসু সন্ধানীদের চোখের নিদ্রা কেড়ে নিয়েছে। চিন্তা-ভাবনার অকুল সমুদ্রে তাঁরা খেই হারিয়ে অবশেষে কোরআন নিয়ে গবেষণায় রত হয়েছেন। গবেষণার এক পর্যায়ে কেউ কেউ মহাসত্যের স্বীকৃতি দিয়ে ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছেন। কেউ বা পার্থিব স্বার্থের কারণে মুখ না খুলে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

মুসলিমরা হচ্ছে সেই সৌভাগ্যবান জাতি, যাদের হাতে রয়েছে সেই পবিত্র কোরআনুল কারীম। আবার এ পবিত্র কোরআনকে যারা অমান্য করে, অনুসরণ করে না, তারা হলো সবচেয়ে বড় হতভাগা জাতি। যে জাতির কাছে আছে অকৃত্রিম কোরআন সে জাতি আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে হতভাগ্য। কারণ মুসলিম জনগোষ্ঠী কোরআন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। যে উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, উক্ত উদ্দেশ্যের বিষয়টিই সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রায় ভুলে গিয়েছে।

আর আজকের পৃথিবীতে প্রায় ১৫০ কোটি মুসলমান হলেও আজ তারা নিগৃহীত, নির্যাতিত, অবহেলিত, অত্যাচারিত। সমগ্র বিশ্বে বর্তমানে মুসলমানরা অত্যাচারিত হচ্ছে। প্রায় সকল মুসলিম দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন। প্রতিদিন পাখির মত গুলী করে শহীদ করা হচ্ছে মুসলমানদেরকে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

عن ثوبان رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعىْ عليكم كما تداعى الاكلة الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور

www.pathagar.com

عدوكم المهابة منكم وليقذ فن قلوبكم الوهن قال قائل يارسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت- (ابوداؤد)

হযরত ছাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শীঘ্রই আমার উম্মতের কাছে এমন একটি সময় আসবে, যখন দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি তাদের দিকে এমনভাবে ধাবিত হবে, যেমন ধাবিত হয় ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্যের দিকে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেদিন কি আমরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য থাকবো যে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি আমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য অগ্রসর হবে? নবী করীম (সাঃ) বললেন- না, বরং সেদিন তোমাদের সংখ্যা অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে বন্যার পানির ফেনা সমতুল্য। অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন তোমাদের মনে তাদের ভয় সৃষ্টি করে দিবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর হাবীব! আমাদের মনে এ দুর্বলতা ও ভীতি দেখা দেয়ার কি কারণ হবে? তিনি বললেন, যেহেতু সেদিন তোমরা দুনিয়াকে ভালোবাসবে এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করবে। (আবু দাউদ)

এই হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এমন একটি সময় আসবে, যখন পৃথিবীতে মুসলিম নামে পরিচিত লোকের সংখ্যা হবে অগণিত। কিন্তু তাদের ঈমানী শক্তি থাকবে না, তারা পৃথিবীতে ভোগ-বিলাসকে প্রাধান্য দিবে। ইসলামের শত্রুদের আনুগত্য করে হলেও ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকার চেষ্টা করবে। ইসলামের দুশমনরা সংখ্যায় অল্প হলেও তারাই মুসলমানদের ওপরে নির্যাতন করবে, মুসলমানদেরকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে। কারণ, শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে শাহাদাতবরণ করাকে মুসলমানরা পসন্দ করবে না। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে এমনভাবে মত্ত হয়ে থাকবে যে, তাদের চোখের সামনে অন্য মুসলিম নারী, শিশু, কিশোর, তরুণ-যুবক, বৃদ্ধ দুশমনদের হাতে লাঞ্ছিত-অপমানিত ও অত্যাচারিত হতে থাকবে, কিন্তু তারা মৌখিক প্রতিবাদও করবে না। মুসলমানরা নিজের যাবতীয় সহায়-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত, শক্তি-মত্তা ইসলামের দুশমনদের অধীন করে দিবে। নিজেদের অর্থ-সম্পদ শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে শত্রুকে পরাজিত করার মন-মানসিকতা মুসলমানদের থাকবে না, যদিও তারা সংখ্যায় হবে বিপুল। পবিত্র কোরআনের বিধান অনুসরণ না করার কারণে আজ এই অবস্থা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের হিদায়াত করুন।

www.pathagar.com

আধুনিক জ্ঞান-গবেষণাগারে পবিত্র কোরআন সম্পর্কিত যে গবেষণা হয়েছে এবং আধুনিক বিজ্ঞান কোরআনের যে কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি করছে, আমি তা থেকে যৎকিঞ্চিত পরিবেশন করার পূর্বে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে মূল বিষয়ের দিকে এগিয়ে যাবো ইন্‌শাআল্লাহ্।

অবিশ্বাসীদের প্রতি পবিত্র কোরআনের চ্যালেঞ্জ

মহাপবিত্র আল কোরআন যে মানব রচিত কোনো গ্রন্থ নয়, এ সত্যের স্বীকৃতি বহু সংখ্যক অমুসলিম চিন্তাবিদগণ দিয়েছেন। পৃথিবী বিখ্যাত গ্রন্থ On Heroes and Hero worship এর রচয়িতা টমাস কার্ললাইল, Muhammad and Muhamadanism গ্রন্থের রচয়িতা রেভারেন্ড আর বসওয়ার্থ স্মিথ, Decline and fall of the Roman Empire এর রচয়িতা ইতিহাসবেত্তা গিবন, The Lord Jesus in the Koran এর রচয়িতা জে, শিল্লিডি, ডি, ডি, The Hundred এর রচয়িতা ডঃ মাইকেল এইচ হার্ট, দার্শনিক জর্জ বার্নাড'শ, জন ডেভেন পোর্ট, এ, জে, আরবেরী, ফিলিপ হিট্টি, মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীসহ বহু সংখ্যক চিন্তানায়ক, গবেষক, ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পবিত্র কোরআনকে ঐশী গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি দিলেও অনেকের ভাগ্যেই মহাসত্য কবুল করার সৌভাগ্য হয়নি।

পবিত্র কোরআনের সম্মোহনী শক্তি, গবেষণা ও ব্যাখ্যা, শৈল্পিক চিত্র, কোরআনে বর্ণিত মনোজাগতিক চিত্র, মানবিক চিত্র, বিধানাবলী, সংঘটিত বিপর্যয়ের চিত্র, শান্তি ও শাস্তির দৃশ্যাবলী, কোরআনে অঙ্কিত কল্পনা ও রূপায়ণ, শৈল্পিক বিন্যাস, শৈল্পিক বিন্যাসের ধরন, এর সুর ও ছন্দ, বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিল, কোরআনে বর্ণিত চিত্রের উপাদান, বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, বিশাল কাহিনীর সংক্ষেপ ও বিস্তৃতি, উপসংহার ও পরিণতি বর্ণনা, কাহিনী বর্ণনায় শৈল্পিক সংমিশ্রণ, কাহিনীর শৈল্পিক রূপ ও বৈশিষ্ট্য, বর্ণনার বিভিন্নতা, কাহিনী বর্ণনায় আকস্মিকভাবে রহস্যের দ্বার উন্মোচন, দৃশ্যান্তরে বিরতি, ঘটনার মাধ্যমে দৃশ্যাঙ্কন, আবেগ অনুভূতির চিত্র, কাহিনীতে ব্যক্তিত্বের ছাপ, কোরআনের বর্ণনা রীতি, মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরীক্ষা, ১৯ সংখ্যার অকল্পনীয় রহস্য ইত্যাদি মুযিজা বিজ্ঞানী ও চিন্তানায়কদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়েছে। ফলে তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, 'এ মহাগ্রন্থ অবশ্যই মানব রচিত নয়'।

পৃথিবীতে যে কয়টি গ্রন্থকে 'ধর্মগ্রন্থ' হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়, এর একটি গ্রন্থও 'নিজেকে নির্ভুল, এ গ্রন্থের একটি শব্দের প্রতি সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই,

www.pathagar.com

যদি সম্ভব হয় তাহলে পৃথিবীর সকলে সকল শক্তি প্রয়োগ করে এমন একটি গ্রন্থ বা এই গ্রন্থে বর্ণিত ছন্দের অনুরূপ একটি ছন্দ রচনা করো আনো।'

এ ধরণের দুঃসাহসিক ও অনতিক্রম্য চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র আল কোরআন। পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং যে দেশে ও পরিবেশে তা অবতীর্ণ হয়েছিলো, সে যুগে আরবী সাহিত্য ছন্দ ও অলঙ্কারিক দিক থেকে সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করছিলো। যাদের সম্মুখে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিলো তাদের মধ্যে আরবী ভাষাসহ অন্যান্য ভাষায় পন্ডিত ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরাও ছিলো। বর্তমানেও জন্মসূত্রে আরবী ভাষী এবং আরবে বসবাস করেন চৌদ্দ মিলিয়নের বেশী খৃষ্টান। আরবী ভাষী ইয়াহূদীদের সংখ্যাও কম নয়। সেই আরবী ভাষাতেই প্রায় চৌদ্দ শত বছর পূর্বে পবিত্র কোরআন অবিশ্বাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ–

আমি আমার বান্দার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তার সত্যতা সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ হয় তাহলে যাও, তার মতো করে একটি সূরা তোমরাও রচনা করে নিয়ে এসো, এক আল্লাহ ব্যতিত তোমাদের আর যেসব বন্ধুবান্ধব আছে প্রয়োজনে তাদেরকেও সহযোগিতার জন্য ডাকো, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও। (সূরা বাকারা-২৩)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ، قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ–

তারা কি এ কথা বলে, এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ স.) এ গ্রন্থটি রচনা করে নিয়েছে, (হে নবী) আপনি এদেরকে বলুন, তোমরা তোমাদের দাবীতে যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তোমরাও এমনি ধরনের একটি সূরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর যাদেরকে তোমরা ডাকতে চাও তাদেরকে ডেকে সাহায্য নাও। (সূরা ইউনুস- ৩৮)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ

www.pathagar.com

اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ–

অথবা এরা কি এ কথা বলে, (মুহাম্মাদ স. নামের ব্যক্তি) কোরআন নিজে নিজে রচনা করে নিয়েছে! (হে নবী) আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা যদি তাই মনে করো তাহলে নিয়ে এসো এর অনুরূপ মাত্র দশটি স্বরচিত সূরা এবং আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য যাদের তোমরা সাহায্যের জন্য ডাকতে পারো তাদের ডেকে নাও, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও। (সূরা হূদ- ১৩)

فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ–

তারা নিজেদের কথায় যদি সত্যবাদী হয় তাহলে তারাও এ কোরআনের মতো কিছু একটা রচনা করে নিয়ে আসুক না! (সূরা তুর- ৩৪)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا–

(হে নবী) আপনি তাদেরকে বলে দিন, যদি সকল মানুষ ও জ্বিন এ কাজের জন্য একত্রিত হয় যে, তারা এ কোরআনের অনুরূপ কোনো কিছু বানিয়ে আনবে, তাতেও তারা এর মতো কিছু বানিয়ে আনতে পারবে না, যদিও এ ব্যাপারে তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয় তবুও নয়। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৮৮)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীর সকল অবিশ্বাসীদের প্রতি পবিত্র কোরআন সম্পর্কে এ ধরণের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, কিন্তু বিগত চৌদ্দ শত বছরেও কারো পক্ষেই এ চ্যালে গ্রহণ করে কোরআনের অনুরূপ ছোট্ট একটি সূরাও কোনো অবিশ্বাসীর পক্ষে বানানো সম্ভব হয়নি। পৃথিবীতে যে কয়টি গ্রন্থ ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে বরিত হয়েছে আসছে, কেউ ইচ্ছে করলে উক্ত গ্রন্থসমূহ দেখতে পারেন, কোনো একটি গ্রন্থেও এ ধরণের কোনো চ্যালেঞ্জ নেই।

প্রশ্ন হলো, কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসী অসংখ্য আরবী ভাষী সাধারণ মানুষ এবং অসাধারণ মানুষ তথা পন্ডিতবর্গ থাকার পরও কেনো তারা পবিত্র কোরআনের ছুড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি?

এ প্রশ্নের জবাবও মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমেই দিয়েছেন–

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ–

এ কোরআন এমন কোনো গ্রন্থ নয় যে, আল্লাহর ওহী ব্যতিরেকে কারো ইচ্ছামাফিক বানিয়ে নেয়া যাবে। (সূরা ইউনুস- ৩৭)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন, তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী ব্যতিত এ ধরণের কোরআন বানানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ পবিত্র কোরআন নবী করীম (সাঃ) রচনা করেননি এবং কোনো মানুষের পক্ষেই তা রচনা করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষের শিক্ষার জন্য যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, তা অতীতের বা বর্তমানের কোনো ইতিহাস গবেষকই ভুল প্রমাণ করতে পারেননি। নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র মুখ উচ্চারিত এসব ঐতিহাসিক ঘটনা যাদের সম্মুখে উচ্চারিত হয়েছিলো, তাদের মধ্যেও বহু সংখ্যক ঐতিহাসিক উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা হাজার বছর বা কয়েক শতাব্দী পূর্বের বর্ণিত ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। কোরআন বর্ণিত ইতিহাস শুনে তাঁরা সামান্যতম আপত্তিও করেননি। বর্তমানে অজানাকে জানার জন্য পৃথিবীর ভূগর্ভ, স্থল ভাগ, জল ভাগ ও মহাশূন্যের বিভিন্ন স্থানে ছুটে বেড়াচ্ছেন, তাঁদেরও কেউ কোরআন বর্ণিত ইতিহাস সম্পর্কে আপত্তি তোলার সাহস দেখাচ্ছেন না।

একমাত্র কোরআন ব্যতিত পৃথিবীর কোনো একটি ধর্মগ্রন্থেও 'গ্রন্থটি' সত্য বা মিথ্যা– তা প্রমাণের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোনো একটি ধর্মগ্রন্থে মূলনীতি হিসেবে বর্ণনা করা হলো, 'মাংসভোজী কোনো প্রাণী কখনো তৃণভোজী হবে না।' অর্থাৎ নিয়মটি অপরিবর্তনীয়। এখন কোনো মানুষ দীর্ঘ প্রচেষ্টায় মাংসভোজী প্রাণীকে তৃণভোজী বানালো। অথবা হঠাৎ করেই কিছু সংখ্যক মাংষাশী প্রাণী তৃণভোজী হয়ে উঠলো।

অবস্থা যদি এ রকম হয়ই, তাহলে উক্ত ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে সন্দেহের দানা বেঁধে উঠবে। অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ অপরিবর্তনীয় মূলনীতি হিসেবে যা কিছু বর্ণনা করছে বাস্তবে ঘটছে তার বিপরীত। কিন্তু মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি মানব জাতির জন্য যে জীবন বিধান পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, তার মধ্যে সামান্যতম কোনো বৈপরীত্য নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন–

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا–

www.pathagar.com

এরা কি কোরআন (ও তার সুত্র নিয়ে চিন্তা) গবেষণা করেনা? এ গ্রন্থটি যদি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক গড়মিল দেখতে পেতো। (সূরা আননিসা-৮২)

অনেক গড়মিল দূরে থাক, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গড়মিলও পবিত্র কোরআনে নেই এবং এ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে গত চৌদ্দশত বছর পূর্বে। কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি সামান্য গড়মিল বের করা। এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, 'গ্রন্থটি সত্য বা মিথ্যা' প্রমাণ করার ব্যবস্থা এক মাত্র কোরআন ব্যতিত কোনো গ্রন্থেই রাখা হয়নি।

এরপর দেখুন, কোরআনে যে বৈজ্ঞানিক থিউরী বর্ণনা করা হয়েছে, তাও আজ পর্যন্ত ভুল বলে কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। পৃথিবীর সৃষ্টি, মহাকাশ, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, মাধ্যাকার্ষণ শক্তি, ব্লাক হোল, গতিবিদ্যা, সম্প্রসারণ শক্তি, উল্কা পতন, মহাশূন্যে পাথরের সাম্রাজ্য, পৃথিবী ব্যতিত অন্য কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব, পৃথিবীর স্থল ভাগ, পাহাড়, বনভূমি, ভূগর্ভ, জল ভাগের তলদেশ, পানির উপাদান, মাটির উপাদান, লৌহ, খনিজ পদার্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য, আকরিক, তামা, প্রাণী জগৎ, মানবদেহ, মাতৃগর্ভে মানুষের আকৃতি গঠন, লিঙ্গ নির্ধারণ ইত্যাদি সম্পর্কিত কোরআনে বর্ণিত সুত্র কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষেও কিয়ামত পর্যন্ত অস্বীকার করা সম্ভব হবে না।

কোরআন বিদ্বেষী কোনো গবেষক, চিন্তাবিদ বা বিজ্ঞানীও কোরআন বর্ণিত বৈজ্ঞানিক সুত্র অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছেন না। কারণ তিনি প্রকৃত সত্য অস্বীকার করলে অন্য কোনো বিজ্ঞানী তা গবেষণার মাধ্যমে সত্য বলে মত প্রকাশ করবেন।

অভ্রান্ত জ্ঞানের উৎস আল কোরআন

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন এবং এই জ্ঞান দুই প্রকার। একটি ওহীর জ্ঞান যা আল্লাহ তায়ালা নবীদের মাধ্যমে দিয়েছেন। আরেকটি হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক দিয়ে অর্জিত জ্ঞান। চিন্তা-চেতনা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান। আমাদের কাছে যে জ্ঞান আছে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً –

(হে মানব জাতি!) তোমাদেরকে সামান্যতম জ্ঞান দান করা হয়েছে।

গোটা পৃথিবীর মানুষের যত জ্ঞান আছে, মানুষ সৃষ্টির প্রথম দিন হতে আজ পর্যন্ত এবং এখন হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত জ্ঞান আসবে, সমস্ত জ্ঞান এক জায়গায়

www.pathagar.com

করলেও আল্লাহ তা'য়ালার অনন্ত-অসীম জ্ঞানের মহাসমুদ্রের এক বিন্দু জ্ঞানের সমপরিমাণও হবে না। মহান আল্লাহ বলছেন, মানুষকে সামান্যতম জ্ঞান দেয়া হয়েছে। আজ আমরা সে সামান্যতম জ্ঞানের কারণে কোথা হতে কোথায় চলে গিয়েছি। গরুর গাড়ি হতে রকেট, টেলিগ্রাফ, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেট, ওয়াবে সাইট হতে মোবাইল ফোন পর্যন্ত চলে গেছি। ই-মেইলে কথাগুলো লিখে বা ছবি দিয়ে কোড বাটনে চাপ দিলে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কয়েক সেকেন্ডের ভেতরে সে দেশের পত্রিকায় পূর্ণ ছবি এবং খবর ছাপা হবে। ক্ষুদ্রাকৃতির একটি সীম কার্ডের সাহায্যে মোবাইল ফোনে মুহূর্তের মধ্যেই পৃথিবীর অপরপ্রান্তে অবস্থানরত কারো সাথে সংবাদ আদান প্রদান করা যায়।

আরও আশ্চর্য হওয়ার মত বিষয় হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্যাটেলাইট ছেড়ে দেয়া হয়েছে মহাশূন্যের ভেতরে। এ স্যাটেলাইট চালক ব্যতীত বছরের পর বছর ঘুরছেই। পৃথিবীর মাটি হতে প্রায় চারশত মাইল ওপর দিয়ে পৃথিবীর ছবি ও অন্যান্য তথ্য জানতে পারছে ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়াগুলোয়। ঐ স্যাটেলাইটের যান্ত্রিক কোন গোলযোগ দেখা দিলে পৃথিবীর মাটিতে বসে বিজ্ঞানীরা কম্পিউটারের মাধ্যমে মনিটরিং করে চারশ' মাইল ওপরের মেশিন মেরামত করছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তোমাদেরকে সামান্যতম জ্ঞান প্রদান করেছি। এ যদি হয় সামান্যতম জ্ঞান, তাহলে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান কত বেশী! সে মহামহিয়ান আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে–

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ–

আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য এসেছে আলো ও স্পষ্ট কিতাব।

এই আলো হচ্ছে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। আর কিতাব হচ্ছে পবিত্র কোরআন মাজীদ। 'কোরআন' শব্দের অর্থ যা বার বার পড়তে হয়, পবিত্র কোরআনে 'কোরআন' শব্দটি ৬৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। 'কোরআন' সার্থক এক নাম এবং এ নামকরণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোরআনের তুলনায় পঠিত হয়েছে বা পাঠ করা হয় এমন গ্রন্থ সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় আরেকটি নেই। সমগ্র পৃথিবীতে এমন একটি মুহূর্তও অতিবাহিত হয় না, যে মুহূর্তে কোথাও না কোথাও কোরআন পাঠ করা হচ্ছে না। এ মহাগ্রন্থের আরেক নাম 'কিতাব' যার অর্থ লিখিত গ্রন্থ। এটিও পবিত্র কোরআনের আরেকটি সার্থক নাম এবং এ নামকরণও করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। গোটা বিশ্বে কোরআনের তুলনায় লিখা হয়েছে বা ছাপা

www.pathagar.com

হয়েছে এমন কোনো গ্রন্থের নাম কেউই উচ্চারণ করতে পারবে না। এ মহাগ্রন্থের আরো কয়েকটি নাম রয়েছে এবং এসব নামকরণও করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। এই কোরআন যখন নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ হলো এবং তিনি তিলাওয়াত করলেন, তখন ইসলামের দুশমনরা বলতে লাগলো এই লোকটি পাগল হয়ে গিয়েছে (নাউযুবিল্লাহ্)। নবী করীম (সাঃ) কে যখন পাগল বলা হলো তখন তিনি তাদের কথার কোন উত্তর দিলেন না। উত্তর এলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে–

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ–

তোমাদের সাথী পাগল নন। (আল কোরআন)

আল্লাহ্র রাসূলের কোরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে মানুষ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগলো। পুরো ত্রিশ পারা কোরআন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রতি একসাথে অবতীর্ণ হয়নি। একটু একটু করে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে দীর্ঘ তেইশ বছরে অবতীর্ণ হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে কোনে বৈপরীত্য নেই, নেই কোনো দুর্বল সুত্র। জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখা এ কোরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। দুর্বল বা মহাকালের আবর্তন-বিবর্তনে পরিবর্তনীয় কোনো জ্ঞানসুত্রও এ কিতাবে বর্ণিত হয়নি। মানুষের সকল প্রয়োজনে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা অকাট্য, অখন্ডনীয়, অপরিবর্তনীয়, মানব স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল, বিশ্ব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল, পালনে ও অনুসরণে সহজ সাধ্য, যুক্তিগ্রাহ্য ও অভ্রান্ত। পবিত্র কোরআন অবতীর্ণের কাল থেকে বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এ কথা চর্চা, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে, কোরআন যা কিছু বর্ণনা করেছে তাই অকাট্য সত্য, অভ্রান্ত এবং এ কোরআনই কেবল মাত্র অপরিবর্তনীয় ও অভ্রান্ত জ্ঞানের উৎস।

অগণিত মানুষকে অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা তথা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে মুসলিম বিশ্বের মূল্যবান লুণ্ঠিত সম্পদ ব্যয় করে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়া ব্যবহার করে বর্তমান পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী চরম সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ আবহাওয়া প্রস্তুত করা হয়েছে। ক্ষমতার দণ্ডে হুমকি-ধমকি প্রদর্শন করে প্রকৃত সত্য গোপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তবে দুশমনদের জেনে রাখা ভালো, 'এ আকাশ চিরদিন মেঘে ঢাকা রবে না'। একদিন অবশ্যই আলোয় আলোয় ভরে উঠবে। সেই সোনালী আলোকচ্ছটায় সকলের সম্মুখে পবিত্র কোরআনের অভ্রান্ত জ্ঞান মানুষকে মহাসত্যের দিকে ধাবিত করবে। আজ যা গোপন করা হচ্ছে, তা আগামীল অবশ্যই প্রকাশিত হবেই হবে। হিংসাত্মক মনোভাব পোষণ করে

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনের অভ্রান্ত জ্ঞান থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে ক্রমশঃ মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের কৃষ্ণকালো গহ্বরের দিকেই নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'য়ালা এ অবস্থা থেকে মানব সভ্যতাকে পরিত্রাণ দান করুন।

কোরআনকে বুঝার জন্য সহজ করা হয়েছে

মানুষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে পবিত্র কোরআনের আয়াত সংখ্যা, রুকুর সংখ্যা, পারার সংখ্যা, সূরার সংখ্যা, অক্ষরের সংখ্যা, শব্দ সংখ্যা, বাক্য সংখ্যা কত ইত্যাদি। এ সকল কিছু কম্পিউটারে প্রবেশ করিয়ে কম্পিউটারকে প্রশ্ন করা হয়েছে এটা মানুষের বানানো কি না? মানুষের পক্ষে কি এটা তৈরি করা সম্ভব? কম্পিউটার উত্তর দিয়েছে, সংখ্যা তথ্যের দিক হতে ভারসাম্যপূর্ণ এমন কিতাব মানুষের দ্বারা তৈরি করা সম্ভব নয়।

সুতরাং পবিত্র কোরআন হলো মানুষের বেঁচে থাকার দলিল। এ কোরআন যেন নকল না হতে পারে সে জন্য কোরআনে কারীমকে মানুষের স্মৃতিশক্তির মধ্যে হেফাজত করার ব্যবস্থা করেছেন মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। পৃথিবীর মানুষ যাকিছু রেকর্ড করে রাখে, তার উপর যদি অন্য কিছু রেকর্ড করে তাহলে পূর্বের রেকর্ড করা সবকিছু মুছে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের স্মৃতির ভেতরে এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যাতে দুনিয়ার সকল কিছু যদি মুখস্থ্ করে রেকর্ড করে রাখা হয় তাহলে পূর্বেরটা মুছবে না।

এ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ্ আছে, যেমন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ্ বেদ। সমগ্র পৃথিবীতে বেদের একজন হাফেজ পাওয়া যাবে না। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ্ বাইবেল, তাদের মধ্যে বাইবেলের একজন হাফেজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। পবিত্র কোরআন ব্যতিত এমন কোনো গ্রন্থ্ নেই, যে গ্রন্থের একজন হাফেজও খুঁজে পাওয়া যাবে। পবিত্র কোরআনুল কারীম মুখস্থ্ করার ও বুঝার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা সহজ করেছেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ–

আমি এই কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়েছি। এ থেকে উপদেশ গ্রহণে কেউ প্রস্তুত আছে কি? (সূরা ক্বামার ঃ ১৭)

পবিত্র কোরনানের অন্যত্র বলা হচ্ছে–

اَلرَّحْمٰنُ، عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ–

www.pathagar.com

পরম করুণাময় আল্লাহ্ এই কোরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। (আর্ রাহ্মান-১ - ৪)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ-

আমি আমার বাণী পৌঁছানোর জন্য যখনই কোন রাসূল প্রেরণ করেছি, সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায়ই পয়গাম পৌঁছিয়েছে, যেন তিনি তাদেরকে অত্যন্ত ভালোভাবে স্পষ্টরূপে বুঝাতে সক্ষম হয়। (সূরা ইবরাহীম-৪)

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا-

হে রাসূল! এ বাণীকে আমি সহজ করে আপনার ভাষায় এ জন্য অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি মুত্তাকিদেরকে সুসংবাদ দিতে ও সীমালংঘনকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। (সূরা মারিয়াম)

কোরআনের বক্তব্যে বিন্দুমাত্র দুর্বোধ্যতা নেই। এ কিতাব যা বলে তা অত্যন্ত সহজ সরল ও স্পষ্টভাবে বলে দেয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ، اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ-

এটা সেই কিতাবের আয়াত, যা নিজের বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। আমি একে কোরআন রূপে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। (সূরা ইউসুফ-১-২)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ-

হে রাসুল! এভাবে আমি একে আরবী কোরআন বানিয়ে অবতীর্ণ করেছি এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সতর্কবাণী করেছি। (সূরা ত্বা-হা-১১৩)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ، قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ-

এ কোরআনের ভেতরে আমি মানুষের জন্য নানা ধরনের উপমা পেশ করেছি যেন

তারা সাবধান হয়ে যায়, আরবী ভাষার কোরআন–যাতে কোন বক্রতা নেই। যাতে তারা নিকৃষ্ট পরিণাম থেকে রক্ষা পায়। (সূরা যুমার–২৭-২৮)

এ কিতাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট, এর ভেতরে না বুঝার মতো কোন জটিল বিষয়ের অবতারণা করা হয়নি। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ، بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا، فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُوْنَ-

এটা পরম দাতা ও মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা জিনিস। এটি এমন এক গ্রন্থ্ যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরবী ভাষার কোরআন। সেসব লোকদের জন্য যারা জ্ঞানের অধিকারী, সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী। (সূরা হা-মীম-সাজদাহ্–২-৪)

وَلَوْجَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ، ءَ اَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ-

আমি যদি একে অনারব কোরআন বানিয়ে প্রেরণ করতাম তাহলে এসব লোক বলতো, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি কেন? কি আশ্চর্য কথা, অনারব বাণীর শ্রোতা আরবী ভাষাভাষী! (সূরা হা-মীম-সাজদাহ্–৪৪)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মহাকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলেছেন–

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ-

আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, আর নক্ষত্রমণ্ডলী যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। (সূরা ইনফিতার- ১-২))

পবিত্র কোরআনে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর্যায় ক্রমিক মেয়াদকাল সম্পর্কে বলা হচ্ছে–

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْ

بَعْدِ اِذْنِهٖ، ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ–

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (সূরা ইউনুস-৩)

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেছেন–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً، وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَا اِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ–

আর তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর তোমাদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য। তুমি যদি বল, মৃত্যুর পর তোমরা অবশ্যই উত্থিত হবে। কাফেররা নিশ্চয়ই বলবে, তাতো সুস্পষ্ট যাদু। (সূরা হুদ-৭)

الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا–

তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সকল কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই রহমান তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে, তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ। (সূরা ফুরকান-৫৯)

পবিত্র কোরআনে আলোচিত ও বর্ণিত সকল বিষয় একত্রিত করলে দেখা যাবে, সকল বিষয়ই অত্যন্ত স্পষ্ট এবং এসবে কোনোই জটিলতা নেই। মানুষ সহজে যা বুঝে এবং মানুষের অনুভূতিতে ধরা পড়বে, সে পদ্ধতিতেই পবিত্র কোরআন তা বর্ণনা করেছে। এ জন্যেই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে একাধিকবার বলেছেন, 'আমি এ কোরআনকে মানুষের বুঝার জন্যে অত্যন্ত সহজ করেছি।'

কোরআন বিজ্ঞানকে পথ দেখায়

কোরআনের আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানের আবিষ্কার কোরআনের বক্তব্যের মোটেই পরিপন্থী নয়। তবে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ পৃথিবী সৃষ্টির যাবতীয় পর্যায়ক্রমিক মেয়াদকাল, ব্যবস্থাপনাকে নিজ থেকেই বা আপনা-আপনিই সৃষ্টি হওয়ার কথা বলেছেন, আবার কেউ কেউ সৃষ্টিকর্তাকে মেনে নিচ্ছেন। আবার কেউ ভুল করছেন আরবী ভাষায় পারদর্শী না হবার কারণে। যেমন অনেকেই প্রশ্ন করেন, 'কোরআন বলছে পৃথিবী মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু বিজ্ঞান বলছে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে ছয়টি মেয়াদকালে বা ছয়টি স্তরে।' কোরআন পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে যেখানে ছয় দিনের কথা বলা হয়েছে সেখানে 'আইয়াম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী 'ইয়াওমুন' শব্দের বহুবচন হলো 'আইয়াম'। এর অর্থ হলো দিন বা অনেক দীর্ঘ সময় এমনকি যুগকেও বুঝায়। যেমন 'আইয়ামে জাহিলিয়াত' অর্থাৎ মুর্খতার যুগ। আইয়াম বা ইয়াওমুন শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে এবং তা প্রয়োগও হয় যথার্থ ক্ষেত্রে। এ শব্দের অর্থ শুধু মাত্র দিন নয়, বিশেষ মেয়াদকালকেও 'আইয়াম' বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান যেখানে ভুল করেনি সেখানে কোরআনে ও বিজ্ঞানে কোন সংঘর্ষ নেই। আর যেখানেই বিজ্ঞান ভুল করেছে সেখানেই কোরআনের সাথে বিজ্ঞানের সংঘর্ষ। বর্তমানে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের উন্নতি দেখে এক শ্রেণীর মানুষ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এ যুগের জন্য অনুপযুক্ত বলে ভাবছে। এ জন্যে কোরআনের বৈজ্ঞানিক আলোচনার যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি এ বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করাও বর্তমান সময়ের দাবী।

কোরআন ও বিজ্ঞান

সচেতন মহল মাত্রই অবগত আছেন, বিজ্ঞান তার পূর্ব ধারণা থেকে প্রায়ই ইউটার্ণ করে অবস্থান পরিবর্তন করে। আজ যে কথা বলে, ক্ষেত্র বিশেষে আগামী কাল বলে ভিন্নরূপ কথা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বিজ্ঞানের সুত্র দিয়েছেন, কিন্তু পবিত্র কোরআন কোনো বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়, অথবা এটি কোনো উন্নতমানের সাহিত্য গ্রন্থও নয়। বরং পবিত্র কোরআন হলো আয়াতের গ্রন্থ যা অগণিত নিদর্শনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। মহাগ্রন্থ আল কোরআন হিদায়াতের গ্রন্থ, যা মানুষকে সকল বিষয়ে সঠিক পথ প্রদর্শন করে।

মানুষের প্রয়োজনেই কোরআনে বস্তুজগৎ তথা বিজ্ঞানের বহু বিষয় আলোচিত

www.pathagar.com

হয়েছে। এখানেই কোরআনের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক। কোরআন প্রচলিত কোন ধর্মগ্রন্থ বা কোন বিষয়ের গবেষণামূলক গ্রন্থের ন্যায় মানব রচিত পুস্তক নয়। নবী করীম (সাঃ) পবিত্র কোরআন অবিকল যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন আজও তাই আছে। পৃথিবীতে কোরআনই একমাত্র মূল গ্রন্থ যা আজও অবিকৃত, যার কোন বিকল্প অনুলিপিও নেই। এ কোরআন কিয়ামত পর্যন্ত ঐ সকল মানুষকেই মহাসত্যের ব্যাপারে নির্ভুল পথ প্রদর্শন করবে, যে সকল মানুষ সত্যানুসন্ধিৎসু, সত্যের অন্বেষায় যারা ব্যকুল এবং সকল বিষয়েই যারা নির্ভুল সত্য জানতে আগ্রহী।

পবিত্র কোরআন সমগ্র বিশ্বের মহাবিস্ময় এবং নবী করীম (সাঃ) এর এক জীবন্ত মুজিযা। এ কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা সবকিছু স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। মানব গোষ্ঠীর জন্য যা অত্যবশ্যকীয় তার সবকিছুর মূলনীতি নিশ্চিত করে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে– এ কিতাব চিরন্তন। আপনারা জানেন, আবহাওয়ার বার্তা বিভাগ থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়া হয়। যেমন– এই এলাকার ওপর দিয়ে এত মাইল বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে এবং তার সাথে জলোচ্ছ্বাস ও বৃষ্টিপাতও হতে পারে।

আবহাওয়াবিদগণ একটি সম্ভাবনার কথা বলে থাকেন; কিন্তু কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না যে, এই এলাকার ওপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হবেই। কোন বিজ্ঞানী একথা বলতে সাহস পাবে না। কিন্তু কোরআন যা বলেছে নিশ্চিত করেই তা বলেছে। যেমন–

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ–

আসমান যখন ফেটে যাবে। তারাগুলো যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। সমুদ্র যখন দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে। কবরগুলো যখন খুলে দেয়া হবে। (সূরা ইনফিতার-১–৪)

পবিত্র কোরআনে সম্ভাবনামূলক কোনো কথা নেই যে, আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে, তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে, কবরসমূহ হতে সকল প্রাণী উত্থিত হতে পারে ইত্যাদি। মহান আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয় নিশ্চিত করে বলেছেন। কোরআনে বর্ণিত কোনো বিষয়ে সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ নেই; সবই অকাট্য।

আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে যত সংখ্যক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, সকল নবী-রাসূলের কথাই এক, কেউ দু'ধরনের কথা বলেননি। পৃথিবীর দার্শনিক ও

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কথা বলেছেন। কার্ল মার্ক্স বলেছেন, মানুষ হচ্ছে পেট সর্বস্ব জীব। ফ্রয়েড বলেছেন, সেক্স সর্বস্ব জীব। ডারউইন বলেছেন, মানুষতো বানরের বংশধর। পৃথিবীর বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের একজনের কথার সাথে আরেক জনের কথার কোনো মিল নেই। আর হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে নবী করীম (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের কথায় কোনো গড়মিল নেই। কেউ এ কথা বলেননি যে, পরকাল হতে পারে বা সকল মানুষের হাশরের ময়দানে হিসেব দিতে হতে পারে। এ ধরনের কোনো অনিশ্চিত কথা নবী-রাসূল বলেননি। নবী-রাসূলগণ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে নিশ্চিত হয়ে বলেছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা পাঁচটি গ্রহ একই সাথে একই রেখার মধ্যে যদি এসে যায়, তাহলে পৃথিবীর মানুষগুলো সমস্যায় পড়বে। কোরআনে কারীম সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই বলে তারা এমন চিন্তা করেন। এ পৃথিবীর কিছুই হঠাৎ করে ধ্বংস হবে না। এ গ্রহগুলো যদি সুতার মালার মত একটির পর আরেকটির পিছনে কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায় তাহলেও দুর্ঘটনা ঘটবে না। কারণ মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ–

রাত দিনকে অতিক্রম করবে না, চন্দ্র সূর্যকে ধরতে পারবে না, দিন রাতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না, সূর্য চন্দ্রকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না, সবগুলো তার আপন আপন কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান ও স্বাতন্ত্রশীল থাকবে। (সূরা ইয়াসীন-৪০)

কোনো কিছুই স্থির নেই, সব কিছু ঘুরছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন অনেক পরে। কেউ বলেছেন সূর্য ঘুরছে, কেউ বলেছেন পৃথিবী ঘুরছে। আসলে যে কি ঘুরছে তা বিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন না। আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করেছেন–

وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً –

আমি তোমাদেরকে একেবারে সামান্যতম জ্ঞান দান করেছি। (বনি ইসরাইল-৮৫)

এ পৃথিবীতে আমরা বাস করি পঁচিশ হাজার ব্যাসার্ধে (গোলার্ধে)। মহাশূন্যের দিকে যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখতে পাবো, এ মহাশূন্য কি- এটা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনেকের ধারণা নেই। অবশ্য বিজ্ঞান নিয়ে যারা লেখাপড়া করেন, বিচার

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ করেন, তারা জানেন মহাশূন্যের ভেতরে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ইউরেনাস, নেপচুন, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও অন্যান্য গ্রহ যা কিছু আছে, তাদের আবার প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন সৌরজগৎ আছে। সৌরজগৎ সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি ততটুকু নয়। বিশাল বিশাল সৌরজগৎ রয়েছে। অসংখ্য গ্যালাক্সি রয়েছে। আবার এ গ্যালাক্সির ভেতর বিলিয়ন বিলিয়ন তারকা রয়েছে। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়, এ রকম তিন কোটি সূর্য খেয়ে হজম করতে পারবে, গ্যালাক্সির ভেতরে সেরকম দৈত্য তারকা রয়েছে অগণিত। এরপর বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন হয়ত এটাই শেষ আবিষ্কার করলেন; কিন্তু না এটাই শেষ আবিষ্কার নয়, এর থেকেও আরো অনেক কিছু অনাবিষ্কৃত রয়েছে। যেমন অদৃশ্য ব্লাক-হোল, যে সব তারকা তিন কোটি সূর্য খেয়ে হজম করে ফেলতে পারে, সে দৈত্য তারকাগুলো ঘুরতে ঘুরতে যখন অদৃশ্য ব্লাক-হোলের আওতায় এসে যায়, তখন এমন দেখায় যে- মানুষ চকলেট চুষে নিঃশেষ করলে যেমন অবস্থা হয় ঠিক তেমনই। যে তারকা পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড় সে তারকাগুলো ব্লাক-হোল এর আওতায় এলে নিমিষে তা শেষ করে দেয়। এটা আবিষ্কার করছেন আজকের বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু কোন বিজ্ঞানাগারে লেখা পড়া না করে নবী করীম (সাঃ) সকল বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী, যিনি লিখতে জানেন না, পড়তে জানেন না, যিনি নাম দস্তখত করতে জানেন না, যাঁকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন-

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ-

আপনি জানতেন না কিতাব কাকে বলে? আপনি একথাও জানতেন না ঈমান কাকে বলে? (আমি আপনাকে শিক্ষা দিয়েছি।) (সূরা শুরা-৫২)

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ-

(হে রাসূল) ইতোপূর্বে আপনি কোনো কিতাব পড়তেন না এবং স্বহস্তে লিখতেনও না, যদি এমনটি হতো, তাহলে অবিশ্বাসীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারতো। (সূরা আনকাবূত)

নবী কারীম (সাঃ) এর শিক্ষক হচ্ছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তিনি তাঁকে শিখিয়েছেন। নবী কারীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি শুধুমাত্র শিক্ষক হিসেবে।' তিনি কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল শিক্ষকমণ্ডলীর শিক্ষক। তাঁর নিকট জ্ঞান এসেছে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ হতে।

www.pathagar.com

ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, নবী কারীম (সাঃ) কোনো বিজ্ঞানাগারে লেখা পড়া করেননি, যিনি অন্ধকার যুগে এ পৃথিবীতে আগমন করে এমন এক কিতাব মানব সভ্যতাকে উপহার দিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত তা বিজ্ঞানকে আলোকিত করতে থাকবে, কিয়ামত পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ভিক্ষুকের মত কোরআনে কারীমের দরজায় হাত পেতে থাকবে। বিজ্ঞানীরা ব্লাক-হোল আবিষ্কার করলেন বর্তমান যুগে, অথচ প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে নবী কারীম (সাঃ) এর পবিত্র মুখে মহান আল্লাহ্ জানিয়েছেন–

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ –

শপথ করছি সে পতিত স্থানের যে স্থানে তারকাসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (সূরা ওয়াকিয়া-৭৫)

তারকাগুলো যে স্থানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সে স্থান হল ব্লাক-হোল, সকল বিজ্ঞান ও অজানাকে জানার উৎস হচ্ছে পবিত্র কোরআনুল কারীম। বিজ্ঞানের সাথে কোরআনুল কারীমের কোন দ্বন্দ্ব নেই, যদি কোথাও বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের মতানৈক্য ঘটে তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোরআনের কাছ থেকে। কারণ কোরআন হচ্ছে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান, অজানাকে জানা ও কল্যাণের উৎস।

মহান আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে উপস্থাপিত প্রায় প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক তথ্যকেই 'শপথের' আকারে অবতীর্ণ করেছেন। এটা সম্ভবতঃ গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণেই হয়ে থাকবে। বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো বিজ্ঞান যদি সত্যি সত্যিই কোনো সঠিক বিষয় উদ্ঘাটনে সফলতা লাভ করে থাকে তাহলে তা ঐ বিষয়ে পবিত্র কোরআনের বাণীকেই বেশী ফুটিয়ে তুলবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً، وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ–

তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভা বর্ধনের জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন এমন অনেক কিছুই, যা তোমরা এখন পর্যন্ত কিছুই অবগত নও। (সূরা নাহল- ৮)

মহাবিশ্বের সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোথায় কোন্ বস্তু সৃষ্টি হয়েছে, কার কি কাজ বা কার কি পরিণতি তার সরাসরি কোনো জ্ঞান পূর্ব হতেই বিজ্ঞানের ছিল না। বিজ্ঞান তার চলার পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে যখন

www.pathagar.com

যতটুকু আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে কেবল ততটুকুই বলতে পারে; এর বাইরে বিজ্ঞান পুরোপুরি অন্ধ। এমনকি কোনো বস্তু কখন আবিষ্কার হবে তাও বিজ্ঞান জানে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করেন–

قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ–

(হে রাসূল!) বলে দিন! আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না তারা কখন উত্থিত হবে। (সূরা নামল-৬৫)

পবিত্র কোরআন যে মহান আল্লাহ্র পবিত্র বাণীসম্ভার তা এ গ্রন্থের মধ্যে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পরবর্তী সময়ে বাস্তবে প্রতিফলিত হওয়ার মধ্য দিয়ে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। বর্তমান বিশ্বে একমাত্র কোরআনই এমন এক অদ্বিতীয় অত্যাশ্চর্য গ্রন্থ্ হিসেবে মানব সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে যা কুদরতী বাণী এবং একক অনন্যের অধিকারী বলে প্রমাণিত।

কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন, তাহলো বর্তমান যুগকে অত্যাধুনিক যুগ বলে দাবি করা হয়। বিজ্ঞান দিয়েই সকল কিছুর সত্যতা নির্ধারণ করা হয়। যে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মানদন্ডে উত্তীর্ণ হবে তাকেই একমাত্র ও চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করার এক অযৌক্তিক মানসিকতা জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জন্মলাভ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র কিতাব এই কোরআনই হলো বিজ্ঞানের মূল উৎস। বিজ্ঞানের নবতর আবিষ্কারের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বিজ্ঞানকে কোরআনের কাছেই ধর্ণা দিতে হবে। কোরআন যে কথা প্রায় চৌদ্দ শত বছর পূর্বে পৃথিবীর মানুষের সামনে পেশ করেছে বিজ্ঞান সে কথাই নতুন করে পৃথিবীবাসীকে শোনাচ্ছে। বিজ্ঞান বলছে, জগৎ একটি নয় অসংখ্য জগৎ বিদ্যমান। অথচ বহুমাত্রিক জগতের ধারণা আল্লাহ্র কোরআন বহুপূর্বেই পৃথিবীবাসীকে দিয়েছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি এবং ব্লাকহোল ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞান মাত্র কিছুদিন পূর্বে ধারণা দিয়েছে, পৃথিবী ব্যতিতও অন্য কোথাও প্রাণের উৎস থাকতে পারে এ ধারণা আল্লাহ্র কোরআন বহুপূর্বেই দিয়েছে।

www.pathagar.com

সুতরাং, আল্লাহর কোরআনের সত্যতা বিজ্ঞান প্রমাণ করবে না, বিজ্ঞানের সত্যতাই আল্লাহর কোরআন প্রমাণ করবে। একটি মাত্র কোষ থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। আলো, তাপ, বাতাস ব্যতিত উদ্ভিদ বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে না, ফুলের পরাগায়ন পদ্ধতি, মৌমাছীর কলা-কৌশল, পিঁপড়ার গতি-প্রকৃতি, মরুজাহাজ উটের পানি ও অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিকাশ সাধন, সৃষ্টির সমতা, প্রতিটি গ্রহের আবর্তন-বিবর্তন, যার যার কক্ষপথে পরিভ্রমণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞান স্বল্প কিছুদিন পূর্বে ধারণা পেশ করেছে। আর এসব তথ্য আল্লাহর কোরআন সপ্তম শতাব্দীতেই মানুষকে অবহিত করেছে এবং এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। অতএব বিজ্ঞানের আবিষ্কার যত বৃদ্ধি লাভ করবে ততই বিজ্ঞান কোরআনের কাছে ঋণের জালে বন্দী হবে। পবিত্র কোরআন থেকে মানব সভ্যতার পক্ষে কল্যাণকর বিষয়সমূহ আবিষ্কারের জন্য সুত্র লাভ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ–

এরা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? (সূরা আননিসা-৮২)

বিজ্ঞান আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর ওপরে নির্ভরশীল

পৃথিবীর কোনো বৈজ্ঞানিকের ক্ষমতা নেই তারা নিজস্ব শক্তি প্রয়োগে আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর সহযোগিতা ব্যতীত ভিন্ন কিছু সৃষ্টি করে প্রশংসা লাভের অধিকারী হতে পারে। তারা যা কিছুই করতে অগ্রসর হবেন, প্রতি মুহূর্তে–প্রতি পদক্ষেপে তাকে মহান আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী হতেই হবে। এ জন্য আল্লাহ ব্যতিত যেমন দাসত্ব লাভের অধিকারী আর কেউ নেই, তেমনি তাঁর প্রশংসা ব্যতিত আর কেউ প্রশংসার হকদারও নেই। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ، وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ–

তিনিই এক আল্লাহ যিনি ব্যতিত দাসত্ব লাভের অধিকারী আর কেউ নন। তাঁরই জন্য প্রশংসা পৃথিবীতেও এবং আখিরাতেও। শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে। (সূরা কাসাস)

একশ্রেণীর লোক রয়েছে যারা নিজেদেরকে প্রকৃতি প্রেমিক বলে পরিচয় দিয়ে

www.pathagar.com

থাকে। এরা বিশ্বপ্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যরাশি অবলোকন করে মুগ্ধ হয়ে তার গুণ বর্ণনা করে থাকে। রাতের নির্জনতায় কৌমুদী স্নাত পুষ্প উদ্যানে সুধাকরের স্নিগ্ধ সৌরভে মন-প্রাণ আমোদিত হয়ে ওঠে, সৌন্দর্য পিয়াসী মানুষ আবেগে উদ্বেলিত হয়ে সৌন্দর্যের স্রষ্টা আল্লাহর প্রশংসার পরিবর্তে চাঁদকেই সকল সৌন্দর্যের আধার মনে করে তার গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে থাকে। প্রখর সূর্য কিরণে পথ-প্রান্তর যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, উদ্ভিদরাজি শ্যামলিমা হারিয়ে হরিদ্রাভা ধারণ করে, নির্জীব ভূমি ফসল উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যায়, প্রচন্ড দাবদাহে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে, তখন হঠাৎ করেই আকাশ থেকে এক পশলা বৃষ্টি যদি নেমে আসে তখন অজ্ঞ মানুষ আল্লাহর প্রশংসা না করে বৃষ্টির প্রশংসা করতে থাকে। মায়াবী চাঁদের আলো নিয়ে প্রশংসামূলক অসংখ্য পংক্তি মালা রচনা করে। মেঘমালা আর প্রশান্তিদায়ক বৃষ্টির প্রশংসায় কবিতা রচনা করে থাকে। কিন্তু এদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, এই চাঁদের আলোর স্রষ্টা কে? এই বৃষ্টি কে বর্ষালেন? এরা তখন বলতে বাধ্য হয়, এসবের পেছনে একজন মহাশক্তিধর স্রষ্টা আছেন। এ সকল তথাকথিত প্রকৃতি প্রেমিকদের লক্ষ্য করেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ، قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ-

আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত পতিত ভূমিকে সঞ্জীবিত করেছেন, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য কিন্তু অধিকাংশ লোক বোঝে না। (সূরা আল আনকাবুত-৬৩)

আল্লাহর সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য রাশি ও সৃষ্টির নিপুণতা দেখে, তাঁর অসংখ্য নিয়ামত ভোগ করে শুধু মুখে মুখে আল্লাহর প্রশংসামূলক বাণী উচ্চারিত করলেই হবে না, তাঁর সামনে দাসত্বের মস্তক অবনত করতে হবে। আল্লাহর প্রশংসা করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো নামাজ আদায় করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ-

সুতরাং, আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় এবং যখন তোমাদের প্রভাত হয়। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তাঁর জন্যই প্রশংসা এবং (তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো) তৃতীয় প্রহরে এবং যখন তোমাদের কাছে এসে যায় যোহরের সময়। (সূরা রুম)

একদিকে মহান আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে, অপরদিকে আল্লাহর কোরআন আবিষ্কারের যে সকল সূত্র দিয়েছে, তা নিয়ে মানব কল্যাণে গবেষণা করতে হবে।

পৃথিবীতে চিন্তা-গবেষণা, পরীক্ষ-নিরীক্ষা এবং অনুশীলনের জন্যে যে সকল উপকরণ প্রয়োজন, তার সবকিছুই মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত। তাঁর সৃষ্টি বস্তু ব্যতিত কারো পক্ষেই কিয়ামত পর্যন্ত কোনো কিছু আবিষ্কার করা কখনোই সম্ভব হবে না।

আল কোরআনে পৃথিবীর বর্ণনা

মানুষ সৃষ্টির ইচ্ছায় আল্লাহ্ তায়ালা এই সুজলা-সুফলা নয়নাভিরাম পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং একে সম্প্রসারিত করেছেন। পৃথিবী সৃষ্টির আদি ইতিহাস মানুষ জানে না। তবে আদি অবস্থায় এ পৃথিবী যে মানুষ ও জীবজন্তুর বসবাসের উপযোগী ছিল না তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র হাদীস হতে এ তথ্য সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন–

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ–

নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। (সূরা আ'রাফ-৫৪)

যখন আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তখন তাতে ভীষণভাবে কম্পন উপস্থিত হলো, সূচনাতে পৃথিবী কোনো প্রাণীর অবস্থানের উপযুক্ত ছিল না। আল্লাহ তায়ালা পাহাড়-পর্বতসমূহকে সৃষ্টি করে যমীনের উপর বসিয়ে দেয়ার ফলে কম্পন থেমে গেল এবং শান্ত হয়ে স্বস্থানে স্থিতিশীল হলো। বিচিত্র এ পৃথিবী অপরূপ তার সৌন্দর্য সমাহার। সাগর মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বৃক্ষ-লতা ও নানা আকৃতির এবং নানা ধরনের জীব-জন্তুতে পরিপূর্ণ এ পৃথিবী। কিন্তু বিস্তৃত মরুভূমি, গহীন অরণ্য, সুউচ্চ বরফ আচ্ছাদিত শুভ্র পর্বতচূড়া, সীমাহীন অথৈ জলরাশি, নানা স্বভাবের জীবজন্তু, নানা ধরনের কণ্ঠস্বর ও আকৃতির পাখি, অর্থাৎ মহান শিল্পীর তুলিতে আঁকা বিচিত্রময় এ পৃথিবী মানুষের সকল কল্পনাকে হার মানায়, শিল্পির শিল্পকর্ম স্তব্ধ হয়ে

www.pathagar.com

যায়। এ বিচিত্র পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী, গাছ-পালা, পত্র-পল্লব, ফল-মূল, বিশাল সাগর-মহাসাগর, সুউচ্চ পর্বতমালা, উজ্জ্বল তারকা খচিত আকাশ, জ্যোৎস্না রাতের মায়াবিনী রূপ, সকলই যেন আল্লাহ্ তায়ালাকে চেনার, জানার ও বুঝার জন্য মানব সম্প্রদায়কে প্রতিনিয়ত হাতছানি দিচ্ছে।

হে মহান স্রষ্টা আল্লাহ! তুমি কত বড় বৈজ্ঞানিক, কত বড় কৌশলী সৃষ্টিকর্তা, কত বড় শিল্পী, কতবড় শক্তির নিয়ন্তা! বৈচিত্র্যপূর্ণ, রহস্যপূর্ণ, মাহাত্ম্যপূর্ণ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত তোমার এ মহান সৃষ্টি! তোমার দরবারে অযুত সিজ্দাহ্ নিবেদন করি। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন–

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًاوَّ السَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًالَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ–

যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে। অতএব, আল্লাহ্ তায়ালার সাথে তোমরা অন্য কাউকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান। (সূরা বাকারা- ২২))

পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, পৃথিবী অন্যান্য গ্রহের মত নয়। বিজ্ঞানীদের মতে সৃষ্টিজগতের গ্রহ, নক্ষত্রগুলোর জন্ম প্রাথমিক পর্যায়ে যদিও একইভাবে সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু কালক্রমে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আলাদা-আলাদা হয়। পৃথিবীর উত্তপ্ত পরিবেশ ধীরে ধীরে শীতল হয় এবং উষ্ণতা স্বাভাবিক হয় আর ভূ–পৃষ্ঠে নানা প্রকারের পরমাণু দ্বারা বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ গঠিত হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন, ধীরে ধীরে বিভিন্ন পরিবর্তন বা বিবর্তনের ফলে ভূ-পৃষ্ঠ হতে বায়ু মণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাস এবং পানির বাষ্প তৈরী হয়ে বায়ুমণ্ডল গঠিত হয়। অতঃপর উক্ত বাষ্প হতে মেঘ ও বৃষ্টি হয় এবং ভূ–পৃষ্ঠে পানির উদ্ভব হয়।

বিজ্ঞানীদের মতে, ভূ-পৃষ্ঠে জীবের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য সঠিক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পর কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি পরমাণু মিলে যৌগিক অণু গঠিত হয় এবং তা হতেই কালক্রমে সাগরে বা পানিতে জীবের আবির্ভাব ঘটে।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা এ পৃথিবীকে সকল প্রকার জীবের তথা মানুষের জন্য উপযোগী করে সৃষ্টি করার কথা বলেছেন–

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا–

তিনি যমীনকে স্থিতি ও বসবাসের উপযোগী জায়গা বানিয়েছেন। (সূরা নামল-৬১)

মানুষ ও জীবজন্তুর বসবাসের জন্য পৃথিবীতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِیْهَا سُبُلاً وَّاَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَاَخْرَجْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰی–

তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (সূরা ত্বাহা-৫৩)

মানুষের কল্যাণে জলে, স্থলে, পাহাড়ে, মরুভূমিতে, কঙ্করময় স্থানে, মহাশূন্যে, বনাঞ্চলে চলার পথ সম্পর্কে আলোচনা করেছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَّسَلَكَ لَكُمْ فِیْهَا سُبُلاً–

এতে তোমাদের জন্য চলার পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা ত্বহা)

পৃথিবীতে জীবন ধারণের উপযোগী নানা ধরণের উপকরণের ব্যাপারেও দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর নানা ধরণের বস্তু মানুষ কিভাবে নিজ কল্যাণে ব্যবহার করবে, পশুসম্পদ কিভাবে কাজে লাগাবে, শস্য ও ফলমূল কোন্ কোন্ কাজে ব্যবহৃত হবে সে ব্যাপারেও কোরআন দিক নির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা এ পৃথিবী সৃষ্টি করে এবং মানুষকে এখানে প্রেরণ করে নীরবতা অবলম্বন করেননি। যেখানে মানুষকে প্রেরণ করা হলো, সে স্থান সম্পর্কেও মানুষকে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, যেখানে মানুষ বসবাস করবে সে স্থানটি কি ধরণের বৈশিষ্ট্য মন্ডিত স্থান। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ–

www.pathagar.com

তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য শয্যা বানালেন, আকাশকে বানালেন ছাদ এবং আকাশ থেকে পানি পাঠালেন, তার সাহায্যে তিনি নানা প্রকারের ফলমূল উৎপাদন করে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করলেন। (সূরা বাকারা-২২)

এ পৃথিবীর সকল কিছুই মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا–

তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি এ পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের ব্যবহারের জন্য তৈরী করেছেন। (সূরা বাকারা-২৯)

পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশল ও কোরআন

এ পৃথিবীপৃষ্ঠে মানবজাতির ইতিহাস খুব বেশী পুরনো নয়। তবে অতীতের যে কোনো যুগের তুলনায় বিজ্ঞান সাধনা ও তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমান মানব সভ্যতাই সর্বাধিক অগ্রগামী। সৃষ্টিসমূহ সম্পর্কে গবেষণা করে তা মানব কল্যাণে ব্যবহারের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে বলেছেন–

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ–

(হে রাসূল! আপনি) বলুন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য করো। (সূরা ইউনুস-১০১)

বর্তমান বিজ্ঞানীদের অভিমত হলো, মহাবিশ্বের সকল কিছুই জ্ঞানের সাগরে নিমজ্জিত। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, 'মহাবিশ্বের অথৈ জ্ঞান সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দু'একটি বালুকণা মাত্র নাড়া-চাড়া করে গেলাম, এর বেশী আর কিছুই করতে পারিনি।' মানুষের জ্ঞানের এই অসহায়ত্বের দিকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য মহান আল্লাহ বলেন–

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ، وَّ اَنْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ–

www.pathagar.com

তারা কি লক্ষ্য করে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে এবং এর সম্পর্কেও যে, সম্ভবত তাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী। সুতরাং এরপর তারা আর কোন্ কথায় ঈমান আনবে? (সূরা আরাফ)

এই পৃথিবী সৃষ্টির কলাকৌশল সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ–

(হে নবী) আপনি বলুন, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করতে চাও যিনি দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা হামীম সিজ্‌দা-৯)

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ –

তিনিই এ যমীনের মাঝে এর ওপর থেকে পাহাড়সমূহ গেড়ে দিয়েছেন ও তাতে বহুমুখী কল্যাণ রেখে দিয়েছেন এবং তাতে সবার আহারের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। (সূরা হামীম সিজদা-১০)

পৃথিবী সৃষ্টি করে এর মাঝে পাহাড় গেড়ে দিয়ে একে স্থিতিশীল করলেন, এরপর পৃথিবীতে যত প্রাণী সৃষ্টি করা হলো তাদের আহারের পরিমাণও নির্দিষ্ট করা হলো।

বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, ঊর্ধ্ব জগতে ছায়াপথ গঠিত হবার পূর্বে ঊর্ধ্ব জগতের ভাসমান বস্তুসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে বাষ্পীয় বস্তুর আকারে বিদ্যমান ছিলো। অর্থাৎ ছায়াপথসমূহ গঠিত হবার পূর্বে তা গ্যাসীয় বস্তু হিসেবে বিদ্যমান ছিলো। আধুনিক বিজ্ঞানের দেয়া এই তথ্যের প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কোরআন একাধিক স্থানে মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে ঘোষণা করেছে–

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا، قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ–

এরপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যা তখন ছিলো ধুম্রকুঞ্জ বিশেষ, এরপর তিনি তাকে ও যমীনকে আদেশ করলেন, তোমরা উভয়েই এগিয়ে এসে- ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়; তারা উভয়েই বললো, আমরা অনুগত হয়েই এসেছি। (সূরা হামীম সিজদা-১১)

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ –

অতঃপর তিনি দু'দিনের ভেতর এ (ধুম্রকুঞ্জ)-কে সাত আকাশে পরিণত করলেন এবং প্রতিটি আকাশে তার উপযোগী আদেশনামা পাঠালেন; পরিশেষে আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং সুরক্ষিত করলাম। এসব পরিকল্পনা অবশ্যই পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'য়ালা কর্তৃক পূর্ব থেকেই সুবিন্যস্ত করে রাখা হয়েছিলো। (সূরা হামীম সেজদা-১২)

আধুনিক বিজ্ঞান 'বিগব্যাঙ' থিউরী উপস্থাপন করেছে, অথচ এর সূত্র নবী করীম (সাঃ) পবিত্র মুখ থেকে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা উচ্চারিত করিয়েছেন সেই সপ্তম শতাব্দীতে।

বিগব্যাঙ এবং বিগক্র্যাঞ্চ থিউরী সম্পর্কে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। উক্ত আয়াতে দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করা বলতে দু'টি মেয়াদকালকে বুঝানো হয়েছে। সৃষ্টির সূচনায় সকল কিছুই যে গ্যাসীয় অবস্থায় ছিলো এবং সাত আকাশ বলতে কি বুঝায় এ বিষয়টিও আমরা যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ্।

জীব বসবাসের উপযোগী গ্রহ

পৃথিবীর সমগ্র পরিবেশের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দায় মাথানত হয়ে আসে। লক্ষ্য করে দেখুন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সমগ্র সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু সমগ্র সৃষ্টিজগতকে মানুষ বা কোনো জীবের জন্য বসবাসের উপযোগী করেননি। সৃষ্টি জগতের সকল স্থানেই জীবের বসবাসের জন্য তিনি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেননি। এর পেছনেও মহান আল্লাহ্ মানুষের জন্য অবশ্যই কল্যাণ রেখেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সৃষ্টি জগতের কোনো গ্রহে প্রাণের উৎপত্তি ও তার বিকাশ এবং বসবাসের জন্য বিশেষ ধরনের অনুকূল পরিবেশ একান্তই অপরিহার্য। যে গ্রহ প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হবে সে গ্রহটিতে কতকগুলো মৌলিক পদার্থ যথা কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি থাকবে। এসব পদার্থের পরমাণুগুলো

www.pathagar.com

বিশেষ নিয়মে মিলে মিশে নানা ধরনের অণু গঠন করে। এসব অণু প্রাণী দেহের কোষ (Tissue), হাড় (Bone), ইত্যাদি গঠনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে।

যে গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকবে, তাতে পরিমিত পরিমাণে পানি থাকতে হবে। কারণ পানি জীবের প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দেয়ার উপরই জীবদেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় বস্তু নিগর্ত হতে সহায়তা করবে। জীবের বসবাসের উপযোগী গ্রহে বায়ু মন্ডল থাকবে। সমগ্র গ্রহটিকে বায়ুমন্ডল আবৃত করে রাখবে। যেখানে থাকবে পরিমিত পরিমাণে অক্সিজেন এবং জীবন ধারনের উপযোগী অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্যাসীয় স্তর। কারণ অক্সিজেন জীবন ধারনের জন্য অপরিহার্য। বায়ুমন্ডল প্রাণী জগতের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করবে।

জীব বসবাসের উপযোগী গ্রহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হতে হবে। তাপমাত্রা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম হলে সে গ্রহটি প্রাণী জগতের বসবাসের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। জীব বসবাসের গ্রহটির বায়ুমন্ডল স্বাভাবিকভাবে উপযুক্ত হতে হবে। যেন সেই বায়ু স্তর ভেদ করে সূর্যের কোনো ক্ষতিকর রশ্মি (Harmful ray) বা ভিন্ন কোনো গ্রহ থেকে ক্ষতিকর রশ্মি আগমন করতে সক্ষম না হয়।

বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবী ব্যতিত সৌরমন্ডলের যতগুলো গ্রহ-উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেসব গ্রহে প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান নেই। কোনো কোনো গ্রহে গ্যাসীয় আবরণ বা বায়ুমন্ডলের অস্তিত্ব নেই। আবার যেগুলোতে রয়েছে তা কোনো প্রাণীর জন্য উপযুক্ত নয়। সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ সম্পর্কে গবেষকগণ গবেষণা করে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সৌরমন্ডল ছাড়াও অন্য সৌরমন্ডলেও প্রয়োজনীয় পরিবেশে জীব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁরা নিয়মিত গবেষণা করে যাচ্ছেন।

পৃথিবী ব্যতিত অন্য কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা তা বিজ্ঞানীদের কাছে অনিশ্চিত বা গবেষণার পর্যায়ে থাকলেও পবিত্র কোরআন চৌদ্দশত বছর পূর্বেই বিষয়টি নিশ্চিত করে ঘোষণা করেছে–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ–

এই আকাশ ও যমীনের সৃষ্টি এবং এবং এ দুই জায়গায় তিনি যেসব প্রাণীকুল ছড়িয়ে রেখেছেন এসব তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। যখন ইচ্ছা তিনি এদেরকে একত্র করতে পারেন। (সূরা শূরা-২৯)

www.pathagar.com

পৃথিবীর বাইরে মানুষের ন্যায় কোনো প্রাণী রয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে কোরআনের বর্ণনানুযায়ী প্রাণের অস্তিত্ব যে রয়েছে, এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

পৃথিবীর আকৃতি কেমন

এই পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন শতাব্দীতে চিন্তাবিদগণ নানা ধরনের মতামত পেশ করেছেন। অনেকে দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণ করতেও এ ভয়ে দ্বিধাবোধ করতেন যে, যদি তারা পৃথিবীর প্রান্তে উপনীত হয়ে নীচে কোনো অন্ধকার বিবরে নিক্ষিপ্ত হন! অর্থাৎ পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে মানুষ বিভিন্ন ধরণের অমূলক ধারণা পোষণ করতেন। ১৫৯ খৃষ্টাব্দে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক পানি পথে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ভ্রমণ করে তথ্য দেন যে, পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছে, পৃথিবীর আকৃতি সম্পূর্ণ গোলাকার নয় বরং এর আকৃতি একটি বড় ধরনের ডিমের অনুরূপ। ইতোপূর্বে অনেকেই মত পোষণ করেছেন, পৃথিবীর আকৃতি সমতল। বিজ্ঞানীগণ গবেষণায় দেখলেন, পৃথিবীর আকৃতি যদি সম্পূর্ণ সমতল হতো, তাহলে রাত এবং দিন চিরাচরিত নিয়মে অর্থাৎ ধীরে ধীরে যেভাবে আবর্তিত হচ্ছে, তা হতো না। হঠাৎ করেই দিনের স্থানে রাত এবং রাতের স্থানে দিনে আগমন ঘটতো।

পৃথিবী ডিম্বাকৃতির কারণেই রাত এবং দিন ধীরে ধীরে ক্রমশ একে অপরকে আচ্ছাদিত করে। ঠিক এ কথাটিই সপ্তম শতাব্দীতে সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে জানিয়ে দিলেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، كُلٌّ يَّجْرِىْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ–

তুমি কি চিন্তা করে দেখোনি, আল্লাহ তা'য়ালা কিভাবে রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করান, আবার দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করান, কিভাবে তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তাঁর আদেশের অধীন করে রাখেন, প্রত্যেক গ্রহ-উপগ্রহ আপন কক্ষপথে এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে, নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। (সূরা লুকমান- ২৯)

www.pathagar.com

যে প্রক্রিয়ায় দিন এবং রাতের আবর্তন পৃথিবীতে সংঘটিত হচ্ছে, বিজ্ঞানীগণ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, এ প্রক্রিয়া সংঘটিত হতে হলে আকৃতি হতে হবে ডিম্বাকৃতি। পরিপূর্ণ গোলাকার বা সমতল হলে এই প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। আরেক আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ج يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَے النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَے الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى، اَلاَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ–

তিনি আকাশ ও যমীন সুপরিকল্পিতভাবেই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই রাতকে দিনের ওপর লেপটে দেন আবার দিনকে রাতের ওপর লেপটে দেন, তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে একটি নিয়মের অধীন করে রেখেছেন, এগুলো সবই একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকবে; জেনে রেখো, তিনি পরাক্রমশালী ও পরম ক্ষমাশীল। (সূরা যুমার- ৫)

আধুনিক বিজ্ঞান বর্তমানে পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে যে কথা বলছে, বিগত চৌদ্দশত বছর পূর্বেই পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা উপস্থাপন করেছে। উট পাখীর ডিমকে আরবী ভাষায় 'দাহাহা' বলা হয়, আর 'দাহা' শব্দের অর্থ হলো, বিছিয়ে দেয়া, ছড়িয়ে দেয়া, বিস্তৃত করা। পৃথিবী সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে–

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا–

এরপর পৃথিবীকে তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন। (সূরা নাযিয়াত- ৩০)

অর্থাৎ এ পৃথিবীকে তিনি ডিম্বাকৃতিতে বিস্তৃত করেছেন। বিজ্ঞানীগণ অঢেল অর্থ ও দীর্ঘ সময় ব্যয় করে পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে মানুষের সম্মুখে এ ধারণা উপস্থাপন করেছেন। অথচ পৃথিবীর স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই পৃথিবীর সঠিক আকৃতি কেমন, তা মানব সভ্যতে জানিয়ে দিয়েছেন।

পৃথিবীর বায়ু মন্ডল

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের জন্য এই পৃথিবীকে উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবী হলো প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য একটি অনুপম গ্রহ।

www.pathagar.com

প্রাণের উৎপত্তির জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থ, উপযুক্ত বায়ুমন্ডল এবং বায়ুমন্ডলে প্রয়োজনীয় গ্যাস ও অক্সিজেন, ভূ-পৃষ্ঠে অফুরন্ত পানি এবং সে পানির উষ্ণতা জীবের জন্য স্বাভাবিক করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা এই পৃথিবীর শূণ্যমার্গে বায়ুমন্ডলের ওপর দিয়ে এমন একটি স্তর সৃষ্টি করেছেন, যাকে ওজোন (Ozone) বলা হয়। এই স্তর সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা ক্ষতিকর রশ্মি (Harmful ray) থেকে প্রাণী জগতকে রক্ষা করে।

পৃথিবী সূর্য থেকে যথাযথ দূরত্বের কক্ষপথে অবস্থান করার কারণে পৃথিবীর উষ্ণতা প্রাণীকুলের জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। পৃথিবীতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সঠিক পরিমাণের পদার্থ অর্থাৎ ভর (Mass) সৃষ্টি করেছেন। ফলে সঠিক মাধ্যাকর্ষণ বলবিশিষ্ট হয়েছে এবং এ কারণে বায়ুমন্ডল যথাযথভাবে আকর্ষিত করে ভূপৃষ্ঠের সাথে চেপে রেখেছে যেন প্রাণীকুলের জন্য বায়ুমন্ডল ক্রিয়া করতে পারে। যদি ভর নির্দিষ্ট পরিমাণের কম থাকতো তাহলে বায়ুমন্ডলের প্রয়োজনীয় গ্যাস ও পানির বাষ্প ক্রমশঃ মহাকাশে হারিয়ে যেত এবং পৃথিবীতে কোন বায়ুমন্ডল থাকতো না। ফলে পৃথিবীতে অক্সিজেন এবং পানির অস্তিত্ব থাকতো না। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ–

হে নবী বলে দিন! তোমরা কি কখনো এ কথা ভেবে দেখেছো যে, তোমাদের কূপের পানি যদি যমীনে তলিয়ে যায়, তাহলে এই পানির প্রবহমান ধারাসমূহ তোমাদেরকে কে বের করে এনে দিবে? (সূরা মুল্‌ক-৩০)

মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর ছবি ক্যামেরায় ধারণ করে দেখা গিয়েছে, ছবিতে সবুজ রং বেশী এসেছে। পৃথিবীর পানিপূর্ণ এলাকাগুলোই ছবিতে সবুজ আকারে উদ্ভাসিত হয়েছে। পানির বেশী প্রয়োজন, এ জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীতে পানি বেশী দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা এই পৃথিবীকে সকল জীবের জন্য বসবাসের উপযোগী করে সৃষ্টি করে বলেছেন–

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا

رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا–

তিনি যমীনকে স্থিতি ও বসবাসের উপযোগী স্থান হিসেবে নির্মাণ করেছেন। এ পৃথিবীর ওপরে নদ-নদী প্রবহমান করেছেন এবং যমীনের ওপরে পাহাড়-পর্বতকে স্তম্ভ হিসেবে গেড়ে দিয়েছেন এবং প্রবহমান নদী-সাগরের দুটো ধারার মধ্যখানে আড়াল সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা নম্‌ল–৬১)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন শুধুমাত্র এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগিই করেননি, এই পৃথিবী থেকে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী যেন তাদের চাহিদানুযায়ী সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারে, সে ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًاوَّ سَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَاَخْرَجْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى، كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ-

যিনি তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ করেছেন এবং এতে তোমাদের জন্য চলার পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। তোমরা আহার করো এবং তোমাদের জন্তু-জানোয়ারকেও বিচরণ করাও। (সূরা ত্বাহা)

বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প

বিজ্ঞানীদের ধারনা অনুসারে পৃথিবীর মূল আবহাওয়ামণ্ডলের বিস্তৃতি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৫০ মাইল বা ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঁচু। পৃথিবীর আবহাওয়ামন্ডলের ৯৯ শতাংশই এর মধ্যে পড়েছে। তবে ১ হাজার মাইল বা ১ হাজার ৬ শত কিলোমিটার উঁচু পর্যন্ত পৃথিবীর আবহাওয়ামন্ডলে গ্যাসের হাল্কা অস্তিত্ব বিরাজমান। পৃথিবীর এই বায়ুমন্ডলের ৭৮ ভাগই নাইট্রোজেন, ২১ ভাগ অক্সিজেন, ১ ভাগ আর্গন। এছাড়া রয়েছে কার্বনডাই-অক্সাইড, অন্যান্য গ্যাস ও জলীয় বাষ্প। বায়ুমন্ডলের এসব উপাদানসমূহ উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের টিকে থাকার জন্য একান্ত অপরিহার্য।

প্রাণীর জীবন ধারনের জন্য অক্সিজেন অপরিহার্য। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে মানব শরীরে অক্সিজেন গ্রহণ করা হয় এবং তা মানবদেহের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। আগুন মানুষের জীবন ধারনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। অক্সিজেন ব্যতিত আগুন প্রজ্জলিত হয় না। কয়লা, তেল বা অন্য কোন দহনের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। বায়ুমন্ডলে থাকা নাইট্রোজেন গ্যাস যে কোনো ধরনের দহন কার্য নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। উদ্ভিদ, বৃক্ষ-তরু, লতার জন্য নাইট্রোজেন অপরিহার্য। বায়ুমন্ডলে অবস্থিত কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস উদ্ভিদের জন্য প্রাণস্বরূপ। শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ ক্লোরোফিলের সাহায্যে আলোকশক্তি ব্যবহার করে কার্বন ডাই- অক্সাইড ও পানির সমন্বয়ে শর্করা (গ্লুকোজ) উৎপন্ন করে এবং উপজাত হিসেবে অক্সিজেন ত্যাগ

করে। অর্থাৎ পানি এবং কার্বনডাই অক্সাইড থেকে সূর্যের আলোতে বৃক্ষ তরুলতার সালোক সংশ্লেষণ (Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় শ্বেতসার খাদ্য ও অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত হয় এবং অনাবশ্যকীয় অক্সিজেন বায়ুমন্ডলে ছেড়ে দেয়।

এভাবে মানুষ এবং অন্যান্য জীব-জন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বায়ুমন্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বনডাই অক্সাইড ছেড়ে দেয়। পক্ষান্তরে বৃক্ষ, তরু-লতা বায়ুমন্ডল থেকে কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ছেড়ে দিয়ে এদের সমতা রক্ষা করে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বায়ুমন্ডলকে আদেশ দান করেছেন, যেন বায়ুমন্ডল সমগ্র পৃথিবীকে আবৃত করে রাখে। ফলে দিন ও রাত, গ্রীষ্ম এবং শীতকালের উষ্ণতার পার্থক্য বেশী হতে না দিয়ে জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ জগৎ টিকে থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ্ বায়ুমন্ডলে নানা ধরনের স্তর সৃষ্টি করেছেন। এসব স্তরের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এর একটি স্তরের নাম হলো ওজোন স্তর। এই ওজোন স্তর সূর্য থেকে নির্গত হওয়া ক্ষতিকর রশ্মি (Harmful ray) শোষণ করে জীব জগৎ ও উদ্ভিদ জগতকে হেফাজত করে। বায়ুমন্ডলের আরেকটি স্তরের নাম হলো Ionsphere। এই স্তর থাকার কারণে মানুষ যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করেছেন। ভূ-পৃষ্ঠের সাগর, মহাসাগর, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড় ইত্যাদি থেকে সূর্যের তাপে পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে আল্লাহর আদেশে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে। এই জলীয় বাষ্প ওপরে ওঠার পর ক্রমে তা শীতল হতে থাকে এবং পানি বিন্দু সৃষ্টি হয়। এরপর তা ঘনীভূত হয়ে আল্লাহর আদেশে মেঘমালায় পরিণত হয়। মহান আল্লাহ্ বায়ুমন্ডলে উষ্ণতা ও চাপের পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। ফলে মেঘ দূর-দূরান্তে চলে যায়। তারপর আল্লাহর আদেশে বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠ সিক্ত করে। এভাবে আল্লাহ্ মৃত যমীনকে জীবিত করেন। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا–

তিনিই আল্লাহ্ যিনি বায়ু প্রেরণ করে এবং বায়ু দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। তারপর তিনি তা নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে পরিচালিত করেন এবং মৃত যমীনকে জীবন্ত করে তোলেন। (সূরা ফাতির-৯)

www.pathagar.com

আল কোরআন ও পানিচক্র

পৃথিবীর যেখানে বৃষ্টি প্রয়োজন আল্লাহ্ তা'য়ালা বায়ুকে আদেশ করেন সেখানে মেঘমালা সঞ্চালিত করার জন্য। মুহূর্তের মধ্যে বায়ু সে আদেশ পালন করে। কি পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং বৃষ্টির ফোটার আকার কি হবে সেটাও আল্লাহ্ তা'য়ালা নির্ধারণ করে দেন। এভাবে বৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবীকে সিক্ত করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ، حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ–

তিনি নিজের অনুগ্রহের (বৃষ্টি বর্ষণের) প্রথমে বাতাসকে সুসংবাদবাহী হিসেবে প্রেরণ করেন। তারপর যখন সে বাতাস পানি ভারাক্রান্ত মেঘমালা উত্থিত করে, তখন সে বাতাসকে কোনো মৃত (শুষ্ক) যমীনের দিকে প্রেরণ করেন, পরে তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তারপর যমীন থেকে নানা ধরনের ফলমূল উৎপদন করেন। (সূরা আরাফ-৫৭)

পবিত্র কোরআন পানিচক্র সম্পর্কে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে। আর ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বার্নার্ড প্যালিসি সর্বপ্রথম পানিচক্র সম্পর্কিত ধারণা পৃথিবীর মানুষের সম্মুখে পেশ করে বলেন, 'পানি সমুদ্র থেকে বাষ্পীভূত হয়ে শীতল হয় তারপর তা মেঘে ঘনীভূত হয়। এরপর মেঘমালা স্থুলভাবে শূন্যমার্গের বিভিন্ন স্থানে গমন করে এবং সেখানে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে ঝরতে থাকে। এই পানি খাল-বিল, নদী-নালা, হ্রদে জমা হয়ে ধারাবাহিক চক্রাকারে পুনরায় সমুদ্রে ফিরে যায়।'

খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে মানুষের ধারণা ছিলো, 'সমুদ্রের ওপরি ভাগের পানি বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে স্থলভাগে তা বৃষ্টির আকারে নেমে আসে।' এ যুগের লোকজন ভূগর্ভস্থিত পানির সন্ধান জানতো না। তারা ধারণা করতো, 'কোনো এক গোপন সুড়ঙ্গের মাধ্যমে পানি সমুদ্রে পতিত হয় এবং এসব সুড়ঙ্গ পথসমূহ সমুদ্রের সাথে যুক্ত রয়েছে।' দার্শনিক প্লেটোর যুগ থেকে এ অবস্থাকে বলা হতো 'টার্টারাস'। ১৮ শতকের বিজ্ঞানী ডেকার্টেও এই মতবাদের বিশ্বাসী ছিলেন। এ্যারিষ্টটলের ধারণানুযায়ী, 'পানি শীতল পর্বত গহ্বরে বা খাদে ঘনীভূত হয়ে মৃত্তিকার তলদেশে হ্রদ বা জলাশয় সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে তা নদী-নালাকে পূর্ণ

www.pathagar.com

করে।' আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, বৃষ্টির পানি মৃত্তিকা স্তরের ফাটল দ্বারা বাহিত হয়ে এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, যার ফলে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড় ইত্যাদি ভরে ওঠে এবং ভূমিতে সজীবতা সৃষ্টি করে। এরই ফলে চারদিকে সবুজের সমারোহ ঘটে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا، اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ–

(হে মানুষ!) তুমি কি কখনো এটা পর্যবেক্ষণ করোনি যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন, এরপর তিনিই তা যমীনের প্রস্রবণগুলোয় প্রবেশ করান, পরে তিনিই আবার তা দিয়ে যমীন থেকে নানা রঙের ফসল বের করে আনেন, কিছুদিন পরে তা আবার শুকিয়েও যায়, ফলে তোমরা তাকে পীতবর্ণের ফসল হিসেবে দেখতে পাও, এরপর তিনিই তাকে আবার খড় কুটায় পরিণত করেন, অবশ্যই এ নিয়মের মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্যে বড় রকমের উপদেশ রয়েছে। (সূরা যুমার- ২১)

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءًا بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ، وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ–

আমিই আকাশ থেকে পরিমাণ অনুযায়ী পানি বর্ষন করেছি এবং তা প্রয়োজন অনুযায়ী যমীনে সংরক্ষণ করে রেখেছি, আবার এক সময় তা উড়িয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারেও আমি সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। (সূরা মুমিনুন- ১৮)

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ–

তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন, এরপর তা দিয়ে যমীন একবার নির্জীব হয়ে যাবার পর তাকে পুনরায় জীবন দান করেন; অবশ্য এতেও বোধশক্তিসম্পন্ন জাতির জন্য (আল্লাহকে চেনার) বহু নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রূম- ২৪)

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার এ ধরনের অগণিত নিদর্শন দেখার পরও যারা নবী করীম (সাঃ) ও কোরআনের প্রতি ঈমান আনে না, ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়না বা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে ইসলামকে পৃথক রাখতে চায়, তাদেরকেই পবিত্র কোরআনে অন্ধ ও বধির হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মহাকাশের মেঘমালা

পানি বাষ্পীভূত হয়ে আবার তার মূল ভান্ডারের দিকে ফিরে যায়। সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পানির এ মওজুদ ভান্ডারের বিন্দুমাত্রও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। তিনি কে, যিনি একই সময় এ বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিশ্রিত করে পানির বিশাল ভান্ডার পৃথিবীর অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন? কোন্ সে প্রতিপালক, যিনি ঐ দুটো গ্যাসকে সে বিশেষ অনুপাতে মিশতে দেন না যার ফলে পানি উৎপন্ন হতে পারে? অথচ এ দুটো পৃথিবীতে মওজুদ রয়েছে। আর পানি যখন বাষ্পাকারে বাতাসে মিশে যায় তখন অক্সিজেন ও হাড্রোজেন কেনো পৃথক হয় না? যিনি এসব নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনিই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ–

তুমি কি (এও) দেখো না, আল্লাহ্ (এ) মেঘমালা সঞ্চালিত করেন, অতপর তিনি তাকে (তার টুকরোগুলোর সাথে) জুড়ে দেন, তারপর তাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখেন (পুঞ্জীভূত করেন), অতপর এক সময় তুমি মেঘের ভেতর থেকে বৃষ্টি (-র ফোঁটাসমূহ) বেরিয়ে আসতে দেখবে। (সূরা আন্ নূর–৪৩)

মহান আল্লাহ্ যদি পানির ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে সকল বিজ্ঞানী একত্রিত হয়েও কি একটি ফোটা পানির ব্যবস্থা করতে পারতো? আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ، وَمَا اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ–

আমিই বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, এরপর আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষন করি, এরপর আমিই তোমাদের তা পান করতে দেই, তোমরা নিজেরা তো তার এমন

www.pathagar.com

কোনো ভান্ডার জমা করে রাখোনি (যে, সেখান থেকে এসব সরবরাহ আসছে)। (সূরা আল হিজর- ২২)

লক্ষ্য করুন, পবিত্র কোরআন কতই না নিখুঁতভাবে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে পানিচক্রের বর্ণনা দিয়েছে–

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ج فَاِذَا اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ–

আল্লাহ্ হলেন সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের জন্যে বায়ু প্রেরণ করেন, এরপর তা এক সময় মেঘমালা সঞ্চালিত করে, তারপর তিনি যেভাবে চান তাকে আকাশে ছড়িয়ে দেন, তাকে টুকরো টুকরো করেন, এক পর্যায়ে তুমি দেখতে পাও তার ভেতর থেকে বৃষ্টি (কণা) বেরিয়ে আসছে, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকেই চান তাদের ওপরই তা পৌঁছে দেন, তখন তারা এটা দেখে ভীষণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে যায়। (সূরা রূম- ৪৮)

উত্তাপের কারণে ভূপৃষ্ঠের পানি বাষ্পাকারে উপরের দিকে উত্থিত হয়ে মহাকাশের শূন্যমার্গে জমা হয়ে তা বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে নেমে আসে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের শপথ করছেন এভাবে–

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ–

বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের শপথ। (সূরা তারিক-১১)

আল্লাহ্ তা'য়ালা পানিচক্র সৃষ্টি না করলে ভূপৃষ্ঠে কোনো উদ্ভিদ এবং একটি খাদ্য কণাও সৃষ্টি হতো না। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ، حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ–

তিনিই মহান আল্লাহ্, যিনি বাতাসকে বৃষ্টি ও রহমতের আগাম সুসংবাদবাহী হিসেবে

www.pathagar.com

জনপদের দিকে পাঠান, শেষ পর্যন্ত সে বাতাস পানির ভারী মেঘমালা বহন করে চলতে থাকে, তখন আমি তাকে একটি মৃত জনপদের দিকে পাঠিয়ে দেই, এরপর সে মেঘ থেকেই আমি পানি বর্ষন করি, এরপর তা দিয়ে যমীন থেকে আমি সব ধরনের ফলমূল বের করে আনি। (সূরা আরাফ- ৫৭)

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا الرَّابِيًا-

আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলেন, তারপর (নদী-নালা ও তার) উপত্যকাসমূহ তাদের নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হলো, এরপর এ প্লাবন (আবর্জনার) ফেনা বহন করে (ওপরে) নিয়ে এলো। (সূরা আর রা'দ- ১৭)

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبٰرَكًا فَاَنْبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ، وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ، رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا، كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ-

আকাশ থেকে আমি বরকতপূর্ণ পানি অবতীর্ণ করেছি এবং তা দিয়ে উদ্যানমালা ও এমন শস্যরাজি সৃষ্টি করেছি, যা (কেটে কেটে) আহরণ করা হয়, (আরো সৃষ্টি করেছি) উঁচু উঁচু খেজুর বৃক্ষ, যার গায়ে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর (সাজানো) রয়েছে, (এগুলো আমি) বান্দাদের জীবিকা (হিসেবে) দান করেছি এবং আমি পানি দিয়ে মৃত ভূমিকে জীবন দান করি। (সূরা ক্বাফ- ৯-১১)

وَهُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ، وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا، لِنُحْيِ يَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا-

তিনি তাঁর (বৃষ্টিরূপী) রহমতের পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, এরপর আকাশ থেকে (তার মাধ্যমে) বিশুদ্ধ পানি বর্ষন করেন, যেন তা দিয়ে তিনি মৃত ভূখন্ডে জীবনের সঞ্চার করতে পারেন এবং তা দিয়ে তাঁর সৃষ্ট অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের পিপাসা নিবারণ করতে পারেন। (সূরা আল ফোরকান- ৪৮- ৪৯)

www.pathagar.com

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ، اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ، وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ، لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ، وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ، اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ–

তাদের শিক্ষার জন্য আমার কুদরতের একটি নিদর্শন হচ্ছে এই মৃত যমীন, যাকে আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে জীবন দান করি এবং তা থেকে শস্যদানা বের করে আনি, তা থেকেই তারা নিজ নিজ অংশ ভক্ষণ করে। আমি তাতে আরো সৃষ্টি করি নানা প্রকার খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান, উদ্ভাবন করি অসংখ্য নদী-নালার প্রস্রবণ। যাতে করে তারা এর ফলমূল উপভোগ করতে পারে, আসলে এগুলোর কোনোটিই তো তাদের হাতের সৃষ্টি নয়, এরপরেও কি তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করবে না? (সূরা ইয়াছিন- ৩৩- ৩৫)

পৃথিবী যে অজস্র ধরনের বিচিত্র সৃষ্টির আবাসস্থল ও অবস্থান স্থল হয়েছে, এটা কোনো সহজ বিষয় নয়। যে বৈজ্ঞানিক সমতা ও সামঞ্জস্যশীলতার মাধ্যমে পৃথিবী নামক এই গ্রহটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। যারা এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেন তারা অনুভব করেন যে, এমন ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যশীলতা একজন জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ ও পূর্ণশক্তি সম্পন্ন সত্তার ব্যবস্থাপনা ব্যতিত প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। পৃথিবী নামক এই ভূ-গোলকটি মহাশূন্যে ঝুলন্তাবস্থায় বিদ্যমান। এটি কোনো জিনিসের ওপর ভর করে অবস্থান করছে না। কিন্তু এরপরও এর মধ্যে কোনো কম্পন ও অস্থিরতা নেই। পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে মাঝে মধ্যে সীমিত পর্যায়ে ভূমিকম্প হলে তার যে ভয়াবহ চিত্র আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়, তাতে সমগ্র পৃথিবী যদি কোনো কম্পন বা দোদুল্যমানতার শিকার হতো, তাহলে এখানে মানুষ বসবাস করতে সক্ষম হতো না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا–

আর তিনি কে, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বসবাসের উপযোগী এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী এবং তার মধ্যে গেড়ে দিয়েছেন (পর্বতমালার) পেরেক, আর পানির দুটো ভান্ডারের মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা নাম্‌ল-৬১)

মহাকাশে অদৃশ্য ছাক্‌নি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আমার নাম রাহ্‌মান। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পর্কে তোমরা একটু ভেবে দেখো। আমি তোমাদের জন্য পানির ব্যবস্থা কিভাবে করেছি। এই পানি তোমাদের জীবন, তোমাদের জীবন ধারণের জন্য অন্যান্য বস্তুর থেকে পানির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এই পানির স্রষ্টা তোমরা নও–আমিই দয়া করে তোমাদের জন্য সে পানি পরিবেশন করেছি। পৃথিবীর বুকে এই নদী-সমুদ্র, খাল-বিল-হাওড়, বিশালাকারের জলাধার আমিই সৃষ্টি করেছি। আমি সূর্য সৃষ্টি করে তার ভেতরে তাপ দান করেছি। এমন পরিমাণে তাপ দান করেছি যেন সে তাপে পানি শোষিত হয়ে বাষ্পাকারে মহাশূন্যের দিকে উত্থিত হয়। পানির ভেতরে এই গুণ-বৈশিষ্ট্য আমিই দান করেছি যে, একটি বিশেষ মাত্রার তাপ লাভ করলেই পানি বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। আমি বাতাস সৃষ্টি করেছি। আমার আদেশে বাতাস সেই বাষ্প কণাগুলো ওপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে জমা করতে থাকে। তারপর আমার আদেশে তা মেঘমালায় পরিণত হয়। আমার আদেশে সেই মেঘ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যে স্থানের জন্য যতটুকু পানির অংশ ও পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়, সেখানে ততটুকু পৌঁছে দেয়া হয়। উর্ধ্বজগতে আমি এমন শীতলতা সৃষ্টি করেছি যার ফলে পৃথিবী থেকে উত্থিত বাষ্প পুনরায় সেখানে পানিতে রূপান্তরিত হয়। তারপর আমারই আদেশে তা পৃথিবীতে বর্ষিত হয়।

পানির ভেতরে মহান আল্লাহ যে বিশেষত্ব দান করেছেন, তা দেখলে সিজ্‌দায় মাথানত হয়ে আসে। সমুদ্রের পানি একদিকে লবণাক্ত, তারপরে এই মানুষ পানিতে কতকিছুর মিশ্রণ ঘটাচ্ছে। কলকারখানার নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ এই পানির সাথে মিলেমিশে একাকার হচ্ছে। মলমূত্র, বিষাক্ত দ্রব্য ও অজস্র মৃতদেহ এই পানিতে মিশে যাচ্ছে। পানির নিচে নানা ধরনের অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে। এভাবে পানি মারাত্মক আকারে দূষিত হয়ে পড়ছে। এই পানি পান করলে মানুষের পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা সূর্য থেকে তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তাপের মাধ্যমে পানি শোষিত হয়ে বাষ্পাকারে ওপরের দিকে উত্থিত হচ্ছে। মহাশূন্যে আল্লাহ্ এমন এক অদৃশ্য শক্তিশালী ছাকনি (Filter) নির্মাণ করেছেন যে, পানিতে যত জিনিস মিশ্রিত হয়েছে, তাপের দরুন পানি যখন বাষ্পে পরিণত হয় তখন সব ধরনের মিশ্রিত জিনিস নিচে পড়ে থাকে এবং শুধুমাত্র পানির জলীয় অংশসমূহ ওপরের দিকে উঠে গিয়ে জমা হতে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

www.pathagar.com

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ، ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُوْنَ-

কখনো কি তোমরা সেই পানি সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছো যা তোমরা নিত্য পান করো; বলতো পারো, আকাশের মেঘমালা থেকে এ পানি কি তোমরা বর্ষণ করো না আমি এর বর্ষণকারী? অথচ আমি চাইলে এ সুপেয় পানি লবণাক্ত করে দিতে পারি, এসব বিষয় জানা সত্ত্বেও তোমরা কেনো আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো না। (সূরা ওয়াকিয়াহ্- ৬৮-৭০)

আল্লাহ্ রাহ্মান, তিনি দয়া করে এ ব্যবস্থা না করলে পানি যখন ওপরের দিকে উত্থিত হতো, তখন সেই পানির মিশ্রিত যাবতীয় বস্তুও উঠে যেতো। এ অবস্থায় পানি হতো দুর্গন্ধময় পানের অযোগ্য। সমুদ্র থেকে যে বাষ্প ওপরের দিকে উঠে যায়, তা লবণাক্ত বৃষ্টির আকারে নেমে এসে পৃথিবীর সকল ভূমিকে লবণাক্ত করে দিতো। ফলে পৃথিবীর ভূমিতে কোনো ফসল হওয়া তো দূরের ব্যাপার, ক্ষুদ্র একটি উদ্ভিদও জন্ম নিত না। মানুষ ও মিষ্টি পানির জীবজগৎ এ পানি পানও করতে সক্ষম হতো না। পানি থেকে অসহনীয় দুর্গন্ধ আর দ্রবণীয়-অদ্রবণীয় বর্জ্য পদার্থ, অগণিত ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া এবং লবণ নিষ্কাশনের এই ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'য়ালা করেছেন।

যিনি পানির এই বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন তিনি সমস্ত দিক বিবেচনা করে তার অসীম জ্ঞানের মাধ্যমে আপন রাহ্মতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই উদ্দেশ্যে করেছেন যে, তার তাঁর প্রিয় সৃষ্টিসমূহের জীবন ও প্রতিপালনের মাধ্যম ও উপায় হয়ে দাঁড়াবে। যেসব সৃষ্টি লবণাক্ত পানিতে জীবিত থাকতে ও লাতিত-পালিত হতে পারে, তিনি সেসব সৃষ্টিকে সমুদ্রে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানেই তারা অত্যন্ত আরামদায়ক অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করছে। কিন্তু স্থলভাগ ও বায়ুমন্ডলে বসবাসের জন্য সৃষ্টি জীবের জীবন ও লালন-পালনের জন্য মিষ্টি পানি ছিল অপরিহার্য। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য বৃষ্টির ব্যবস্থা কার্যকর করার পূর্বেই তিনি পানির ভেতরে এই গুণ ও বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছেন যে, পানি তাপের প্রভাবে বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় এতে সংমিশ্রিত কোন জিনিসসহ উত্থিত হবে না বরং তা সম্পূর্ণ গন্ধ ও দূষিত বস্তু পরিশোধিত হয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় পান ও জীবন ধারনের উপযোগী হয়ে উত্থিত হবে। তিনি রাহ্মান–তাঁর রাহ্মত সৃষ্টিজগৎ ব্যাপী পরিব্যাপ্ত।

www.pathagar.com

মেঘমালা থেকে বজ্রপাত

মানুষ ক্ষেতে চাষ করে ফসল লাভের আশায় বীজ বপন করে বাড়িতে চলে আসে। কৃষক ক্ষেতে বীজ বপন করে তারপর তার পক্ষে আর মূল বিষয়ে করণীয় কিছুই থাকে না। যে ভূমিতে সে বীজ বপন করলো, এই ভূমি তার সৃষ্টি নয়। ভূমিতে উর্বরা শক্তি ও ফসল উৎপাদনের যোগ্যতা কোন মানুষ দান করেনি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا–

তাঁর নিদর্শনের মধ্যে এও একটি যে, তিনি তোমাদের বিদ্যুৎ ও তার আলো দেখান ভয় এবং আশার সঞ্চারের মাঝ দিয়ে তা প্রতিভাত হয়। (সূরা রূম-২৪)

বর্তমান বিজ্ঞানীগণ বলছেন, যে ঋতুতে বজ্রপাত অধিকহারে সংঘটিত হয়, সে ঋতুতে ফসলের উৎপাদন সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়। কারণ বজ্রপাতের মাধ্যমে ভূমিতে যে নাইট্রোজেন চক্র ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, এতে করে ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি লাভ করে। এই নাইট্রোজেনই গাছের প্রাণশক্তি। যেসব মৌল উপাদান খাদ্য সামগ্রীতে সংগৃহীত হয়, সেটা মানুষের চেষ্টার ফসল নয়। জমিতে যে বীজ মানুষ বপন করে, তাকে বিকশিত করা ও প্রবৃদ্ধি লাভের যোগ্যতাও মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। এই চাষাবাদ ও বীজ বপনকে সবুজ আভায় হিল্লোলিত চারাগাছে পরিপূর্ণ ক্ষেতে পরিণত করার জন্য ভূমির মধ্যে যে কার্যক্রম এবং মাটির ওপরে যে আলো, বাতাস, তাপ, শীতলতা ও মৌসুমী অবস্থার আবর্তন হওয়া প্রয়োজন, তার ভেতরে একটি জিনিসও মানুষের সৃষ্টি নয়। ফসলের ভেতরে দানা সৃষ্টির ব্যাপারেও মানুষের কোনো ভূমিকা নেই। এগুলো সবই ঐ দয়াময় রাহ্‌মান–আল্লাহই অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদের জন্য করে থাকেন। তিনি বলেন–

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ، ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ،
لَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ–

তোমরা কি কখনো চিন্তা-বিবেচনা করে দেখেছো, তোমরা যে বীজ বপন করো, তা থেকে তোমরা ফসল উৎপাদন করো না আমি করি? আমি ইচ্ছা করলে এই ফসলকে দানাবিহীন ভূষি বানিয়ে দিতে পারতাম। (সূরা আল ওয়াকী'আ-৬৩-৬৫)

www.pathagar.com

পানির দুটো ধারা তথা পানি প্রাচীর

রাব্বুল আলামীন বলেন, নদী-সাগর ও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখো, পানির দুটো ধারা কিভাবে বয়ে চলেছে। একটি ধারা সুমিষ্ট আরেকটি ধারা লবণাক্ত। এই পানির ভেতরে নানা ধরনের মাছ আমি তোমাদের খাদ্য হিসাবে মওজুদ রেখেছি। তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ নানা ধরনের অলঙ্কার প্রস্তুত করার উপাদান রেখেছি।

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ، هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وَمِنْ كُلٍّ تَاْ كُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ، يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى، ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ–

পানির দুটো উৎস সমান নয়। একটি সুমিষ্ট ও পিপসা নিবারণকারী সুস্বাদু পানীয় এবং অন্যটি ভীষণ লবণাক্ত যা কণ্ঠনালীতে ক্ষত সৃষ্টি করে, কিন্তু উভয়টি থেকে তোমরা সজীব গোস্ত লাভ করে থাকো, পরিধান করার জন্য সৌন্দর্য্যের সরঞ্জাম বের করো এবং এ পানির মধ্যে তোমরা দেখতে থাকো নৌযান তার বুক চিরে ভেসে চলছে, যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তিনি দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আসেন। চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি অনুগত করেছেন। এসব কিছু একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। এ আল্লাহই তোমাদের রব, সার্বভৌমত্বও তাঁরই। (সূরা ফাতির)

আল্লাহ্ তা'য়ালা এমন রব, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সকল কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। লবণাক্ত পানি পান করার অযোগ্য কিন্তু লোনা পানির ভেতর দিয়ে মানুষ যখন নৌযানে পথ অতিক্রম করতে থাকে, তখন যদি তার পানির প্রয়োজন হয়, এ জন্য আল্লাহ্ সাগর-মহাসাগরের ভেতরে অসংখ্য মিষ্টি পানির প্রস্রবণ প্রস্তুত করে রেখেছেন।

পৃথিবীর কোন বড় নদী এসে যেখানে সাগরে মিলিত হয়, সেখানেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া সমুদ্রের মধ্যেও বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি পানির প্রস্রবণ পাওয়া যায়। সমুদ্রের ভীষণ লবণাক্ত পানির মধ্যেও মিষ্টি পানির প্রস্রবণ তার নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম। পারস্য উপসাগরেও মিষ্টি পানির প্রস্রবণ রয়েছে। চারদিকে লবণাক্ত পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছে, আর মাঝখানে গোল বৃত্তের মতো মিষ্টি পানির স্রোত ঘুরছে। লবণাক্ত পানির স্রোত এসে মিষ্টি পানির স্রোতের সাথে মিলিত হয়েছে, কিন্তু সে পানি পরস্পর মিলিত হয়ে আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে না। রাব্বুল আলামীন এমন এক অদৃশ্য প্রহরার ব্যবস্থা সেখানে করেছেন, যেন তারা পরস্পর মিলিত হতে না পারে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَٰنِ، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَٰنِ–

দুটো সমুদ্রকে তিনি প্রবাহিত করেছেন, যেন পরস্পরে মিলিত হয়। এরপরেও উভয়ের মাঝে একটি আবরণ আড়াল হয়ে রয়েছে, যা তারা অতিক্রম বা লংঘন করে না। (সূরা রাহ্মান-১৯-২০)

বর্তমানে সমুদ্র বিজ্ঞানীগণ নানা ধরণের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পেরেছেন যে, সুস্বাদু বা মিষ্টি পানি এবং লবণাক্ত পানির মধ্যে বিভাজক তথা দুর্ভেদ্য পানি প্রাচীর রয়েছে। অথচ নবী করীম (সাঃ) কখনো সমুদ্র ভ্রমণ করেছেন বা সমুদ্র দেখেছেন বলে কেউই প্রমাণ করতে পারবেন না। তাঁর সমগ্র জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম ঘটনাও সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু এ প্রমাণ কোথাও নেই যে তিনি মক্কা থেকে মাত্র একশত মাইল দূরে জেদ্দায় এসে সমুদ্র দেখেছেন বা সমুদ্রে ভ্রমণ করেছেন। নদী, সমুদ্র বা বড় ধরনের কোনো জলায়শয় তিনি কখনো দেখেননি। অথচ তাঁর পবিত্র মুখ থেকেই উচ্চারিত হলো মিষ্টি পানি এবং লবণাক্ত পানি তথ্য এবং পানি প্রাচীর সম্পর্কিত নিখুঁত বর্ণনা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ) এর মুখ থেকে উচ্চারিত করিয়েছেন–

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا–

কিংবা তিনি শ্রেষ্ঠ- যিনি যমীনকে সৃষ্টিকুলের বসবাসের উপযোগী করেছেন, আবার তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন অসংখ্য নদী-নালা, যমীনকে সুদৃঢ় করার জন্যে তার মধ্যে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, দুই সাগরের মাঝে মিষ্টি ও লোনা পানির সীমারেখা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা নামল-৬১)

www.pathagar.com

বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান এ গবেষণার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করেছে, দু'টি সমুদ্র বা নদীর পানি শুধুমাত্র রংয়ের বৈশিষ্ট্যসহই বিভাজিত হয়নি, উভয়ের তাপমাত্রা, ঘনত্ব, মিষ্টতা বা লবণাক্ততাসহই বিভাজিত হয়েছে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, দুই সমুদ্রের মাঝে এক অদৃশ্য ক্রমনিম্নগতি সম্পন্ন তীর্যক পানি প্রাচীর যেখানে যেখানে রয়েছে, এ প্রাচীর এক সমুদ্রের পানি অন্য সমুদ্রে প্রবেশ করে নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। কিন্তু পানি প্রাচীরের এপার ও ওপারে উভয়ের পৃথক বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে।

বিজ্ঞানীগণ বলেন, যেখানে মিষ্টি ও লবণাক্ত পানি মিলিত হয় অর্থাৎ মোহনা এলাকায়, আর যেখানে দু'টি সমুদ্র মিলিত হয়, এ দুই এলাকার অবস্থা ভিন্ন ধরনের। মোহনা এলাকায় লবণাক্ত পানি থেকে মিষ্টি পানির যে পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাহলো, একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের ঘনত্বের Pycnoclin Zone এর উপস্থিতি। যা অনিয়মিতভাবে দুইটি পানি স্তরকে পৃথক করে রাখে। মিষ্টি ও লবণাক্ত উভয় পানি থেকে আলাদা এক লবণাক্ততা রয়েছে এসব সীমান্ত এলাকার পানি প্রাচীরে। ভূমধ্য সাগর, আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে জিব্রাল্টার এবং মিসরের নীলনদ প্রবাহিত হয়ে যেখানে ভূমধ্যসাগরের মিলিত হয়েছে, এসব স্থানে উক্ত অবস্থা দেখা যায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا-

তিনি একই জায়গায় দুটো সাগর এক সাথে প্রবাহিত করে রেখেছেন, একটি হচ্ছে মিষ্ট ও সুপেয়, আরেকটি লোনা ও ক্ষারবিশিষ্ট, উভয়ের মাঝখানে তিনি একটি সীমারেখা বানিয়ে রেখেছেন, সত্যিই এটি একটি অনতিক্রম্য ব্যবধান। (সূরা আল ফুরকান-৫৩)

পানির তলদেশ, আল কোরআন ও বিজ্ঞান

সাগর, মহাসাগর তথা সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞান অনুসন্ধান চালিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে, সমুদ্রের নীচে গভীর অন্ধকার এবং এ অন্ধকার কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। সমুদ্রের বিশ থেকে ত্রিশ মিটার নীচে কোনো উপকরণ ব্যতিত ডুবুরীদের পক্ষে ডুব দেয়া যেমন অসম্ভব তেমনি গভীর সমুদ্রে দুই শত মিটার নীচে মানুষের পক্ষে জীবিত থাকা প্রায় অসম্ভব। বিজ্ঞান জানাচ্ছে- লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, বেগুনী ও বেগুনী নীল, এই সাতটি রঙের মিশ্রণে একটি আলোক রশ্মি গঠিত হয়।

www.pathagar.com

যে স্থানের পানিকে এই আলোক রশ্মি উত্তপ্ত করে সেখানেই প্রতিসরণ ঘটে। পানির ওপরের অংশের দশ থেকে পনেরো মিটার অংশ লাল রঙ চুষে নেয়।

ঠিক এ কারণে যদি কোনো মানুষ পানির পঁচিশ মিটার নীচে কোনো কারণবশত রক্তাক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সে তার রক্তের লাল রঙ দেখতে পাবে না। কারণ পানির পনেরো থেকে পঁচিশ মিটার নীচে লাল রঙ পৌঁছতে পারে না। আবার পানির ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ মিটার নীচে, এ স্তরে কমলা রঙ চুষে নেয় ফলে এ পর্যন্ত কমলা রঙও পৌঁছতে পারে না। পানির পঞ্চাশ থেকে একশত মিটার নীচের স্তরে হলুদ রঙ শুষে নেয়। এক বা দুইশত মিটার নীচে সবুজ রঙ চুষে নেয়, এরও নীচে বেগুনী রঙ এবং বেগুনী নীল রঙ চুষে নেয়। এভাবে একেকটি স্তরে পৌঁছলে সকল রঙ যখন চুষে নেয় তখন পানির তলদেশ ক্রমশ অন্ধকার হয়ে ওঠে। পানির এক হাজার মিটার নীচে গভীর অন্ধকার বিরাজ করছে।

বিজ্ঞান বলছে, সূর্যের আলো মেঘ কর্তৃক শোষিত হবার ফলে তা এলোমেলো বিক্ষিপ্ত আলোক রশ্মিতে পরিণত হয়ে মেঘের নীচে এক ধরনের অন্ধকার সৃষ্টি করে আর এ অন্ধকার হলো অন্ধকারাচ্ছন্নতার প্রাথমিক পর্যায়। আলোক রশ্মিসমূহ যখন সমুদ্রের ওপরের অংশে নিপতিত হয় তখন তা তরঙ্গ বা ঢেউ এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে সমুদ্রের ওপরের অংশকে উজ্জ্বল করে তোলে। ফলে তরঙ্গের মাধ্যমে আলো প্রতিফলিত হবার কারণে অন্ধকারাচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়। আলোকরশ্মি যখন সমুদ্রের ওপরি ভাগ ভেদ করে কিছুটা গভীরে পৌঁছে, তখন সমুদ্রে দুই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের ওপরের অংশ তপ্ত এবং আলোকিত হয়ে ওঠে আর গভীরের অংশ ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। শুধু তাই নয়, তরঙ্গের কারণে এ সময় সমুদ্রের ওপরের অংশ এবং নীচের অংশ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান জানাচ্ছে, সমুদ্রের অভ্যন্তরের তরঙ্গ বা ঢেউ সমুদ্রের গভীরের পানিকে আবৃত করে রাখে। কারণ সমুদ্রের গভীর পানির কদধডপভ্র বা ঘনত্ব ওপরের পানির ঘনত্বের তুলনায় অনেক বেশী। সমুদ্রের গভীরে যে অংশে অভ্যন্তরীণ তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে, এর নীচের স্তর থেকেই অন্ধকারাচ্ছন্নতার সূচনা হয়। এর নীচের অংশে যেসব মাছ অবস্থান করে, তারাও নিজেদের দেহের বিচ্যুরিত আলোর সাহায্য ব্যতিত একে অপরকে দেখতে পায় না। সমুদ্রের নীচের এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্ববাসীর সম্মুখে বর্তমানে তুলে ধরলেও এর থেকেও নিখুঁত বর্ণনা ও অকাট্য সত্য গত চৌদ্দশত বছর পূর্বে ওহীর মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ) এর মুখ উচ্চারিত হয়েছিলো-

www.pathagar.com

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ، ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، اِذَا اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا، وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ-

কিংবা একটি অতল সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ গভীর অন্ধকারের মতো, এরপর তাকে একটি বিশাল আকারের ঢেউ এসে ঢেকে আরো অন্ধকার করে দিলো, তার ওপর আরো একটি ঢেউ এলো, তার ওপর ছেয়ে গেলো কিছু ঘন কালো মেঘ; এক অন্ধকারের ওপর এলো আরেক অন্ধকার, যদি কেউ এ অবস্থায় তার হাত বের করে, অন্ধকারের কারণে তার তা দেখার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। (সূরা নূর-৪০)

সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা যেমন তাঁর বান্দাদের সাবধান করেছেন, তেমনি মরুভূমির মরীচিকা সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞান মানুষকে ধারণা দিলেও সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বেই আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে মরীচিকার ব্যাপারে সাবধান করে বলেছেন-

كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً، حَتّٰى اِذَا جَاءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا-

যেমন মরুভূমিতে মরীচিকা, পিপাসার্ত মানুষ দূর থেকে তাকে পানি বলে মনে করলো, পরে যখন সে তার কাছে এলো তখন সেখানে পানির মতো কিছুই পেলো না। (সূরা নূর- ৩৯)

পানি থেকেই জীবন্ত বস্তুর উদ্ভব

এই পৃথিবীতে মানুষ এমন অনেক কিছু ভোগ করে, চোখে দেখে এবং জ্ঞানে ধরা পড়ে এসব হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রকাশ্য নেয়ামত। আর যেসব নেয়ামত সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না এবং অনুভবও করতে পারে না সেগুলো হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার গোপন নেয়ামত। স্বয়ং মানুষের নিজের দেহে এমন অনেক কিছু কাজ করে যাচ্ছে এবং দেহের বাইরে পৃথিবীর পরিবেশে মানুষের স্বার্থে কল্যাণময় ভূমিকা পালন করছে এমন অগণিত জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু মানুষ এসব সম্পর্কে জানেও না যে, মহান আল্লাহ্ তাকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য, তার প্রতিদিনের আহারের জন্য, তার দেহের জীব কোষ বৃদ্ধি ও মেধা বিকাশের জন্য এবং তার

www.pathagar.com

অন্যান্য কল্যাণের জন্য নানা ধরনের উপকরণ থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞানের নানা শাখায় মানুষ যতই গবেষণা করছে ততই মানুষের সামনে আল্লাহ তা'য়ালার এমন অগণিত নেয়ামত স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হচ্ছে যে, এসব নেয়ামত সম্পর্কে মানুষের পূর্ব ধারণাও ছিল না। পক্ষান্তরে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই মানুষ আল্লাহর যেসব নেয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে, সেগুলো ঐসব নেয়ামতের তুলনায় অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ, যেসব নেয়ামত বর্তমান সময় পর্যন্তও মানুষের জ্ঞানের অগোচরে রয়েছে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলছেন, পানি থেকেই প্রথমে জীবন্ত বস্তুর উদ্ভব হয়েছে। অথচ চৌদ্দ শত বছর পূর্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন এক ব্যক্তির মুখ দিয়ে পৃথিবীবাসীকে শুনিয়ে দিয়েছেন যে, 'পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে পানি থেকে।' অথচ তিনি কখনো বিজ্ঞান গবেষণাগারে গবেষণা করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা সেই মহামানবের মুখ দিয়েই উচ্চারিত করালেন–

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ–

আমি পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুকে সৃষ্টি করেছি। (সূরা আম্বিয়া-৩০)

আধুনিক বিজ্ঞান অতি সম্প্রতি কোষের মূল অংশ সম্পর্কে জানতে পেরেছে, যার আশি ভাগই পানি দিয়ে গঠিত। কোষের এই মুল অংশকে বলা হয় 'সাইটোপ্লাজম।' আধুনিক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে, অধিকাংশ প্রাণী দেহই পঞ্চাশ থেকে নব্বুই ভাগ পানি দিয়ে গঠিত এবং প্রত্যেকটি সজীব বস্তুর অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে পানি অপরিহার্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ–

আল্লাহ তা'য়ালা বিচরণশীল প্রতিটি জীবকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নূর- ৪৫)

জীবন্ত বস্তু বলতে শুধু মানুষকেই বুঝানো হয় না। সৃষ্ট জগতের অসংখ্য জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ এবং উদ্ভিদসমূহও জীবন্ত বস্তুর মধ্যে শামিল রয়েছে। প্রজননের মাধ্যমেও জীবের জন্ম ও বিকাশের ক্ষেত্রেও পানি অপরিহার্য। জীব কোষের পদার্থসমূহের অধিকাংশই পানি এবং অতি সামান্য অংশ রয়েছে অন্যান্য পদার্থ। পানি ব্যতিত জীব কোষ জীবিত থাকতে পারে না এবং কোনো ধরনের জীবের উৎপত্তি ও বিকাশ কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে পৃথিবী সূর্যের তৃতীয় নিকটবর্তী গ্রহ। আর আয়তনের দিক থেকে পৃথিবী হলো পঞ্চম বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে পৃথিবীর দুরত্ব ১৪ কোটি ৯৬ লক্ষ কিলোমিটার। এই দুরত্বকে জ্যোতির্বিদ্যার একক বা এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট (Astronomical unit) বলে। এই হিসেবে সূর্য থেকে পৃথিবীর দুরত্ব ১ জ্যোতির্বিদ্যা একক। পৃথিবীর ব্যস ১২ হাজার ৭ শত ৫৬ দশমিক ৩ কিলোমিটার। আর ভর ৬. ৬ সেক্সটিলিয়ন। পৃথিবীর গতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেন, ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে পৃথিবী এক পাক সম্পন্ন করে। যাকে আমরা একদিন বলে থাকি। আর সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে আমাদের এই পৃথিবী সময় নেয় ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ৯ মিনিট, ৯ দশমিক ৫৪ সেকেন্ড।

এই পৃথিবীর আকার সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর এক মেরু থেকে আরেক মেরুর দুরত্ব ৭ হাজার ৮ শত ৯৯ দশমিক ৮৩ মাইল বা ১২ হাজার ৭ শত ১৩ দশমিক ৫৪ কিলোমিটার। আর বিষুবীয় অঞ্চলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দুরত্ব ৭ হাজার ৮ শত ৯৯ দশমিক ৮৩ মাইল বা ১২ হাজার ৭ শত ১৩ দশমিক ৫৪ কিলোমিটার। পৃথিবী পৃষ্ঠের আয়তন সম্পর্কে বলা হয়েছে, ১৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫১ হাজার বর্গমাইল বা ৫১ কোটি ১ লক্ষ কিলোমিটার। এই বিশাল আয়তনের পৃথিবীর মধ্যে ভূ-ভাগ হলো মাত্র ৫ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৯ হাজার মাইল বা ১৪ কোটি ৮৩ লক্ষ কিলোমিটার। অর্থাৎ পৃথিবীর আয়তনের মোট এক এর ৩ শতাংশই হলো পানি।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি করেছেন পানি থেকে। পৃথিবীতে জীব টিকে থাকা ও বিকাশের জন্যও পানি একান্তই প্রয়োজন। পৃথিবীতে পানির অংশের আয়তন হলো ১৩ কোটি ৯৬ লক্ষ ৯২ হাজার মাইল বা ৩৬ কোটি ১৫ লক্ষ কিলোমিটার। কত পানি যে আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তা কল্পনাও করা যায় না। জীবন ধারনের জন্য পানির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য নদী-নালা, ডোবা-পুকুর, হ্রদ, সাগর, মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন। এরপরেও আল্লাহ তা'য়ালা মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এসব কিছুই করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য।

আল্লাহ্ তা'য়ালা এই পৃথিবীতে যত সাগর-মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গভীর এলাকার নাম হলো ম্যারিনা ট্রেঞ্চ। গুয়ামের দক্ষিণ পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে এই এলাকাটির গভীরতা ৩৬ হাজার ১৯৮ ফুট বা ১১ হাজার ৩৩ মিটার। পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলোর গড় গভীরতা ১২ হাজার ৪ শত ৫০ ফুট বা

www.pathagar.com

৩ হাজার ৭ শত ৯৫ মিটার। এই পরিমাপের কম বা বেশী হলেই পৃথিবীর পরিবেশ বিপন্ন হবে এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পানির পরিমাপ এই পৃথিবীতে ঠিক রেখেছেন। এই ব্যবস্থা যথাযথভাবে যিনি সম্পাদন করেন তিনিই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

এ পৃথিবীতে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে লিবিয়ার আল আজিজিয়ায় ১৩৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এ্যান্টার্টিকার ভোকষ্ট-এ মাইনাস ১২৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট অর্থাৎ মাইনাস ৮৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আল্লাহ তা'য়ালা এই তাপমাত্রার ব্যতিক্রম করে দিলেই পৃথিবীর প্রাণীকুল বিপন্ন হয়ে পড়বে। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তির অস্তিত্ব নেই, আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য ব্যতিত পৃথিবীর পরিবেশ প্রাণী বসবাসের উপযোগী করতে পারে।

পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য বিচিত্র প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত প্রাণীর চলার ধরণ ও গতি এক রকম নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ-فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ، وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى اَرْبَعٍ، يَخْلُقُ اللّٰهُ مَايَشَاءُ، اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

আল্লাহ সকল জীবকে পানি থেকেই সৃষ্টি করেছেন। তাদের কোনটি বুকের ওপরে ভর করে চলে। কোনটি দু'পায়ে ভর করে চলে। আবার কোনটি চলে চার পায়ে ভর করে। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন, তিনি তো সকল কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। (সূরা আন্ নূর-৪৫)

মাটির মৌলিক উপাদান

আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীকে মানুষের জন্য বিছানা হিসেবে বিছিয়ে দিয়েছেন, দূর-দূরান্তে মানুষ যেন গমন করতে পারে, সে জন্য নানা ধরনের পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এই পৃথিবীর ভূ-ভাগকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নানা ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠন করেছেন। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের ৪৬ দশমিক ৬ শতাংশ হলো অক্সিজেন, ২৭ শতাংশ সিলিকন, ৮ দশমিক ১ শতাংশ এ্যালূমিনিয়াম, ৫ শতাংশ লোহা, ৩ দশমিক ৬ শতাংশ ক্যালসিয়াম, ২ দশমিক ৮ শতাংশ সোডিয়াম, ২

www.pathagar.com

দশমিক ৬ শতাংশ পটাসিয়াম, ২ শতাংশ ম্যাগনেসিয়াম এবং অন্যান্য উপাদান ১ দশমিক ৬ শতাংশ। এখানে মানুষ যেন তার প্রয়োজনীয় জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম হয় সে ব্যবস্থাও আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন করেছেন। আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তিনি অনুর্বর যমীনকে উর্বর করেছেন, যেন মানুষ ফসল উৎপাদনে সক্ষম হয়। যমীনে নানা ধরনের উদ্ভিদ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করেছেন যেন নিরামিষাশী প্রাণীকুল এসব আহার করে তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারে। মানুষকে বলা হয়েছে এসব আহার করো আর আমারই দাসত্ব করো। আমিই তোমাদের রব এবং শুধু আমারই প্রশংসা করো। আমার আইন ব্যতিত অন্য কারো আইন-বিধান অনুসরণ করো না। তোমরা লক্ষ্য করে দেখো, কিভাবে আমি এই পৃথিবীর যমীনকে তোমাদের জন্য কল্যাণকর করে দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ–

যমীনকে আমি বিস্তৃত করে দিয়েছি এবং যমীনের ওপর পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছি, প্রত্যেক বস্তু আমি সুপরিমিতভাবে (Balanced) সৃষ্টি করেছি এবং এসবের মধ্যে তোমাদের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তোমাদের জন্য আর সেই অসংখ্য সৃষ্টির জন্য যাদের রিয্কদাতা তোমরা নও। (সূরা হিজর-১৯-২০)

মাটি চারটি পর্বে বিভক্ত

বিজ্ঞানীগণ বলেন, এ পৃথিবী প্রধানত চারটি পর্বে বিভক্ত। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অভ্যন্তরের পর্বকে ইনার কোর (Inner Core) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই ইনার কোর (Inner Core) কঠিন লোহা দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। ইনার কোরের ব্যাসার্ধ প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার। (Outer Core) আউটার কোর (Inner Core) ইনার কোরকে আবৃত করে রেখেছে। এই আউটার কোর তরল লোহা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এর সাথে ২০ ভাগ মত নিকেল রয়েছে। এই আউটার কোরের পুরুত্ব (Thickness) প্রায় ১৮০০ কিলোমিটার। এই আউটার কোরের ওপরের পর্বকে ম্যান্টেল (Mantle) নামে অভিহিত করা হয়েছে। ম্যান্টেল (Mantle) প্রধানত অক্সিজেন, সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও লোহার

www.pathagar.com

তৈরী যৌগিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। এই ম্যান্টেলের পুরুত্ব প্রায় ২৯২০ কিলোমিটার।

বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই ম্যান্টেল কোরের ওপরের স্তরকে ক্রাষ্ট (Crust) বলা হয়। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ এই ক্রাষ্টের ওপরেই অবস্থান করছে। এই ক্রাষ্টের পুরুত্ব প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার এবং সমুদ্র তলদেশে প্রায় ১০ কিলোমিটার। ম্যান্টেলের ওপর অংশের ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত একটু ভিন্ন গুণাবলী সম্পন্ন। ক্রাষ্ট এবং ম্যান্টেলের ওপরের অংশের এই এলাকা সম্মিলিতভাবে লিথোস্ফিয়ার (Lithosphere) প্রস্তুত করে। লিথোস্ফিয়ার (Lithosphere) অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে গঠিত এবং সাতটি বিরাটাকারের খন্ডে বিভক্ত। এগুলোকে কন্টিনেন্টাল প্লেটস (Continental Plates) নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার লিথোস্ফিয়ারের নিচের অংশকে এ্যাসথেনোস্ফিয়ার (Asthenosphere) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের তাপমাত্রা ৪০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং যতই ওপরের দিকে আসা যাবে ততই এর তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে। পৃথিবীর ভূ-ভাগের ওপরের অংশের এই তাপমাত্রা .০৬ ওয়াট প্রতি বর্গমিটারে এবং তা পৃথিবীর ভেতর থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসার সময় এ্যাসথেনোস্ফিয়ারে কনভেকশন কারেন্ট (Convection Current) প্রস্তুত করে।

এই কারেন্ট বা স্রোত যমীনের ওপরের অংশে ধাক্কা দেয় এবং তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ্যাসথেনোস্ফিয়ারের এই কনভেকশন কারেন্টের কারণে কন্টিনেন্টাল প্লেটগুলো অত্যন্ত ধীর গতিতে চলতে থাকে। পৃথিবীর সাতটি মহাদেশ এই সাতটি প্লেটের ওপরে অবস্থিত, এ কারণে মহাদেশগুলো অত্যন্ত ধীর গতিতে চলতে থাকে। এই প্লেটগুলো যখন চলতে থাকে তখন এর কিনারাগুলো একটির সাথে আরেকটি ক্রিয়া করে থাকে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই ক্রিয়া চার ধরণের হতে পারে। যখন একটি প্লেট আরেকটি প্লেটকে ধাক্কা দেয় এবং একটি অন্যটির নীচে চলে যেতে পারে না, যে এলাকায় এটা ঘটে সে এলাকাকে কলিসন জোন (Collision Zone) বলে। এলাকায় প্লেটের কিনারা বাঁকা হয়ে পর্বতমালার সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, হিমালয় পর্বত এই প্রক্রিয়াতেই সৃষ্টি হয়েছে। আর যখন একটি প্লেট অন্য প্লেটের নীচে চলে যায় তখন ভূমিকম্প হতে পারে, আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নি উদগীরণ হতে পারে। আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত লাভা দ্বারা পর্বতমালার সৃষ্টি হতে পারে যেমন হয়েছে আন্দিজ পর্বতমালা। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই প্রক্রিয়াতেই পৃথিবীকে প্রসারিত করেছেন মানব জাতির কল্যাণের জন্য।

www.pathagar.com

মাটি নিয়ন্ত্রণসাধ্য

মানুষের প্রতিদিনের জীবনের প্রয়োজনীয় সব ধরনের উপকরণ দিয়েই এই ভূ-পৃষ্ঠ আল্লাহ তা'য়ালা গঠন করেছেন যেন মানুষ তার জ্ঞান বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ ভূ-পৃষ্ঠ থেকেই সংগ্রহ করতে পারে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ–

তিনি তোমাদের জন্য মাটিকে পরিচালনসাধ্য বা নিয়ন্ত্রণসাধ্য (Manageable) করে দিয়েছেন। তোমরা মাটির বুকে বিচরণ করো এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার্য গ্রহণ করো। (সূরা মুল্ক–১৫)

আল্লাহ্ তা'য়ালা এই মাটিকে পাথরের মতো কঠিন করেননি, আবার পানির মতো তরলও করেননি। যেরূপে যে অবস্থায় মাটি থাকলে সমস্ত সৃষ্টির কল্যাণ হয়, আল্লাহ্ তাই করেছেন। আর যিনি এটা করেছেন তাকেই বলা হয় রব্। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا، وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ، اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ–

আর তিনিই ভূ-তলকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন এবং পৃথিবীর বুকে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক ফল সৃষ্টি করেছেন দুই প্রকারের। তিনি দিনকে রাত দিয়ে আবৃত করে দিয়েছেন। এসব কিছুর মধ্যে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রা'দ-৩)

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'পৃথিবীর ভূ-তলকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন'। এ আয়াতে যে 'মাদ্দা' শব্দ ব্যহার করা হয়েছে, এর অর্থ হলো, 'কোন কিছুকে টানা বা বিস্তৃত করা।' বিজ্ঞানীদের পৃথিবী সম্পর্কে গবেষণালব্ধ তথ্যানুযায়ী আমরা জানতে পারি যে, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ এলাকা অতিরিক্ত উত্তপ্ত থাকার পরও অতিরিক্ত চাপের (Pressure) কারণে কঠিন অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠের অল্প গভীরে চাপের পরিমাণ কম থাকার কারণে মাটির নিচের পদার্থসমূহ গলিত অথবা কঠিন বা মিশ্রণ

অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে ভূ-পৃষ্ঠ ঠান্ডা হওয়ার জন্য কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ঢাকনা (Crust) বা আবরণের সৃষ্টি হয়েছে। মাটির এই আবরণ পৃথিবীর কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ হয়নি। আবরণটি গোলাকার পৃথিবীকে ঘিরে বা আবৃত করে রেখেছে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই আবরণ গঠিত না হলে এই পৃথিবীতে কোন প্রাণী বসবাস করতে পারতো না।

ভূ-পৃষ্ঠের আবরণ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সমস্ত প্রাণী জগতের কল্যাণের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের আবরণ সৃষ্টি করে টেনে দিয়েছেন বা বিস্তৃত করে দিয়েছেন। কিন্তু এই আবরণের বিষয়টি এতটা সহজ নয়। চিন্তা গবেষণা করলে মাটির এই আবরণটির গঠনের কলা-কৌশল দেখলে সিজ্দায় মাথানত হয়ে আসে। যমীনকে আল্লাহ্ বিস্তৃত করেছেন–

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ–

এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, দেখতো আমি কত চমৎকার করে বিছিয়েছি! (সূরা যারিয়াত-৪৮)

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ–

আমি যমীনকে বিস্তৃত করেছি, তারপর এর ওপরে পাহার গেড়ে দিয়েছি, তারপর যমীনের ওপরে নব ধরনের উদ্ভিদ দান করেছি এবং এসব উদ্ভিদ যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, সেখানে ততটুকুই দান করেছি। (সূরা হিজর–১৯)

গোলাকার উত্তপ্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠ মাটির স্তর দিয়ে ঢেকে দিয়ে বা বিস্তৃত করে দিয়ে যথাযথ উষ্ণতা, পানি, বায়ূ ইত্যাদি সৃষ্টি করে আল্লাহ্ পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করেছেন। ভূ-পৃষ্ঠের মাটির ভেতরে আল্লাহ্ স্তর সৃষ্টি করেছেন বা বিছানার মতো করে বিছিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً–

তোমাদের জন্য মাটিকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন। (সূরা বাকারাহ্-২২)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

www.pathagar.com

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا-

তোমাদের জন্য মাটিকে বিছানা করেছেন। (সূরা ত্বাহা-৫৩)

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا-

মাটিকে তোমাদের জন্য বিছানা হিসেবে বিছিয়ে দিয়েছি, তা কি তোমরা দেখতে পাও না? (সূরা নাবা)

ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে

আল্লাহর আদেশে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। কোন একটি ধূলি কণাও যেন শুষ্ক না থাকে মহান আল্লাহ্ সে ব্যবস্থা করেন। গাছ ফলে-ফুলে সুশোভিত হবে-এ জন্য প্রয়োজন হয় কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ইত্যাদি। আল্লাহ্ হলেন রাব্বুল আলামীন-তিনি এসবের ব্যবস্থা করেন। বৃক্ষ-তরুলতা বায়ুমন্ডলে থাকা কার্বনডাই-অক্সাইড থেকে কার্বন সংগ্রহ করে, বায়ুমন্ডল মাটি ও পানি থেকে হাইড্রোজেন সংগ্রহ করে এবং বায়ুমন্ডল ও পানি থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে। এছাড়াও নানা পদার্থসমূহ্ মাটি থেকে সংগ্রহ্ করে।

এই পৃথিবীকে তিনি প্রাণীকুলের জন্য বাসোপযোগী করেছেন। বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, এই পৃথিবী আকৃতিতে গোলাকার। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ অঞ্চল উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে। কেন্দ্রস্থ এলাকার উষ্ণতা সবচেয়ে বেশি এবং ওপরের দিকের উষ্ণতা ক্রমশঃ কমে এসেছে। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ শিলা, বালি ও মাটি দিয়ে গঠিত। এই ভূ-পৃষ্ঠের নিচে মহান আল্লাহ্ নানা ধরনের খনিজ সম্পদ দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছেন। আবার ওপরের দিকে রয়েছে নদী, সাগর, মহাসাগর এবং বনজসম্পদ। নদী সাগর, মহাসাগরের গর্ভে আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষের কল্যাণের জন্য অগণিত সম্পদ দান করেছেন। বনজ সম্পদ শুধু মানুষেরই কল্যাণে আসে না, সমস্ত প্রাণীকুল বনজ সম্পদ থেকে যেন উপকৃত হতে পারে, মহান আল্লাহ্ সে ব্যবস্থাও করেছেন।

পৃথিবীর ওপরে শূন্যমার্গে বায়ুমন্ডল দিয়ে আবৃত করা রয়েছে। মাটি, পানি ও বায়ুমন্ডল সৃষ্টি করেছেন বলে এই পৃথিবী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য বসবাসোপযোগী হয়েছে। এই পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন-

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً

وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ، ذٰلِكُمُ

اللّٰهُ رَبُّكُمْ، فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ-

আল্লাহই তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করেছেন এবং ওপরে আকাশের গম্বুজ নির্মাণ করেছেন, যিনি তোমাদের প্রতিকৃতি রচনা করেছেন, অত্যন্ত সুন্দর করে বানিয়েছেন, যিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিস সমূহের রিয্ক দান করেছেন। তিনিই আল্লাহ্ এসব কাজ যিনি নিপুণভাবে সম্পাদন করেছেন তিনি তোমাদের রব, অসীম অপরিমেয় বরকতওয়ালা বিশ্বলোকের সেই রব।

আল্লাহ্ তা'য়ালা শুধু এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগিই করেননি, এই পৃথিবীকে মানুষের জন্য শয্যা বানিয়েছেন, পৃথিবীতে মানুষের জন্য অসংখ্য কল্যাণের পথ সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন-

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-

যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যা এবং সেখানে তোমাদের কল্যাণের জন্য পথ করে দিয়েছেন যেন তোমরা নিজেদের গন্তব্যস্থলের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হও। (সূরা যুখরুফ-৯)

ভূপৃষ্ঠের কম্পন

পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে-

خَلَقَ السَّمٰوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ-

তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো, তিনি আকাশ মন্ডল সৃষ্টি করেছেন কোন ধরনের স্তম্ভ ব্যতিতই, তিনি যমীনের বুকে পর্বতমালা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে দিয়েছেন, যেন যমীন তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না যায়। তিনি সব ধরনের জীব-জন্তু যমীনের বুকে বিস্তার করে দিয়েছেন, আকাশ থেকে পানি বর্ষিয়েছেন এবং যমীনের বুকে রকমারী উত্তম জিনিসসমূহ উৎপাদন করেছেন। (সূরা লূকমান- ১০)

www.pathagar.com

এসব আয়াতে 'কাঁপা' বা 'হেলে' যাওয়া শব্দ দিয়ে আমরা যে মাটির ওপরে অবস্থান করছি সেই মাটিকে বা পৃথিবী পৃষ্ঠকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এসব আয়াত থেকে গোটা ভূ-পৃষ্ঠের কম্পন বা আন্দোলিত হবার কথা বুঝানো হয়নি। বরং গোটা পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ আন্দোলিত না হয়েও ভূ-পৃষ্ঠের যে কোনো স্থান যে কোনো মুহূর্তে আন্দোলিত হতে পারে। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর একটি দেশে ভূমিকম্প হলে অন্য দেশ তা অনুভব করতে পারে না। আবার একটি দেশের ভেতরেও একটি বিশেষ এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয় কিন্তু পার্শ্ববর্তী এলাকায় তা অনুভূত হয় না। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ভূ-পৃষ্ঠের কম্পন হওয়ার জন্য পৃথিবীর সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ কাঁপার প্রয়োজন হয় না। ভূমিকম্পের কারণে স্থানীয়ভাবে ভূ-পৃষ্ঠের কম্পন হয় এবং সেই কম্পন দূরবর্তী কোন স্থানকে প্রভাবিত নাও করতে পারে- সাধারণত এটা করে না তাই আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ তা'য়ালা যদি পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি না করতেন তাহলে ভূ-পৃষ্ঠের এই স্থানীয় কম্পন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতো এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধিলাভ করতো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ–

আমি ভূ-পৃষ্ঠে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে দিয়েছি যেন ভূ-পৃষ্ঠ তাদের নিয়ে কাঁপতে না পারে। (সূরা আম্বিয়া-৩১)

রেল লাইনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই যে, ইস্পাত নির্মিত পাতগুলোর নিচে রয়েছে অনেকগুলো ইস্পাতের পাত বা মোটা কাঠ। এগুলোর সাথে লোহার মোটা পেরেক দিয়ে রেল লাইনগুলো অত্যন্ত মজবুতভাবে এঁটে দেয়া হয়েছে যেন ট্রেন চলাচলের সময় তা নড়াচড়া করতে না পারে। তেমনি আল্লাহ তা'য়ালা পাহাড়-পর্বতগুলো পেরেকের ন্যায় ভূ-পৃষ্ঠের গভীরে গেঁথে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا–

আর পাহাড়গুলো গ্রাফীর ন্যায় গেড়ে দিয়েছি। (সূরা নাবা-৭)

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পাহাড়-পর্বতের উচ্চতা ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে যত পরিমাণ দৃষ্টিগোচর হয় তারচেয়েও অনেক বেশী মাটির অতলদেশে প্রোথিত রয়েছে। কোন পর্বতমূল ভূ-গর্ভের কতটা গভীরে প্রোথিত রয়েছে তা নির্ভর করে সেই পর্বতটির সৃষ্টির সূচনা কিভাবে হয়েছিল। অর্থাৎ আগ্নেয়গিরির লাভার মাধ্যমে তা সৃষ্টি হয়েছে না অন্য কোনভাবে। গড় হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০ থেকে ১৫

www.pathagar.com

মাইল পর্যন্ত পুরু বা মোটা হতে পারে। এ কারণে পর্বতের মাটির নিচের মূল অংশ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০ থেকে ১৫ মাইল গভীরে প্রোথিত থাকতে পারে। এরচেয়ে অধিক গভীরে অতিরিক্ত উত্তাপের কারণে পদার্থগুলো গলিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই, পাহাড়-পর্বতসমূহ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে উত্থিত হয়েছে এবং নিচের দিকেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। সুতরাং পাহাড়-পর্বতগুলো ভূ-পৃষ্ঠে গজালের ন্যায় বিদ্ধ হয়ে রয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা এ ব্যবস্থা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন–

وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا، مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ–

আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠে পর্বত প্রোথিত করে দিয়েছেন, জীবিকার সামগ্রী হিসেবে তোমাদের জন্য এবং তোমাদের পশুর জন্য। (সূরা নাযিয়াত-৩২-৩৩)

আল্লাহ তা'য়ালা পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সঠিক অবস্থান দান করেছেন। পর্বতের এই সঠিক অবস্থিতির কারণে বাতাস তথা মেঘের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বৃষ্টি বর্ষণে সহায়ক হয়। পাহাড়-পর্বত থেকে প্রবাহিত নদ-নদীর পানি প্লাবিত হয়ে কৃষি কাজের জন্য মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধিলাভ করে। নদ-নদীর পানি নিয়ন্ত্রিত করে দূর-দূরান্তে পানির সরবরাহ করা সম্ভব হয় এবং পানিবিদ্যুৎ উৎপন্ন করে মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। এভাবে নানা ধরনের খাদ্য সামাগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে এবং তা মানুষ ও প্রাণীকুলের আহার যোগাচ্ছে। এগুলো যিনি সম্পাদন করেছেন তাঁর নামই হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোরআন ঘোষণা করছে–

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا–

এবং তিনি ভূ-পৃষ্ঠে পর্বতমালা ও নদী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রা'দ-৩)

একই মোহনায় মিলন

পুরুষ ও নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও মিলন বিশ্বপ্রকৃতির এক স্বভাবসম্মত বিধান এবং তা এক চিরন্তন শ্বাশত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা কার্যকর হয়ে রয়েছে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি পরতে পরতে। প্রতিটি প্রাণী, উদ্ভিদ ও বস্তুর মধ্যে। সৃষ্ট জীব, জন্তু ও বস্তুনিচয় জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার তাৎপর্য হলো, সৃষ্টির মূল রহস্য দুটো জিনিসের পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে মিলে মিশে একই মোহনায় অবস্থান করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যখনই এভাবে দুটো জিনিসের মিলন সংঘটিত হবে, তখনই সে মিলনের মধ্য থেকে তৃতীয় আরেকটি জিনিসের উদ্ভব হতে পারে।

www.pathagar.com

সৃষ্টিজগতের কোন একটি জিনিসও চিরন্তন এই নিয়ম ও পদ্ধতির বাইরে নয়। এর ব্যতিক্রম কোথাও দৃষ্টি গোচর হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ–

পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি সবকিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, তা যমীনের উৎপন্ন উদ্ভিদ থেকে হোক, অথবা স্বয়ং তাদের নিজেদের থেকে, অথবা এমন সব সৃষ্টি থেকে হোক, যাদের সম্পর্কে মানুষ এখনো আদৌ কিছু জানে না। (সূরা ইয়াছিন- ৩৬)

وَمِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ–

প্রত্যেকটি বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে করে এ নিয়ে তোমরা চিন্তা-গবেষণা করতে পারো। (সূরা যারিয়াত- ৪৯)

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا، وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ–

তিনিই তোমাদের জন্যে এ যমীন বিস্তৃত করে দিয়েছেন এবং তাতে পাহাড় ও নদী বসিয়ে দিয়েছেন, সেখানে আরো রয়েছে রং বেরংয়ের ফল ফুল, তাও বানিয়েছেন আবার জোড়ায় জোড়ায়। (সূরা আর রা'দ-৩)

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَاَخْرَجْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى، كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ، اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى–

তিনি এমন এক সত্তা, যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন, ওতে তোমাদের চলার জন্যে বহু ধরনের পথঘাটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি প্রেরণ করেন, এরপর দিয়ে যমীন থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ বের করে আনেন। যেনো তোমরা তা নিজেরা খাও এবং তাতে তোমাদের পশুদেরও চরাতে পারো; অবশ্যই এর মধ্যে বিবেকসম্পন্ন মানুষদের জন্যে শিক্ষার অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সূরা ত্বাহা- ৫৩-৫৪)

www.pathagar.com

এই যে একই মোহনায় মিলন অবস্থান এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে তৃতীয় ফসল উৎপাদন করার ব্যবস্থা শুধুমাত্র মানবজাতি, প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদরাজির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটা হচ্ছে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত এক সুক্ষ্ম ও ব্যাপক ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক জগতের কোন একটি জিনিসও এ ব্যবস্থা থেকে মুক্ত নয়। গোটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থাই এমন কৌশলে রচিত ও সজ্জিত যে, এখানে সর্বত্রই পুরুষ জাতি এবং স্ত্রী জাতি। এ দুটো প্রজাতি সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে বিদ্যমান। এ দুটো প্রজাতির ভেতরে রয়েছে এক দুর্লংঘ্য ও অনমনীয় আকর্ষণ, যা পরস্পরকে নিজের দিকে প্রতিনিয়ত তীব্রভাবে আকর্ষিত করছে। এ আকর্ষণের কারণেই মানুষের ভেতরে নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং বিয়ের মাধ্যমে মিলিত জীবন-যাপন করে। সমস্ত প্রাণীজগতেও এ আকর্ষণ কার্যকর রয়েছে।

মানুষ এবং প্রাণীসমূহ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের কারণে একের কাছে আরেকজন যেতে পারে এবং মিলিত হতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদজগৎ তথা জড়জগতের অবস্থা ভিন্নরূপ। এসব সৃষ্টির সূচনাতে যে স্থানে অবস্থান করে, পরিসমাপ্তিতেও সেই একই স্থানে অবস্থান করে। এরা অবস্থানচ্যুত হতে পারে না। উদ্ভিদ জগতে ফুলের থেকে ফল সৃষ্টি হয়। আর এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা পরাগায়নের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি ফুলের প্রতিটি উর্বর পুংকেশরের মাথায় একটি করে পরাগধানী সৃষ্টি করেছেন। এই পরাগধানীর ভেতরেই পরাগরেণু উৎপাদিত করেন। নির্দিষ্ট একটি সময়ে পরাগধানী যেন ফেটে যায় এবং পরাগরেণু কীট-পতঙ্গ ও বাতাসের মাধ্যমে একই গাছের অন্য একটি ফুলের অথবা একই প্রজাতির অন্য একটি গাছের কোন একটি ফুলের গর্ভমুন্ডের সাথে যেন লেগে যায়, এ ব্যবস্থা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন করেছেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকেই বলা হয়েছে পরাগায়ন (Pollination)।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের দেহ গঠন

মানুষের সৃষ্টি প্রসঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, এই মানুষের কোন অস্তিত্বই ছিল না। মহান আল্লাহ বলেন–

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى–

মানুষ কি সেই সামান্যতম শূক্র ছিল না, যা সবেগে নির্গত হয়েছিল? (সূরা কিয়ামাহ্- ৩৭)

পক্ষান্তরে মানব দেহে এই শূক্র এলো কোত্থেকে? পৃথিবীতে আমরা যা কিছুই দেখি, এসবের মূল উপাদান হলো মাটি। মাটি থেকেই সকল কিছু সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

বিশাল আকাশের শূন্যগর্ভে যে উড়োজাহাজ চলাচল করে, তা যে উপকরণ দিয়ে নির্মিত হয়েছে, নির্মাণকালে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব বস্তুর মূল উপাদান মাটি থেকে উৎপাদিত হয়েছে। যেমন লৌহ, তামা, দস্তা, পিতল, স্বর্ণ, কয়লা ইত্যাদির খনি মৃত্তিকা অভ্যন্তরেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্রমশ অস্তিত্ব লাভ করে। কাঠ সংগৃহিত হয় গাছ থেকে। গাছ উৎপন্ন হচ্ছে মাটি থেকে। পৃথিবীতে আমরা যা কিছুই দেখছি, তা মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন জাতবস্তু আল্লাহর দেয়া জ্ঞান প্রয়োগে পরিবর্তন করে মানুষ নবতর আবিষ্কার করেছে। সুতরাং, মানুষ মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্য আহার করে। দেহ এবং দেহের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে, তা গঠিত হয় গ্রহণকৃত খাদ্যের সার নির্যাস থেকে। মানুষের দেহ থেকেই শূক্র নির্গত হয়, অতএব শূক্রের মূল উপাদান হলো মাটি। এ জন্যেই বলা হয় মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে।

মানুষের দেহ গঠনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিস্ময়ের ধাক্কায় হতবাক হয়ে যেতে হয়। অসংখ্য কোষ (Cell) দিয়ে মানব দেহ গঠন করেছেন আল্লাহ–যিনি হলেন রব। লক্ষ লক্ষ কোষের মাধ্যমে গঠিত মানুষের দেহসৃষ্টি নৈপুন্যতায় এক অদ্ভুত জটিল সৃষ্টি। বিশাল একটি ইমারত যেমন একটির পর একটি ইট পাথর সাজিয়ে নির্মাণ করা হয়, তদ্রুপ মানুষের দেহে কোষের পর কোষ বিন্যাসের মাধ্যমে মানুষের দেহ কাঠামোটি গড়ে তুলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এই অসংখ্য কোষ সর্বপ্রথমে বিস্তৃতি লাভ করেছে একটি মাত্র কোষ থেকে। সূচনায় যা ছিল একটি পুরুষ প্রজনন কোষ যাকে বলা হয়েছে শুক্রাণু (Spermatozoon) এবং আরেকটি স্ত্রী প্রজনন কোষ যাকে বলা হয়েছে ডিম্বাণু (Ovum)। এই দুটো কোষের মিলিত হওয়াকে বলা হয়েছে নিষেক (Fertilization)। এ দুটো কোষ মিলিত হয়ে যে কোষটি উৎপন্ন হয়েছে তাকে বলা হয়েছে জাইগোট (Zygote)। বিভাজনের মাধ্যমে এই জাইগোট মহান আল্লাহর নির্দেশে ক্রমশঃ মাতৃগর্ভে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। মাতৃগর্ভের যে স্থানটির নাম জরায়ূ (Uterus) সেখানে তা স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং এটাকেই বলা হয়ে থাকে ভ্রূণ (Embryo)। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً–

www.pathagar.com

হে জনগণ! তোমাদের রবকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকেই তোমাদের জুটি নির্বাচিত করেছেন এবং এই উভয় থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারীকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা আন নিছা-১)

মাতৃগর্ভে আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় ভ্রূণ বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। এভাবে প্রায় চল্লিশ সপ্তাহ অর্থাৎ দুই শত আশি দিন বা আরো কিছু কম সময়ের ব্যবধানে অপূর্ব সুন্দর মানব শিশু এই পৃথিবীতে আগমন করে। রব্বুল আলামীন বলেন–

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ–

তিনি মানুষকে এক ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন নাহ্ল–৪)

এই আয়াতে 'নুৎফা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটির অনেক ধরনের অর্থ হতে পারে যা যথাস্থানে প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণতঃ নুৎফা শব্দ দ্বারা শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুকে বোঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহর নির্দেশে যে সমস্ত কোষ একটির পর আরেকটি সজ্জিত হয়ে মানব দেহ গঠিত হয়, তার ভেতরে নানা ধরনের জৈব পদার্থ বিদ্যমান থাকে। এসব পদার্থকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে এবং তার একটিকে বলা হয়েছে সাইটোপ্লাজম ও অপরটিকে নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থান করছে DNA (Deoxyribonucleic Acid)। মূলতঃ এজিনিসটিই হচ্ছে প্রাণীজগতের বংশগতির ধারক-বাহক। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রতিটি প্রাণীর ডিএনএ-কে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন ফলে একটি প্রাণীর গর্ভ থেকে ভিন্ন প্রজাতির আরেকটি প্রাণী জন্মগ্রহণ করে না। নারী দেহের একটি ডিম্বাণুর মধ্যে পুরুষ দেহের একটি শুক্রাণু প্রবেশ করে নিষেক ঘটাতে সক্ষম হলেই ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। এরপর এই ভ্রূণ নানা স্তর অতিক্রম করতে থাকে। আর এগুলো যিনি সুনিপুন দক্ষতার সাথে সম্পাদিত করেন, তিনিই হলেন আমাদের রব। আল্লাহ্ বলেন–

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا–

তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নূহ–১৪)

মানুষ মাতৃগর্ভে কিভাবে অবস্থান করে এবং কয়টি পর্যায় অতিক্রম করে এই পৃথিবীতে আসে, বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন–

يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ

www.pathagar.com

ظُلُمَاتٍ ثَلٰثٍ، ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ–

তিনিই মাতৃগর্ভে তিন তিনটি অন্ধকারময় আবরণের মধ্যে তোমাদেরকে একের পর এক সজ্জিত করেছেন। তিনিই আল্লাহ–যিনি তোমাদের রব। প্রভুত্ব সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, তিনি ব্যতীত দাসত্ব লাভের অধিকারী কেউ নেই। (সূরা যুমার-৬)

তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন স্তর অতিক্রম করে এই মানুষকে মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়েছে। আধুনিক ভ্রূণ তত্ত্ববিদগণ মাতৃগর্ভে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভ্রূণ বিকাশের স্তরগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, যে তিনটি স্তরের কথা কোরআন বলেছে, তার প্রতিটি স্তর তিনটি পর্দা দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে। এসব পর্দা মানব শিশুকে দেহ সম্পর্কিত নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করে যাচ্ছে। এই বিস্ময়কর ব্যবস্থা যিনি সুচারুরূপে সম্পাদন করছেন, তিনিই হলেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। বর্তমান মেডিকেল সাইন্স এই তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণকে বলেছে, জাইগোট, ব্লাষ্টোসিষ্ট ও ফিটাস (Zygote. Blastocyst. Foetus)। বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুসারে প্রতিটি মানুষের দেহে যে কোষ রয়েছে, তার ভেতরে তেইশ জোড়া বা ছয়চল্লিশটি ক্রোমোজোম (Chromosome) বিদ্যমান। মানব শিশুর সূচনায় দেহ কোষে তেইশটি ক্রোমোজোম সরবরাহ হয় পিতার শুক্রাণু থেকে এবং আরো তেইশটি ক্রোমোজোম সরবরাহ করে মায়ের ডিম্বাণু। এই ছয়চল্লিশটি ক্রোমোজোমের মধ্যে তেইশটিকে বলা হয় দেহ ক্রোমোজোম (Autosome)। দেহ ক্রোমোজোমের মধ্যে বাইশ জোড়া ক্রোমোজোমের আকার ও কর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতা এক ও অভিন্ন। এই এক ও অভিন্ন ক্রোমোজোম মানব শিশুর দেহ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

তারপর আরো যে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম (Sex chromosome), এগুলো মানব শিশুর যৌন বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ পুরষ হবে না নারী হবে–তা নিয়ন্ত্রণ করে। এই তেইশটি ক্রোমোজোমকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এর একটি হলো মেইল ক্রোমোজোম (Male chromosome) ও অপরটি হলো ফিমেইল ক্রোমোজোম (Female chromosome)। বিজ্ঞানীগণ মেইল ক্রোমোজোমের পরিচিতি তুলে ধরেছেন ইংরেজী অক্ষরের ওয়াই (Y) অক্ষর দিয়ে এবং ফিমেইল ক্রোমোজোমের পরিচয় দিয়েছেন ইংরেজী অক্ষরের এক্স (X) অক্ষর দিয়ে। অর্থাৎ নারীর যৌন ক্রোমোজোমের সাংকেতিক চিহ্ন হলো দুটো এক্স (XX)। পক্ষান্তরে পুরুষের যৌন ক্রোমোজোমের জোড়ায় একটি এক্স ও অন্যটি ওয়াই বিদ্যমান রয়েছে (XY)।

www.pathagar.com

এভাবে পুরুষের যৌন ক্রোমোজোমের পরিচিতি দেয়া হয়েছে একটি এক্স ও একটি ওয়াই দিয়ে। এই যৌন ক্রোমোজোমের কারণেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে দেহগত বাহ্যিক আকৃতি–বৈশিষ্ট্য এবং শরীরের অভ্যন্তরীস্থ পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। এই অকল্পনীয় জটিল বিষয়টি যিনি সুনিপুনভাবে সম্পাদন করেছেন, তিনিই হলেন রাব্বুল আলামীন। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلاَ تَضَعُ اِلاَّ بِعِلْمِهٖ–

আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্রকীট থেকে। এরপর তোমাদেরকে জোড়ায় পরিণত করা হয়েছে। কোন নারী গর্ভবতী হয়না, না সন্তান প্রসব করে–এসব কিছু রয়েছে আল্লাহর জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণে। (সূরা ফাতির–১১)

এভাবে জোড়া সৃষ্টি বা ক্রোমোজম সংক্রান্ত বিষয় অত্যন্ত রহস্যময়। কিভাবে এটা সংঘটিত হয়, তা বিজ্ঞানীদের কাছে এক চরম বিস্ময়কর বিষয়। সমগ্র সৃষ্টি জগতসমূহের রব মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِيْنٍ، ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا، ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ، فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ–

আমি মানুষকে মাটির সার নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে একটি সুসংরক্ষিত স্থানে টপ্‌কে পড়া ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি। এরপর সেই ফোঁটাকে জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত করেছি। তারপর সেই রক্তপিন্ডকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি। এরপর মাংসপিন্ডে অস্থি-পিঞ্জর স্থাপন করেছি। তারপর অস্থি-পিঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি গোস্ত দিয়ে। তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি হিসাবে। সুতরাং আল্লাহ্ বড়ই বরকত সম্পন্ন, সমস্ত শিল্পীর চেয়ে সর্বোত্তম শিল্পী তিনি। (সূরা মুমিনুন-১২-১৪)

www.pathagar.com

উল্লেখিত আয়াতে 'সুলালাতিম মিন ত্বিন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো মাটির সার-নির্যাস। মাটি যেসব উপাদানে গঠিত তাহলো, ৬৪ দশমিক ৬ শতাংশ অক্সিজেন, ২৭ শতাংশ সিলিকন, ৮ দশমিক ১ শতাংশ এ্যালুমিনিয়াম, ৫ শতাংশ লোহা, ৩ দশমিক ৬ শতাংশ ক্যালশিয়াম, ২ দশমিক ৮ শতাংশ সোডিয়াম, ২ দশমিক ৬ শতাংশ পটাশিয়াম, ২ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম। তারপর হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য উপাদান ১ দশমিক ৬ শতাংশ রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের উদ্ভিদরাজি তার মূলের সাহায্যে মাটির এসব উপাদান শোষণ করে। তারপর উদ্ভিদ থেকে যেসব খাদ্য উৎপন্ন হচ্ছে তা মানুষ খাদ্য হিসাবে আহার করে। পাকস্থলিতে এগুলো ডাইজেষ্ট হয়। গ্রহণকৃত খাদ্যের সার-নির্যাস থেকে জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পুরুষের শুক্রাশয়ে স্পার্ম্যাটাজোন (Spermatozoon) এবং নারীর ডিম্বাশয়ে (Ovary) ওভাম (Ovum) উৎপন্ন হয়। ওভাম-এর নিষেক থেকে সৃষ্টি হয় জাইগোট। এই জাইগোট নারীর জরায়ুতে স্থানান্তরিত হয়ে ভ্রূণ গঠন করে। জগতসমূহের রব মহান আল্লাহ এই ভ্রূণ থেকেই পর্যায়ক্রমে মানুষ সৃষ্টি করেন।

জাইগোট গঠনের মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সেটা নারীর বাচ্চা থলির দেয়ালে একটি ঘেরা প্রকোষ্ঠে স্থান লাভ করে। এরপর তা জ্যামিতিক হারে বিভাজন হতে থাকে এবং সময়ের ব্যবধানে তা জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত হয় এবং বিজ্ঞানীগণ এটাকেই ব্লাষ্টোসিষ্ট নামে অভিহিত করেছেন। এই ব্লাষ্টোসিষ্ট অনেকটা পানির জোঁকের মতো দেখায়। তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে জোঁক রক্তপান করলে যেমন আকৃতি ধারণ করে, এটিও তেমন আকার ধারণ করে। এই ব্লাষ্টেসিষ্ট মায়ের রক্ত দ্বারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে এবং মাতৃগর্ভের বাচ্চাথলির দেয়ালে ঝুলতে থাকে। ব্লাষ্টোসিষ্টের বাইরের যে স্তরটি তাকে বলা হয় ট্রফোব্লাষ্ট-এই ট্রফোব্লাষ্ট থেকে এক ধরনের এনজাইম নির্গত হতে থাকে।

এনজাইমের প্রভাবে বাচ্চাথলির টিসুগুলো গলে যায় এবং গলিত টিসুর ভেতরে ব্লাষ্টোসিষ্ট ডুবে যায়। এ সময় ব্লাষ্টোসিষ্ট পরিণত হয় মাংসপিন্ডে যাকে সুমিটেস বলা হয়। এ প্রক্রিয়া প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। এই সুমিটেসের শিরদাঁড়ায় তেরটি উঁচু নিচু দাগের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এটাই পরবর্তীতে মেরুদন্ডে পরিণত হয়। ছয় সপ্তাহের শেষ সময়ে এটা একটি মানব কঙ্কালের আকার ধারণ করে। বার সপ্তাহের মধ্যে ভ্রূণের একটি ক্ষুদ্র অথচ পরিপূর্ণ কঙ্কাল গঠিত হয় এবং এ কঙ্কালে সর্বমোট তিন শত ষাটটি জোড়া থাকে। মানুষের কঙ্কাল সর্বমোট দুই শত ছয়টি হাড় দিয়ে গঠিত। আট সপ্তাহের শেষের দিকে তা একটি পরিপূর্ণ মানব শিশুর আকার ধারণ করে এবং ভ্রূণ তখন নড়াচড়া করতে সক্ষম হয়। এই প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত সুচারুরূপে মহান আল্লাহ মাতৃগর্ভে মানুষের দেহ গঠনের কাজ সম্পাদন করেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সর্বোত্তম রব। ভ্রূণকে রেখেছিলেন এমন একস্থানে যেখানে কোনো ধরনের রোগ শিশুকে আক্রান্ত করতে পারে না। এই স্থানটিকেই কোরআনে বলা হয়েছে, 'কারারিম মাকিন' বা সুসংরক্ষিত স্থান। সেখান থেকে শিশুকে যখন পৃথিবীতে নিয়ে আসা হলো, তখন তার অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ –

মানুষকে আমি এমন এক অবস্থায় তার মায়ের গর্ভ থেকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছি, যে সময় তার কোন চেতনাই ছিল না। সেই সাথে তাকে আমি তিনটি জিনিষ দিয়েছি। তাকে শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তা করার মত মগজ দিয়েছি। (আল কোরআন)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আস্‌সাজদার মধ্যে বলেছেন, মানুষের সৃষ্টির সূচনা তিনি করেছেন কাদা-মাটি থেকে। তারপর তার বংশধারা এমন এক বস্তু থেকে চালু করেছেন যা নিকৃষ্ট পানির মতই। এরপর তিনি দেহের যেখানে যে অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের প্রয়োজন তা সজ্জিত করে রুহ্ দান করেছেন। তারপর তিনি মানুষকে জ্ঞান, চোখ এবং হৃদয় দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তার শরীরের ত্বকের ভেতরে স্পর্শ অনুভূতি এবং নাক দিয়েছি ঘ্রাণ গ্রহণ করার জন্য। এভাবে তাকে আমি সুন্দর করে সাজিয়েছি। তার যা যেখানে প্রয়োজন আমি তাই দিয়েছি। তার মাতা-পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ভেতরে তার জন্য অসীম মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছি। সে পৃথিবীতে চোখ খুলেই দেখতে পায়, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তাকে প্রতিপালন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সমস্ত কিছুই তার সেবায় নিয়োজিত করেছি। মানুষের জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন আমি তাই দিয়েছি। মানুষের ভেতরে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কোন যোগ্যতা কারো ভেতরে বেশী দিয়েছি। আবার তা কারো ভেতরে কম দিয়েছি। এমন না করলে কেউ কারো মুখাপেক্ষী হত না। একজন মানুষ আরেকজনের পরোয়া করতো না এবং মানুষের যোগ্যতার কোন মূল্যায়ন হত না।

যে জিনিষের প্রয়োজন যতবেশী মহান আল্লাহ তা অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবীর জন্য কর্মীর প্রয়োজন অধিক এবং মহান আল্লাহ্ তা অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। বড় বড় বিজ্ঞানী, সেনাপতি, তাত্ত্বিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সম্পন্ন

www.pathagar.com

মানুষের প্রয়োজন কম, আল্লাহ্ তা কম পরিমাণেই সৃষ্টি করেছেন। এ জাতিয় মানুষের সংখ্যা আল্লাহ্ ঘরে ঘরে সৃষ্টি করেননি। কারণ, এসব মানুষের অবদান এই পৃথিবীতে শতাব্দীর পরে শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে। এ জন্য এসব দুর্লভ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ পৃথিবীর জন্য যে কয়জন প্রয়োজন মহান আল্লাহ্ তাই সৃষ্টি করেছেন। তাদের একজনের যে অবদান, শতকোটি মানুষ ঐ একজন মানুষের চিন্তাধারা দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকে। এভাবে নানা ধরনের বিদ্যায় পারদর্শী মানুষকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্য প্রকৌশলী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, স্থপতি, শাসক, শিল্পী, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সেনাপতি, শিক্ষাবিদ, সমরবিদ, নানা ধরনের বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক তথা যে ধরনের গুণাবলী ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন, আল্লাহ্ তা মানব জাতিকে দান করেছেন।

সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে এ পৃথিবীতে আগমন করবে, সন্তানের যারা অভিভাবক তাদেরকে পূর্ব থেকেই সন্তানের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়নি। যিনি ঐ সন্তানকে প্রেরণ করছেন, তিনিই সন্তানের মায়ের বুকের ওপরে এমন এক খাদ্য প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার বিকল্প গোটা পৃথিবীতে নেই। মায়ের বুকের দুধের মধ্যে পানির ভাগ বেশী এবং সামান্য মিষ্টি থাকে যেন শিশু আগ্রহ সহকারে পান করে। আল্লাহ্ তা'য়ালা এই দুধে পানির ভাগ বেশী না দিলে সদ্যজাত শিশু তা হজম করতে সক্ষম হতো না। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুকে পানি পান করালে তার নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে। এ জন্য মহান রব আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ দুধের মধ্যেই পানি দিয়েছেন যেন শিশুকে পৃথকভাবে পানি পান করাতে না হয়।

মাতৃদুগ্ধ শিশুর সর্বোত্তম ওষুধ

মাতৃদুগ্ধ শুধুই দুধ নয়, এই দুধ শিশুর জন্য সর্বোত্তম ওষুধ। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে মাতৃদুগ্ধ যেসব সন্তান নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পান করার সুযোগ পেয়েছে, তারা রোগে খুব কমই আক্রান্ত হয় এবং এরা মেধাবী হয়। শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে, মায়ের দুধও ক্রমশঃ ঘন হতে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে প্রথমে মায়ের বুকে যে দুধ থাকে, অজ্ঞতার কারণে তা অনেকে ফেলে দেয়। অথচ ঐ দুধই হলো সন্তানের সমস্ত রোগের প্রতিষেধক। শিশু বড় হচ্ছে মায়ের দুধও ঘন হচ্ছে, এর কারণ হলো-প্রথমে দুধ ঘন হলে শিশু তা চুষে বের করতে পারবে না এবং সে ঘন দুধ তার অপরিপক্ক পাকস্থলীতে হজম হবে না। পাকস্থলী ক্রমশঃ শক্তিশালী হতে থাকে, সেই সাথে মায়ের দুধও ঘন হতে থাকে। এভাবে শিশু যখন

www.pathagar.com

বাইরের খাদ্য আহার করতে সক্ষম হয়, তখন মায়ের দুধ ক্রমশঃ ঘন হতে হতে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। মায়ের স্তনে একটি ছিদ্র নেই, একটি ছিদ্র থাকলে তা দিয়ে বেগে দুধ নির্গত হয়ে সন্তানের কণ্ঠনালীতে অসুবিধার সৃষ্টি করতো। এ জন্য মায়ের স্তনে আল্লাহ্ তা'য়ালা বত্রিশটি ছিদ্র দিয়েছেন যেন সমতা রক্ষা করে দুধ নির্গত হয় এবং শিশু তা পরম প্রশান্তিতে পান করতে সক্ষম হয়।

শিশু যখন বাইরের খাদ্য গ্রহণ করার উপযুক্ত হলো, তখন শক্ত খাদ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার জন্য মাড়িতে দাঁতের প্রয়োজন। এই দাঁতের জন্য আল্লাহর কাছে কারো আবেদন করতে হয়নি। তিনি এমন রব যে, তা না চাইতেই তিনি দিয়েছেন। মানুষের মাথার মগজ–যাকে ব্রেন বলা হয়ে থাকে। এই মগজ এমনভাবে মাথার খুলির ভেতরে রাখা হয়েছে, যেন তা কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মগজের চারদিকে বেশ কয়েকটি আবরণ বা পর্দা নির্মাণ করা হয়েছে, এগুলো কোন কঠিন পদার্থ দিয়ে বানানো হয়নি। এগুলো করা হয়েছে নরম এবং সিক্ত। ক্রীম যেভাবে পানির ভেতরে ভাসতে থাকে, মাথার মগজকে সেভাবে সিক্তাবস্থায় রাখা হয়েছে, যেন তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে না পারে। মানুষের মাথায় অসংখ্য সেল নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো কম্পিউটার। এই কম্পিউটারের কার্যক্ষমতা দেখলে হতবাক হতে হয়। তারপরেও কম্পিউটারের মেমোরির একটি নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু মানুষের এই মাথা অনেকগুণ বেশী বিস্ময়কর। মানুষের মাথায় আল্লাহ্ যে মেমোরি দিয়েছেন, পৃথিবীর যাবতীয় তথ্য এই মেমোরিতে রাখার পরও আরো বিশাল জায়গা অবশিষ্ট রয়ে যাবে।

মানুষের চোখে কর্ম ক্ষমতা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন। মানুষ রাস্তায় চলতে গিয়ে যদি সাপ দেখে, তাহলে এই চোখ অত্যন্ত দ্রুত বিপদ সংকেত প্রেরণ করে ব্রেনকে। এই ব্রেন তাৎক্ষণিকভাবে সক্রিয় করেছে পা ও হাতকে। সংকেত দিয়েছে হাতে যদি কোন অস্ত্র থাকে তাহলে তা দিয়ে সাপকে আঘাত করতে হবে আর না থাকলে পায়ের শক্তিতে দৌড় দিতে হবে। বিষয়টি যতটা সহজ মনে করা হয় প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বিষয়টি এত অল্প সময়ের ভেতরে বাস্তবায়িত হয় যে, এতে কতটুকু সময় ব্যয় হলো তা মানুষের পক্ষে হিসাব করে বের করা অসম্ভব। চোখ সাপ দেখলো এবং সে মাথায় সংবাদ প্রেরণ করলো, মাথা পা ও হাতকে সক্রিয় করলো। এই পুরো বিষয়টি সংঘটিত হতে, এক সেকেন্ডেরও সময়ের প্রয়োজন হয়নি, এক সেকেন্ডের কয়েক লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র সময় প্রয়োজন হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি সম্ভব করা কেবল মাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষেই সম্ভব আর এ জন্যেই তাঁর যাবতীয় প্রশংসা।

www.pathagar.com

আবার মানুষ তার চোখে যা দেখে তা নেগেটিভ ভঙ্গীতে দেখে থাকে। নেতিবাচক দৃশ্য ধরে চোখ তা ব্রেনে পৌঁছে দেয় এবং সেখান থেকে তা পজিটিভ হয়ে বের হয়ে আসে এবং মানুষ তখন স্পষ্ট দেখতে পায়। আল্লাহ্ হলেন রব্ব এবং এসব ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। মানুষ তার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে অসংখ্য শব্দ শুনে থাকে। কিন্তু অনেকগুলো শব্দ একই সাথে কানে প্রবেশ করে অস্বাভাবিক কোন শব্দের সৃষ্টি করে না, কোন একটি শব্দও জড়িয়ে যায় না। মানুষের জিহ্বার গঠন প্রণালী এমন যে, জিহ্বা অসংখ্য স্বাদ গ্রহণ করতে ও পার্থক্য নির্দেশ করতে সক্ষম।

মহান আল্লাহ্ পৃথিবীতে অগণিত মানুষ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এই মানুষের একজনের হাতের আঙ্গুলের রেখা আরেক জনের সাথে মিলবে না। হাতের আঙ্গুলের ছাপের বিষয়টি আধুনিক বিজ্ঞান কাজে লাগিয়েছে। বিশেষ করে কারো সম্পত্তি জাল হওয়া বা অপরাধীদের সনাক্তকরণের কাজে আঙ্গুলের ছাপ এবং বর্তমানে অধিকাংশ বিমান বন্দরেও যাত্রীর হাতের আঙ্গুলের ছাপ নেয়া হয়। হাতের আঙ্গুলের ছাপ ও গিরার বিষয়টিও আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে সূরা কিয়ামাহ্য় বর্ণনা করেছেন। এ জন্য সেই রব-এরই প্রশংসা করতে হবে, যিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে মানুষকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন।

পৃথিবীর সৃষ্টি–দুর্ঘটনার ফসল নয়

নাস্তিকদের ধারণানুযায়ী এ পৃথিবী কোনো দুর্ঘটনার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি। এ পৃথিবী সৃষ্টির পেছনে রয়েছেন একজন মহাবিজ্ঞানী–যাঁর নাম আল্লাহ। তিনি এ পৃথিবীকে পরিকল্পনা ভিত্তিক সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ–

আমি যমীন ও আকাশমন্ডলকে এবং এই দু'য়ের মধ্যবর্তী ঐ মহাশূন্যে যা কিছু রয়েছে, তা মহাসত্য ব্যতিত অন্য কোন ভিত্তির ওপর সৃষ্টি করিনি। (সূরা হিজর)

খেল-তামাসার বিষয়বস্তু করে এ পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়নি। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোন কিছুই এ পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ–

আমি এই আকাশ ও যমীন এবং এর ভেতরে যা কিছুই রয়েছে, তার কোন কিছুকেই খেল-তামাসার ছলে সৃষ্টি করিনি। (সূরা আম্বিয়া-১৬)

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ، مَاخَلَقْنٰهُمَآ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ هُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ–

এই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এর ভেতরে অবস্থিত জিনিসগুলো খেল-তামাসার ছলে সৃষ্টি করিনি। এগুলোকে আমি সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অবগত নয়। (সূরা দুখান-৩৮-৩৯)

আল্লাহ্ বলেন, আমি কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি করিনি এবং অসুন্দর করেও সৃষ্টি করিনি। গোটা পৃথিবীর চারদিকে এবং নিজের দেহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো, আমার সৃষ্টির নৈপূন্যতা লক্ষ্য করো–কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি তোমার চোখে পড়বে না। কোরআন চ্যালেঞ্জ করছে–

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا، مَاتَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ، هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ–

তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছেন। তোমার মহাদয়াবানের সৃষ্টিকর্মে কোন ধরনের অসংগতি দেখতে পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখো, কোথাও কোন দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি? বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তোমাদের দৃষ্টি ক্লান্ত-শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। (সূরা মুল্কঃ–৩-৪)

পাহাড়-পর্বতসমূহের উৎপত্তি

এ কথা আমরা সবাই জানি যে, এই পৃথিবীর পৃষ্ঠ অসমান। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ইত্যাদি থাকার কারণে এই ভূ-পৃষ্ঠ সমান নয়, অসমান। কিন্তু বিছানা তো অসমান হয় না–তাহলে আল্লাহ্ এই ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানা বলে কোরআনে কেন উল্লেখ করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, বিছানা বা কার্পেট এ দুটো জিনিস ব্যবহার করা হয় কোন কিছুকে ঢেকে বা আবৃত করার জন্য। বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই পৃথিবীর ভেতরের অংশ উত্তপ্ত কঠিন এবং গলিত অবস্থায় রয়েছে। এই উত্তপ্ত গলিত

www.pathagar.com

অংশ উপযুক্ত পরিবেশের ভূ-পৃষ্ঠ দিয়ে আল্লাহ্ ঢেকে দিয়েছেন বা আবৃত করে দিয়েছেন বলেই এই যমীনের ওপরে বসবাস করা সম্ভব হয়েছে। ভোগবহুল জীবন ব্যবস্থার যাবতীয় উপকরণ বা জিনিস যমীন নামক এই ঢাকনার ওপরে বিদ্যমান। এ কারণেই এই ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানার সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানুষ আকারে খুবই ছোট, এ কারণে তার চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সে পৃথিবীকে অসমতল দেখতে পায়। আসলে বিশাল এই পৃথিবীর আকারের তুলনায় এই পৃষ্ঠদেশের অসমতলতা অত্যন্ত নগণ্য। ছোট্ট প্রাণী পিঁপড়ার কাছে তার ঘরের মেঝে অসমতল হলেও আমরা আমাদের চোখ দিয়ে দেখতে পাই যে, পিঁপড়ার ঘর সমতল। তেমনি এই বিশাল পৃথিবীও আমাদের কাছে অসমতল বলে মনে হয়।

পৃথিবীর ভূ-বিজ্ঞানীগণ (Geologists) পাহাড়-পর্বতসমূহের উৎপত্তি ও গঠন সম্পর্কে গবেষণা করে দেখেছেন যে, স্মরণাতীত কাল থেকে একটি বিরাট সময় পর্যন্ত পৃথিবী পৃষ্ঠে বিবর্তন হওয়ার কারণেই এসব পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর অধিক সংখ্যক পাহাড়-পর্বত বিচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি না করে শ্রেণীবদ্ধভাবে (In ranges) সৃষ্টি করেছেন।

কোন কোন পাহাড়কে ভূ-পৃষ্ঠে নিঃসঙ্গভাবে দৃষ্টি গোচর হলেও মাটির তলদেশ দিয়ে দূরে-অনেক দূরে অন্য পাহাড়ের সাথে যোগসূত্র থাকতে দেখা যায়। বিজ্ঞানিগণ পাহাড়-পর্বতগুলোর আকার-আকৃতি পর্যবেক্ষণ করে শিলা, বালু ও মাটি প্রভৃতি পরীক্ষা করে এবং অন্যান্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলেছেন, পৃথিবী প্রাথমিক পর্যায়ে ভয়ংকর ধরনের উত্তপ্ত ছিল। পর্যায়ক্রমে বির্বতনের ফলে কালক্রমে তাপ বিকিরণের কারণে পৃথিবী ঠান্ডা হয়ে সংকুচিত হতে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের ভিতরের অংশের অতিরিক্ত চাপের কারণে তার কিছু অংশ ওপরের দিকে ভাঁজ হয়ে ফুলে উঠতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়। একটি কমলা লেবু শুকিয়ে গেলে যেমন তার ওপরের বাকলের ওপরে যে ধরনের ভাঁজ সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে পৃথিবীর বুকে ভাঁজের সৃষ্টি হয়।

বিজ্ঞানীগণ বলেন, পৃথিবীর ভিতরের অংশে অতিরিক্ত উত্তপ্ত থাকার ফলে সেখানে অস্থিরতা (Unstability) বিরাজ করছে। ভূ-পৃষ্ঠের ভেতরে প্রতি মুহূর্তে প্রচন্ড আলোড়ন হচ্ছে। এই আলোড়নের কারণে কখনো কখনো পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ বা ওপরের স্তরটি ফেটে যায় এবং সেই ফাটল দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের ভেতরের গলিত পদার্থ প্রচন্ড বেগে বেরিয়ে আসতে থাকে। এভাবে গলিত পদার্থগুলো ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে জমা হয়ে কালক্রমে পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীগণ আরো বলেন, কোটি কোটি বছরের সময়ের বির্বতনেও ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন হয়ে কিছু সংখ্যক পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ এই তিন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। মহান আল্লাহ পাহাড়-পর্বতসমূহ এ পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের অনেক গভীরে প্রোথিত করেছেন এবং অধিক সংখ্যক পাহাড় পর্বত শ্রেণীবদ্ধভাবে মাটির তলদেশ দিয়ে একটির সাথে আরেকটির সংযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর এ জন্যই ভূ-পৃষ্ঠ স্থিরতা (Stability) লাভ করেছে। ভূপৃষ্ঠের সুস্থিরতার ব্যাপারে পাহাড়-পর্বতের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এটা এক সাধারণ সূত্র যে, বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে বস্তুটির অণু-পরমাণুগুলোর গতি শক্তি বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে এবং উত্তপ্ত জিনিসের আলোড়নও বৃদ্ধি লাভ করে।

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে, কোন তরল পদার্থ যেমন পানি, উত্তপ্ত করলে পানির ভেতরে অস্থিরতা বা আলোড়ন বৃদ্ধি পায় এবং এ কারণে পানির ওপরের পৃষ্ঠে নানা ধরনের স্রোত বা ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। অবশেষে উত্তাপে পানি ফুটতে থাকে। তেমনিভাবে পৃথিবীর ভেতরের অংশও উত্তপ্ত হওয়ার কারণে গলিত পদার্থগুলোর উত্তপ্ততার জন্য এক প্রচন্ড অস্থির অবস্থায় বিরাজ করছে সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত। এই উত্তপ্ত গলিত আলোড়িত পদার্থের ওপরে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের ওপরি ভাগ বা মাটির স্তর বিদ্যমান।

এই মাটির সুস্থিরতা আনয়নে পাহাড়-পর্বত ভূমিকা পালন করছে। পাহাড়-পর্বত ভূ-পৃষ্ঠের অনেক গভীর পর্যন্ত প্রোথিত থাকায় এবং বিস্তীর্ণ আয়তন জুড়ে মাটির নিচে পরস্পর সংযুক্ত থাকায় এই পৃথিবী পৃষ্ঠ স্থিরতা লাভ করেছে। পাহাড় পর্বতগুলো মাটির নিচ দিয়ে একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত রয়েছে অর্থাৎ টানাটানি অবস্থায় আল্লাহ রেখেছেন। এটা এ জন্য রেখেছেন যেন পৃথিবী পৃষ্ঠের কোথাও সহজে ফাটল ধরে প্রাণী জগৎ ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। পাহাড়গুলো একটির সাথে আরেকটি বিচ্ছিন্নও হতে পারে না। পাহাড়গুলোকে আল্লাহ যদি এভাবে না রাখতেন, তাহলে পৃথিবীর এই ভূ-পৃষ্ঠ কখনও সুস্থির হতো না এবং এখানে মানুষ বসবাস করতে সক্ষম হতো না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ–

এবং তিনি ভূ-পৃষ্ঠে পর্বতসমূহ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যেন তোমাদের নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠ কাঁপতে না পারে। (সূরা নাহ্‌ল-১৫)

www.pathagar.com

আল কোরআন, মহাকাশ ও সাধারণ বিজ্ঞান

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

خَلَقَ السَّمٰوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ، هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ، بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ–

তিনি (আল্লাহ) মহাকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন কোন রকম স্তম্ভ ছাড়াই, যা তোমরা দেখতে পাও। তিনিই (আল্লাহ) পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে সর্বপ্রকার জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রকার উত্তম জোড়া উৎপাদন করেন। এ আল্লাহর সৃষ্টি, তিনি ব্যতীত অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। বরং সীমালঙ্ঘনকারীরা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে। (সূরা লূকমান)

আল্লাহ তায়ালা এই বিশাল আকাশটি সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ছাড়াই। একটি প্যান্ডেল তৈরি করতে হলে শত শত খুঁটির প্রয়োজন দেখা দেয়; কিন্তু এই বিশাল আকাশটি খুঁটি ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা রেখেছেন।

بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا–

সূরা লুকমানের এই আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে তোমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছো যে, কোন স্তম্ভ ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা আকাশটাকে ঝুলিয়ে রেখেছেন। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এমন স্তম্ভ আছে, যা তোমরা দেখতে পাওনা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু বর্তমান যুগের পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে যদি আলোচনা করা হয় তাহলে এভাবে বলা যেতে পারে যে, সমগ্রবিশ্ব, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, এগুলোর একটি থেকে আরেকটি যেন ছিটকে না পড়ে সে জন্য একটি পদ্ধতি দিয়ে আল্লাহ তায়ালা স্তম্ভ ছাড়াই কুদরতের ওপর রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا–

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা নভোমণ্ডল এবং ভূ-মণ্ডলকে এমনভাবে ধারণ করে রেখেছেন, যেন একটি থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। (সূরা ফাত্বির-৪১)

এ পৃথিবী থেকে সূর্য অনেক বড়। সে সূর্যের চেয়ে তারকাগুলো আরো বড়। আবার তারকাগুলোর চেয়ে ছায়াপথ আরো অনেক বড়। এই বিশাল বিশাল গ্রহ-উপগ্রহগুলো আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টি করে একটিকে আরেকটির সাথে আটকিয়ে রেখেছেন মধ্যাকর্ষণ শক্তি দিয়ে। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্যার আইজ্যাক নিউটন সর্বপ্রথম মধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু স্যার আইজ্যাক নিউটনের জন্মের অন্তত হাজার বছর পূর্বে নবী করীম (সাঃ), যিনি কোন বিজ্ঞানাগারে লেখাপড়া করেননি, রিসার্চ করেননি, তাঁর মুখ থেকে মধ্যাকর্ষণের কথা আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনে কারীমে ঘোষণা করেছেন।

এই মধ্যাকর্ষণ দিয়েই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র, সৌররাজি একটির সাথে আরেকটিকে এভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে, যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না যায়। আল্লাহ্ তায়ালা মহাশূন্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে যদি সূর্যের কথাই বলা যায়, তাহলে সূর্য এত বিশাল যে, পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়। এ রকমের তিন কোটি সূর্যকে খেয়ে হজম করতে পারবে এমন আরো রয়েছে গ্যালাক্সির ভেতরে একটি দুটি নয়, হাজার হাজার সূর্য। এই সূর্য হচ্ছে সে সূর্য যা পৃথিবীর মানব সভ্যতার বিকাশের জন্য আজ পর্যন্ত মানবগোষ্ঠী যত শক্তি ব্যয় করছে, সূর্য তার চারদিকে ঘুরতে প্রতি সেকেন্ডে সে পরিমাণ শক্তি খরচ করছে। শুধু তাই নয়, এই জ্বলন্ত সূর্যের সম্মুখ ভাগ থেকে এক প্রকার জ্বালানি গ্যাস নির্গত হয়। এগুলো প্রতি সেকেন্ডে ষাট হাজার মাইল বেগে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এই গ্যাস যদি পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতো, তবে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে ষাট হাজার মাইল বেগে যে গ্যাস বের হচ্ছে– কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি ষাট হাজার মাইল বেগে সে গ্যাসকে আবার সূর্যের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। যেন সৃষ্টিজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ–

আমিই তোমাদের ওপর এ সাত আকাশ বানিয়েছি এবং আমি আমার সৃষ্টি সম্পর্কে উদাসীন নই। (সূরা মুমিনুন- ১৭)

এ পৃথিবীতে চন্দ্র এবং সূর্যকে পরিমাপ অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা রেখেছেন। বিজ্ঞানীরা বলেছে সূর্য যেখানে দাঁড়িয়ে আছে এর থেকে যদি কয়েক ডিগ্রী ওপরে

www.pathagar.com

উঠে যায় তাহলে গোটা পৃথিবী বরফে পরিণত হয়ে যাবে। সমস্ত প্রাণীজগৎ বরফ হয়ে যাবে। আর যদি কয়েক ডিগ্রী নিচে নেমে আসে তাহলে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

চাঁদ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে যদি কিছু অংশ ওপরে উঠে যায় তাহলে গোটা পৃথিবী মরুভূমি হয়ে যাবে। আবার যদি কিছু অংশ নিচে নেমে আসে তাহলে গোটা পৃথিবী পানিতে তলিয়ে যাবে।

هٰـذَا خَلْقُ اللّٰهِ –

এটাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। (আল কোরআন)

সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি যেন পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে না পারে, সে জন্য ওজোন স্তরে লেয়ার দিয়েছেন। এই লেয়ার আছে বলেই আলট্রাভায়োলেট-রে পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালা গোটা সৃষ্টি জগতকে রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন; কিন্তু ওজোন স্তরে ফাটল ধরেছে। কারণ হচ্ছে আমরা পরিবেশ দূষিত করেছি, পাহাড়গুলো কেটে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করেছি। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, আমি পাহাড়গুলোকে গেড়ে দিয়েছি যেন যমীন নড়া-চড়া করতে না পারে। আর মানুষ পাহাড় গাছ-গাছালি কেটে নষ্ট করে দিচ্ছে। অথচ সে পরিমাণ গাছ লাগানো হচ্ছে না। রাসূলে কারীম (সাঃ) বলেছেন, গাছ লাগালে সদকার মত সওয়াব মিলে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فِيْمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ–

তোমাদের ওপরে যত বিপদ আসে সমস্ত বিপদ তোমাদের দু'হাতের উপার্জন করা, তোমরা যা উপার্জন করো সেটাই তোমাদের কাছে ফিরে আসে।

আল্লাহ্র নবী বলেছেন, গাছ কাটাতো দূরের কথা, গাছের পাতাটিও ছিঁড়বে না। প্রয়োজনে গাছ কাটতে পার বিনা প্রয়োজনে গাছের পাতাটিও ছিঁড়বে না। কারণ গাছের পাতাগুলো আল্লাহ্র তাসবীহ্ পড়ছে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ–

আকাশে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ্ পাঠ করছে। (আল কোরআন)

গাছ হলো মানুষের প্রাণ। গাছ অক্সিজেন ছাড়ে আর আমরা সে অক্সিজেন গ্রহণ করি। আর আমরা যেটা ছাড়ি সেটা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড। আমরা কার্বন

ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দিয়ে গোটা পরিবেশকে দূষিত করে ফেলছি। দুনিয়ার কোন বিজ্ঞানী বা সরকার নেই যে, এ দূষিত কাবর্ন ডাইঅক্সাইডকে রিফাইন করে দূষণ মুক্ত করবে। গাছগুলোকে আল্লাহ তায়ালা এমন বন্ধু বানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের জন্য যেটা বিষ গাছের জন্য সেটা খাদ্য। আমরা গাছ হতে অক্সিজেন গ্রহণ করে আমাদের বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেই, গাছ ঐ বিষাক্ত অক্সিজেনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। গাছের পাতার সবুজ রং আর সূর্যের তাপ দুটি মিলে এক প্রকারের রন্ধন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গাছ ঐ কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে প্রতি মুহূর্তে অক্সিজেন তৈরি করে ছেড়ে দিচ্ছে। এগুলোকে আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টি করে গোটা মানব জাতির কল্যাণ করেছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে–

فَأَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ–

তিনি ব্যতীত অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও।

বিজ্ঞানীরা কয়েকটি জিনিস একত্র করে একটি জিনিস তৈরি করেছেন। কিন্তু মূল জিনিস হল আল্লাহ তায়ালার। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা একত্রিত হয়েও একটি চাল বা একটি মুরগীর ডিম বানাতে পারবে না। বিজ্ঞানীরা যা কিছু তৈরি করে তার পেছনে মহান আল্লাহর তৈরি করা জিনিস না হলে বানাতে পারবে না। তওহীদের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ্ তাঁর নিজের সৃষ্টির উপমা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا اللّٰهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ–

তিনি বান্দার ওপরে কখনো জুলুম করেন না। তিনি মানুষের ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেন না।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا–

কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও যমীন? কে আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন? অতঃপর তা দিয়ে মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেন? তাঁর বৃক্ষাদি উদ্গত করার

www.pathagar.com

ক্ষমতা তোমাদের নেই। এ সকল কাজে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কি কোন অংশীদার আছে? বরং এরা সঠিক পথ থেকে সরে যাচ্ছে। (সূরা নমল-৬০)

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন−

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا−

কে এ যমীনকে বসবাসের উপযোগী করেছেন? কে এর মাঝে নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন? কে তাতে সুদৃঢ় পর্বত ও দু'সাগরের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন? (সূরা নমল- ৬১)

মহান আল্লাহ্ যমীনকে বসবাসের উপযোগী করেছেন। জমি এভাবে শক্ত করলেন না, যেন কোদাল দিয়ে খনন করে পিলার উঠাতে না পারে। আবার এমন নরমও করলেন না, যাতে কোন গাছ রোপণ করা না যায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন−তোমরা কি দেখ না? তোমরা কি চিন্তা কর না? বীচি মাটির ভেতরে দিয়ে দিলে আর মাটি ফেটে গিয়ে নরম পাতা উদ্গত হয়ে গেল। মাটি থেকে কে এই পাতা উদ্গত করল? মাটি এমনভাবে সৃষ্টি করলেন যে, ছোট দু'টি পাতা মাটি ফেড়ে উপরে চলে আসতে পারে। আবার একশ' চল্লিশ তলা বিল্ডিং বানাচ্ছেন মাটি ধসে বিল্ডিং মাটির নিচে চলে যাচ্ছে না। এভাবে মাটিকে বসবাসের উপযোগী করে কে বানালেন? আল্লাহ্ বলেছেন আমি বানিয়েছি।

পানিকে আল্লাহ্ তায়ালা দু'ভাগে ভাগ করে দিলেন। একদিকে লোনা পানি, অন্যদিকে মিষ্টি পানি। তাও কি চোখে দেখো না? চোখে দেখে না নাস্তিক এবং মুরতাদরা, ওদের চোখে ধরা পড়ে না? কিন্তু ঈমানদারদের চোখে ঠিকই ধরা পড়ে। পৃথিবীর সকল উল্লেখযোগ্য বিষয় রেকর্ড করা হয় গ্রীনিজ বুক নামক গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রশান্ত মহাসাগরের ভেতরে একটি নদী আবিষ্কার হয়েছে। সে নদীটি আড়াইশত কিঃ মিটার প্রস্থ এবং চার হাজার কিঃ মিটার দীর্ঘ। এর পানি মিষ্টি। চতুর্দিকের লোনা পানির সমুদ্রের মাঝখানে মিষ্টি পানির এই বিরাট নদী। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন−

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّايَبْغِيَانِ−

তিনি প্রবাহিত করেন দু'টি সমুদ্র যারা পরস্পর মিলিত; কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। (সূরা আর্ রাহ্মান)

www.pathagar.com

মাঝখানে কোন বাধা নেই। অথচ লোনা পানির কোন ক্ষমতা নেই মিষ্টি পানিকে লোনা বানায়। এগুলো চোখে দেখো না? মহান আল্লাহ্ বলছেন–

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ، اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ–

এই যে নদীর পানিকে আল্লাহ্ তায়ালা ভাগ করে দিলেন এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্র সাথে কেউ শরীক ছিল? বরং তোমরা এ ব্যাপারটি অনুধাবন করো না, বুঝতে চেষ্টা কর না। (সূরা নমল)

মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاءُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الاَرْضِ–

এমন কে আছে যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন। আর তোমাদেরকে দুনিয়ার খলীফা বানিয়ে দিয়েছেন। (সূরা নমল-৬২)

তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ তায়ালা। গভীর রাতে আপনি যে ক্রন্দন করেন, মামলা-মোকদ্দমায় পড়ে, ঋণগ্রস্ত হয়ে, রোগাক্রান্ত হয়ে, ব্যথা-বেদনা নিয়ে, অস্থির মন নিয়ে আপনি যে দোয়া করেন সে দোয়া তো আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ শ্রবণ করেন না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, আমি সব দেখতে পাই, শ্রবণ করতে পারি। এমন কিছু নেই যা আমি দেখি না, শ্রবণ করি না। সমুদ্রের অতল তলদেশে শৈবালের সাথে লাগানো ছোট্ট একটি পোকা যা মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না, তাও আমি দেখি। আটলান্টিক মহাসাগরের অতল তলদেশে যদি ছোট একটি পোকা ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করে, তাহলে পৃথিবীর কেউ সে চিৎকার শুনতে পায় না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আরশের মালিক আমি আল্লাহ্ সে পোকার চিৎকার শ্রবণ করি। পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে–

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ–

এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কি কোন অংশীদার আছে? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। (সূরা নমল)

আজ মানুষ মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছে কিন্তু উপকার কতটুকু তা আমাদেরকে দেখতে হবে।

www.pathagar.com

পৃথিবীর মানুষ যেখানে না খেয়ে মারা যাচ্ছে, যে অর্থ ব্যয় করা হলো মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য, সে অর্থ দিয়ে যদি বিদ্যুৎ তৈরি করা হতো তাহলে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া যেত। যে অর্থ দিয়ে মারণাস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে মানুষ মারার জন্য, সে অর্থগুলো যদি একত্রিত করা হত, তাহলে প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানি পৌঁছে দেয়া যেত। মানুষ মারার জন্য যে সব অস্ত্র তৈরি করা হয়, সে অর্থ দিয়ে যদি পৃথিবীতে হাসপাতাল তৈরি করা হত তাহলে মানুষ আর বিনা চিকিৎসায় মারা যেত না। আজ অনর্থক অর্থ খরচ করা হয়। এই খরচ করার কি মূল্য?

হিমালয় পর্বতের ওজন কত তা বের করার জন্য অর্থ খরচ করার কোন যুক্তি নেই। আবার আটলান্টিক মহাসাগরে কত কোটি গ্যালন পানি আছে তা বের করার জন্য অর্থ ব্যয় করার কোনো যুক্তি নেই। এ ব্যাপারে লক্ষ কোটি ডলার খরচ করার কি মূল্য আছে? মানুষ মঙ্গল গ্রহে যায়, চাঁদে যায়। যাক্ না, কোন ক্ষতি নেই। যে গবেষণায় মানবতার কল্যাণ হয়, পৃথিবীর কল্যাণ হয়, অর্থ সেখানে খরচ করুক; কিন্তু পৃথিবীর একশ্রেণীর মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ যে, মানবতার কল্যাণে অর্থ খরচ করা হবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন–

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ–

আর কে জল-স্থলের অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান এবং কে নিজের অনুগ্রহের পূর্বাহ্নে বাতাসকে সুসংবাদ দিয়ে পাঠান? (সূরা নমল-৬৩)

কে তিনি? যিনি জলে, স্থলে, অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখান। সমুদ্রের ভেতরে নাবিকেরা যখন পথ চলে, দিনের বেলায় সূর্য দেখে নাবিকেরা পথ নির্ণয় করে; কিন্তু রাতের বেলায় অন্ধকারে নাবিকেরা যেন পথ হারিয়ে না ফেলে সে জন্য আমি আকাশকে তারকাখচিত করে রেখেছি। তারকা দেখে নাবিকেরা পথ নির্ণয় করে গন্তব্যে পৌঁছে যায়, পথ হারিয়ে যায় না। অন্ধকারের ভেতর আমিই তাদের পথ নির্ণয় করে দেই। পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে–

أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ–

ঐ আল্লাহর সাথে কি কোন শরীক আছে যে আল্লাহর সাথে উক্ত কাজে সহযোগিতা করেছে। যারা শিরক করছে তা থেকে আল্লাহ্ মুক্ত। (আন্ নামল-৬৫)

www.pathagar.com

অর্থাৎ তিনি বৃষ্টি বর্ষণে বৃষ্টির আগে ঠাণ্ডা বাতাস দিয়ে বৃষ্টি আসছে এ সুসংবাদ প্রদান করেন। এ কাজের মধ্যে কি কেউ আল্লাহর শরীক আছে? মহান আল্লাহ বলেন–

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ–

আল্লাহর সাথে কি কোন অংশীদার আছে? যদি তোমাদের কাছে কোন দলীল থাকে তাহলে তা পেশ কর। (সূরা নমল)

আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, সৌর জগত, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ইত্যাদি যা কিছু আমি বানিয়েছি এতে আমার সাথে কে শরীক আছে? যদি তোমাদের কাছে যুক্তি থাকে তাহলে তা পেশ কর। এদের কাছে যুক্তি হল আকাশ বলতে কিছুই নেই, স্রষ্টা বলতে কেউ নেই। (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ–

আল্লাহই তো আসমান এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তায়ালার পুত্র-কন্যা কি করে হতে পারে? ইহুদী–খৃষ্টানরা দাবী করেছে আল্লাহ তায়ালার ছেলে আছে। খৃষ্টানরা আল্লাহর স্ত্রী পর্যন্ত বানিয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ) মহান আল্লাহ ছোট্ট একটি সূরার ভেতরে তাওহীদের কথা এমনভাবে পেশ করেছেন যে, গোটা পৃথিবীর মানুষ যদি হেদায়েত পেতে চায় তবে এ ছোট্ট সূরাই তাদের জন্য যথেষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَّه كُفُوًا اَحَدٌ–

হে নবী আপনি বলে দিন! আল্লাহ এক এবং একক। তিনি অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আকাশ এবং যমীনে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (সূরা ইখলাছ)

আল্লাহ তায়ালা এক এবং একক, তাঁর এ একত্বের দাওয়াত দেয়ার জন্য তিনি অসংখ্য পয়গাম্বর এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সকল পয়গাম্বর দাওয়াত দিয়েছেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ–

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, কোন আইনদাতা, বিধানদাতা, শাসনকর্তা, পালনকর্তা এবং কোনো রিয্কদাতা নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَلَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ–

আল্লাহ্ হচ্ছেন তিনি, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করে দিয়েছেন। (সূরা বাকারা)

এই পানি হচ্ছে মানুষের জন্য জীবন। এ জন্যই পানির অপর নাম জীবন বলা হয়। এই পানিকে নিয়ন্ত্রণ করেন মহান আল্লাহ্ তায়ালা। এই পানি যদি কয়েক ফুট উঁচু হয়ে আসে তাহলে আল্লাহ্ এর মাধ্যমে মানুষকে শেষ করে দিতে পারেন। আবার আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে পানির ভেতরেই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। সমস্ত কর্তৃত্ব হচ্ছে মহান আল্লাহ্র। আবার আল্লাহ্ তায়ালা আগুনের ভেতর থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারেন। সব কিছুই আল্লাহ্র নিয়ামত। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا–

তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামত গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। (সূরা নহ্ল-১৮)

মহামহিমাময় পরম ক্ষমতাশালী মহাবিশ্বের স্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী, অতীন্দ্রিয় লা-শারীক মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আল কোরআন অবতীর্ণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই বলেছেন, আল কোরআন তাঁরই অবিনশ্বর অলৌকিক নিদর্শন। চৌদ্দশ' বছর পূর্বে অবতীর্ণ কোরআনের বক্তব্য এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নের যন্ত্র কম্পিউটারের রায় যখন এক হয়ে যায়, তখন বিস্ময় জাগে। মনে হয় আজকের কম্পিউটার শুধু এই সত্যই আবিষ্কার করেছে যা পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا–

হে রাসূল আপনি বলে দিন! যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআন মাজীদের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। (বনী ইসরাঈল)

www.pathagar.com

মাত্র কয়েক দশক আগে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা গ্রহ এবং সমগ্র সৌরজগতের উৎপত্তি মহাবিশ্বের গঠন-প্রকৃতি নিয়ে তাদের সকল গবেষণার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সর্বজন স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য এই যে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর পূর্বে মহাবিশ্ব ছিল একটি বিশাল বস্তুপিণ্ড মাত্র। পরে ঐ বস্তুপিণ্ডের অভ্যন্তরে ঘটলো এক বিস্ফোরণ, ফলে বিশাল বস্তুটি খণ্ড খণ্ড বস্তুতে বিভক্ত হয়ে একটি আদি ভরবেগে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এভাবে সৃষ্টি হলো চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র। অর্থাৎ মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তু। আজ অবধি তারা তেমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৃত্তাকারে ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে দিনের পর দিন। এক সময় বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত দিল যে, পৃথিবী স্থির, সূর্য তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে ; কিন্তু পরে আবার সিদ্ধান্ত দিল সূর্য স্থির পৃথিবী ঘুরছে। এ মতবাদগুলো ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক সত্য হচ্ছে মহাবিশ্বের সকল বস্তুই বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের বিজ্ঞানী সমাজ মাত্র কয়েক দশক আগে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অথচ পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ আজ হতে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে এ কথাই বলেছেন–

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا–

কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম। (সূরা আম্বিয়া- ৩০)

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন দিন–রাত এবং চন্দ্র–সূর্য সম্পর্কে বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ–

আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য। সব আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। (সূরা আম্বিয়া-৩৩)

এমনিভাবে যদি বিজ্ঞানীদেরকে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে তারা বলবেন, বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পূর্বে সমুদ্রের বুকে প্রাচীন বস্তুকণা থেকে প্লাটোপ্লাজম–এর উৎপত্তি হয়। এই প্লাটোপ্লাজম থেকেই জন্ম নেয় এমিবা নামের ক্ষুদ্রতম এককোষী প্রাণী। এভাবে সমুদ্রের উৎস থেকে পৃথিবীর বুকে প্রাণীর জন্ম হয়েছে।

www.pathagar.com

এক কথায় বলতে গেলে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সমুদ্র থেকেই সকল প্রাণীর জন্ম। অর্থাৎ সমুদ্র বা পানিই হচ্ছে সকল প্রাণের উৎস। এই তথ্য বিজ্ঞানীরা আমাদের জানিয়েছেন মাত্র কিছুদিন পূর্বে। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় কয়েক দশক, মাত্র কয়েকদিন বটে। অথচ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে চৌদ্দশত বছর আগে ঘোষণা করেছেন-

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ-

আর প্রাণবন্ত সব কিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। এর পরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? (সূরা আম্বিয়া-৩০)

প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে অবশ্যই পানির প্রভাব আছে। চিন্তাবিদদের মতে শুধু মানুষ ও জীবজন্তুই প্রাণী ও আত্মাযুক্ত নয়; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও জীবন প্রমাণিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে কাছীর ইমাম আহমাদের সনদে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তু সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন। উত্তরে নবী করীম (সাঃ) বললেন, প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে।

পৃথিবী ব্যতীত আরো পাঁচটি গ্রহের অস্তিত্বের কথা প্রাচীন কাল থেকে মানুষ জানতো। আধুনিক কালে আরো তিনটি গ্রহের অস্তিত্ব বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নে এগারটি গ্রহ দেখেছিলেন। সে স্বপ্নের কথা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে কারীমে বর্ণনা করেছেন-

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سٰجِدِيْنَ-

যখন ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতাকে বললেন, হে আব্বাজান, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র ও সূর্য আমার উদ্দেশ্যে সিজদা করছে।

উপরোক্ত আয়াতে কার্যত হযরত ইউসুফ (আঃ) এর এগার ভাই (এগারটি গ্রহরূপে) এবং তাঁর পিতা ও মাতা (চন্দ্র ও সূর্যরূপে) তাঁকে সিজদা করেছিলেন। মিশরে উপস্থিতির পর প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাসীন হযরত ইউসুফ (আঃ) এ ঘটনা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমাণ করেছিলেন, একথা পবিত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সূর্যের গতিপথ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনই প্রথমবারের মত মানুষকে এ তথ্য দিয়েছে যে, সূর্যের একটি কক্ষপথ বা গতিপথ রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ– وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ–

সূর্য কখনও ধরতে পারবে না চন্দ্রকে, কিংবা রাত্রি অতিক্রম করতে পারবে না দিবসকে, প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে নিজ নিজ কক্ষপথে। (সূরা ইয়াছিন)

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের দিকে আধুনিক বিজ্ঞান জানতে পেরেছে যে, আমাদের ছায়াপথ এবং সূর্যেরও একটি গতিপথ আছে এবং তাদের নিজ নিজ মেরুদণ্ডের ওপরে ঘুরপাক খেতে খেতে তাদের কেন্দ্রকে আবর্তন করে আসতে মোট সময় লাগবে পঁচিশ কোটি বছর। একথা মাত্র এই শতাব্দীতে জানা গেছে যে, কোপার্নিকাসের থিওরী মতে সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ না করলেও সূর্য স্থির বসে নেই, আর পবিত্র কোরআনে কারীম চৌদ্দশত বছর পূর্বে এই তথ্য প্রদান করেছে যখন এ সম্পর্কে মানুষের কোন কিছুই জানা সম্ভব ছিল না।

ছায়াপথের আলোক-রশ্মির বহু বর্ণ-বিভা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষায়রত পদার্থ বিজ্ঞানীগণ লক্ষ্য করেন যে, বিভিন্ন ছায়াপথের বর্ণালী বিভা ক্রমান্বয়ে লালচে হয়ে যাচ্ছে। এ দৃশ্য থেকে তাদের এই ধারণা জন্মে যে, ছায়াপথগুলো ক্রমশ পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাবিশ্বের পরিমণ্ডল ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে; কিন্তু মহান আল্লাহ এই তথ্য দিয়েছেন প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে কারীমে বলেছেন–

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ–

আমি আমার নিজস্ব ক্ষমতা বলেই এই আকাশ সৃষ্টি করেছি, অবশ্যই আমি মহান ক্ষমতাশালী। (সূরা যারিয়াত-৪৭)

এই আয়াতে ব্যবহৃত 'মুছিউন' শব্দের অর্থ, বিশালতা ও বিস্তৃতি দানকারী, ধনীগণ, বিত্তশালীগণ, প্রচন্ড ক্ষমতাধর, শক্তির নিরিখে কোন কিছুর সম্প্রসারণ বা বৃদ্ধি ঘটানো ইত্যাদি হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে এখানে আকাশমন্ডলের প্রসঙ্গে উক্ত শব্দের অর্থ দাঁড়াবে বিস্তৃতি ও বিশালতা দানকারী। সুতরাং এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুর থেকেই

www.pathagar.com

সম্প্রসারিত হচ্ছে বর্তমানেও সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং অনন্তকাল ধরে সম্প্রসারিত হতেই থাকবে। যখন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে, তখনই ঘটবে মহাপ্রলয়। মহাবিশ্বে যদি সম্প্রসারণ গতি না থাকতো, তাহলে মহাবিশ্বের কোন বস্তুরই বিকাশ ঘটতো না। যে গতিতে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে, সে গতি সামান্য কম বা বেশী হলে মহাবিপর্যয় ঘটতো, মহাবিশ্বের কোন অস্তিত্বই থাকতো না।

সুরক্ষিত মহাকাশ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আকাশে তথা উর্ধ্বজগতে কত সহস্র ধরনের বিশালাকারের অকল্পনীয় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সে সম্পর্কে সামান্য ধারণা ওপরে পেশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এই আকাশ মন্ডল কিসের ওপর নির্ভর করে ওপরে অবস্থান করছে? এই প্রশ্নের জবাব কোন মানুষ বিজ্ঞানীদের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়নি। কোন বিষয়ে মানুষ জ্ঞানার্জন করলে বা জ্ঞান থাকলে তাকে সে বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব পাওয়া যেতে পারে। আসলে বর্তমান বিজ্ঞানীগণ আকাশের কোন সন্ধানই লাভ করতে সমর্থ হয়নি। সর্বাধুনিক দূরবিক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাদের চোখে যা ধরা পড়েছে, সে সম্পর্কে তারা পৃথিবীবাসীর কাছে ধারণা পেশ করেছেন। আকাশের কোন ঠিকান তারা খুঁজে পাননি। মহাশূন্যের অসংখ্য জগৎ সম্পর্কে তারা বলেছেন, সেখানে এমন ধরনের অদৃশ্য শক্তি বিরাজ করছে যে, তারা প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহকে এক আকর্ষণী শক্তির মাধ্যমে যার যার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে বাধ্য করছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا–

তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলকে দৃশ্যমান নির্ভর ব্যতিরেকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (সূরা রা'দ-২)

কোন পিলার বা স্তম্ভ নেই, মানুষের দৃষ্টিতে কোনকিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না অথচ আকাশ ঠিকই যথাস্থানে অবস্থান করছে। অদৃশ্যমান কোন নির্ভরের ওপরে আকাশ স্থির রয়েছে। এই আকাশ জগতে আল্লাহ তা'য়ালা যে অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যার বিশলতা সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না, সেসব জগৎ একটির সাথে আরেকটি সংঘর্ষ বাধিয়ে ধ্বংসলীলা সংঘটিত করছে না। উর্ধ্বজগতের এমন সব অংশ যার ভেতরকার প্রতিটি অংশকে অত্যন্ত শক্তিশালী সীমান্ত অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক করে রেখেছে। যদিও এ সীমান্ত রেখা মহাশূন্যে অদৃশ্যভাবে অঙ্কিত রয়েছে তবুও সেগুলো অতিক্রম করে কোন জিনিসের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাওয়া

www.pathagar.com

অত্যন্ত কঠিন। রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ–

আকাশে আমি অনেক শক্তিশালী দূর্গ নির্মাণ করেছি, দর্শকদের জন্য সেগুলো সুসজ্জিত করেছি। (সূরা হিজর-১৬)

উল্লেখিত আয়াতে 'বুরুজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই বুরুজ শব্দের অর্থ করা হয়েছে, দূর্গ, শক্তিশালী ইমারত বা প্রাসাদ। মহান আল্লাহই ভালো জানেন তিনি উর্ধ্বজগতে কি ধরনের বুরুজ নামক জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তবে আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, উর্ধ্বজগৎ থেকে যে ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে, তা যেসব স্তরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছেঁকে প্রয়োজনীয় রশ্মি পৃথিবীতে প্রেরণ করে, সেসব স্তরই বুরুজ হতে পারে। আবার উর্ধ্বজগতে শয়তানের প্রবেশ পথে যেসব বাধা নির্মাণ করা হয়েছে, তাও বুরুজ হতে পারে। সুতরাং আকাশ জগতসমূহে কোথাও কোন দুর্বলতা নেই। সবকিছু নির্মিত হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী ভিত্তির ওপরে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ–

এরা কি কখনো নিজেদের ওপরে অবস্থিত আকাশমন্ডলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে না? কিভাবে আমি তা নির্মাণ করেছি এবং সুসজ্জিত করেছি আর তাতে কোথাও কোন ধরনের ফাঁক ও ফাটল নেই। (সূরা ক্বাফ–৬)

আকাশ জগতের এই বিস্ময়-উদ্দীপক বিশালতা সত্ত্বেও এই বিরাট বিস্তীর্ণ মহাবিশ্ব ব্যবস্থা একটি ধারাবাহিক ও সুদৃঢ় ব্যবস্থা এবং এর বন্ধন, গ্রন্থনা এতই দৃঢ়–দুশ্ছেদ্য যে, তার কোথাও কোন ধরনের ফাটল বা অসামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায় না। এর ধারাবাহিকতা কোথাও গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا–

অসীম বরকত সম্পন্ন তিনি–যিনি আকাশে বুরুজ নির্মাণ করেছেন এবং তার মধ্যে একটি প্রদীপ ও একটি আলোকময় চাঁদ উজ্জ্বল করেছেন। তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। (সূরা আল ফুরকান–৬১-৬২)

www.pathagar.com

যে আল্লাহর প্রশংসা করতে বলা হয়েছে, তিনি অসীম বরকত সম্পন্ন। তিনি আকাশকে পৃথিবীর ছাদ হিসাবে নির্মাণ করে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করেননি। সূর্যকে সেখানে প্রদীপ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা এই সূর্যরশ্মির ভেতরে এমন উপাদান রেখেছেন, যা পৃথিবীর প্রাণীসমূহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সূর্যের তাপ ব্যতিত পৃথিবীতে কোন কিছুই টিকে থাকতে পারে না, নতুন কিছু সৃষ্টিও হতে পারে না। আকাশ মন্ডলে তিনি অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করে তার ভেতরে আলো দান করেছেন। মাথার ওপরে তারাজ্বলা অপূর্ব সৌন্দর্য মন্ডিত আকাশ দেখে মানুষ আমোদিত হবে, মায়াবী চাঁদের জ্যোসনায় অবগাহন করে হৃদয়-মন জুড়াবে। ক্লান্তি দূরিকরণে রাতকে তিনি দিয়েছেন বিশ্রামের জন্য, দিনকে দিয়েছেন জীবন ধারনের উপকরণ সন্ধানের জন্য।

উর্ধ্বজগতে ক্ষতিকর রশ্মি

মাথার ওপরে তারাজ্বলা আকাশের সেই অদৃশ্য জগৎ থেকে প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর দিকে অবর্ণনীয় গতিতে মৃত্যু দুতের মতই ছুটে আসছে অসংখ্য ক্ষতিকর আলোক রশ্মি। পরম করুণাময় আল্লাহ্ যে অদৃশ্য প্রতিরোধক শক্তি মহাশূন্যে সৃষ্টি করেছেন, এসব রশ্মির গতি পথে তারা প্রচন্ড বাধার সৃষ্টি করে। কতকগুলো রশ্মি ফিল্টারে প্রবেশ করে। এভাবে ছেঁকে ক্ষতিকর কণাগুলো ধ্বংস করে কল্যাণকর কণাগুলোকে পৃথিবীতে আসার অনুমোদন দেয়া হয়। করুণার সাগর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন।

উর্ধ্বজগৎ থেকে ক্ষতিকর কণাগুলোর দু'চারটি যদিও বা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে, ঐসব চৌম্বক ক্ষেত্র তখন দয়াময়ের নির্দেশে সক্রিয় হয়ে ওঠে। চৌম্বককে দান করা প্রবল আকর্ষণী ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেসব ক্ষতিকর কণাগুলোকে টেনে নিয়ে যায় মেরু অঞ্চলের দিকে–যেখানে কোন জীবনের স্পন্দন নেই। রাহ্মান তাঁর সৃষ্টির সুরক্ষার জন্য এসব ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন।

মহাকাশে শৃঙ্খলা

পবিত্র কোরআনে আকাশ সম্পর্কে বহু তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। কিভাবে আকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কেমন করে তার সাংগাঠনিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং কোন পদ্ধতিতে আকাশকে কোন ধরনের স্তম্ভ ব্যতিত যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআন মানুষকে ধারণা দান করেছে। আকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ এখন পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে

www.pathagar.com

সক্ষম হননি। তারা প্রকৃত অর্থে আকাশের কোন সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিষয়টি এখনো গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে। মানুষ সসীম জ্ঞানের অধিকারী। কোন কিছু সম্পর্কে এরা সঠিক জ্ঞানার্জন করতে ব্যর্থ হলেই তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা এদের স্বভাব। আকাশের ঠিকানা আবিষ্কারে ব্যর্থ কেউ কেউ আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলেছে, আকাশ বলতে কিছুই নেই। পৃথিবীর ধূলিকণা মহাশূন্যে বায়বিয় স্তরে পুঞ্জিভূত হয় এবং তার ওপরে সূর্যের আলো পতিত হবার ফলে তা নীল দেখায়। প্রকৃত অর্থে আকাশের কোন অস্তিত্ব নেই। অথচ এই আকাশের যিনি স্রষ্টা তিনি বলছেন−

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ−

আমি তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে নয়নাভিরাম নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করে রেখেছি। (সূরা আস্ সা-ফ্ফা-ত-৬)

উল্লেখিত আয়াতে পৃথিবীর আকাশ বলতে সেই আকাশকেই বুঝানো হয়েছে, যা আমাদের এই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী। যে আকাশকে আমরা কোন কিছুর সাহায্য ব্যতিতই খালি চোখে দেখে থাকি। এই আকাশ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীগণ যে বিশ্বকে দেখে থাকেন এবং তাদের পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে যেসব বিশ্ব এখন পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়নি সেগুলো সবই দূরবর্তী আকাশ।

কোরআনে আকাশ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে 'সাব'আ' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যার সরল অনুবাদ করা হয়েছে 'সাত আকাশ'। আল্লাহ্‌র কোরআনের বক্তব্য মানুষের বোধগম্য ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। যে শব্দ ব্যবহার করলে মানুষ সহজে বুঝতে সক্ষম হবে, সেই শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। কোরআনে কোন জটিলতা রাখা হয়নি। আরবী পরিভাষায় 'আলিফ' বলতে অগণিত কিছু বোঝায়। এখন কেউ যদি এই আলিফ বলতে শুধুমাত্র একহাজার বুঝে, তাহলে সে তার জ্ঞান অনুযায়ী তা বুঝতে পারে। কিন্তু এই আলিফ দিয়ে আল্লাহ্‌র কোরআন অসংখ্য অগণিত বুঝিয়েছে।

যেমন সূরা কদরে 'লাইলাতুল কাদরি মিন আলফি শাহ্‌রে' বলতে বুঝানো হয়েছে অসংখ্য অগণিত মাসের থেকেও উত্তম হলো কদরের রাত। আবার কিয়ামত সংঘটিত হবার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করতে গিয়ে কোরআন 'সুর' শব্দ ব্যবহার করেছে। এই 'সুর' শব্দের অর্থ হলো শিঙ্গা। হযরত ইসরাফিল (আঃ) শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন,

www.pathagar.com

কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। সেই প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্তও কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রচারের জন্য ঢেড়া পিটিয়ে বা শিঙ্গা বাজিয়ে মানুষকে একত্রিত করা হয়। এখানো সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করার জন্য বিউগল বাজানো হয়। অর্থাৎ মানুষ এই শিঙ্গা শব্দটির সাথে পরিচিত, এ কারণে কোরআন শিঙ্গা শব্দই ব্যবহার করেছে। এদেশেও কথার মাঝে মানুষ সীমাহীন দূরত্ব বুঝাতে 'সাত সমুদ্দুর তের নদী–সাত তবক আসমান' ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করে থাকে। অমূল্য কোনকিছু বুঝাতে 'সাত রাজার ধন' বাক্যটি ব্যবহার করে। এ জন্য আল্লাহর কোরআন অসংখ্য আকাশকে বুঝাতে 'সাব'আ' বা সাত আকাশ শব্দ ব্যবহার করেছে, যেন মানুষ সহজে বুঝতে পারে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، وَمَاكُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ، وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنَّهُ فِى الْاَرْضِ، وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقَادِرُوْنَ–

নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ওপরে অসংখ্য স্তর সৃষ্টি করেছি। আমি আমার সৃষ্টি সম্পর্কে মোটেও অমনোযোগী নই। আর আকাশ থেকে আমি ঠিক হিসাব মতো একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে ভূমিতে সংরক্ষণ করেছি। আমি তাকে যেভাবে ইচ্ছা অদৃশ্য করে দিতে সক্ষম। (সূরা মুমিনুন)

মহান আল্লাহ্ হলেন রাব্বুল আলামীন। তিনি অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং এসব সৃষ্টি করেই তিনি অবসর গ্রহণ করেননি। তিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন রয়েছেন। কোনটি কিভাবে পরিচালিত হবে, কোন সৃষ্টির কি প্রয়োজন, এ সম্পর্কে তিনি মোটেও অমনোযোগী নন। তাঁর সৃষ্টি অসংখ্য জগৎ যেন যথা নিয়মে পরিচালিত হয়, এ ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ্ তা'য়ালা একই সঙ্গে এমন পরিমিত পরিমাণ পানি পৃথিবীতে বর্ষণ করেছিলেন যা পৃথিবী নামক এই গ্রহটির ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। এই পানি পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এভাবে পানিকে সংরক্ষণ করার কারণেই নদী, সাগর-মহাসাগর ও জলাধারের সৃষ্টি হয়েছে, ভূগর্ভেও বিপুল পরিমাণ পানি রিজার্ভ রয়েছে। এই পানিই চক্রাকারে উষ্ণতা, শৈত্য ও বাতাসের মাধ্যমে বর্ষিত হতে থাকে। মেঘমালা, বরফাচ্ছাদিত পাহাড়, সাগর, নদী-নালা ঝরণা ও কুয়া, ডিপ টিউবওয়েল এই পানিই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

মহাশূন্যে বাতাসের ঘনস্তর

পৃথিবী নামক এই গ্রহটি নিয়মিতভাবে সূর্যের সম্মুখ ভাগে একবার আসে এবং আবার পিছনের দিকে সরে যায়। এরই ফলে দিন ও রাতের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যদি পৃথিবীর একটি দিক সব সময় সূর্যের দিকে অবস্থান করতো এবং অন্য দিকটি সময় সময় সূর্যের আড়ালে অবস্থান করতো, তাহলে এই পৃথিবীতে কোন প্রাণী বসবাস করতে সক্ষম হতো না। কারণ একদিকের সার্বক্ষণিক শৈত্য ও আলোকহীনতা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্মলাভের উপযোগী হতো না এবং অন্যদিকের ভয়াবহ দাবদাহ প্রচন্ত উত্তাপ পৃথিবীর সূর্যের দিকে একইভাবে অবস্থানরত অংশকে পানিহীন, উদ্ভিদহীন ও প্রাণহীন করে দিতো।

উল্কা পতনের ভয়াবহ প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এই ভূ-মন্ডলের প্রায় আটশত কিলোমিটার ওপর পর্যন্ত বাতাসের একটি ঘনস্তর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি এ ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে প্রতিদিন কোটি কোটি বিশালাকারের উল্কাপিন্ড প্রতি সেকেন্ডে আট চল্লিশ কিলোমিটারেরও অধিক গতিতে এসে পৃথিবী পৃষ্ঠে আঘাত হানতো। এর ফলে পৃথিবীতে যে ধ্বংস লীলা সাধন হতো তাতে করে মানুষ, পশু-প্রাণী, বৃক্ষতরু-লতা কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতো না। সকল কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চর্বিত তৃণের ন্যায় ধারণ করতো।

মহাকাশে পাথরের সাম্রাজ্য

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলেন–

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ
وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ، يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ–

আকাশের শিলাস্তর থেকে তিনি শিলা বর্ষণ করেন এবং যার ওপর চান তার ওপরই তা বর্ষণ করেন, (আবার) যাকে চান তাকে তিনি তার (আঘাত) থেকে অব্যাহতিও দেন; মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক (চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়), মনে হয় তা বুঝি দৃষ্টি (-শক্তিকে এক্ষুণি) নিষ্প্রভ করে দিয়ে যাবে। (সূরা আন নূর-৪৩)

এই পৃথিবীতেই শুধু পাথরের খনি বিদ্যমান নেই, আল্লাহ তা'য়ালা যে আরো অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সেখানেও পাথর বিদ্যমান। মাহশূন্য সম্পর্কে যাদের সামান্য লেখাপড়া রয়েছে, তারা এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে, মহাশূন্যে বিশালাকারের একটি পাথরের জগৎ রয়েছে। মহাকাশে শূন্যতার মহাসমুদ্রে ভাসমান

www.pathagar.com

পাথরের জগৎ বিদ্যমান। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্য বলয়ে এসটিরয়েড ও মিটিওরিট বেল্ট রয়েছে। এটাই হলো এককভাবে পাথরের জগৎ। এ ছাড়াও প্রায় প্রতিটি গ্রহেই পাথর রয়েছে। মহাশূন্যে ভাসমান পাথরের এই জগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ জানতে পেরেছেন মাত্র উনিশ শতকে। অথচ আল্লাহর কোরআন এ জগৎ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেশ করেছে সেই সপ্তম শতাব্দীতে।

আল্লাহর কিতাবের সূরা জ্বিন-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, কিভাবে মহাশূন্যে পাথর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বিজ্ঞান অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে যে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে রয়েছে একটি সুবিশাল পাথরের বেল্ট, একটি ভাসমান পাথরের জগৎ। পাথরের এই জগৎ নিয়ে বর্তমান বিজ্ঞানীগণ মারাত্মক শঙ্কিত রয়েছেন। কি জানি, কখন কি অবস্থায় এসব পাথর পৃথিবীর দিকে সেকেন্ডে শত শত কিলোমিটার গতিতে ছুটে এসে আঘাত হেনে মানব সভ্যতাকে অস্তিত্বহীন করে দেয়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই আকাশে যে শতকোটি নানা ধরনের জগৎ বিদ্যমান, এসব জগতই একদিন পৃথিবী নামক গ্রহটির সর্বনাশ করে ছাড়বে। হয়ত তাদের ধারণা একদিন বাস্তবে পরিণত হলে হতেও পারে। কারণ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আল্লাহর আদেশে সমস্ত আকর্ষণ বলয় ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা যে মহাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করে মহাশূন্যে শতকোটি বিশালাকারের গ্রহ-উপগ্রহ পরিচালিত করছেন, সে আকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব থাকবে না, তখন তা পৃথিবীতে পতিত হবে।

বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, সুমেকার লেভী-৯ নামক একটি গ্রহের মাত্র একুশটি পাথর নিপতিত হয়েছিল বৃহস্পতি গ্রহের ওপর। যার ক্ষমতা ছিল প্রায় আড়াই কোটি মেগাটন টিএনটি'র ধ্বংযজ্ঞের। ছয়শত পঞ্চাশ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে একবার প্রায় দশ কিলোমিটার ব্যাসের একটি ঝুলন্ত পাথর আঘাত করে এক মহাধ্বংস যজ্ঞের সূত্রপাত করেছিল।

জীব বিজ্ঞানীদের ধারণা সে আঘাতেই বিরাটাকারের প্রাণী ডাইনোসোর পৃথিবী থেকে অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহের মাঝে অসংখ্য পাথরের দল মহাশূন্যে চলমান অবস্থায় রয়েছে। এগুলো পৃথিবীতে পতিত হচ্ছে না। কে এগুলোর পতন রোধ করেছেন? আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ، وَحِفْظًا، ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ–

আর পৃথিবীর আকাশকে আমি উজ্জ্বল প্রদীপ দিয়ে সজ্জিত করলাম এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সুরক্ষিত করে দিলাম। এসবই এক মহাপরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার পরিকল্পনা। (সূরা হামীম আস সাজদাহ্-১২)

মহাশূন্য থেকে শুধু উল্কাই নয়, এমন অসংখ্য রশ্মি পৃথিবীর দিকে প্রতি মুহূর্তে ছুটে আসছে যে, তা পৃথিবীতে পতিত হবার সুযোগ পেলে মুহূর্তে পৃথিবী নামক এই গ্রহটি প্রাণী বসবাসের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলতো। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর আকাশকে সুরক্ষিত ছাদের মতো না করলে সূর্য থেকে আগত সৌর ঝন্ঝা পৃথিবীর ওপরে প্রচন্ড উত্তাপ আর ঝড়ের ধ্বংস আঘাত হানতো যে, পৃথিবীর বুকে কোন জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করা কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। শুধু তাই নয়, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে এসটিরয়েড ও মিটিওরের বেল্ট থেকে প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় কমবেশী ত্রিশ লক্ষ উল্কা পতিত হচ্ছে পৃথিবীর দিকে। কোন সে বিজ্ঞানী যিনি বিশালাকারের উল্কাগুলো মহাশূন্যের গ্যাসীয় বলয়ে মিশিয়ে দিচ্ছেন? আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا-

আর আমি আকাশকে করেছি একটি সুরক্ষিত ছাদ। (সূরা আল আম্বিয়া-৩২)

মহাকাশে বায়ুমন্ডলীয় অদৃশ্য ছাতা

রাব্বুল আলামীন বায়ু মন্ডলে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করেছেন। বায়ুমন্ডলীয় অদৃশ্য অথচ দৃঢ় ছাদই ক্ষতিকর বিকিরণ ছেঁকে যা পৃথিবীর পরিবেশের জন্য কল্যাণকর সেসব রশ্মি প্রবেশ করতে দেয়। এক্সরে আয়নোস্ফিয়ার ও আলট্রাভায়োলেট স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে মাত্রাতিরিক্ত অবলোহিত রশ্মি ট্রপোস্ফিয়ারে বিশোষিত হয়ে যায়।

শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় রশ্মিরাই প্রতিপালন ব্যবস্থায় বিস্ময়করভাবে পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে সোলার উইন্ড এবং লক্ষ লক্ষ উল্কাপতনের কবল থেকে নিরাপদ রাখার জন্য এই অদৃশ্য ছাদই প্রতিরোধ্যতায় অটল-অবিচল। আল্লাহ তা'য়ালা বাতাস সৃষ্টি করেছেন। এ বাতাসই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, সমুদ্র থেকে মেঘ উঠিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে এবং মানুষ, পশু ও উদ্ভিদের জীবনে প্রয়োজনীয় গ্যাসের যোগান দেয়। বাতাসের অনুপস্থিতিতে এ পৃথিবী কোন প্রাণী বসবাসের উপযোগী অবস্থান স্থলে পরিণত হতো না।

এই ভূ-মন্ডলের ভূ-ত্বকের নিকটবর্তী বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খনিজ ও

বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বিপুল পরিমাণে স্তূপীকৃত করেছেন। উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের জীবনের জন্য এগুলো একান্ত অপরিহার্য। পৃথিবীর যে অঞ্চলে এসবের অবস্থান নেই, সে অঞ্চলের ভূমি জীবন ধারনের উপযোগী নয়।

পৃথিবী নামক এই গ্রহটিতে নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, হ্রদ, ঝরণা ও ভূগর্ভস্থ স্রোতধারার আকারে বিপুল পরিমাণ পানির ভান্ডার গড়ে তুলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। পাহাড়ের ওপরও পানির বিশাল ভান্ডার ঘনীভূত করে এবং পরবর্তীতে তা গলিয়ে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। তিনি রব, এ ব্যবস্থা যদি তিনি না করতেন, তাহলে পৃথিবী নামক গ্রহ প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হতো না। আবার এই পানি, বাতাস এবং পৃথিবীতে অন্যান্য যেসব বস্তুর অবস্থান রয়েছে সেগুলোকে একত্র করে রাখার জন্য এই গ্রহটিতে অত্যন্ত উপযোগী মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। এ মধ্যাকর্ষণ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের থেকে কম হতো তাহলে পৃথিবী বাতাস ও পানি শূণ্য হয়ে যেতো এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি লাভ করে এমন প্রচন্ড আকার ধারণ করতো যে, প্রাণের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতো।

মাধ্যাকর্ষণ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী হতো, তাহলে বাতাস এতটা ঘন হয়ে যেতো যে, কোন প্রাণী নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে পারতো না, মৃত্যু ছিল অনিবার্য। বাতাসের চাপ বৃদ্ধি লাভ করতো এবং জলীয় বাষ্প সৃষ্টি হতো না, ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হতো না, শীতলতা বৃদ্ধি লাভ করতো, ভূ-পৃষ্ঠের কোন এলাকাই বাসযোগ্য হতো না বরং ভারীত্বের আকর্ষণ অনেক বেশী হলে মানুষ ও পশুর শারীরিক দৈর্ঘ-প্রস্থ কম হতো কিন্তু তাদের ওজন এতটা বৃদ্ধি লাভ করতো যে, তাদের পক্ষে চলাফেরা করা সম্ভব হতো না।

রাব্বুল আলামীন পৃথিবী নামক এ গ্রহটিকে সূর্য থেকে জনবসতির সবচেয়ে উপযোগী একটি বিশেষ দুরত্বে রেখেছেন। এরচেয়ে কম দূরত্বে যদি রাখতেন, তাহলে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে নিঃশেষে ভষ্ম হয়ে যেতো। যদি অধিক দূরত্বে রাখতেন তাহলে পৃথিবী প্রচন্ড ঠান্ডায় বরফে পরিণত হতো। আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি জগতকেই সঠিক পরিমাপে নির্দিষ্ট কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করার ব্যবস্থা করেছেন।

গ্রহসমূহ কক্ষপথে সন্তরণশীল

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এসব জগৎ তিনি ঠিকানা বিহীন অবস্থায় ছেড়ে দেননি। প্রতিটি জগত-ই তার নির্দিষ্ট গতি পথে পরিভ্রমণ করছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

www.pathagar.com

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ-

সূর্যের ক্ষমতা নেই চাঁদকে অতিক্রম করে এবং রাতের ক্ষমতা নেই দিনের ওপর অগ্রবর্তী হতে পারে, সবাই এক একটি কক্ষ পথে সন্তরণ করছে। (সূরা ইয়াছিন-৪০)

সুদূর অতিত থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষ যে জ্ঞানার্জন করেছে, এটাই শেষ না এর পরেও আরো কিছু জানার অবশিষ্ট আছে? এ কথা দৃঢ়তার সাথে কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয় যে, জ্ঞানের শেষস্তর পর্যন্ত সে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। চূড়ান্ত কথা তখনই বলা সম্ভব হবে, যখন বিশ্বজগতের নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষ সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে।

পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞানের বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এটাই যে, মানুষের অর্জিত জ্ঞান প্রতিটি যুগে পরিবর্তনশীল ছিল এবং বর্তমানেও মানুষ যে জ্ঞানার্জন করেছে, যে কোন সময় তা পরিবর্তন হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবী ও চন্দ্র, সূর্য সম্পর্কে মানুষ যুগে যুগে বিভিন্ন ধরনের ধারণা পোষণ করেছে। এক সময় লোকজন চাক্ষুষ দর্শনের ভিত্তিতে সূর্য সম্পর্কে এ নিশ্চিত বিশ্বাস অন্তরে লালন করতো যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এ ধারণা কিছু দিন প্রতিষ্ঠিত থাকার পর বিভিন্ন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে এ ধারণা আবার প্রতিষ্ঠিত হলো যে, সূর্য তার নিজের অবস্থানে স্থির রয়েছে এবং গোটা সৌরজগৎ তাকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করছে।

কালের আবর্তনে উল্লেখিত ধারণা স্থায়ী হলো না। পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হলো যে, শুধু সূর্যই নয়, মহাশূন্যে যা রয়েছে, তা সবই একদিকে ছুটে চলেছে। যে যার কক্ষপথে সঞ্চালনশীল। এসব কিছুর চলার গতি হলো প্রতি সেকেন্ডে সাড়ে ষোল কিলোমিটার থেকে একশত একষট্টি কিলোমিটার পর্যন্ত। আল্লাহর কিতাবের সূরা ইয়াছিনের উক্ত আয়াতে যে 'ফালাক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ হলো গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ এবং আকাশের অর্থ থেকে ভিন্ন। আয়াতে বলা হয়েছে, সমস্ত কিছুই কক্ষপথে সন্তরণশীল। মুফাচ্ছিরগণ এ আয়াতের চার ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কেউ বলেছেন, শুধুমাত্র চন্দ্র, সূর্য নয়-বরং সমস্ত তারকা ও গ্রহ এবং সমগ্র আকাশ জগৎ আবর্তন করছে। আবার কেউ বলেছেন, এদের প্রতিটির আকাশ অর্থাৎ প্রতিটির আবর্তন পথ বা কক্ষপথ ভিন্ন ভিন্ন। কেউ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আকাশসমূহ তারকারাজিকে নিয়ে আবর্তন করছে না বরং তারকারাজি আকাশসমূহে আবর্তন

করছে। কারো ব্যাখ্যা হলো, আকাশসমূহে তারকাদের আবর্তন এমনভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যে, যেমন কোন তরল পদার্থে কোন বস্তু ভেসে চলে, ঠিক তেমনি মহাশূন্যে সমস্ত কিছুই ভেসে চলছে।

যে বা যিনি যে ধরনের ব্যাখ্যাই দিন না কেন, একটি কথা স্মরণে রেখে আল্লাহর কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে যে, কোরআন মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের বিষয়সমূহ উপস্থাপন করতে গিয়ে সৃষ্টির বিভিন্ন দিকের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর ভেতর দিয়েই বিজ্ঞানের নানা তথ্য বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, কোরআন নিরেট বিজ্ঞানের কিতাব।

বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের প্রতি ইঙ্গিত দেয়ার অর্থ হলো, মানুষকে এ কথা বুঝানো যে, যদি সে সমস্ত কিছুর ওপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং নিজের জ্ঞান, বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার করে তাহলে পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, সেদিকেই তার সামনে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বের অসংখ্য ও অগণিত যুক্তি-প্রমাণের এক বিশাল সমাবেশ দেখতে সক্ষম হবে।

এসব সৃষ্টিসমূহের ভেতরে মানুষ কোথাও আল্লাহর অস্তিত্বহীনতার ও অংশীদারিত্বের স্বপক্ষে সামান্যতম যুক্তি ও প্রমাণও অনুষ্কান করে পাবে না। তিনি অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এসব যথা নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে, এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এ জন্যই করা হয়েছে যে, কোন সুদক্ষ স্রষ্টা ব্যতিত এসব কি এমনিতেই চলতে পারে? শতকোটি জগৎ একটি নিয়মের অধীনে চলছে, স্রষ্টার যদি কোন অংশীদার থাকতো, তাহলে এসব পরিচালনা করতে গিয়ে অবশ্যই মতানৈক্য ঘটতো এবং তার বহিঃপ্রকাশ অবশ্যই মানুষ দেখতে সমর্থ হতো। সুতরাং কোথাও যখন কোন অনিয়ম মানুষের চোখে পড়ছে না, তখন এ কথা কি অনুভব করতে অসুবিধা হয় যে, সৃষ্টি জগতসমূহের পেছনে একজন স্রষ্টা রয়েছেন এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়? সমস্ত কিছুই যখন একটি নিশ্চিত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন কি এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয়, পৃথিবীর মানুষেরও একটি পরিণতি রয়েছে? তোমরাই বলছো, সমস্ত কিছুই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছো, কিভাবে ধ্বংস হচ্ছে–এসব ধ্বংসের পরে তাঁর পক্ষে এসব আবার দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কি অসম্ভব? প্রথমবার যিনি অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বদান করেছেন, দ্বিতীয়বারও তো তিনি অস্তিত্বদান করতে সক্ষম–এই সহজ সরল কথাটি তোমাদের মাথায় প্রবেশ করে না? সুতরাং আখিরাত অবশ্যম্ভাবী–এ কথা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়।

www.pathagar.com

ছায়াপথই সমগ্র সৃষ্টিজগৎ নয়

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বহুমাত্রিক জগতের ধারণা দিয়ে অবিশ্বাসীদের সামনে তাঁর অস্তিত্বই প্রকাশ করেছেন। এসব দেখেও যারা তাঁর অস্তিত্বে, তাঁর একত্বে, রিসালাতের ওপরে, আখিরাতের প্রতি সংশয়যুক্ত মানসিকতা লালন করবে, তাদেরকে কপাল পোড়া ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে। আমাদের এ পৃথিবী যে সৌরজগতের অন্তরভুক্ত তার বিশালত্বের অবস্থা হলো এই যে, তার কেন্দ্রীয় সূর্যটি পৃথিবীর ভরের তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার আট শত গুণ। আর সূর্যের ব্যাস হলো পৃথিবীর ব্যাসের একশত নয় গুণ। ঘনত্ব একহাজার চারশত দশ গ্রাম বা ঘন সেন্টিমিটার।

সূর্যের সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ–যার নাম দেয়া হয়েছে নেপচুন, সূর্য থেকে এর দূরত্ব কমপক্ষে দুই শত উনআশি কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। বরং যদি প্লুটো নামক গ্রহটিকে দূরবর্তী গ্রহ হিসাবে ধরা হয় তাহলে সূর্য তার দূরত্ব চারশত ষাট কোটি মাইলে গিয়ে উপনীত হয়। এত বড় বিশাল হবার পরও এ সৌরজগৎ একটি বিরাট বিশাল গ্যালাক্সী বা ছায়াপথের নিছক একটি ছোট্ট অংশ মাত্র।

মানুষ যেখানে অবস্থান করছে, এই সৌরজগৎ যে গ্যালাক্সী বা ছায়াপথটির অন্তুর্ভুক্ত তার মধ্যে প্রায় তিন হাজার মিলিয়ন অর্থাৎ তিনশত কোটি সূর্য রয়েছে এবং সে সকল সূর্যের সবচেয়ে কাছের সূর্যটি এই পৃথিবী থেকে এতদূরে অবস্থান করছে যে, তার আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে চার বছর সময়ের প্রয়োজন হয়।

এই ছায়াপথই গোটা সৃষ্টিজগৎ নয়। বরং দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীগণ যে অনুমান করেছেন, তাহলো প্রায় বিশ লক্ষ নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে এই ছায়াপথও একটি এবং ঐ বিশ লক্ষ নীহারিকাপুঞ্জের ভেতর থেকে সবচেয়ে কাছের নীহারিকা এত দূরে অবস্থিত যে, তার আলো আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছতে দশ লক্ষ বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। বর্তমান বিজ্ঞানীগণ যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূরের যে নীহারিকাটি দেখেছেন, তার আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে দশকোটি বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। তারা বলছেন, এটাই শেষ নয়–এরপরও আরো অসংখ্য জগৎ রয়ে গিয়েছে, অসংখ্য নীহারিকা রয়ে গিয়েছে, যেগুলো বিজ্ঞানীদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে এখনো ধরা পড়েনি। ভবিষ্যতে আরো শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হলে, তার সাহায্যে অনেক কিছুই দেখা যেতে পারে। সুতরাং এ যাবৎ বিজ্ঞানীগণ আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের যে নমুনা দেখেছে, তার তুলনা করা যেতে পারে, গোটা পৃথিবীর সমস্ত বালুকণার মধ্যে মাত্র একটি বালুকণার সাথে। আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির

www.pathagar.com

তুলনা যদি পৃথিবীর সমস্ত বালুকণার সাথে করা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে, বিজ্ঞানীগণ মাত্র একটি বালুকণার সমান অংশের সন্ধান পেয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীগণ যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী যেসব উপাদানে গঠিত হয়েছে এবং যে নিয়মের অধীন, গোটা সৃষ্টি জগতসমূহ সেই একই উপাদানে গঠিত হয়েছে এবং সেই একই নিয়মের অধীন। পার্থক্য রয়েছে শুধু পরিবেশের। পৃথিবী সৃষ্টির উপাদান ও অন্যান্য জগৎ সৃষ্টির উপাদান যদি একই না হতো, তাহলে এই পৃথিবীতে অবস্থান করে মানুষ যে অতি দূরবর্তী জগতসমূহ পর্যবেক্ষণ করছে, দূরত্ব পরিমাপ করছে এবং তাদের গতির হিসাব বের করছে, এসব করা কখনো সম্ভব হতো না।

সমগ্র সৃষ্টি জগতে একই ধরনের উপাদান ও নিয়ম কার্যকর রয়েছে বলেই বিজ্ঞানীদের পক্ষে এসব করা সম্ভব হচ্ছে। সমস্ত জগতে যে নিয়ম-শৃংখলা, প্রজ্ঞা দক্ষতা, কলাকৌশল, শিল্পকারিতা, সৃষ্টির নিপুণতা, নান্দনিক সৌন্দর্য, উন্নত রুচির প্রকাশ, নিঁখুত শিল্পকর্ম, একটির সাথে আরেকটির সম্পর্ক এবং অগণিত গ্যালাক্সী ও তাদের মধ্যে সঞ্চরণশীল শত শত কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে দেখা যায়, এসব দেখে কি কোন জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধিমান মানুষ এ কথা কল্পনা করতে পারে যে, এসব স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়েছে? এসব নিয়ম-শৃংখলার পেছনে কোন ব্যবস্থাপক, কোন কৌশলী শিল্পী, কোন মহাবিজ্ঞানী এবং মহাপরিকল্পনাকারীর অস্তিত্ব অনুপস্থিত? বিজ্ঞানীদের এসব আবিষ্কার ও কার্যাবলীই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, সৃষ্টি জগতসমূহের স্রষ্টা আছেন এবং তিনি একজন। একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন মাত্র একটি সত্তা তথা আল্লাহ্ তা'য়ালা সৃষ্টিজগৎ নিয়ন্ত্রণ করছেন।

আকাশ একটি ছাদ বিশেষ

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করার পূর্বে মানুষকে যেখানে প্রেরণ করবেন, সে পৃথিবীকে নানাভাবে সজ্জিত করেছেন। পৃথিবীর ছাদ হিসাবে আকাশ সৃষ্টি করেছেন। যমীনকে গালিচার মতো বিছিয়ে দিয়েছেন। তারপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ-

www.pathagar.com

সেই আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে গালিচা হিসাবে বিছিয়ে দিয়েছেন, আকাশকে ছাদ হিসাবে নির্মাণ করেছেন, তারপর সে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তার সাহায্যে নানা ধরনের ফল উৎপন্ন করে তোমাদের জন্য রিয্‌কের ব্যবস্থা করেছেন। (সূরা বাকারা-২২)

পৃথিবীর স্থলভাগকে শুধু শুষ্ক মাটি আর বালির মরুভূমি বানিয়ে তিনি শ্রীহীন না করে সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লীলাভূমিতে পরিণত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَاَخْرَجْنَابِهٖ نَبَتَا كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَكِبًا، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ–

তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তার সাহায্যে সব ধরনের উদ্ভিত উৎপাদন করেছেন এবং তার দ্বারা শস্য-শ্যামল ক্ষেত-খামার ও বৃক্ষ-তরু-লতার সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে বিভিন্ন কোষসম্পন্ন দানা বের করেছেন, খেজুরের মোচা থেকে ফলের থোকা বানিয়েছেন, যা বোঝার ভারে নূয়ে পড়ে। আর সজ্জিত করেছেন আঙ্গুর, যয়তুন ও ডালিমের বাগান সাজিয়ে দিয়েছেন, সেখানে ফলসমূহ পরস্পর স্বদৃশ, অথচ প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন ভিন্ন। এই গাছগুলো যখন ফল ধারণ করে, তখন এদের ফল বের হওয়া ও তা পেকে যাওয়ার অবস্থাটা একটু সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখো। (সূরা আল আন'আম-৯৯)

আকাশের কোলে বিরাটায়তন প্রদীপরাশি

কোনটি আল্লাহ অপূর্ণ রাখেননি। গোটা পৃথিবীকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছেন। সমুদ্র সৃষ্টি করে তার ভেতরে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করেছেন। সমুদ্র নিশ্চল থাকলে তা দেখতে অসুন্দর মনে হতো। এ জন্য আল্লাহ সমুদ্রের বুকে ঢেউ সৃষ্টি করে পানিতে তরঙ্গ সৃষ্টি করে তা দৃষ্টি-নন্দন করেছেন। পানির ভেতরে মাছ সৃষ্টি করেছেন। আকাশে কোন আলোর ব্যবস্থা না থাকলে তা দেখতে কুৎসিত দেখাতো। তিনি সে আকাশ সুন্দর করে সাজিয়েছেন। পবিত্র কোরআন বলছে–

www.pathagar.com

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ-

তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে বিরাটায়তন প্রদীপরাশি দ্বারা সুসজ্জিত ও সমুদ্ভাসিত করে দিয়েছি। (সূরা মুল্‌ক-৫)

আল্লাহ বলেন, এই বিশ্বলোককে আমি অন্ধকারময় ও নিঃশব্দ নিষ্প্রভ করে সৃষ্টি করিনি। আকাশে তারকামালা ও নক্ষত্রপুঞ্জ দিয়ে অত্যন্ত মনোহর; উজ্জ্বল উদ্ভাসিত ও সুসজ্জিত করে দিয়েছি। তোমরা রাতের অন্ধকারে তার উজ্জ্বল আলো ঝকমকে রূপ দেখে গভীরভাবে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে পড়ো। শুধু তাই নয়, আমি চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছি। তোমরা লক্ষ্য করে দেখো-

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا-وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا-

তোমরা কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সাত আকাশ স্তরে স্তরে নির্মাণ করেছেন? আর সে আকাশে চন্দ্রকে আলো ও সূর্যকে প্রদীপ বানিয়ে দিয়েছি। (সূরা নূহ)

মহান আল্লাহর রুচিবোধ, তাঁর সৌন্দর্যবোধ; সৃষ্টির ভেতরে তাঁর শৈল্পিক জ্ঞানের প্রকাশ দেখলেই অনুমান করা যায় তিনি কত সুন্দর। প্রতিটি সৃষ্টির ভেতরেই তাঁর অকল্পনীয় উন্নত রুচির প্রকাশ ঘটেছে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে তিনি জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরআনে সূরা ইয়াছিনে বলা হয়েছে-

سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ-

মহান পবিত্র সেই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টিলোকের যাবতীয় জোড়া সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভিদ ও মানবজাতির মধ্য থেকে এবং এমন সব সৃষ্টি থেকে, যার সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না। (সূরা ইয়াছিন)

মহাকাশে চাঁদ-সূর্যের দুরত্ব

এই পৃথিবী যদি চাঁদের সমান হতো অথবা তার নিজস্ব ব্যাসের এক চতুর্থাংশ হতো, তাহলে তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বর্তমানে যতটা রয়েছে তার এক ষষ্ঠাংশ হতো। এই ষষ্ঠাংশ শক্তি সম্পন্ন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কখনো পৃথিবীর বায়ূমন্ডলীয় পানিকে ধরে

www.pathagar.com

রাখতে সমর্থ হতো না। এই পৃথিবীতে মওজুদ সমস্ত পানির ভান্ডার দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যেতো। বাতাসের জলীয় বাষ্পমাত্রা বায়ূমন্ডলীয় বলয় থেকে বিমুক্ত হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবী হারিয়ে ফেলতো তার তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি লাভ করতো ফলে এখানে জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যেত না। সূর্যের প্রাণঘাতী অবলোহিত রশ্মি (Infrared Ray) প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীতে পৌছে সমস্ত কিছু মুহূর্তে চিরকালের জন্য ভস্মীভূত করে দিতো। পৃথিবী হারিয়ে ফেলতো তার জীবন সংক্ষরণ ক্ষমতা। বর্তমান ব্যাসের দ্বিগুণ হলে বর্ধিত পৃথিবীর উপরিভাগের পরিমাণ বর্তমান ভূ-পৃষ্ঠের চারগুণ হতো।

এমন একটি অবস্থায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল বৃদ্ধি লাভ করতো বর্তমানের দ্বিগুণ যা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সৃষ্টি করতো ৩০ পাউন্ড চাপ। মারাত্মকভাবে কমে যেত বায়ূমন্ডলের স্তরগত উচ্চতাসমূহ। এই উচ্চতা কমে যাওয়ার ফলে অনিবার্য ধ্বংসের ভয়াবহ বিভীষিকা নেমে আসতো এই পৃথিবীতে। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুসারে প্রতিদিন প্রায় ২০ লক্ষ উল্কা এই পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে তীব্র গতিতে ছুটে আসে। আমরা অনুভবও করতে পারিনা, আল্লাহ্ উর্ধ্ব জগতে যে বায়ূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন, তার পুরুত্ব ও ব্যাপ্তি দিয়ে পৃথিবীর প্রাণীকুল ও অন্যান্য বস্তুকে ধ্বংসকারী উল্কাপতন থেকে হেফাজত করে যাচ্ছে। পৃথিবীর আকারের বৃদ্ধি যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে বর্ধিত করে দিত, তাহলে নীচে নেমে আসতো বায়ূমন্ডলের এই অদৃশ্য প্রতিরোধী ব্যবস্থার বিস্তার। পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌছার পূর্বে বায়ূমন্ডলীয় ঘর্ষণে ভস্মীভূত না হয়ে উল্কাসমূহ প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীতে আঘাত হানার পথ সুগম হয়ে পড়তো। ফলে মুহূর্তে সমস্ত প্রাণী মুহূর্তে ধ্বংস স্তুপে পরিণত হতো।

এই পৃথিবী বর্তমানে সূর্য থেকে যে দুরত্বে অবস্থান করছে, এর থেকে যদি দ্বিগুণ দুরত্বে সরিয়ে নেয়া হতো তাহলে পৃথিবী বর্তমানে সূর্যের কাছ থেকে যে পরিমাণ উত্তাপ লাভ করছে, তখন লাভ করতো মাত্র এক চতুর্থাংশ। এই দুরত্বের কারণে বার্ষিক গতির মাত্রা হতো বর্তমানের অর্ধেক কিন্তু অক্ষ পরিধির পরিমাপ হতো বর্তমানের দ্বিগুণ। ফলে একটি বছরের পরিমাপ হতো চারটি বছরের সমান। এতে যে ফলাফল হতো তাহলো দুরত্ব জনিত কারণে তাপমাত্রার এক মারাত্মক হ্রাসপ্রাপ্তি যা বর্তমানের এক চতুর্থাংশ অথবা তারও কম মাত্রায় পৌছে যেতো। শীত মৌসুমের ব্যাপ্তি বর্তমানের চারগুণ দীর্ঘতর হয়ে যেতো ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের সমস্ত প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদ জগৎ জমাট বদ্ধ হয়ে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। এমনকি প্রচন্ড খরা মৌসুমে কোন একটি তরুলতাও প্রয়োজনের সময় এক বিন্দু মুক্ত পানি লাভ করতে সক্ষম হতো না।

www.pathagar.com

আবার পৃথিবীর সৌর দূরত্ব বর্তমান দূরত্বের অর্ধেক হলে কক্ষপথের পরিধি নেমে আসতো অর্ধেকে কিন্তু গতিবেগ হতো দ্বিগুণ। যার ফলে বর্তমানের একটি সৌর বছর হতো মাত্র ৩ মাস দীর্ঘ। এমন অবস্থায় সূর্য থেকে আগত তাপের পরিমাণ হতো বর্তমানের চেয়ে চারগুণ অধিক। ফলে এই পৃথিবীতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতো না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে রাত ও দিনের আবর্তনের মাধ্যমে এসব কল্যাণ তাঁর সৃষ্টির জন্য রেখেছেন। এসবের পেছনে স্রষ্টা যদি একজন না হয়ে অধিক হতো, তাহলে আবহমান কাল থেকে একই নিয়মে এসব চলতো না, ব্যতিক্রম অবশ্যই হতো।

সূর্যের আলোয় আলোকিত চাঁদ

চাঁদ পৃথিবীর নিকটতম মহাকাশীয় জ্যোতিষ্ক ও প্রাকৃতিক উপগ্রহ। এর ব্যাস প্রায় দুই হাজার মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ মাত্র। পৃথিবী হতে গড়ে প্রায় দু'লক্ষ ত্রিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে। পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে–

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا، وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا–

তোমরা কি দেখতে পাওনা, কিভাবে আল্লাহ সাত আকাশ বানিয়ে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখেছেন, কিভাবে এর মাঝে তিনি চাঁদকে আলো (গ্রহণকারী) ও সূর্যকে (আলোদানকারী) প্রদীপ বানিয়েছেন। (সূরা নূহ-১৫- ১৬)

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا–

কতো মহান সেই সত্তা, যিনি আকাশে অসংখ্য গম্বুজ বানিয়েছেন, এরই মাঝে তিনি সৃষ্টি করেছেন প্রদীপসম একটি সূর্য এবং একটি জ্যোতির্ময় চাঁদ। (সূরা ফুরকান-৬১)

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا–

সে মহান আল্লাহ সূর্যকে প্রখর তেজোদ্দীপ্ত করে বানিয়েছেন এবং চাঁদকে বানিয়েছেন জ্যোতির্ময়। (সূরা ইউনুস- ৫)

www.pathagar.com

আধুনিক বিজ্ঞান ঘোষণা করেছে, চাঁদের নিজস্ব আলো নেই, চাঁদ সূর্যের আলোয় আলোকিত। অথচ এ মহাসত্য সেই সপ্তম শতাব্দীতেই পবিত্র কোরআন মানব জাতির সম্মুখে পেশ করেছে। পবিত্র কোরআনে চাঁদকে 'সিরাজ, দিয়া, শাম্‌স বা ওয়াহ্‌হাজ' নামে অভিহিত করা হয়নি। কারণ এসব শব্দের যা অর্থ এবং যে গুণ-বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকলে ঐ শব্দসমূহ তার প্রতি প্রয়োগ হয়, তা চাঁদে নেই। এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে সূর্যের মধ্যে এবং এ কারণেই পবিত্র কোরআনে উক্ত শব্দসমূহ সূর্যের প্রতিই প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ সূর্য তার অভ্যন্তরীণ দাহ্য শক্তির দ্বারা প্রচন্ড তাপ এবং আলো সৃষ্টি করে।

অপরদিকে পবিত্র কোরআনে সূর্যকে 'ক্বমার, মুনীর বা নূর' শব্দে বিশেষিত করা হয়নি। কারণ যে গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকলে এ সকল শব্দ প্রয়োগ করা যাবে, তা সূর্যে নেই- চাঁদে রয়েছে। এ কারণেই এ সকল শব্দ চাঁদের পক্ষে প্রয়োগ হয়েছে। কারণ চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো, দাহ্য শক্তি বা তাপ নেই। চাঁদ সূর্যের আলোয় আলোকিত।

বর্তমান বিজ্ঞান আমাদের মানবসমাজ হতে বেশ কয়েকজনকে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করাতে বাস্তবভাবে সফল হয়েছে। সাথে সাথে চন্দ্রের সর্ববিষয়ে অনেক ছবি পৃথিবীর মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেছে। তাতে বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে, চাঁদে কোন বায়ুমণ্ডল নেই এবং সে কারণে চাঁদ নিজ দেহকে মহাজাগতিক পাথরখণ্ড বা গ্রহাণুদের সরাসরি আক্রমণ হতে রক্ষা করতে পারে না। সমগ্র চন্দ্রপৃষ্ঠটি মহাকাশীয় পাথর এবং ধূমকেতুর আঘাতজনিত ক্ষতচিহ্ন দিয়ে ভরপুর হয়ে রয়েছে। এ ক্ষতচিহ্নমূলক অধিকাংশ পুরানো গর্তগুলো গলিত লাভা দিয়ে প্রায় ভরে আছে। চাঁদের গঠন হচ্ছে কঠিন অমসৃণ মাটি ও পাথরস্তুপ দিয়ে। জলবায়ু না থাকায় ব্যাপকভাবে রুক্ষ ও বন্ধুর হয়ে পড়েছে।

বিজ্ঞান অবহিত করছে, যখন কোন পাথরখণ্ড বা গ্রহাণু মহাশূন্য হতে চাঁদের মধ্যাকর্ষণের কারণে তার পৃষ্ঠের দিকে সবেগে ছুটে আসতে থাকে তখন চাঁদের কোন বায়ুমণ্ডল না থাকায় এরা বিনা বাঁধায় এত প্রচণ্ড গতিতে চন্দ্রপৃষ্ঠে আঘাত হানে যে, পতিত স্থানে কল্পনাতীত ধাক্কায় Fusion পদ্ধতিতে পারমাণবিক বোমার মত ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ঘটে। ফলে ব্যাপক তাপের সৃষ্টি হওয়ায় পতিত স্থানে মুহূর্তেই বিরাট অগ্নিগোলকের সৃষ্টি হয়। অগ্নিগোলকের প্রচণ্ড তাপে চাঁদের শক্ত-কঠিন মাটি, পাথর সব গলে গিয়ে উত্তপ্ত লাভায় পরিণত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ-

সূর্য এবং চন্দ্র (মহান আল্লাহর) গণনায় নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। (সূরা রাহ্‌মান-৫)

www.pathagar.com

সৌরজগতের পঁচাশি ভাগই সূর্যের দখলে

বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির বিশ হাজার কোটি তারার মধ্যে একটি মধ্যম ধরনের তারা হলো সূর্য। এই সূর্যকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর সৌরজগৎ গড়ে উঠেছে। সৌরজগতে যতো কিছু রয়েছে তার নিরানব্বই দশমিক পঁচাশি ভাগই সূর্যের দখলে রয়েছে। এই সূর্যের থেকেও লক্ষ কোটি গুণ উজ্জ্বল আলো সম্পন্ন কোয়াসার ঊর্ধ্ব জগতে বিদ্যমান রয়েছে। মহাবিশ্বের পরিমাপে সূর্য অত্যন্ত নগণ্য প্রকৃতির নক্ষত্র যার উজ্জ্বলতাও অত্যন্ত নগণ্য। সূর্যের থেকেও পঞ্চাশ গুণ বড় এবং চল্লিশ লক্ষ গুণ উজ্জ্বল একটি নক্ষত্রের নাম বিজ্ঞানীগণ দিয়েছেন, 'ইটা ক্যারিনা'। মহাশূন্যে অসংখ্য গ্যালাক্সি রয়েছে এবং নিত্য নতুন গ্যালাক্সি সৃষ্টি হচ্ছে। এ ধরনের এক একটি গ্যালাক্সির ভেতরে সূর্যের থেকেও বিশাল আকৃতির অগণিত নক্ষত্র প্রবেশ করার পরও অসংখ্য জায়গা শূন্য রয়ে যাবে। সূর্যের চেয়ে বিশালাকৃতির আরেকটি তারকার নাম হলো 'বেটলজিয়ুজ'। এই বেটলজিয়ুজ নক্ষত্রের মধ্যে বর্তমান সূর্যের মতো পঞ্চাশ কোটি সূর্য অবস্থান করতে পারে।

এ ধরনের অসংখ্য নক্ষত্র আল্লাহ তা'য়ালা গ্যালাক্সির ভেতরে সৃষ্টি করে রেখেছেন। সূর্যের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ উজ্জ্বল তারকা ঊর্ধ্বাকাশে রয়েছে। এসব এক একটি তারকা একটির কাছ থেকে আরেকটি কত দূরে অবস্থিত? একটি তারকা থেকে আরেকটি তারকায় পৌঁছতে সহস্র সহস্র বিলিয়ন আলোকবর্ষের প্রয়োজন হবে। অথচ আলোর গতি হলো প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। পৃথিবী থেকে তের লক্ষ গুণ বড় হলো সূর্য, আর এ ধরনের পঞ্চাশ কোটি সূর্যের থেকেও বড় হলো বেটলজিয়ুজ তারকা। বিজ্ঞানীগণ বলেন, সূর্য মহাকাশে সেকেন্ডে ১৫০ মাইল গতিতে যাত্রা করে এবং ছায়াপথের কেন্দ্রের চতুর্দিকে কক্ষপথে সূর্যের একবার পূর্ণ পরিক্রমণ করতে প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। এই পরিক্রমণে চাঁদ, সূর্য বা অন্য কোনো গ্রহ-উপগ্রহ কেউ কারো কক্ষপথ পরিহার করে অন্যের পথে প্রবেশ করে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا، ذٰلِكَ تَقْدِرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ، لاَالشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَاَ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ–

সূর্য তার জন্যে নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট গণ্ডির মাঝে আবর্তন করে; এটা হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহরই সুনির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। চাঁদ, তার জন্যে আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্ধারণ করেছি, (কক্ষ পরিক্রমণের সময় ছোট হতে হতে তা এক সময়) এমন (ক্ষীণ) হয়ে পড়ে, যেন তা পুরনো খেজুরের একটি পাতলা ডাল। সূর্যের এ ক্ষমতা নেই যে সে চাঁদকে নাগালের মধ্যে পাবে- না রাত দিনকে অতিক্রম করে আগে চলে যেতে পারবে, (মূলত চাঁদ সুর্যসহ এরা প্রত্যেকেই শূন্যলোকে সাঁতার কেটে চলেছে। (সূরা ইয়াছিন- ৩৮- ৪০)

মহাকাশে সূর্যের পরিণতি

বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে সূর্য হলো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ২০ হাজার কোটি তারকার মধ্যে একটি মাঝারি মানের তারকা হলো সূর্য এবং এটাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই সৌরজগৎ। সৌরজগতে যতো বস্তু আছে তার ৯৯ দশমিক ৮৫ ভাগই রয়েছে সূর্যের দখলে। সৌরজগতের ভেতরের দিকের গ্রহগুলোকে বলা হয় ইনার প্লানেট এবং তুলনামূলকভাবে এরা আয়তনে ছোট। সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্র সূর্যের প্রভাব বলয় বিশাল এবং এই প্রভাব বলয়ভুক্ত অঞ্চলকে বলা হয়ে থাকে হেলিওস্ফেয়ার। আর এর সীমান্ত রেখাকে বলা হয় হোলিওপজ। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুসারে সূর্য থেকে হোলিওপজ-এর দুরত্ব ১শ' এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউানট বা জ্যোতির্বিদ্যা একক। ১ এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট সমান ১৫ কোটি কিলোমিটার বা ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। অর্থাৎ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকেই এক জ্যোতির্বিদ্যা একক বলা হয়।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কয়েকটি সর্পিল বাহু রয়েছে। তেমনই একটি বাহুতে আমাদের সৌরজগতের অবস্থান। সৌরজগৎ অবস্থান করছে মিল্কিওয়ের নিরক্ষীয় তল থেকে ২০ আলোকবর্ষ ওপরের দিকে। আর গ্যালাক্সি কেন্দ্র থেকে সৌরজগতের দুরত্ব ২৮ হাজার আলোকবর্ষ। সূর্য আকাশের বুকে জ্বলন্ত এক অগ্নিকুন্ড। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর ভেতরে দান করেছেন বিপুল শক্তি, বিশাল আয়তন আর তীব্র গতি। এ কারণে সূর্য লাভ করেছে এক মহাদানবীয় মর্যাদা। এই সূর্য ভয়ঙ্কর উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে অবিশ্রান্তভাবে আর সেই অগ্নিস্নানে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে বিশাল একটি জগৎ বিকাশ আর সমৃদ্ধির বিস্ময়কর সোপানে। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে সূর্য তাপের কারণেই পৃথিবীর সমস্ত কিছু সজীব রয়েছে। সূর্য মানেই জীবন ও সৃষ্টির উৎস। সূর্যহীনতায় এই সমৃদ্ধজগৎ পরিণত হবে প্রাণের স্পন্দনহীন এক মহাঅন্ধকার জগতে।

www.pathagar.com

মহাজগতের বিচারে সূর্য এক অতি তুচ্ছ একটি তারকা। কারণ এর থেকে কয়েক কোটি গুণ বিশালাকৃতির সূর্য আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন অন্যান্য গ্যালাক্সির ভেতরে এবং বর্তমান দৃশ্যমান সূর্যের মতো তিনকোটি সূর্যকে ঐসব সূর্য চুষে খেয়ে হজম করার ক্ষমতা রাখে। পৃথিবীর শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানব সভ্যতা বিকাশের জন্য যে শক্তি ব্যয় করা হয়েছে, বর্তমান সূর্য তার কক্ষপথে ঘুরতে প্রতি সেকেন্ডে সেই শক্তি ব্যয় করে থাকে। শুধু তাই নয়, এই জ্বলন্ত সূর্যের সম্মুখ ভাগ থেকে এক প্রকার জ্বালানি গ্যাস প্রতি সেকেন্ডে ষাট হাজার মাইল বেগে নির্গত হয়। এই গ্যাস যদি পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতো তাহলে সমগ্র পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যেত। প্রতি সেকেন্ডে ষাট হাজার মাইল বেগে যে গ্যাস বের হচ্ছে–কোন এক অদৃশ্য শক্তি ষাট হাজার মাইল বেগে সে গ্যাসকে আবার সূর্যের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে যেন সৃষ্টিজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সৌর জগতের মোট ভরের ৯৯. ৮৫ শতাংশই সূর্যের। সূর্যের ভর হলো আমাদের পৃথিবীর ভরের ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৮ শ' গুণ। আর সূর্যের ব্যাস হলো পৃথিবীর ব্যাসের ১০৯ গুণ অর্থাৎ ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার কিলোমিটার। সূর্য পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৫৮০০ ডিগ্রি কেলভিন এবং কেন্দ্রের তাপমাত্রা ১ কোটি ৫৬ লক্ষ কেলভিন। বিশাল সৌরজগতের মোট ভরের ৯৯ দশমিক ৮ শতাংশের বেশি ভর হচ্ছে সূর্যের। সূর্যের মোট ভরের ৭৫ শতাংশ হলো হাইড্রোজেন এবং বাকি ২৫ শতাংশ হিলিয়াম। সূর্যের মোট অণুর সংখ্যা হিসাব করলে এর ৯২ দশমিক ১ শতাংশ হলো হিলায়াম। হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ছাড়া আরেকটু ভারী পদার্থের পরিমাণ সূর্যে দশমিক ১ শতাংশ। সূর্য অবিরত মিল্কিওয়ের কেন্দ্রকে যেমন প্রদক্ষিণ করে চলেছে তেমনি নিজেও অবিরাম নিজ অক্ষে লাটিমের মতোই ঘুরছে।

প্রতি সেকেন্ডে সূর্য থেকে ৩৮৬ বিলিয়ন মেগাওয়াট শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে। এই পরিমাণ হাইড্রোজেন পুড়ে উৎপন্ন হয় ৬৯ কোটি ৫০ লক্ষ টন হিলিয়াম এবং গামারে'র আকারে ৫০ লক্ষ টন শক্তি। উৎপাদিত এই শক্তি কেন্দ্র ছেড়ে যতই বাইরে দিকে বেরিয়ে আসতে থাকে ততই সেই শক্তি মহান আল্লাহর কুদরতি ব্যবস্থার কারণে শোষিত হতে থাকে এবং তা থেকে বিকীর্ণ তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে। সূর্যের বাইরের দিককে বা পৃষ্ঠদেশকে বলে ফটোস্ফিয়ার। এই এলাকার তাপমাত্রা ৫ হাজার ৮ শ' কেলভিন। গ্যালাক্সি কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০, ০০০ আলোকবর্ষ দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সূর্য ছায়াপথের নিজস্ব সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার অর্থাৎ ১৫৬ মাইল বেগে ধাবিত হচ্ছে। সূর্যের এই প্রচন্ড গতিই তাকে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীগণ বলছেন, সূর্য তার সমস্ত হাইড্রোজেন জ্বালানি এক সময় শেষ করে ফেলবে এবং ক্রমশঃ তা শেষ হয়ে যাচ্ছে, সূর্যের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসছে। এক সময় তার গতি থাকবে না, তেজ থাকবে না, তখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে। হাইড্রোজেন জ্বালানি শেষ হয়ে গেলেই সূর্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে লাল দানবে (Red giant)। নক্ষত্রের বিলয় প্রক্রিয়ায় এই লাল দানবের অভ্যন্তরে জ্বালানি সংকট, অভিকর্ষ বলের প্রভাব তখন কার্যকর হবে ধ্বংস পতন ঘটিয়ে। এই ধ্বংস পতনের কেন্দ্রবিন্দুতে চাপজনিত কারণে পরিণামে সৃষ্টি হবে একটি সাদা বামন। শীতল, অনুজ্জ্বল, নির্জীব ও অত্যধিক ঘনত্বসম্পন্ন সূর্য সাদা বামনাকৃতি লাভ করবে, তখন তা মহাজাগতিক উচ্ছিষ্টে পরিণত হবে এবং তখনই সূর্য চিরতরে হারিয়ে যাবে মানুষের দৃষ্টির বাইরে।

এই অবস্থার দিকেই নির্দেশ করে আল্লাহর কোরআন বলছে, সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে অর্থাৎ সূর্যকে এমন অবস্থায় উপনীত করা হবে যে, তার আলো ও উত্তাপ বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সূর্যে আলো এবং উত্তাপ থাকবে না ফলে এই পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দনও থাকবে না, কোন উদ্ভিদ সৃষ্টি হবে না, নদী-সমুদ্রের পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে মেঘমালায় পরিণত হবে না, বৃষ্টি বর্ষণও হবে না। স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত সৃষ্টির অন্তিম দশা ঘনিয়ে আসবে। সূর্যের মতই অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র, নিহারিকা পুঞ্জের অভ্যন্তরে যে জ্বালানি শক্তি রয়েছে এবং যার কারণে তা উজ্জ্বল দেখায়, এসব জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এক সময় তা অন্ধকারের বিবরে হারিয়ে যাবে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে বর্তমানে যে যার অবস্থানে রয়েছে। সেদিন মাধ্যাকর্ষন শক্তিকে অকার্যকর করে দেয়া হবে। তখন সকল কিছুই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকবে।

মহাকাশে ব্লাকহোল

এসব তারকার থেকেও বিশাল দানব আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করে রেখেছেন। বিজ্ঞানীগণ সেগুলোর নাম দিয়েছেন 'ব্লাকহোল বা অন্ধকূপ'। এই ব্লাকহোল সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ–

শপথ সে পতন স্থানের, যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তোমরা যদি জানতে তা এক মহা গুরুত্বপূর্ণ শপথ। (সূরা ওয়াকিয়া-৭৫-৭৬)

এই ব্লাকহোল বা অন্ধকূপ এক অদৃশ্য দানবীয় শক্তি। নক্ষত্র তা যতো বড়ই হোক না কেন, পরিভ্রমণ করতে করতে তা এই ব্লাকহোলের রেঞ্জের মধ্যে বা আওতায় এসে

www.pathagar.com

গেলে, এমনভাবে শোষণ করে নেয় যে, তার আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ধরনের ব্লাকহোল মহাশূন্যে দু'একটি নয়, আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য ব্লাকহোল সৃষ্টি করেছেন। বিজ্ঞানীগণ বলেন, আমাদের এই পৃথিবী কোনভাবে যদি ব্লাকহোলের আওতায় এসে পড়ে, তাহলে মুহূর্তের ভেতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ব্লাকহোল এই বিশাল পৃথিবীকে সংকুচিত করে এমন এক ক্ষুদে পিন্ডে পরিণত করবে যে, এর ব্যাসার্ধ হবে মাত্র এক সেন্টিমিটার। এই সৌরজগতের আয়তনের সমান একটি ব্লাকহোল শত লক্ষ কোটি সূর্যকে মুহূর্তে সংকুচিত করে নিঃশেষ করে দিতে পারে।

মহাকাশে কোয়াসার

মহাকাশের রহস্যময় আবেগদীপ্ত জ্যোতিষ্কের নাম বিজ্ঞানীগণ দিয়েছেন 'কোয়াসার'। এই কেয়াসারের আলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সমস্ত নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা ম্লান করে দিয়েছে। অথচ সৌরজগতের সবচেয়ে কাছের কোয়াসার থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময়ের প্রয়োজন হয় দেড় শতকোটি বছর। আর দূরতম কোয়াসার থেকে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছতে সময়ের প্রয়োজন হবে এক হাজার কোটি বছর। বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেছেন, বর্তমান পৃথিবীর বয়স হলো চারশত ষাট কোটি বছর। তাহলে দূরতম কোয়াসার পৃথিবীতে পৌঁছবে আরো পাঁচশত কোটি বছর পরে। এই বিশাল ও উজ্জ্বল আলো সম্পন্ন কোয়াসারের সংখ্যা মহাকাশে অগণিত। এক একটি ধুমকেতুর কাছে ঐ বিশালাকের সূর্য ছোট্ট একটি বালুকণার মতো। সৃষ্টির শুরু থেকে এসব বিশাল আকৃতির জগৎ সেকেন্ডে শতকোটি কিলোমিটার গতিতে বিরামহীনভাবে একদিকে ছুটে চলেছে। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে ছুটতেই থাকবে, ধ্বংস না পর্যন্ত তা চলতে থাকবে। তবুও তা গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। মহান আল্লাহ অসংখ্য সৃষ্টিজগতের রব। শুধুমাত্র তিনি মহাকাশেই কত বিশাল জায়গা সৃষ্টি করেছেন, তা কল্পনাও করা যায় না।

আদিতে আকাশ ও পৃথিবী সংযুক্ত ছিল

বিজ্ঞানীদের ধারণানুসারে আমাদের এ মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ হতে প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পূর্বে প্রচণ্ড ঘনায়নকৃত এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে ঈধথ ঈটভথ নামক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ–

অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (একে অপরের সাথে) পরস্পর সংযুক্ত ছিল, পরে আমি তাদের পৃথক করে দিয়েছি এবং প্রতিটি জীবন্ত জিনিসকে আমি সৃষ্টি করেছি পানি হতে। তারপরও কি তারা বিশ্বাস করবে না? (সূরা আম্বিয়া- ৩০)

Big Bang বিন্দু হতে পর্যায়ক্রমে ৪টি ধাপ অতিক্রম করার পর 'শক্তি' পদার্থ কণার ধুঁয়ার অস্তিত্ব লাভ করে এবং মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে গুচ্ছ গুচ্ছভাবে বিভক্ত হয়ে নবীন মহাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যা পরবর্তীতে 'নেবুলা' নামে পরিচিতি লাভ করে। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ-

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আসো-ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা এলাম অনুগত হয়ে। (হা-মীম সাজদা-১১)

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন-

هُوَالَّذِىْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ-

তিনিই (আল্লাহ) তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান। (সূরা মু'মিন-১৩)

শত-সহস্র লক্ষ মাইল ব্যাসের নক্ষত্রসমূহ মহাকাশে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উত্তপ্ত ধূলা-বালি, অগ্নিশিখা ও মৌলিক পদার্থের গলিত মিশ্রণ দিয়ে শত-শত আলোকবর্ষ এলাকা পরিপূর্ণ করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। বর্তমান বিজ্ঞান এ ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিবেশ জয় করার জ্ঞান এখনও লাভ করতে পারেনি।

বহুমাত্রিক জগতের ধারণা

সাধারণতঃ মানুষ এই পৃথিবীকেই প্রথম ও শেষস্থল বলে জানতো। এরপর মানুষ ধারণা লাভ করলো মানুষের জীবনাবসানের পরে পরলোক বলে আরেকটি জগৎ রয়েছে। কোরআনে বর্ণিত বহুমাত্রিক জগতের ধারণা পেয়ে চিন্তাশীল মানুষ যখন গবেষণা করেছে তখন তারা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত 'আলামীন' শব্দের রহস্য উদ্ঘাটন করতে কিছুটা সমর্থ হয়েছে। সূরা ফাতিহা আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে ঘোষণা করেছে, তিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন

www.pathagar.com

জাগে, আমরা চোখের সামনে জগৎ দেখছি মাত্র একটি এবং পৃথিবী নামক এই জগতে আমরা বসবাস করছি। অন্য জগতগুলো কোথায়? সাধারণভাবে চিন্তা করলেই কোরআনে বর্ণিত বহুমাত্রিক জগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

মহাশূন্যে কতটি জগৎ রয়েছে, সে আলোচনা মুলতবী রেখে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের নীচে আরেকটি জগৎ বিদ্যমান। মাটির নানা স্তর সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ তা'য়ালা। অসংখ্য খনিজজগৎ মাটির নীচে সৃষ্টি করেছেন। খনিজ পদার্থসমূহ মাটির নীচের জগতেই অবস্থান করছে। পানির জগৎ রয়েছে মাটির নীচে। মাটির নীচে এমন ধরনের জগৎ বিদ্যমান রয়েছে যে, প্রতিটি মুহূর্তে সেখানে গলিত উত্তপ্ত লাভা আলোড়িত হচ্ছে। মাঝে মাঝে তা জ্বালামুখ দীর্ণ করে পৃথিবীতে এসে আঘাত হানছে। কোথাও রয়েছে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি। ফুটন্ত প্রসবণ, ঝর্ণার আকারে তা নির্গত হয়ে থাকে।

সমুদ্র গর্ভে রয়েছে আরেকটি জগৎ। অগণিত প্রাণী সেখানে বসবাস করছে। সমুদ্রের অতল তলদেশে রয়েছে উদ্ভিদজগৎ। এরও নীচে রয়েছে উত্তপ্ত লাভার জগৎ। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠে রয়েছে মরুজগৎ, অরণ্যজগৎ, পশুজগৎ। দৃশ্যমান জগতেরই কোন শেষ সীমা নেই, এরপরেও রয়েছে অদৃশ্যজগৎ। পরমাণু জগতও সম্পূর্ণ একটি অদৃশ্যজগৎ। পরমাণু বা এ্যাটম–একে আমরা কোন কিছুর সাহায্য ব্যতীত দেখতে সক্ষম নই। এটা কেন দেখা যায় না এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে প্রথমে দেখতে হবে আমাদের দেখার বা চোখের ক্ষমতা কতটুকু।

যখন আমরা কোন বস্তুকে দর্শন করি, তখন ঐ বস্তু থেকে আলোক তরঙ্গ ছড়িয়ে পরে এবং তা আমাদের চোখের ভেতরে প্রবেশ করে। আলোক তরঙ্গের বিচ্ছুরণ ব্যতীত কোন কিছুই আমরা দেখতে পাই না। যখন কোন আলোক তরঙ্গ কোন জিনিসের ওপরে পতিত হয়ে বস্তুকে সর্ম্পূণরূপে আবৃত করে ফেলে তখন আলোক তরঙ্গ আর ঐ বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত হতে পারে না। সুতরাং, কোন বস্তু থেকে আলোক তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হবার শর্ত হলো, বস্তুতে পতিত আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বড় হতে হবে।

এবার আসা যাক পরমাণু সম্পর্কিত ব্যাপারে। পরমাণু দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক ছোট। এ কারণে আলোক তরঙ্গ যখন তার ওপর পতিত হয় তখন তা সম্পূর্ণ পরমাণুকে পরিপূর্ণভাবে আবৃত করে ফেলে। যে কারণে আর তা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে পারে না। এই কারণেই আমরা পরমাণু খালি চোখে দেখতে পাই না।

www.pathagar.com

এভাবে যদি কয়েক লক্ষ পরমাণু মানুষের চোখের সামনে রাখা হয়, তবুও তা মানুষের দৃষ্টি দেখতে সক্ষম হবে না। মানুষের দৃষ্টি যা দেখতে সম্পূর্ণ অক্ষম অথচ এই পরমাণুরে ভেতরে আল্লাহ্ তা'য়ালা আরেকটি শক্তিশালী জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই জগতকেই বলা হয় পরমাণু জগৎ। মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু ভাঙলে পাওয়া যায় ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, নিউক্লী, কোয়ার্ক এবং আরো কত কিছু। এ ধরনের বহু অণুকণা ও প্রতিকণা অদৃশ্য জগতে বিরাজ করছে। স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে এসব কণা দর্শন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভারী মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরাম নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হচ্ছে। এসব রশ্মি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং উচ্চ ভেদন শক্তি সম্পন্ন; এসব নিউক্লিয়াসকে ভেঙে প্রতি মুহূর্তে নির্গত হয়। এ ধরনের আরো অদৃশ্য রশ্মি সৃষ্টি জগতে বিদ্যমান এবং যা খালি চোখে দেখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অদৃশ্যজগতে এমন অনেক ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী রয়েছে যেগুলো মানুষের পরিবেশকে বেষ্টন করে আছে। এসব এককোষী প্রাণীর মধ্যে কোন একটির অভাব ঘটলে পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হবে, ফলশ্রুতিতে মানুষের জীবন বিপন্ন হবে।

বর্তমান বিজ্ঞান বলছে, মানুষ যে সৌরজগতে বসবাস করছে এবং তার দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান যে জগত বিদ্যমান এটাই শেষ নয়। এ ধরনের অসংখ্য সৌরজগৎ মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর প্রতি চার বিলিয়ন মানুষ যদি একটি করে সৌরজগতে অবস্থান করে, এরপরেও সহস্র বিলিয়িন তথা অসংখ্য সৌরজগৎ ফাঁকা থেকে যাবে। এত সৌরজগৎ মহান আল্লাহ্ মহাশূন্যে সৃষ্টি করেছেন। মহাশূন্য যে কত বিশাল তা কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে আবিষ্কার করা তো দূরের কথা, এর বিশালতা সম্পর্কে কল্পনাও করতে পারেনি। মহাশূন্যে রয়েছে অসংখ্য চন্দ্র, সূর্য, তারকাপুঞ্জ, গ্রহ-উপগ্রহ, মিল্কীওয়ে,, গ্যালাক্সী এবং ব্লাকহোল। এসবের পরিধি এবং বিশালতা দেখে বিজ্ঞানীগণ স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা যে বিশলতা দিয়ে মহাশূন্য নির্মাণ করেছেন সে তুলনায় এই পৃথিবী একটি ছোট্ট মার্বেলের সমানও নয়। মহাজগতের বিবেচনায় বর্তমানে মানুষ যেখানে অবস্থান করছে, এই সৌরজগতটি নিতান্তই ক্ষুদ এবং অতি তুচ্ছ একটি অঞ্চল। বিশাল মহাসমুদ্রে একবিন্দু পানি যেমন, মহাবিশ্বে এই সৌরজগতের অবস্থান ঠিক তেমনি। স্বয়ং পৃথিবীর অবস্থা যদি ছোট্ট একটি মার্বেলের মতো হয় তাহলে ক্ষমতাদর্পী এই মানুষের অবস্থান কোথায়? মহাশূন্যের তুলনায় মানুষ ক্ষুদ্র একটি পিপীলিকার মতও নয়। অতএব অস্তিত্বহীন শক্তি আর ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ জীবনের অধিকারী হয়ে মানুষের পক্ষে স্বয়ং আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা চরম

www.pathagar.com

বোকামী বৈ আর কিছুই নয়। এ জন্য পৃথিবীর বর্তমানে যারা বিখ্যাত বিজ্ঞানী তারা নাস্তিক্যবাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন। মহাশূন্যের সৃষ্টিসমূহ আর বিশালতা দর্শন করে তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

দিন-রাতের আবর্তন ও বিবর্তন

আল্লাহর কোরআন ঘোষণা করছে–

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَاهُمْ مُّظْلِمُوْنَ، وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا، ذٰلِكَ تَقْدِرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ، لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ –

এদের জন্য রাত হচ্ছে আরেকটি নিদর্শন। আমি তার ওপর থেকে দিনকে সরিয়ে দেই তখন এদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়। আর সূর্য, সে তার নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে ধেয়ে চলছে। এটি প্রবল পরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার নিয়ন্তিত হিসাব। আর চাঁদ, তার জন্য আমি মন্‌যিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, সেগুলো অতিক্রম করে সে শেষ পর্যন্ত আবার খেজুরের শূকনো শাখার মতো হয়ে যায়। না সূর্যের ক্ষমতা রয়েছে চাঁদকে অতিক্রম করে এবং রাতের ক্ষমতা রয়েছে দিনকে অতিক্রম করতে পারে, এসব কিছুই একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে সন্তরণ করছে। (সূরা ইয়াছিন-৩৭-৪০)

পৃথিবীর সামনে থেকে সূর্যের সরে না যাওয়া পর্যন্ত কখনো দিবাবসান ও রাতের আগমন ঘটতে পারে না। দিবাবসান ও রাতের আগমনের মধ্যে যে চরম নিয়মানুবর্তিতা পাওয়া যায় তা সূর্য ও পৃথিবীকে একই অপরিবর্তনশীল বিধানের আওতায় আবদ্ধ না রেখে সম্ভবপর ছিল না। তারপর এ রাত ও দিনের আসা-যাওয়ার যে গভীর সম্পর্ক পৃথিবীর সৃষ্ট প্রাণীকুলের সাথে পরিলক্ষিত হয় তা স্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, চরম বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা সহকারে কোন বিজ্ঞ স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির কল্যাণের লক্ষ্যে অনুগ্রহ করে এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই পৃথিবী পৃষ্ঠে মানুষ, প্রাণীকুল ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব, পানি ও বাতাসের অস্তিত্ব এবং নানা ধরনের খনিজ সম্পদের অস্তিত্বও প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীকে সূর্য থেকে একটি বিশেষ দূরত্বে অবস্থান করানোর এবং তারপর পৃথিবীর নানা অংশের একটি ধারাবাহিকতা সহকারে নির্ধারিত বিরতির পর সূর্যের সামনে আসার এবং তার সামনে থেকে সরে যেতে থাকার ফসল।

www.pathagar.com

যদি পৃথিবীর দূরত্ব সূর্য থেকে একটু কম বা বেশী হতো অথবা তার এক অংশে প্রতি মুহূর্তে রাত ও অন্য অংশে দিন অবস্থান করতো অথবা দিন-রাতের পরিবর্তন অত্যন্ত দ্রুত বা খুবই কম গতিসম্পন্ন হতো অথবা নিয়ম অনুসারে না ঘটে হঠাৎ কখনো দিন বা রাতের আগমন ঘটতো, তাহলে পৃথিবী কোন প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হতো না। শুধু তাই নয় বরং এ অবস্থা যদি হতো তাহলে পৃথিবীর নিষ্প্রাণ জড় পদার্থসমূহের বর্তমান আকৃতি থেকে ভিন্ন আকৃতির হতো।

এসব দেখে কোন মানুষ যদি একেবারে মূর্খ না হয় এবং অন্তরের চোখ বন্ধ করে না রাখে, তাহলে সে মানুষ এসব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার মধ্যে এমন এক আল্লাহর কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে, যিনি এই পৃথিবীর বুকে এই বিশেষ ধরনের সৃষ্ট প্রাণী জগতকে অস্তিত্ব দান করার ইচ্ছে করেন এবং সৃষ্টির যথাযথ প্রয়োজন অনুসারে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে এক অদৃশ্য বন্ধন স্থাপন করেন। মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব তথা তাওহীদ যারা মানতে অস্বীকার করে তারা এ কথা বলুক যে, সৃষ্টিজগতের এই বৈজ্ঞানিক পন্থাসমূহ কয়েকজন স্রষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট করা অথবা কোন অন্ধ ও বধির প্রাকৃতিক আইনের আওতায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব কিছু সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা কতটা মূর্খতার পরিচয় বহন করে?

রাত ও দিনের নিয়মতান্ত্রিকভাবে আগমনের অর্থ পৃথিবী ও সূর্যের ওপর একই আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্য চলছে, এখানে অন্য কারো আধিপত্য বিস্তারের সামান্যতম সুযোগ নেই। রাত আর দিনের ঘুরে ফিরে আসা এবং পৃথিবীর আর সমস্ত সৃষ্টির জন্য তা উপকারী হওয়া এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, একমাত্র আল্লাহই এসব জিনিসের স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক। তিনি তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ করে এমনভাবে এই ব্যবস্থা চালু করেছেন যেন তাঁর সৃষ্টির জন্য সমস্ত কিছুই কল্যাণকর হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ، اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ–

আল্লাহই তো সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা রাতের পরিবেশে আরাম করতে পারো। আর দিনকে আলোকিত করেছেন। সত্য এই যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পাশীল। তবে অধিকাংশ লোক শুকরিয়া আদায় করে না। (সূরা আল মু'মিন-৬১)

www.pathagar.com

ভূগোল সম্পর্কে যাদের সাধারণ জ্ঞান রয়েছে তারাও এ কথা জানে যে, পৃথিবী নামক এই গ্রহের দুটো গতি রয়েছে এবং তার একটি নাম হলো আহ্নিক গতি ও অপরটির নাম হলো বার্ষিক গতি। বিজ্ঞানীগণ বলছেন, সূর্যকে কেন্দ্র করে আমাদের এই পৃথিবী ৩৬৫ দিনে একবার ঘুরে আসে। আহ্নিক গতির কারণে পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর ঘুরছে এবং এ কারণে দিন রাতের আবর্তন ও বিবর্তন হচ্ছে। এই কক্ষগতির সাথে অক্ষগতির একটা সুসামঞ্জস্য রয়েছে বলেই দিন, রাত ও ঋতুর আবর্তন হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অক্ষগতির সঠিক কারণ কি এবং তার উৎস কোথায় ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান শুধুমাত্র অনুমানলব্ধ। সম্প্রসারণশীল এই মহাবিশ্বের শাসনে বার্ষিক গতির পাশাপাশি দিন রাত আবর্তনকারী এই আহ্নিক গতি একটি মহাবিস্ময়কর বিষয়।

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ–

আমি আমার নিজস্ব ক্ষমতা বলেই এই আকাশ সৃষ্টি করেছি, অবশ্যই আমি মহান ক্ষমতাশালী। (সূরা যারিয়াত-৪৭)

এই আয়াতে ব্যবহৃত 'মুছিউন' শব্দের অর্থ, বিশালতা ও বিস্তৃতি দানকারী, ধনীগণ, বিত্তশালীগণ, প্রচন্ড ক্ষমতাধর, শক্তির নিরিখে কোন কিছুর সম্প্রসারণ বা বৃদ্ধি ঘটানো ইত্যাদি হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে এখানে আকাশমন্ডলের প্রসঙ্গে উক্ত শব্দের অর্থ দাঁড়াবে বিস্তৃতি ও বিশালতা দানকারী। সুতরাং এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুর থেকেই সম্প্রসারিত হচ্ছে বর্তমানেও সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং অনন্ত কাল ধরে সম্প্রসারিত হতেই থাকবে। যখন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে, তখনই ঘটবে মহাপ্রলয়। মহাবিশ্বে যদি সম্প্রসারণ গতি না থাকতো, তাহলে মহাবিশ্বের কোন বস্তুরই বিকাশ ঘটতো না এবং যে গতিতে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে, সে গতি সামান্য কম বা বেশী হলে মহাবিপর্যয় ঘটতো, মহাবিশ্বের অস্তিত্বই থাকতো না।

মহাবিশ্ব কি নিয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে? এ প্রশ্নের পরিপূর্ণ উত্তর মানুষের জানা নেই। বিজ্ঞানীগণ এ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে যতটুকু জানতে পেরেছেন, তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, আমরা খালি চোখে এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের যে অবস্থা দেখতে পাই, এর থেকে কয়েক শত কোটিগুণ বিশাল হলো এই মহাবিশ্ব। মানুষ ধারণা করতো রাতের দৃশ্য অসীম আকাশই হলো মহাবিশ্ব জগৎ। কিন্তু মাত্র কিছুদিন

www.pathagar.com

পূর্বে বিজ্ঞানীগণ দেখতে পেলেন, দৃশ্য জগতের অগণিত অযুত নক্ষত্রমালা শুধুমাত্র একটি গ্যালাক্সি যা পৃথিবীর ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ দৃশ্যমান মহাবিশ্বের মানে হলো দৃশ্যমান নিকটতম প্রতিবেশী, যা আমাদের থেকে প্রায় ২২ লক্ষ আলোক বর্ষ দূরের আর বিপুল বিরাট জগৎ, নক্ষত্র ধারণ ক্ষমতায় যা ছায়াপথের তিনগুণ এবং বিশাল জগতটিও লক্ষ কোটি আলোক বর্ষ দূর-দূরান্তে অবস্থিত একশত কোটির মধ্যে একটি সামান্য গ্যালাক্সি মাত্র। এই আলোক বর্ষের হিসাবটি কি! আমাদের জানা আছে যে, আলো প্রতি মুহূর্তে ১, ৮৬, ০০০ মাইল বেগে ধাবিত হয়ে থাকে।

অর্থাৎ আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল তথা আলো প্রতি সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। সুতরাং আলোর এক মিনিটে অতিক্রমযোগ্য দূরত্ব হলো তার ৬০ গুণ। তাহলে ঘন্টায় বৃদ্ধি পায় আরো ৬০ গুণ। দিনে বৃদ্ধি পায় আরো ২৪ গুণ। বছরে বৃদ্ধি পায় ৩৬৫, ২৫ গুণ। যার দূরত্বের দৈর্ঘ্য হলো কমবেশী ৫, ৮৬৯, ৭১৩, ৬০০, ০০০ মাইল। এর নাম হলো আলোক বর্ষ আর এই হিসাবে পৃথিবী যে গ্যালাক্সিতে রয়েছে তার ব্যাস হলো ১০০, ০০০ গুণ বা ৫৮৬, ৯৭১, ৩৬০, ০০০, ০০০, ০০০ মাইল-যা ভাষার তুলিতে প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য। এটা হলো সেই গ্যালাক্সির মাপ বলেছেন বিজ্ঞানীরা, যেটায় এই পৃথিবী অবস্থান করছে। আর এর থেকে কয়েক কোটি গুণে বড় গ্যালাক্সি রয়েছে উর্ধ্ব আকাশে এবং এ ধরনের অতিকায় গ্যালাক্সির সংখ্যা যে কত কোটি, তা বিজ্ঞানীরা আজো জানে না।

আর এসব গ্যালাক্সি একটির থেকে আরেকটি ১৬০, ০০০ থেকে ১০, ০০০, ০০০, ০০০ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থান করছে এবং যার যার দূরত্ব ঠিক রেখে প্রতি সেকেন্ডে আলোর গতিতে ধাবিত হচ্ছে। এই পৃথিবী যে গ্যালাক্সি গুচ্ছে অবস্থান করছে বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে এই গ্যালাক্সির সংখ্যা হলো মাত্র ২০টি। আর পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা যেসব বিশাল গ্যালাক্সি আবিষ্কার করেছেন, সেসব গ্যালাক্সি মহাবিশ্বের মহাশূন্যতার মহাসমুদ্রে এক একটি বিশাল জগৎ, যে জগৎ সম্পর্কে মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। এসব গ্যালাক্সি বিপুল বিস্তৃতি নিয়ে ব্যাপ্ত রয়েছে। এসব গ্যালাক্সির সামনে আমাদের দৃশ্যমান এই বিশাল জগৎ ক্ষুদ্র একটি বালু কণার সমানও নয়। পৃথিবীর ছায়াপথ বা মিল্কীওয়ে এক অতি সাধারণ দীন হীন গ্যালাক্সি, অনন্ত ঐ মহাবিশ্বে যার কোন উল্লেখযোগ্য স্থান নেই।

বর্তমানের বিজ্ঞানীরা এই পৃথিবী থেকে উর্ধ্ব আকাশের মাত্র ১০, ০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরের কোয়াসারকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ ১০, ০০০ মিলিয়ন আলোক বছর দূরত্বের ওপারে ঐ মহাশূন্যে আরো কত বিশাল জগৎ যে রয়েছে, এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোন ধারণাই নেই। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এতদিন

www.pathagar.com

মানুষ যাকে বিশ্বজগৎ বলে মনে করেছে, এই বিশ্বজগতের সমান এবং এর থেকে কয়েক কোটি গুণে বিশাল জগতের সংখ্যা ঐ মহাশূন্যে ১০০ কোটির বেশী। তারা বলছেন, ঐ এক একটি জগতের মধ্যে রয়েছে কল্পনার অতীত অগণিত বিশাল ছায়াপথ, এসব ছায়াপথে রয়েছে অকল্পনীয় সংখ্যক সূর্য, তারকা, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি।

এসব কিছুই সৃষ্টির শুরু থেকেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই পৃথিবী এবং গ্যালাক্সি কেন্দ্রের মাঝে অবস্থিত বাহু প্রতি মুহূর্তে ৫৩ কিলোমিটার বেগে এবং বিপরীত বাহু প্রতি সেকেন্ডে ১৩৫ কিলোমিটার বেগে সম্প্রসারিত হচ্ছে। একই পদ্ধতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে ২০০০ আলোক বর্ষ ব্যাসের গ্যালাক্সি কেন্দ্রও প্রতি সেকেন্ডে ৪০ কিলোমিটার গতিতে। আর এই সম্প্রসারণ নীতি গ্যালাক্সির ভেতরে, বাইরে ও গ্যালাক্সিসমূহের মধ্যে সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য। একটি গ্যালাক্সি থেকে আরেকটি গ্যালাক্সির দূরত্ব শত কোটি আলোক বর্ষ এবং এই দূরত্বের মাঝে রয়েছে আরো অগণিত বস্তু। কোন কোন গ্যালাক্সি আলোর গতিতে এক অজানা পথে সৃষ্টির শুরু থেকেই ছুটে চলেছে। মানুষ বিজ্ঞানীরা ১১, ০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষের ওপারে কোন গ্যালাক্সি চলে গেলে আর দেখতে পান না।

এর পরিষ্কার অর্থ হলো, প্রতি মুহূর্তে কত শতকোটি গ্যালাক্সি কোথায় কোন দূর অজানায় হারিয়ে গিয়েছে, তার সন্ধান একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। ১১, ০০০ মিলিয়ন দূরের গ্যালাক্সির সন্ধান বিজ্ঞানীদের জানা নেই এবং এই দূরত্বের পরে আর কি রয়েছে, তাও তাদের জানা নেই। আর এসবের কত ওপরে যে আকাশ রয়েছে, তা বিজ্ঞানীরা কল্পনাও করতে সক্ষম নয়। সুতরাং আকাশ সম্পর্কে তারা কিভাবে ধারণা দেবে! মহাকাশের এতকিছু নিয়ে গোটা মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে এ অবস্থায় যখন তা শেষ সীমানায় পৌঁছে যাবে, তখন ঐ মহাকাশ বেলুনের মতই ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

ছোট্ট একটি কথায় এই মহাবিশ্বের আকৃতি তুলনা করা যায় এভাবে যে, বিজ্ঞানীগণ এই পৃথিবী ও পৃথিবী থেকে মহাশূন্যের দিকে ১১, ০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরের যে মহাবিশ্বের সন্ধান পেয়েছেন, তা গোটা বিশ্বের সমস্ত বালু কণার তুলনায় একটি মাত্র বালুকণার সমান। সমস্ত কিছুই এক অবিশ্বাস্য গতিতে এক অজানা পথে কৃষ্ণ গহ্বরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীবাসীকে জানিয়েছেন, আকাশমন্ডল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে-সেদিকেই মহাবিশ্ব ধাবমান। অথচ এই একই কথা মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনে জানিয়েছেন।

www.pathagar.com

কিয়ামতের দিন সেদিন তারকাসমূহ এলোমেলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। কিভাবে তা পড়বে, বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু পরস্পরকে তীব্র গতিতে আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। এই আকর্ষণী শক্তিকে বিজ্ঞানীগণ বলেছেন (Gravitational Force) বা মহাকর্ষীয় শক্তি। সৌর জগতের সমস্ত গ্রহ সূর্যের আকর্ষণে আবর্তিত হয়ে থাকে আবার উপগ্রহগুলো গ্রহের আকর্ষণে আবর্তিত হয়। গ্রহাণুপুঞ্জ সূর্যের চারদিকে দলবদ্ধভাবে পরিক্রমণ করে। এভাবে একক গ্যালাক্সি গুচ্ছ গ্যালাক্সির আকর্ষণে আবর্তিত হয়। এভাবে করে প্রতিটি বস্তুই একে অপরের সাথে মিলিত হতে আগ্রহী। পক্ষান্তরে এই মিলন ঘটতে না পারার কারণ হলো মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি (Force of Expansion.)। এই গতির ফলেই পরস্পরের মধ্যে Space সৃষ্টি হয় এবং দূরত্ব বৃদ্ধি পায়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সম্প্রসারণ গতি একদিন হরণ করবেন। বিজ্ঞানীগণও বলছেন, সম্প্রসারণ গতি ক্রমান্বয়ে থেমে যাবে। তখন মহাকর্ষীয় আকর্ষণে গ্রহ, উপগ্রহ, গ্যালাক্সি গুচ্ছ, নক্ষত্রপুঞ্জ পরস্পরের কাছে তাদের অকল্পনীয় গতি নিয়ে। ফলে একটির সাথে আরেকটির মহাসংঘর্ষ ঘটবে। তখন সমস্ত নক্ষত্রগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে। মহাকর্ষ শক্তি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ (Expansion) স্তব্ধ করে দেবে মহাজাগতিক পদার্থের ঘনত্ব সৃষ্টি করে। মহাজাগতিক পদার্থের ঘনত্ব এক সময় এত অধিক বৃদ্ধি লাভ করবে যে, তখন মহাকর্ষ শাক্তি অধিক পরিমাণে শক্তিশালী হবে। ফলে মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ করে মহাসংকোচের দিকে নিয়ে যাবে। এই অবস্থাকে বিজ্ঞানীগণ বলেছেন Big Crunch.

অর্থাৎ আল্লাহর কোরআনের সূরা দুখানে যেমন বলা হয়েছে, আদিতে সমস্ত কিছুই একটি বিন্দুতে ধূমায়িত ছিল এবং আল্লাহ তা'য়ালা তা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করেছেন, তেমনি Big Crunch-এর মাধ্যমে পুনরায় মহাবিশ্ব একটি বিন্দুতে এসে বিস্ফোরিত হবে। বিজ্ঞানীগণ বলছেন, মহাকাশে নতুন নতুন নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, কোয়াসার ইত্যাদি সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই কারণে মহাজাগতিক গড় ঘনত্ব প্রভাবিত হচ্ছে। আবার মহাবিশ্বের প্রতিটি পরমাণুর ভেতর ১০ কোটি Neutrino রয়েছে। এর পরিমাণও বিশাল ভরে সমৃদ্ধ এবং তাদের মোট ওজন মহাবিশ্ব closed করার জন্য যথেষ্ট।

এ ছাড়া বিপুল পরিমাণ মহাজাগতিক ধূলি (Cosmic Dust) মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব বৃদ্ধি করছে। যেমন প্রতি বছর ১০ হাজার টন ধূলি কণা শুধু পৃথিবী গ্রহে পতিত হয়। এরপরে রয়েছে মহাকাশে রয়েছে কৃষ্ণ বিবর (Black Hole)। বিজ্ঞানীদের ধারণা

www.pathagar.com

মহাকর্ষের আকর্ষণে নক্ষত্রগুলো পরস্পরের কাছাকাছি হলেই সংঘর্ষ হয় তখন Black Hole-এর সৃষ্টি হয়। কিয়ামতের দিন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং মহাশূন্যের সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, গ্যালাক্সি গুচ্ছ, নক্ষত্রমন্ডলী তীব্র আকর্ষের কারণে একে অপরের দিকে আলোর গতিতে ছুটে আসতে থাকবে। তখন একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটবে এবং তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকবে।

সম্প্রসারণশীল মহাজগৎ

কোরআন বলেছে, এই জগতের একদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে-বিজ্ঞান এ কথার স্বীকৃতি দানে বাধ্য হয়েছে। কোরআন বলেছে, এই সৃষ্টিজগৎ ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে-বিজ্ঞান অনেক জল ঘোলা করে তারপর এ কথার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে যে, সত্যই-মহাশূন্যে সমস্ত কিছু সম্প্রসারিত হচ্ছে। একটি গ্যালাক্সি আরেকটি গ্যালাক্সির কাছ থেকে প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার বেগে অজানার পথে সৃষ্টির সেই শুরু থেকেই ছুটে চলেছে। কোথায় যে এর পরিসমাপ্তি-তা বিজ্ঞান অনুমান করতে যেমন পারছে না, তেমনি অনুমান করতে পারছে না, মহাশূন্য কতটা বিশাল। এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার একদিন সমাপ্তি ঘটবে, তখন শুরু হবে আবার সংকোচন প্রক্রিয়া। মহাশূন্যে সমস্ত কিছুই যে ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ-

আমি আকাশ মন্ডলীকে নিজস্ব শক্তিবলে সৃষ্টি করেছি আর একে আমি সম্প্রসারিত করছি। (সূরা যারিয়াত-৪৭)

সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ একসাথে অনেকগুলো গ্যালাক্সির ওপরে গবেষণা করে দেখেছেন যে, সম্প্রসারণের ধরণটা কেমন। তারা দেখতে পেয়েছেন যে, সম্প্রসারণের ধরণটি একটি অন্যটির সমান্তরাল নয়। তারা ধারণা করেন, একটি গ্যালাক্সি অন্য আরেকটি গ্যালাক্সি অথবা একাধিক গ্যালাক্সি ক্রমশঃ দূরত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। বিষয়টিকে তারা সহজবোধ্য করার জন্য বেলুনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বেলুনে বাতাস দিতে থাকলে তা যেমন ক্রমশঃ ফুলতেই থাকে, তারপর এক সময় ফেটে যায় এবং রাবারের টুকরোগুলো চারদিকে ছিটকে পড়ে। বেলুন ফুলতে থাকাবস্থায় তার ভেতরের স্থান যেমন সম্প্রসারিত হতে থাকে, তেমনি এই মহাশূন্য সম্প্রসারিত হচ্ছে। নক্ষত্রসমূহ কোনো গ্যালাক্সি ব্যবস্থার পরিমন্ডলে সম্প্রসারিত হচ্ছে, তেমনি এই মহাবিশ্ব প্রতি মুহূর্তে প্রবল গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

পৃথিবী এবং গ্যালাক্সী কেন্দ্রের মাঝে অবস্থিত বাহুটি প্রতি সেকেন্ডে তিপ্পান্ন কিলোমিটার বেগে এবং তার বিপরীত বাহুটি প্রতি সেকেন্ডে একশত পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার বেগে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কোন গ্যালাক্সি সেকেন্ডে পঁয়তাল্লিশ হাজার মাইল বেগে, কোনটি সেকেন্ডে নব্বই হাজার মাইল বেগে আবার কোনটি সেকেন্ডে আলোর গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

গ্যালাক্সিসমূহের পশ্চাদপসরণ

সৃষ্টির আদি থেকেই এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলছে। কোথায় যে এরা ছুটে যাচ্ছে, তা বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করতে সমর্থ হননি। এই গ্যালাক্সিগুলো একটি আরেকটিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে না। তারা একেবারে সোজা পিছে সরে যাচ্ছে। মহাকর্ষ বলের কারণে প্রতিটি গ্যালাক্সি একে অপরকে আকর্ষণ করে। এরপরও তারা পরস্পরের কাছে ছুটে আসতে পারে না। কারণ গোটা মহাবিশ্ব ব্যাপী একটি সম্প্রসারণ বল সক্রিয় রয়েছে। এই বল এখনো মহাকর্ষ বলের থেকে অনেক বেশী এবং এ কারণেই মহাবিশ্ব সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু মহাকর্ষ বল প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করছে গ্যালাক্সিগুলোকে পরস্পরের দিকে টেনে নিয়ে আসার জন্য। এই মহাকর্ষ বলের কারণেই ক্রমশঃ একদিন গ্যালাক্সিগুলোর পশ্চাদপসরণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এক কথায় মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি হঠাৎ করেই স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীগণ মতামত দিচ্ছেন।

তারপর মহার্কষ বলের কারণেই গ্যালাক্সিগুলো পরস্পরের দিকে ছুটে আসতে শুরু করবে আর এভাবেই শুরু হবে মহাবিশ্বের সংকোচন প্রক্রিয়া। ক্রমান্বয়ে মহাবিশ্ব কেন্দ্রের দিকে সংকুচিত হতে থাকবে, সময় যতই অতিবাহিত হবে, গ্যালাক্সিগুলোর পরস্পরের প্রতি ছুটে আসার গতি ততই বৃদ্ধি লাভ করবে। এভাবে এক সময় সমস্ত গ্যালাক্সি তাদের যাবতীয় পদার্থ তথা নক্ষত্র, উন্মুক্ত গ্যাস, ধূলিকণা ইত্যাদিসহ মহাবিশ্বের কেন্দ্রে পরস্পরের ওপরে পতিত হবে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, সংকোচনের শেষ পর্যায়ে মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র তথা সৃষ্টি জগতের যাবতীয় পদার্থ, মহাবিশ্বের কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র পিন্ডে পরিণত হবে। সমাপ্তিতে সৃষ্টি জগতের এই একত্রিত অবস্থাকে বিজ্ঞানীগণ বিগ্ ক্রাঞ্চ (Big Crunch) নামে আখ্যায়িত করেছেন।

পৃথিবীর ও মহাবিশ্বের ভবিষ্যত তথা পরিণতি সম্পর্কে উল্লেখিত ধারণা পোষণ করছে বর্তমানের বিজ্ঞানীগণ। তারা বলছেন, তাপের উৎস হলো সূর্য। আর এই তাপের কারণেই গোটা সৃষ্টিজগৎ সচল রয়েছে। অথচ এই সূর্য ক্রমশঃ তার জ্বালানি শক্তি

নিঃশেষ করে ফেলছে। অর্থাৎ সূর্য একটি পরিণতির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টির জন্যই একটি নির্দিষ্ট সীমা রেখা অঙ্কন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ، مَاخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى–

তারা কি কখনো নিজেদের মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করেনি? আল্লাহ্ পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সবকিছু সঠিক ও উদ্দেশ্যে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আর রূম-৮)

এই পৃথিবীতে যা কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে, তা অনাদি ও অনন্ত নয়, এ কথা বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। দৃষ্টির সামনেই মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছে, পুরাতনের স্থানে নতুনের আগমন ঘটছে। কিন্তু এর একদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিভাবে–কি করে ঘটবে তা গবেষকদের কাছে আর অনাবৃত নেই।

সৃষ্টি জগতের নির্দিষ্ট পরিণতি

সৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রথম বিষয় বলা হলো, কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি হয়নি–সমস্ত কিছুই একটি নির্দিষ্ট ছক অনুসারে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রতিটি সৃষ্টির পেছনেই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে। এরপর মানব জাতির সামনে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসেছে, এসব সৃষ্টি নশ্বর না অবিনশ্বর? এ প্রশ্নের জবাব লাভের জন্য চিন্তাবিদ ও গবষেকগণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন সৃষ্টিসমূহের প্রতি। তারা নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এখানে কোন জিনিসই অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী নয়। প্রতিটি জিনিসেরই একটি নির্ধারিত জীবনকাল নির্দিষ্ট রয়েছে। নির্দিষ্ট সেই প্রান্ত সীমায় পৌঁছানোর পরে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। সামগ্রিকভাবে গোটা সৃষ্টি জগতসমূহও একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে, এ কথা আজ বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। তারা বলছেন, এখানে দৃশ্যমান–অদৃশ্যমান যতগুলো শক্তি সক্রিয় রয়েছে তারা সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ পরিসরে তারা কাজ করে যাচ্ছে। সমস্ত শক্তি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করবে। তারপর কোন এক সময় তারা অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এ ব্যবস্থাটির পরিসমাপ্তি ঘটবে।

www.pathagar.com

সুদূর অতীতকালে যেসব চিন্তাবিদগণ পৃথিবীকে আদি ও চিরন্তন বলে ধারণা পেশ করেছিলেন, তাদরে বক্তব্য তবুও সর্বব্যাপী অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি লাভ করতো। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে নাস্তিক্যবাদী ও আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্ব-জগতের নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা নিয়ে যে তর্ক-বিতর্ক চলে আসছিল, আধুনিক বিজ্ঞান প্রায় চূড়ান্তভাবেই সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের পক্ষে রায় দিয়েছে। সুতরাং বর্তমানে নাস্তিক্যবাদীদের পক্ষে বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামাবলী গায়ে দিয়ে এ কথা বলার আর কোন অবকাশ নেই যে, এই পৃথিবী আদি ও অবিনশ্বর। কোনদিন এই জগৎ ধ্বংস হবে না, নাস্তিক্যবাদীদের জন্য এ কথা বলার মতো কোন সুযোগ বিজ্ঞানীগণ আর রাখেননি। তারা কোরআনের অনুসরণে স্পষ্টভাবে মত ব্যক্ত করেছেন যে, এই পৃথিবী ও সৃষ্টিজগতের সকল কিছুই একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে।

অতীতে বস্তুবাদিরা এ ধারণা প্রচলন করেছিল যে, বস্তুর কোন ক্ষয় নেই–বস্তু কোনদিন ধ্বংস হয় না, শুধু রূপান্তর ঘটে মাত্র। তাদের ধারণা ছিল, প্রতিটি বস্তু পরিবর্তনের পর বস্তু–বস্তুই থেকে থেকে যায় এবং তার পরিমাণে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এই চিন্তা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে বস্তুবাদীরা প্রচার করতো যে, এই বস্তু জগতের কোন আদি-অন্ত নেই। সমস্ত কিছুই অবিনশ্বর। কোন কিছুই চিরতরে লয় প্রাপ্ত হবে না।

পক্ষান্তরে বর্তমানে আনবিক শক্তি আবিষ্কৃত হবার পরে বস্তুবাদীদের ধ্যান-ধারণার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আধুনিক বিজ্ঞানীগণ বলছেন, শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হয় এবং বস্তু আবার শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই বস্তুর শেষ স্তরে এর কোন আকৃতিও থাকে না এবং এর কোন ভৌতিক অবস্থানও বজায় থাকে না। তারপর Second law of thermo-Dynamics এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এই বস্তুজগৎ অবিনশ্বর নয়, এটা অনন্ত নয় এবং তা হতে পারে না। এই বস্তুজগৎ যেমন শুরু হয়েছে, তেমনি এটি একদিন শেষ হয়ে যাবে। কোরআন সপ্তম শতাব্দীতে যে ধারণা মানব জাতির সামনে পেশ করেছিল, বর্তমানের বিজ্ঞানীগণ তা নতুন মোড়কে মানব জাতির সামনে উত্থাপন করছে।

সকল প্রশংসা একমাত্র সেই মহাবৈজ্ঞানিকের

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই বিশ্ব-জাহান ও এর সমস্ত জিনিসের মালিক, এ বিশ্ব প্রকৃতিতে সৌন্দর্য, পূর্ণতা, জ্ঞান, শক্তি, শিল্পকারিতা ও কারিগরির যে নিপুণতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এসবের জন্য একমাত্র মহান আল্লাহ-ই প্রশংসার অধিকারী। এ

www.pathagar.com

পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীজগৎ যে কোন বস্তু থেকে উপকারিতা লাভ করছে, লাভবান হচ্ছে, আনন্দ ও স্বাদ উপভোগ করছে সে জন্য অন্যান্য প্রাণীসমূহ যেমন আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, মানুষকেও আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর দাসত্ব করতে হবে। যাবতীয় সৌন্দর্যের পেছনে এক আল্লাহ্ ব্যতীত যখন অন্য কারো কোন ভূমিকা নেই, তখন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ–

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসের মালিক এবং আখেরাতেও প্রশংসা তাঁরই জন্য। (সূরা সাবা-১)

মহান আল্লাহর সৃষ্টিতে কারো কোন অংশ নেই, সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে এ কথাটিই অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সমস্ত কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে একক কৃতিত্ব একমাত্র তাঁর। তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা। এ জন্য সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ–

প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা। (সূরা ফাতির-১)

একশ্রেণীর মানুষ বোঝে না, না বুঝে আল্লাহর সৃষ্টি কাজে অন্যের অংশ আছে বলে বিশ্বাস করে। তারা ধারণা করে, সৃষ্টি কাজে আল্লাহকে সহযোগিতা করার জন্য স্বয়ং আল্লাহই অনেককে নিয়োগ করেছেন। তারাও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অসীম ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। এ জন্য তাদেরও পূজা-অর্চনা করতে হবে। এভাবে অজ্ঞ মূর্খ মানুষ কল্পিত শক্তির মূর্তি নির্মাণ করে তার সামনে মাথানত করে দেয়। মাটির নিষ্প্রাণ মূর্তির প্রশংসায় মুখরিত হয়ে ওঠে। এদেরকে ভ্রান্তিমুক্ত করার জন্য মহান আল্লাহ্ বলেন–

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ–

তারা যেসব কথা তৈরী করছে তা থেকে পাক-পবিত্র তোমার রব, তিনি মর্যাদার অধিকারী। আর সালাম প্রেরিতদের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের জন্য। (সূরা সাফ্‌ফাত-১৮০-১৮২)

www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, তোমরা নিজের হাতে যেসব মূর্তি নির্মাণ করো, তাদের যে কোন ক্ষমতা নেই, তা তোমরা নিজেরাই অনুধাবন করতে পারো। তাদের দেহে মাছি বসলে তারা সে মাছিকেও তাড়াতে অক্ষম তা তোমরা দেখছো। তোমরা যেসব জিনিসকে শক্তির উৎস বলে তার পূজা-অর্চনা করছো, তা ধ্বংসশীল, তারা কিভাবে ধ্বংস হয় সে দৃশ্য তোমরা নিজেদের চোখে দেখে থাকো। এসব দেখেও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো না? সুতরাং, দাসত্ব ও প্রশংসা করো ঐ আল্লাহর–যিনি অমর অক্ষয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ–

তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তোমাদের দ্বীন তাঁর জন্য নিবেদিত করে তাঁকেই ডাকো। গোটা সৃষ্টি জগতের রব আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। (সূরা মুমিন)

প্রশংসা করো একমাত্র আমার এবং দাসত্ব করো শুধু আমারই। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নিয়ম-পদ্ধতি আমার বিধানের অনুগত করে দাও। আমার একনিষ্ঠ গোলাম হয়ে যাও। আমার গোলামীর সাথে অন্য কারো গোলামীর মিশ্রণ ঘটিয়ো না। এ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছুই তোমরা দেখছো, এসবের মালিক আমি। যাবতীয় ব্যবস্থাপনা আমারই হাতে নিবদ্ধ। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে–

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ–

সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি যমীন ও আসমানের মালিক এবং গোটা বিশ্বজাহানের সবার রব্ব। (সূরা আল জাসিয়া-৩৬)

এ পৃথিবীতে অসংখ্য বস্তু এমন রয়েছে, যাদেরকে জড়পদার্থ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এসব বস্তুর ভেতরে প্রাণের কোন স্পন্দন নেই। এসব প্রাণহীন বস্তুও মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। আকাশের মেঘমালাও আল্লাহর প্রশংসা করে। ঈশান কোণে কালবৈশাখীর নিকষকালো মেঘ রুদ্র ভয়াল রূপ ধারণ করে ক্রমশঃ গোটা আকাশ ছেয়ে ফেলে। ভয়ঙ্কর গর্জন করতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ–

মেঘের গর্জন তাঁরই প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করে। (সূরা আর-রা'দ-১৩)

www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কত যে সুন্দর, তা তাঁর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই অনুভব করা যায়। যাঁর সৃষ্টি এত সুন্দর, তিনি কত সুন্দর হতে পারেন তা কল্পনাও করা যায় না। মনের গহীনে কল্পনার কুঞ্জবনেও মানুষ আল্লাহর রুচি ও শৈল্পিক জ্ঞান সম্পর্কে ছায়াপাত ঘটাতে সক্ষম নয়। সমুদ্রের অতল তলদেশে অসংখ্য প্রাণী বাস করে। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ আকারের মাছের সমাহার রয়েছে সমুদ্রে। এসব মাছের দেহের সৌন্দর্য দেখলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়। আল্লাহভীরু লোকদের মুখ থেকে নিজের অজান্তেই উচ্চারিত হয় 'আল হাম্‌দুলিল্লাহ'। সৌন্দর্যের পূজারীরা এসব মাছ ক্রয় করে এ্যাকুইরিয়ামে রেখে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। অপূর্ব সৌন্দর্যমন্ডিত এসব মাছ শুধুই তাকিয়ে দেখে এক শ্রেণীর লোক। তাদের মুখ থেকে আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারিত হয় না। কিন্তু সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে যে মাছগুলো মানুষের চোখের সামনে বিচিত্র ভঙ্গীতে পানির ভেতরে সাঁতার কেটে ফিরছে, তারা এক মুহূর্ত নীরব নেই। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তারা ঐ মহান আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করছে।

ঐ দূর নীলিমায় পাখিরা ডানা মেলে দিয়ে মনোমুগ্ধকর ভঙ্গীতে উড়ছে। মানুষ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে কিভাবে পাখিগুলো মহাশূন্যে উড়ছে। পাখিদের ওড়ার এই দৃশ্য দেখে অকৃতজ্ঞ মানুষ হতবাক হয়ে থাকলেও উড়ন্ত পাখিগুলো কিন্তু নীরব নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ–

তুমি কি দেখো না, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে যারা আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তারা সবাই এবং যে পাখিরা ডানা বিস্তার করে আকাশে ওড়ে। (সূরা নূর-৪১)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাবিজ্ঞানী, তাঁর জ্ঞানের সাথে কোন কিছুর তুলনা হয় না। তিনি আপন কুদরতে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এব্‌ এসব সৃষ্টি তাঁরই প্রশংসায় নিয়োজিত রয়েছে। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে–

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ–

আল্লাহর তাস্‌বীহ করছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশমন্ডলে ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিরাজ করছে। তিনিই সর্বজয়ী ও মহাবিজ্ঞানী। (সূরা আস-সফ্‌–১)

www.pathagar.com

আকাশমন্ডলে মহাশূন্যে অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র, অগণিত তারকারাজি এবং গ্যালাক্সি (Galaxy) রয়েছে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এসবের রহস্য সন্ধানে ব্যপৃত রয়েছেন। তারা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের (Telescope) সাহায্যে তা অবলোকন করছেন। মহান আল্লাহ এসব সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর এসব সৃষ্টি তাঁরই প্রশংসা করছে। পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর এবং এসবের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সমস্ত কিছু তাদের নিজস্ব ভাষায় মহান আল্লাহর তাসবীহ করে যাচ্ছে। মানুষকেও তাঁরই প্রশংসা করার জন্য এসব বিষয় কোরআনে তুলে ধরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ–

আল্লাহর তাস্‌বীহ্ করছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশমন্ডলে রয়েছে এবং এমন প্রতিটি জিনিস যা পৃথিবীতে রয়েছে। তিনি রাজাধিরাজ; অতি পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী এবং সুবিজ্ঞানী। (সূরা জুম'আ–১)

তিনি নিরঙ্কুশ শক্তির অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। কোন শক্তি তাঁর এই সীমাহীন কুদরতকে সীমাবদ্ধ বা সংকুচিত করতে পারে না। এই সমগ্র বিশ্বলোক তাঁরই এক রাজত্ব ও সাম্রাজ্য। তিনি এ পৃথিবীকে একবারই পরিচালিত করে দিয়ে এর থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে যাননি। তিনিই এর ওপর নিরন্তর শাসনকার্য পরিচালনা করে যাচ্ছেন। এই শাসন -প্রশাসন চালানোর ব্যাপারে অন্য কারো এক বিন্দু অংশীদারীত্ব নেই। অন্য কারো অস্থায়ীভাবেও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই বিশ্বলোকের কোন স্থানে সামান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা, মালিকানা ভোগ করা অথবা শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা যদিও কিছুটা থেকে থাকে, তা সে স্বয়ং অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, আল্লাহর পক্ষ থেকেই তা দান করা হয়েছে। আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করবেন, ততদিন এই ক্ষমতা দিয়ে রাখবেন। আর যখনই তিনি ইচ্ছা করবেন, তখনই ক্ষমতার মসনদ থেকে বিদায় করে দেবেন।

সুতরাং, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই এবং তিনিই তা লাভের যোগ্য। শুধু তিনিই প্রশংসা লাভের অধিকারী। অন্য কোন সত্তায় যদি প্রশংসার যোগ্য কোন গুণ বা সৌন্দর্য দেখা যায়, তাহলে তা তাঁরই অবদান। তিনি দান করেছেন বলেই তাতে সৌন্দর্য বিদ্যমান। অতএব কৃতজ্ঞতা লাভের প্রকৃত ও একমাত্র অধিকারী তিনিই। কারণ সর্বপ্রকার নিয়ামত তাঁরই সৃষ্ট, তাঁরই অবদান। সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রকৃত

www.pathagar.com

কল্যাণকারী তিনি ব্যতীত আর কেউ নয়। অন্য কারো কোন উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেও তা এই হিসাবে করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নিয়ামত আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হচ্ছে তার মাধ্যমে। কেননা, সে নিয়ামতের প্রকৃত স্রষ্টা হলেন আল্লাহ্। তাঁর অনুমতি ব্যতীত এবং তিনি সুযোগ না দিলে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের কোনক্রমেই উপকার করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং কোন মানুষের কাছ থেকে উপকৃত হলেও আল্লাহরই প্রশংসা করতে হবে। কেননা তিনিই সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক। মহান আল্লাহ্ বলেন–

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ–

আল্লাহর তাসবীহ করছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশমন্ডলে রয়েছে এবং এমন প্রতিটি জিনিস যা পৃথিবীর বুকে রয়েছে। বাদশাহী তাঁরই এবং তারীফ-প্রশংসাও তাঁরই জন্য। আর তিনিই প্রতিটি জিনিসের ওপরে কর্তৃত্বের অধিকারী। (সূরা তাগাবুন-১)

যাবতীয় সৃষ্টিতেই রয়েছে সুন্দরের ছোঁয়া

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে অসুন্দর দেখতে চান না। তিনি যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুর ভেতরেই সৌন্দর্য বিদ্যমান। আল্লাহর সৃষ্টি এই বিশ্বলোকে কোথাও একঘেয়েমি ও বৈচিত্রহীনতা নেই। সর্বত্রই বৈচিত্র দেখা যায়। একই মাটি ও একই পানি থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছের দুটো ফলের বর্ণ, বাহ্যিক কাঠামো ও স্বাদ এক নয়। পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে তার ভেতরে নানা রংয়ের সমাহার। পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বস্তুগত গঠনপ্রণালীতে অদ্ভূত ধরনের পার্থক্য বিরাজমান। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে একই জনক-জননীর দুটো সন্তানও একই ধরনের হয় না। পৃথিবীতে শতকোটি মানুষ, একজনের সাথে আরেকজনের চেহারার কোন মিল নেই। স্বভাবগত ও গুণগত বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। সৃষ্টির এই বৈচিত্র ও বিরোধই স্পষ্ট করে আঙ্গুলি সংকেত করছে, এ সৃষ্টিজগতকে কোন মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞানী বহুবিধ জ্ঞান ও বিজ্ঞতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং এর নির্মাতা একজন দৃষ্টান্তহীন স্রষ্টা ও তুলনাবিহীন নির্মাণ কৌশলী।

সে অতুলনীয় নির্মাণ কৌশলী একই জিনিসের শুধুমাত্র একটি নমুনা জ্ঞানের জগতে ধারণ করে সৃষ্টি কাজ সম্পাদনে আদেশ দেননি। বরং তাঁর জ্ঞানের দর্পণে প্রতিটি

www.pathagar.com

জিনিসের জন্য একের পর এক এবং অসংখ্য ও সীমাহীন নমুনা, প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত রয়েছে। বিশেষ করে মানবিক স্বভাব, প্রকৃতি ও বুদ্ধি-বৈচিত্র সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে যে কোন ব্যক্তি এ কথা অনুভব করতে সক্ষম যে, সৃষ্টির এই নিপুণতা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং প্রকৃতপক্ষে অতুলনীয় সৃষ্টি জ্ঞান-কুশলতার প্রকাশ্য নিদর্শন। যদি জন্মগতভাবে সমস্ত মানুষকে তাদের নিজেদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক প্রবৃত্তি ও কামনা, আবেগ-অনুভূতি, ঝোঁক-প্রবণতা এবং চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে এক করে দেয়া হতো, কোন প্রকার বৈষম্য-বিভিন্নতার কোন পার্থক্য রাখা না হতো, তাহলে পৃথিবীতে মানুষের মতো একটি নতুন ধরনের সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত করা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যখন এ পৃথিবীতে একটি কর্তব্য পরায়ণ-দায়িত্বশীল ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করার সিদ্ধান্ত করেছেন, তখন মানুষের সৃষ্টিগত কাঠামোর ভেতরে সব ধরনের বিচিত্রতা ও বিভিন্নতার অবকাশ রাখা ছিল সে সিদ্ধান্তের অনিবার্য দাবী। মানুষ যে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ও পরিকল্পনাহীনতার ফসল নয় বরং একটা মহান বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ফলশ্রুতি, তা মানুষের স্বভাবগত বিচিত্রতা ও বিভিন্নতাই প্রমাণ বহন করে। এখানে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যেখানেই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা দৃষ্টিগোচর হবে, সেখানেই অনিবার্যভাবে সে পরিকল্পনার পশ্চাতে এক বিজ্ঞানময় প্রতিষ্ঠিত সত্তার সক্রিয় সংযোগ লক্ষ্য করা যাবে। বিজ্ঞানী ব্যতীত যেমন বিজ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি পরিকল্পনা ভিত্তিক সৃষ্টির পেছনে পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্বও অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্র ও নিপুণতার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন–

اَلَمْ تَرَاَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذَالِكَ–

তুমি কি দেখো না আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তারপর তার মাধ্যমে আমি নানা ধরনের বিচিত্র বর্ণের ফল বের করে আনি? পাহাড়ের মধ্যেও রয়েছে বিচিত্র বর্ণের–সাদা, লাল ও নিকষকালো রেখা। আর এভাবে মানুষ, জীব–জানোয়ার ও গৃহপালিত জন্তুও বিভিন্ন বর্ণের রয়েছে। (সূরা ফাতির–২৭-২৮)

www.pathagar.com

স্রষ্টার শৈল্পিক ও নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ

এ বিষয়টি কিভাবে সংঘটিত হয়, তা অবলোকন করলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়। অন্যান্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি না দিয়েও এই একটি মাত্র বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলেই আল্লাহর রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, শৈল্পিক নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ কত যে বিস্ময়কর; কত যে প্রশংসামূলক, তা দেখে যেমন হতবাক হতে হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রশংসা করেও শেষ করা যাবে না। ফুলসমূহের চলৎশক্তি নেই; তারা চলাফেরার মাধ্যমে একটি আরেকটির সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারে না। এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাতাসের মাধ্যমে, পানির মাধ্যমে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রমর, মৌমাছি ও সুদর্শন দৃষ্টি-নন্দন প্রজাপতির মাধ্যমে ফুলের পুরুষ কেশরকে স্ত্রী কেশরের সাথে মিলিত হবার ব্যবস্থা করেছেন। এই কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব মহান আল্লাহ সর্বভূক প্রাণী আরশোলা–তেলাপোকাকে দেননি। কারণ তাঁর বান্দারা এই ফুলের সৌরভ গ্রহণ করে, ফুল দেখতে সুন্দর আর এ জন্য ফুলের ওপর বিচরণ করে সে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন দৃষ্টি নান্দনিক প্রজাপতির ওপরে এবং মৌমাছি আর ভ্রমরের ওপরে।

কি অপূর্বদর্শন এই ভ্রমর আর প্রজাপতি। এদেরকে দেখলে মনে হয় যেন কোন এক নিপুণ শিল্পী দীর্ঘদিন সাধনা করে তার দেহে অপূর্ব সৌন্দর্যের পশরা অঙ্কন করেছে। শত সহস্র প্রজাপতি; একটি প্রজাতির সাথে আরেকটি প্রজাতির রংয়ের কোন মিল নেই। আল্লাহ সুন্দর এবং ফুলও সুন্দর, এই সুন্দর ফুলগুলোর ওপরে কুৎসিত দর্শন এবং নোংরা কোন প্রাণী বিচরণ করে পরাগায়ন ঘটালে সৌন্দর্য ও রুচিবোধ ক্ষুন্ন হতো। ফুলের সৌন্দর্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মহান আল্লাহ অপূর্ব সুন্দর প্রজাপতিকেই নির্বাচিত করেছেন, তারা গোটা বিশ্বব্যাপী পরাগায়ন ঘটাবে। মহান আল্লাহর রুচিবোধ যে কত সুন্দর, কত মার্জিত ও উন্নত রুচি, তা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই প্রকাশ ঘটেছে। আল্লাহকে কেউ যদি চিনতে চায়, কেউ যদি তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হতে চায়, তাহলে তাকে আল্লাহর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। তাঁর সৃষ্টির অপূর্ব সৌন্দর্য আর সামঞ্জস্যতা দেখে মুখ থেকে নিজের অজান্তেই উচ্চারিত হতে থাকবে–আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন- সকল প্রশংশা একমাত্র আল্লাহর জন্য-যিনি গোটা জাহানের রব।

পৃথিবীর সকল ফলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, এমন কোন একটি ফলও পাওয়া যাবে না, যে ফলের ওপরে আবরণ নেই। সমস্ত ফলের ওপরে আবরণ রয়েছে। মনে হয় যেন মানুষ আল্লাহর সম্মানিত মেহমান, আর মেহমানের সামনে তিনি খাদ্যগুলো পরিবেশন করছেন অত্যন্ত যত্নের সাথে। আবরণহীন ফলের ওপরে

www.pathagar.com

নানা ধরনের কীট-পতঙ্গ বসবে; তারা মলমূত্র ত্যাগ করবে, ফলগুলো রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবে এবং তা খেতে রুচি হবে না। এ জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রতিটি ফলের ওপরেই আবরণ সৃষ্টি করেছেন। যেন ফলের গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে এবং খেতেও রুচিতে না বাধে। একটি বেদানার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, বেদানার দানাগুলোর ওপরে বেশ কয়েকটি আবরণ রয়েছে। ওপরের আবরণটি সবচেয়ে ঘন আর মোটা। তারপরের আবরণগুলো পাতলা। এগুলো ছিন্ন করার পরেই রসে ভরা দানাগুলো বের হবে। নারিকেলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, তার প্রথম আবরণটি খোসার আকারে বিদ্যমান এবং সেটা খুবই মোটা। এরপর রয়েছে একটি খোলা জাতিয় শক্ত আবরণ। এসব ছিন্ন করার পরই পাওয়া যাবে সুস্বাদু নারিকেল আর শরবত। ছোট্ট একটি ফল আঙ্গুর, তার ওপরেও আবরণ রয়েছে। চালের ওপরেও রয়েছে অনেকগুলো আবরণ। এসব সৃষ্টির সাথে কতটা উন্নত রুচি জড়িত, তা সৃষ্টির ধরণ দেখলেই অনুমান করা যেতে পারে।

সত্যের অনুসারী সত্যানুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সম্পন্ন একজন মানুষ নিখিল বিশ্বের অনু-পরমাণু থেকে শুরু করে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র থেকে ঐ বিশাল আকাশ পর্যন্ত এবং বৃক্ষ-তরু-লতা, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ও বৈচিত্রপূর্ণ প্রাণীজগতের অপূর্ব গঠন প্রণালী তার দৃষ্টির সামনে দেখতে পায়, তখন তার মুখ থেকে নিজের অগোচরেই বেরিয়ে আসে–আল হাম্দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন- সকল প্রশংসা একমাত্র ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি নিখিল জাহানের রব। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ، الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا، سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে সেসব বিচক্ষণ-জ্ঞানী লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যারা উঠতে, বসতে ও শুতে–যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সংগঠন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে–আমাদের রব্ব ! এসব কিছু তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। তুমি উদ্দেশ্যহীন কাজের বাতুলতা থেকে পবিত্র। (সূরা আলে ইমরাণ-১৯০-১৯১)

www.pathagar.com

মানুষ নিজেকেও সুন্দর করে সাজাতে জানতো না। কোরআন শরীফ বলছে, মহান আল্লাহ এই মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য পোষাক অবতীর্ণ করেছেন, পাখির দেহে একটির পর আরেকটি পালক সজ্জিত করে পাখির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। পাখির পালকগুলো যেন সুন্দর ঝকঝকে থাকে, পালকে কোন ময়লা-আবর্জনা যেন স্থির থাকতে না পারে, এ জন্য আল্লাহ ঐ পালকের গোড়া থেকে ক্রীম জাতিয় এক প্রকার পিচ্ছিল পদার্থ নির্গত করার ব্যবস্থা করেছেন। পালকধারী প্রাণীগুলো তা নিজের মুখ দিয়ে পালকের গোড়া থেকে টেনে টেনে ঐ পিচ্ছিল পদার্থ সমস্ত পালকে ছড়িয়ে দেয়। এ ব্যবস্থা যদি আল্লাহ না করতেন, তাহলে হাঁস, মুরগী, কবুতর এবং অন্যান্য যেসব পাখি মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, সেসব প্রাণী দেখতে শুষ্ক মৃতের মতো হতো। মানুষের খেতে তা রুচিতে বাধতো। এই সৌন্দর্য আর রুচিবোধের যিনি পরিচয় দিলেন তিনিই হলেন আল্লাহ এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।

বস্ত্রহীন থাকলে মানুষকে ভীষণ কদাকার ও কুৎসিত দেখাবে। এ জন্য আল্লাহ পোষাক অবতীর্ণ করেছেন। এই পোষাকের মাধ্যমে মানুষ নিজের লজ্জাস্থান আবৃত রাখবে এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে। মহান আল্লাহ বলেন−

يَابَنِىْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا−

হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহকে আবৃত করতে পারো। এটা তোমাদের জন্য দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়ও। (সূরা আল আ'রাফ-২৬)

এই পোষাক অবিন্যস্তভাবে ব্যবহার করলে অরুচিকর দেখাবে। এ জন্য তা পাক-পবিত্র, পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, মহান আল্লাহ সূরা মুদ্দাচ্ছিরের মাধ্যমে তাও শিক্ষা দিয়েছেন। অজ্ঞতার কারণে তাদানীন্তন যুগে একশ্রেণীর লোকজন বস্ত্রহীন হয়ে কা'বাঘরকে তাওয়াফ করতো। বিষয়টি ছিল চরম অরুচিকর এবং অসামাজিক। এ কুপ্রথা বন্ধ করে পোষাকে সজ্জিত হয়ে ইবাদাতের হক আদায় করতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিলেন−

يَابَنِىْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ−

হে আদম সন্তান! প্রতিটি ইবাদাতের ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের ভূষণে সজ্জিত হয়ে থাকো। (সূরা আল আরাফ-৩১)

www.pathagar.com

মানুষের নান্দনিক দেহ সৌষ্ঠব

মানুষের রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, ভদ্রতা, শালিনতা, কোন কিছু চাওয়ার পদ্ধতি, আহার করার শালীন পদ্ধতি, হাঁটা-উঠা-বসা এক কথায় মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক যেন সৌন্দর্যময় ও উন্নত রুচি গড়ে ওঠে, তা মহান আল্লাহ শিখিয়েছেন। তিনি স্বয়ং সুন্দর এবং সবচেয়ে প্রশংসামূলক রুচির অধিকারী, মানুষকেও তিনি তাঁর কোরআনের মাধ্যমে রুচি ও সৌন্দর্যবোধ শিখিয়েছেন। মানুষকে তিনি সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ–

মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি। (সূরা আত-তীন-৪)

মানুষকে এমন সুন্দর করে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, যার সাথে অন্য কোন সৃষ্টির কোন তুলনা হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ–

তিনি পৃথিবী ও আকাশমন্ডলকে সত্যতার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের আকার -আকৃতি অত্যন্ত সুন্দর করে নির্মাণ করেছেন। (সূরা আত তাগাবুন–৩)

শারীরিক কাঠামোয় যেখানে যা প্রয়োজন, সেখানে তাই সংযোজন করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অদ্ভূত সুন্দর আকৃতিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন–

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ، وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ–

আমি তাকে দুটো চোখ, একটি জিহ্বা এবং দুটো ওষ্ঠ দেইনি? (সূরা বালাদ-৮-৯)

মানুষের শারীরিক কাঠামো ও গঠন প্রণালী দেখে কারো এ কথা বলার মতো ধৃষ্টতা নেই যে, কান দুটো মাথার দু'পাশে না দিয়ে তা বগলের নিচে দিলে ভালো হতো। চোখ দুটো কপালের নিচে টানা টানা করে না দিয়ে কপালের ওপরে গোল বৃত্তের মতো করে দিলে ভালো হতো। নাকটা ঠোঁটের ওপরে না দিয়ে নাভীর ওপরে দিলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতো। ফুলের পাঁপড়ীগুলো ভিন্ন ধরনের হলে আরো সুন্দর দেখাতো। চতুষ্পদ প্রাণীর লেজ পেছনের দিকে না দিয়ে তা পিঠের ওপরে থাকলে ভালো হতো। এ ধরনের অমূলক কথা বলার ধৃষ্টতা এবং দুঃসাহস কেউ দেখাতে পারবে না। আল্লাহর সৃষ্টিতে অসামঞ্জস্য রয়েছে, এমন চিন্তাও করা যায় না। যেখানে যা প্রয়োজন, আল্লাহ তাই করেছেন।

www.pathagar.com

কথিত আছে, আল্লাহর একজন ওলী পথ দিয়ে যেতে যেতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বিশ্রামের জন্য একটি বট গাছের নিচে শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ করে বট গাছের ফল তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি চিন্তা করলেন, এত বড় একটি বিশাল গাছ, আর তার ফলগুলো কতই না ছোট্ট। মনে মনে তিনি আল্লাহকে বললেন, 'তোমার সৃষ্টিতে তো কোন অসামঞ্জ্য নেই–এ কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু বেল গাছ এই বট গাছের তুলনায় কত ছোট অথচ তার ফলগুলো বেশ বড়। আর বট গাছ কত বিশাল কিন্তু তার ফল খুবই ছোট। বিষয়টা আমার কাছে কেমন যেন....!'

আল্লাহর সেই ওলী মনে মনে আল্লাহকে যে কথাগুলো বলছিলেন, তা শেষ না হতেই বাতাসের এক ঝাপটা এসে বট গাছের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। বাতাসের ঝাপটায় বট গাছের একটি ছোট্ট ফল গাছের নিচে শায়িত সেই ব্যক্তির নাকের ওপরে এসে পতিত হলো। সাথে সাথে আল্লাহর ওলী উঠে সিজদায় গিয়ে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ ! আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমার কল্পনা অনুযায়ী এই বট গাছের ফল যদি গাছ অনুসারে বড় হতো, তাহলে আজ আমার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো এবং তোমার বান্দারা সূর্যের প্রখর তাপে নিঃশেষে জ্বলে পুড়ে গেলেও কেউ এই গাছের নিচে ছায়ায় বিশ্রামের জন্য আসতো না।'

সুতরাং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। তিনিই সকল প্রশংসার অধিকারী। তাঁর সৃষ্টিতে কোথাও কোন অসামঞ্জ্যতা নেই। মহান আল্লাহ বলেন–

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا، مَاتَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ، هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ–

তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছেন। তোমরা মহাদয়াবানের সৃষ্টিকর্মে কোন ধরনের অসঙ্গতি পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখো, কোথাও কোন দোষ-ক্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি? বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। (সূরা আল মুল্ক- ৩-৪)

মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো, তারা সৃষ্টির এই অপরূপ দর্শনে আত্মহারা হয়ে ওঠে। নারীর সৌন্দর্য অবলোকনে অস্থির চিত্তে তারা কবিতা রচনা করে।

www.pathagar.com

প্রজাপতির রঙ দেখে মুগ্ধ হয়ে তারা প্রশংসামূলক গীত রচনা করে। আকাশের নীল রঙ, সাগরের তরঙ্গমালা, বনানীতে বাতাসের হিন্দোল, দূরনিহারিকা কুঞ্জের পলায়নপর আলো, শশধরের মায়াবী কিরণ, দক্ষিণা মলয় সমিরণ, ফুলের মন মাতানো সৌরভ আর পাখির কলকাকলীতে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে। কিন্তু এসবের যিনি মূল স্রষ্টা, যিনি পাখির কণ্ঠে গান দিয়েছেন, অরণ্যের মাঝে যিনি সবুজাভা দান করেছেন, সাগর তরঙ্গে যিনি রজত শুভ্র কিরীট দান করেছেন, নক্ষত্রপুঞ্জে যিনি আলোর দ্যুতি সৃষ্টি করেছেন, চাঁদের মাঝে যিনি স্নিগ্ধ কিরণ দিয়েছেন, সমিরণ মাঝে যিনি প্রশান্তির স্পর্শ-আবেশ সৃষ্টি করেছেন, ফুলের পাঁপড়ীকে যিনি মাধুরী আর সুষমামন্ডিত করেছেন তাঁর প্রশংসা করতে ভুলে যায়। সৃষ্টির ব্যাপারে প্রশংসায় কোন কার্পণ্য নেই, কিন্তু স্রষ্টার প্রশংসায় জিহ্বায় জড়তা নেমে আসে। সুতরাং, আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য দর্শন করে যারা তাঁর প্রশংসা করতে কার্পণ্য করে, তারা নিকৃষ্ট রুচি আর হীন মানসিকতারই পরিচয় দিয়ে থাকে।

উদ্ভিদ মাটি দীর্ণ করেই বেরিয়ে আসে

মানুষের মালিক মানুষ স্বয়ং নয়, তার মালিক হলেন আল্লাহ। এ জন্য তার অধিকার নেই যে, সে তার মালিককে অস্বীকার করে নিজের খেয়াল-খুশী অনুসারে পৃথিবীতে জীবন অতিবাহিত করে। তাঁর যে মালিক ও স্রষ্টা, তাঁরই দাসত্ব এবং যাবতীয় ব্যাপারে তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কিতাব ঘোষণা করছে-

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ-

বলো, আমি আশ্রয় চাই রাব্বুল ফালাকের কাছে। (সূরা ফালাক-১)

সূরা ফালাক আল্লাহর কিতাবের ত্রিশ পারার ছোট্ট একটি সূরা। এ সূরাটি অধিকাংশ মুসলমানের মুখস্থ রয়েছে। নামাজে এটি বার বার পাঠ করা হয়। এ সূরার প্রথম আয়াতে ফালাক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সাথে রব শব্দ সহযোগে উচ্চারিত হয়েছে, 'রাব্বুল ফালাক'। রাব্বুল ফালাক কাকে বলা হয়-বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝতে হবে। আরবী ফালাক শব্দের ক্রিয়ামূল হলো 'ফুল্‌কু'। এর অর্থ হলো 'যে চিরে ফেলে।' আর ফালাক শব্দের অর্থ হলো, কোন কিছু দীর্ণ করা বা চিরে ফেলা। সূরা আল আন্‌আ'ম-এর ৯৬ আয়াতে 'ফলিকুল ইস্‌বাহ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং আল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনিই রাতের আবরণ দীর্ণ করে রঙিন প্রভাতের উন্মেষ ঘটান।' আর সূরা ফালাকের প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত 'রাব্বুল ফালাক' শব্দের সরল অর্থ হলো, 'প্রভাত কালের রব'।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে এক একটি দেশে প্রভাত কিভাবে হয়? রাতের নিকষ কালো অন্ধকার ভেদ করে পূর্ব গগনে তরুণ তপন উদিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রভাত হওয়া বলে। অর্থাৎ অন্ধকারের বুকচিরে নবারুণের আগমন ঘটে। আর এই প্রক্রিয়াকে আরবী ভাষায় বলা যেতে পারে, ফালাকুস্ সুবাহ্ অর্থাৎ প্রভাত সূর্যের উদয়। এই ফালাক শব্দের আরেকটি অর্থ করা হয়েছে 'সৃষ্টিকার্য সমাধা করা।' এই অর্থ এ জন্য করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে যত কিছুই সৃষ্টি হয়, তা কোন না কোন জিনিস বা আবরণ ভেদ করে, দীর্ণ করেই সৃষ্টি হয়। তিমিরাবৃত রজনীর বুকচিরেই দূর নিহারিকা কুঞ্জের মিটিমিটি আলো পৃথিবীর বুকে এসে পৌছায়। উত্তাল সাগরের বুক চিরেই জলযানসমূহ গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়। খেজুর গাছে সুমিষ্ট রসের ভান্ডার মওজুদ থাকলেও তা নির্গত হয় না। খেজুর গাছকে যখন দীর্ণ করা হয়, তখনই রস বেরিয়ে আসে। রাবার গাছসমূহ দীর্ণ করা না হলে রাবার পাওয়া যায় না। ডাবের পানি পান করতে হলেও তা দীর্ণ করা ত হবে। পৃথিবীর উদ্ভিদ বীজসমূহ মাটির বুকচিরেই তার অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। উদ্ভিদ মাটি দীর্ণ করেই পৃথিবীর আলো বাতাসে বেরিয়ে আসে।

ডিমের মাধ্যমে বংশধারা টিকিয়ে রাখার জন্য পৃথিবীতে যেসব প্রাণী ডিম দেয়, সেই ডিম দীর্ণ করেই শাবক পৃথিবীতে বেরিয়ে আসে। কুমিরের মতো বিশাল প্রাণীর বাচ্চাও ডিম চিরেই ভূমিষ্ঠ হয়। নদী-সাগর-মহাসাগরে যেসব প্রকান্ড মাছ বাস করে, সেসব মাছের বাচ্চাও ডিম থেকেই বেরিয়ে এসেছে। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী মাতৃগর্ভ থেকে কোন বাধা বা আবরণ দীর্ণ করেই এই পৃথিবীতে আগমন করছে। বৃক্ষের বহিরাবরণ দীর্ণ করেই শাখায় শাখায় জাগে কিশলয়। ফুলের কুড়ি দীর্ণ করেই ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে পাঁপড়ী মেলে দেয়। অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত কিছুই কোন না কোন বাধা অপসারিত করে, কোন কিছুর বুক চিরে বা কোন আবরণ দীর্ণ করেই সৃষ্টি হয়, আর এই প্রক্রিয়ায় যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই হলেন রাব্বুল ফালাক। তিনিই মানুষের মালিক, খালিক, সম্রাট, শাসক, আইনদাতা ও জীবন বিধানদাতা। একমাত্র তাঁরই সকল প্রশংসা এবং তিনিই দাসত্ব লাভের অধিকারী। কোরআনের গবেষকগণ এই ফালাক শব্দের বিস্তারিত তাফসীর করেছেন।

উপসংহার

মহাগ্রন্থ আল কোরআন গবেষণা করার মতো সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا–

www.pathagar.com

তারা কি মনোযোগ সহকারে কোরআন নিয়ে চিন্তা- ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরগুলো তালা লাগানো রয়েছে? (আল কোরআন)

উপসংহারে আমরা বলতে চাই, কয়েক বছর পূর্বে একজন আরব মুসলিম স্কলার ডক্টর তারেক আল সুয়াইদান মহাগ্রন্থ আল কোরআনে ব্যবহৃত কতকগুলো শব্দের ওপর গবেষণা করে বিস্ময়কর পরিসংখ্যানগত উপাত্ত (Statistical Data) লাভ করেছেন। যা তিনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর গবেষণা লব্ধ বিষয়গুলো আমরা নিম্নে তুলে ধরছি। সমগ্র কোরআন মাজীদে-

الدنيا। 'ইহজগত' তথা দুনিয়া শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ১১৫ বার।

الاخرة। 'পরজগত' তথা আখিরাত শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ১১৫ বার।

الملئكة। 'মালায়িকা তথা ফিরিশতাগণ শব্দটি এসেছে ৮৮ বার।

الشيطان। 'শয়তান' শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ৮৮ বার।

الحياة। 'হায়াত' বা জীবন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ১৪৫ বার।

الموت। 'আল মাউত' বা মৃত্যু শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ১৪৫।

النفع। 'আন নাফ্'উ' বা উপকারী শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ৫০ বার।

الفساد। 'আল ফাসাদ' বা ক্ষতিকর শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে ৫০।

الناس। 'নাস' বা জনগণ শব্দটি এসেছে ৩৬৮ বার।

الرّسول। 'রাসূল' বা রাসূলগণ শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ৩৬৮।

الزكوة। 'যাকাত' শব্দটি এসেছে ৩২ বার।

البركة। 'বরকত' শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ৩২।

اللسان। 'আল লিছান' বা জিহ্বা শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ২৫ বার।

الموعظة। 'আল মাও'ইযাত' তথা উত্তম বাক্য শব্দটিও এসেছে ২৫।

الرجل। 'আর রাজুল' বা পুরুষ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ২৪ বার।

المرأة। 'আল মারাআত' তথা নারী শব্দটিও এসেছে ২৪ বার।

www.pathagar.com

الشهر।'আশ্ শাহ্র' তথা মাস শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ১২ বার।

اليوم। 'আল ইয়াওম' তথা দিন শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ৩৬৫ বার।

الامر। 'আল আমর' বা আদেশ শব্দটি এসেছে ১,০০০ বার।

النهى। 'আন্ নাহি' বা নিষেধ শব্দটিও এসেছে ১,০০০ বার।

الحلال। 'হালাল' বা বৈধ শব্দটি এসেছে ২৫০ বার।

حرام 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ২৫০ বার।

جنّت 'জান্নাত' দেয়া হবে এমন প্রতিশ্রুতিমূলক কথা এসেছে ১,০০০ বার।

جهنّم 'জাহান্নাম' সম্পর্কিত ভীতি প্রদর্শনমূলক কথাও এসেছে ১,০০০ বার।

সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে রহস্যময় গাণিতিক সুত্রে গ্রথিত এমন বিস্ময়কর কিতাব সমগ্র বিশ্বে আর একটিও নেই। মহান আল্লাহ কোরআনের বর্ণনা সম্পর্কে বলেন-

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا-

এরা কি কোরআন (ও তার সুত্র নিয়ে চিন্তা) গবেষণা করেনা? এ গ্রন্থটি যদি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক গড়মিল দেখতে পেতো। (সূরা আননিসা-৮২)

কোরআন বিশাল এক মু'জিজাহ্, এর বিস্ময়কারিতার কোনো শেষ নেই, এর ব্যাখ্যারও কোনো শেষ নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا-

(হে নবী) আপনি (এদের) বলুন, আমার মালিকের (প্রশংসার) কথাগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্যে যদি সমুদ্র কালি হয়ে যায়, তাহলে আমার মালিকের জ্ঞানের কথা (লেখা) শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র শুকিয়ে যাবে, এমনকি যদি আমি তার মতো (আরো) সমুদ্রকে (লেখার কালি করে) সাহায্য করার জন্যে নিয়ে আসি (তবুও)। (সূরা কাহ্ফ- ১০৯)

www.pathagar.com

اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، وَّ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ–

অবশ্যই এ (কোরআন) হচ্ছে (সত্য-মিথ্যার) পার্থক্যকারী (চূড়ান্ত কথা, তা অর্থহীন (কোনো কথাবার্তা) নয়। (সূরা তারিক- ১৩-১৪)

আরবী শব্দের যথার্থ অর্থ এবং একটি শব্দের অনেকগুলো অর্থ এবং যথার্থ স্থানে এর প্রয়োগ- জ্ঞানের অভাবজনিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পৃথিবীতে পবিত্র কোরআনের যে অনুবাদসমূহ হয়েছে, তা মাতৃভাষায় পাঠ করে অনেকেই ভ্রান্তির শিকার হন। এ কারণে কোরআনকে যথার্থ অর্থে বুঝতে হলে অবশ্যই আরবী ভাষায় পারদর্শী হতে হবে অথবা যিনি পারদর্শী তার সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। অথবা যথার্থ অনুবাদ এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে। তবে এ বিষয়টি মাথায় রেখে কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে যে, এ কোরআন কোনো বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। এটি হিদায়াতের গ্রন্থ, মানব জাতির জীবন বিধান এবং মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের বর্ণনা সম্বলিত কিতাব।

কোরআন আল্লাহর বাণী কিনা এ বিষয়ে যারা সন্দেহ পোষন করেন, তাদেরকে অনুরোধ করবো আধুনিক বিজ্ঞানের পাশাপাশি পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করুন অথবা কোরআন ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্বলিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করুন। তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে, কোরআনের সত্যতা বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করতে যাবার মতো বোকামী যেনো কেউ না করেন। বরং বিজ্ঞানের সত্যতাকে অবশ্যই কোরআন দিয়ে যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান যা কিছু বলছে, তা অন্ধের মতো বিশ্বাস করা যাবে না।

কিছু সংখ্যক মানুষ বিজ্ঞানের থিউরীর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখেন এবং বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে আলেম-ওলামাদের ঘায়েল করার ঘৃণ্য মানসিকতা পোষণ করেন। তাদের জ্ঞান দৃষ্টি উন্মোচন করার লক্ষ্যেই আমি এ গ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানের সামান্য কয়েকটি দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আমার আলোচনায় ভুল-ভ্রান্তি থাকতেই পারে, কারো দৃষ্টিতে তেমন ভুল ধরা পড়লে তার সঠিক তথ্য আমাকে জানাতে অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ্। আমার এ আলোচনায় একজন মানুষও যদি আল কোরআনের পথ অনুসরণের তাগিদ অনুভব করে, তাহলে এটা হবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য এক অতুলনীয় পুরস্কার। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের সকলকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করুন- আমীন।

www.pathagar.com

সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) অনুসরণের সঠিক পদ্ধতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইত্তেবা-ই সুন্নাতের ব্যাখ্যা

ইত্তেবা আরবী শব্দ। এ শব্দের অর্থ হলো অনুসরণ করা, আনুগত্য করা, তাঁবেদারী করা, কারো পদাঙ্ক অনুসরণ করা, কারো পিছে পিছে চলা। রাসূলের ইত্তেবা করার অর্থ হলো, রাসূলকে অনুসরণ করা। রাসূলকে অনুসরণ সম্পর্কিত যে আয়াতসমূহ পবিত্র কোরআনে এসেছে, সেসব আয়াতেও ইত্তেবা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ

হে রাসূল! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকেও ভালোবাসবেন; তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ ক্ষমাকারী- করুণাময়। (সূরা আলে ইমরাণ-৩১)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'ইত্তেবা' শব্দ ব্যবহার করে তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করার কথা বান্দাদের জানিয়ে দিলেন এবং এ কথা স্পষ্ট করে দিলেন যে, মানুষ যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে তাকে অবশ্য অবশ্যই তাঁর প্রেরিত রাসুলকে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার এ ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই। সেই সাথে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসুলকে যারা অনুসরণ করবে, তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভালোবাসবেন অর্থাৎ তাদের ওপরে তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

সুন্নাহ্-ও আরবী শব্দ। এই সুন্নাহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ করা হয়েছে, তরীকা, পথ-রাস্তা, রীতি-নীতি। আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনেও সুন্নাহ্ শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং তিনি তাঁর নিয়মকে সুন্নাহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

سُنَّةَ مَنْ قَدْاَرْسَلْنَاقَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُلِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلاً-

আপনার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি এ হলো তাদের ব্যাপারে সুন্নাত এবং আপনি কখনও আল্লাহর সুন্নাতের কোন ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাবেন না। (সূরা বনী ইসরাঈল)

সূরা 'ফাতাহ্'-এ আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেছেন-

www.pathagar.com

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً–

আল্লাহর সুন্নাত, যা পূর্ব থেকেই কার্যকর রয়েছে, আর কখনও আল্লাহর এ সুন্নাতে কোন ধরনের পরিবর্তন দেখবে না। (সূরা ফাতাহ্)

সূরা ফাতির–এ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন–

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيْلاً–

তুমি আল্লাহর সুন্নাতে কোন ধরনের পরিবর্তন হতে, কোন প্রকারের ব্যতিক্রম হতে দেখতে পাবে না। (সূরা ফাতির)

পবিত্র কোরআনের এসব আয়াতে যে সুন্নাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তাফসীরকারগণ ও আরবী ভাষাবীদগণ এর অর্থ করেছেন, 'পথ, পন্থা, পদ্ধতি, আল্লাহর কর্মকুশলতার বাস্তব পদ্ধতি, আল্লাহর নিয়ম।'

সুতরাং বুঝা গেল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে পদ্ধতি ও নিয়মের অধীনে তাঁর সৃষ্টিসমূহ পরিচালিত করছেন, তা হলো আল্লাহর সুন্নাত এবং তাঁর সুন্নাতে কখনও কোন পরিবর্তন হয় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে দৃষ্টি দান করেছেন দর্শন করার জন্য। শ্রবণ শক্তি দান করেছেন শোনার জন্য। মস্তিষ্ক দান করেছেন চিন্তা গবেষণা করার জন্য। মাথা দিয়ে যেমন চোখের কাজ চলে না, হাত দিয়ে যেমন কানের কাজ চলে না, পা দিয়ে মুখের কাজ চলে না। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ যে কাজের জন্য নির্ধারণ করেছেন, তাই আল্লাহর সুন্নাত এবং আল্লাহর এ সুন্নাতে কোন ব্যতিক্রম নেই।

সুন্নাতে নববী এবং ইত্তেবা–ই সুন্নাত হলো রাসুলের নিয়ম এবং তাঁর অনুসরণ করা। হাদীস গবেষকগণ অনেক ক্ষেত্রেই সুন্নাতের অর্থ করেছেন, 'শরীয়াত।' এই অর্থে ইত্তেবা-ই সুন্নাতের অর্থ হলো, নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে মানব জাতির জন্য যে জীবন বিধান লাভ করেছেন, তা অনুসরণ করা।

এই অর্থে সুন্নাত হলো সেই মৌলিক আদর্শ, যে আদর্শ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র পৃথিবীবাসীর অনুসরণ- অনুকরণের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। যে আদর্শ আল্লাহর রাসুল স্বয়ং তাঁর বাস্তব জীবনে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালনের বিশাল বিস্তীর্ণ অঙ্গনে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছেন এবং মানব জাতিকে অনুসরণ করার আহ্বান করেছেন। নবী করীম (সাঃ) অনুসরণ করেছেন আল্লাহর দেয়া নিয়ম-নীতি। তিনি বলেছেন–

www.pathagar.com

اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَايُوْحٰى اِلَىَّ-

আমি কারো কোন আদর্শই অনুসরণ করি না, আমি তাই অনুসরণ করি, যা আমার কাছে ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়।

ইসলামে সুন্নাত বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হলো হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণের ভাষায়, 'নবী করীম (সাঃ) এর মৌখিক বক্তব্য, তাঁর ক্রিয়া-কর্ম, আর অন্য কারো কথায় বা কাজে তাঁর সমর্থন। তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন অথবা অন্য কারো কাজে বা কথায় যেসব বিষয়ে তিনি সমর্থন দান করেছেন, এগুলোর সমষ্টিই হলো ইসলামী শরীআত। এ অর্থে আল্লাহর রাসুলের সুন্নাতের অনুসরণ করার অর্থই হলো ইসলামী শরীয়াতের আনুগত্য করা। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِى فَقَدْ اَحَبَّنِى وَمَنْ اَحَبَّنِى كَانَ مَعِىَ فِى الْجَنَّةِ-

যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো সে প্রকৃত অর্থে আমাকেই ভালোবাসলো। আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে অবস্থান করবে।

এখানেও সুন্নাতকে শরীয়াত বা নবী করীম (সাঃ) এর পরিপূর্ণ জীবনাদর্শকেই বুঝতে হবে। এক কথায় ইসলামী শরীয়াতই সুন্নাতে রাসুলের পরিপূর্ণ রূপ তথা ইসলামের সমগ্র অবয়ব। এদিক থেকে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জুমা, ঈদ ও কোরবানী ইত্যাদি ইবাদাত পর্যায়ের বিষয়াদি–আর শরীয়াত মোতাবিক বিয়ে-শাদী, লেন-দেন, বিচার কার্য পরিচালনা ও রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি মুআমালাত পর্যায়ের বিষয়াবলী সব কিছুই সুন্নাতে রাসুলের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী আইন বিশারদগণ তথা ফোকাহায়ে কেরাম কর্তৃক কোরআন ও হাদীস থেকে নির্গত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইত্যাদী পর্যায়ভুক্ত যে কোন প্রকারের বিষয়াদি মূল সুন্নাতে রাসুলের অন্তর্ভুক্ত।

এদিক থেকে ইসলামী শরীয়াত ও সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) একই জীবনাদর্শের দুটো নাম। সুন্নাতে রাসুলকে এ ধরনের ব্যাপক অর্থের ধারক হিসেবে গ্রহণ করা হলে, তখন এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সুন্নাতে রাসুলের অনুসরণই হেদায়াতের বাস্তবরূপ, আর সুন্নাতে রাসুলকে প্রত্যাখ্যান করাই হলো পথভ্রষ্টতা তথা। নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন-

لَوْتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ-

www.pathagar.com

তোমরা যদি তোমাদের নবীর সুন্নাতকে (জীবনাদর্শকে) প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। (আল হাদীস)

সিরাতুল মুস্তাকিম বা হেদায়াতের পথে চলা শুধুমাত্র কোরআনের ওপরে নির্ভর করে না। এ পথে চলতে হলে অবশ্যই রাসুলের সুন্নাতকেও অনুসরণ করতে হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِنِّى تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا اَبَدًا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّتِىْ وَلَنْ يَّفْتَرِقَا حَتّٰى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ–

আমি তোমাদের মধ্যে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, এ দুটো জিনিসের অনুসরণ করতে থাকলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। সে দুটো জিনিসের একটি হলো আল্লাহর কিতাব আর অপরটি হলো আমার সুন্নাত এবং কিয়ামতের দিন হাউজে কাওসারে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এ দুটো জিনিস কখনও একটির সাথে থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন হবে না। (মুস্তাদরাকে হাকেম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১৩)

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ দান কালেও আল্লাহর রাসুল তাঁর সুন্নাতের অনুসরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তা অনুসরণের জন্য মানব জাতিকে তাগিদ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন–

يَاأَيُّهَاالنَّاسُ قَدْتَرَكْتُ فِيْكُمْ مَاانْ اعْتَصَمْتُمْ بِهٖ فَلَنْ تَضِلُّوْا اَبَدًا اَمْرًا بَيْنَنَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهٖ–

হে মানব গোষ্ঠী! আমি তোমাদের কাছে এমন এক অমূল্য সম্পদ রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি সে সম্পদকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, তাহলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। সে সম্পদ হলো আল্লাহর কোরআন ও তাঁর নবীর সুন্নাত। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে হাকিমেও তাঁর রাসুলের সুন্নাতকে অনুসরণ করার জন্য বারবার নির্দেশ দান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَاۤ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ، وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا–

রাসুল তোমাদেরকে যা কিছু দান করে তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ ও ধারণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। (সূরা হাশর-৭)

www.pathagar.com

রাসুলের সুন্নাত অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে সত্য-সঠিক পথ। তাঁর সুন্নাত ব্যতীত সহজ-সরল পথ লাভ করা কল্পনার অতীত। মহান আল্লাহ বলেন–

وَاِنْ تُطِعُوْهُ تَهْتَدُوْا–

তোমরা রাসুলের আনুগত্য ও অনুসরণ করলেই সত্য সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে। (সূরা নূর-৫৪)

রাসুলের সুন্নাতের অনুসরণ করার অর্থই হলো আল্লাহর আদেশ পালন করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ–

যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করবে, সে-ই যথার্থ অর্থে আল্লাহর আনুগত্য করলো। (সূরা নিছা-৮০)

রাসুলের সুন্নাত অনুসরণ না করলে তথা তাঁর আদেশ-নিষেধ না মানলে, তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা করলে আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ–

যারা রাসুলের আদেশের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের ওপর যে কোন বিপদ-মুসিবত আসতে পারে অথবা কোন কঠিন আযাব তাদেরকে পরিবেষ্টন করতে পারে। (সূরা নূর-৬৩)

রাসুলের সুন্নাতের সাথে সামান্যতম দ্বিমত পোষণ করা, তাঁর সুন্নাতের ব্যাপারে কোন সংশয়-সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খাওয়ার কারো কোন অধিকার নেই। প্রশ্নাতীতভাবে তাঁর ইত্তেবা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا-

www.pathagar.com

কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ও রাসুলের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ আসার পর তা অনুসরণ করা না করার ব্যাপারে মুমিন পুরুষ ও নারীদের কোন অধিকারই থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের নাফরমানী করে সে পথভ্রষ্ট হয়ে ইসলাম থেকে অনেক দূরে চলে যায়। (সূরা আহযাব-৩৬)

রাসুলকে কোন মুসলমান অনুসরণ করতে অনিচ্ছুক হলে সে কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

قُلْ اَطِيْعُوْ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ، فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ-

হে নবী আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ ও রাসুলকে মেনে চলো, যদি তা না করো তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্ কাফিরদের ভালোবাসেন না। (সূরা ইমরাণ-৩২)

সুন্নাতের অনুসরণ অপরিহার্য

মহান আল্লাহ্ যেমন আদেশ-নিষেধ দান করার ব্যাপারে কারো মুখাপেক্ষী নন-সম্পূর্ণ স্বাধীন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসুলও তেমনি স্বাধীন। আদেশ-নিষেধ দানের ক্ষেত্রে তিনি কোন মানুষের মুখাপেক্ষী নন। মুসলিম পরিচয় দানকারী ব্যক্তি রাসুলের আদেশ-নিষেধ তথা তাঁর সুন্নাত অনুসরণে বাধ্য। আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত ও নির্দেশের সাথে দ্বিমত পোষণ করলে মানুষ যেমন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, কাফির হিসেবে চিহ্নিত হয়, রাসুলের আদেশ-নিষেধের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং কাফির হয়ে যাবে।

আরেকটি ব্যাখ্যানুসারে সুন্নাত হলো, নেক কর্মসমূহের একটি বিশেষ স্তর। ইসলামী শরীয়াতের বিধি-নিষেধ পালনের সুবিধার্থে, ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী মুজতাহিদ ইমামগণ কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রামাণ্য করণীয় বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও মোস্তাহ্সান ইত্যাদি স্তরসমূহের বিভক্তি দেখিয়েছেন। অপরদিকে বর্জনীয় বিষয়াদিকে হারাম, মাকরুহে তাহ্রিমী ও সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি ইত্যাদি স্তরে বিভক্ত করে উপস্থাপিত করেছেন। আবার শরীয়াত কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়নি এমন ধরনের বিষয়াদিকে মুবাহ্ বা হালালের স্তরে রেখেছেন।

শরীয়াতের এ ধরনের স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনবীদগণ তথা ফিকাহ্বীদগণ ফরজ ও ওয়াজিবের পরবর্তী পর্যায়ের করণীয় বহু বিষয়াদিকে সুন্নাত

www.pathagar.com

নামে আখ্যায়িত করেছেন। সুন্নাত মুস্তাহাব পর্যায়ের করণীয় নেক কাজগুলো ফরজ ও ওয়াজেবের ক্ষতি পূরণের পক্ষে সহায়ক। ফিকাহ্‌বীদগণ ফরজ-ওয়াজিবের পরবর্তী পর্যায়ের কাজগুলোকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।

প্রথমতঃ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্‌ অর্থাৎ এমন ধরনের সুন্নাত কাজ যা পালন করার জন্য জোর তাকিদ করা হয়েছে।

জামায়াতের সাথে ফরজ নামায আদায় করা, মুষ্ঠি পরিমাণ দাড়ি রাখা, গোঁফ খাটো করা, পুরুষের খাত্‌না করা, যথা সময়ে হাত-পায়ের নখ কাটা, নাভীর নীচের পশম পরিষ্কার করা, বোগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা; নারীর উভয় ক্ষেত্রে উপড়ানো, মুসলমানের দাওয়াত গ্রহণ করা, মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাতে একের প্রতি অন্যের সালাম আদান-প্রদান করা, মোসাফাহ্‌ করা, মাথায় টুপি রাখা ইত্যাদি কাজগুলো সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্‌ পর্যায়ের। রোযা পূর্ণ করে সূর্যাস্তের পর ইফ্‌তার করা, আর রোযা রাখার জন্য সেহ্‌রী খাওয়াও সুন্নাত। তবে সোবহে সাদেক হয়ে গেলে কিছুই খাওয়া বা পান করা যাবে না। বরং তখন কিছু খেলে বা পান করলে রোযা হবে না।

এক মুষ্ঠিরও কম পরিমাণ দাড়ি কেটে ছোট করা মাকরুহে তাহরীমী। দাড়ি শুধু নীচের দিকে বৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে মুখের দু'পাশ থেকে কেটে ছোট করাও মাকরুহে তাহরীমী। দাড়িকে বৃদ্ধি লাভ করতে দেয়া আর গোঁফ খাটো করা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى-

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের গোঁফ খুব ছোট করবে আর দাড়ি লম্বা করবে। (মুসলিম শরীফ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১২৯)

দাড়ি সম্পর্কে আরো একটি হাদীসে বলা হয়েছে-

عن ابى هريرة رضى الله تعلى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا للحى خالفوا المجوس-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের গোঁফগুলো খুব খাটো করবে, আর দাড়িগুলো লম্বা করে রাখবে। (এ ব্যাপারে) অগ্নি পূজকদের বিপরীত করবে। (মুসলিম শরীফ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১২৯)

অর্থাৎ যারা আগুনের পূজা করে তারা গোঁফ বড় করে রাখে এবং দাড়ি ছোট করে অথবা দাড়ি একেবারেই কেটে ফেলে। এ জন্য হাদীসে বলা হয়েছে, তোমরা তাদের বিপরীত করবে।

আবার অন্য হাদীসে মুখের দু'দিকের ও নীচের দিকের দাড়ি কেটে ছোট করে রাখার কথা রয়েছে। দাড়ি লম্বা করে রাখা এবং কেটে ছোট করে রাখার উভয় পর্যায়ের হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর আমল সম্পর্কীত হাদীসটি সনদ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রদ্দুল মোহতার কিতাবের তৃতীয় খন্ডের ৩৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'দাড়ি সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বিশুদ্ধ সুত্রে বর্ণনা এসেছে যে, তিনি এক মুষ্ঠি থেকে অতিরিক্ত দাড়ি ছেটে নিতেন।

তবে এ ক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসারী এক শ্রেণীর ভোগবাদী লোক ষ্টাইল হিসেবে যেমন ছোট ছোট দাড়ি রাখে, তাদেরকে অনুসরণ করা ইসলামী আইন বিশারদগণের কেউ বৈধ বলে মনে করেননি। এক মুষ্ঠি দাড়ির অতিরিক্ত দাড়ি ছেটে নেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যামূলক কিতাব বাজলুল মাজহুদের প্রথম খন্ডের ৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আর তা এভাবে করতে হবে যে, পুরুষ লোক তার নিজ দাড়ি হাতের মুঠোয় ধরবে, তারপর মুঠোর বাইরের অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলবে। এমন ধরনের পদ্ধতির বিষয়টি ইমাম মুহাম্মদ (রাহঃ), ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) থেকে কিতাবুল আসারে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করা ও গায়ে লম্বা জামা পরিধান করা সুন্নাতে যায়েদাহ্ বা মুস্তাহাব পর্যায়ের কাজ। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) পাগড়ী ও লম্বা জামা পরিধান করেছেন বলে সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত। সুতরাং লম্বা জামা ও পাগড়ী ব্যবহার করতে পারলে উত্তম। কিন্তু নিজে লম্বা জামা ও পাগড়ী ব্যবহারও করবে না এবং যারা ব্যবহার করবে তাদেরকে বিদ্রুপ করবে, এটা বৈধ হবে না। মনে রাখতে হবে, আল্লাহর রাসুল এসব ব্যবহার করেছেন, সতরাং এ ধরনের বিদ্রুপ করা থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করতে হবে। আল্লাহর রাসুলের যে কোন সুন্নাত–তা হতে পারে বাহ্যিক দৃষ্টি থেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পর্যায়ের, তার প্রতি সামান্যতম অবহেলা

www.pathagar.com

অবজ্ঞা প্রদর্শন করা যাবে না। এ ব্যাপারে তেমনি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেমনভাবে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কারণ মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ، وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا–

আমার রাসুল তোমাদেরকে যা কিছু দান করেন তা তোমরা পূর্ণভাবে গ্রহণ ও ধারণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। (সূরা হাশর-৭)

কোরআনের উল্লেখিত আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, রাসুলের নির্দেশের মধ্যে ফরজ আর ওয়াজিব পর্যায়ের বিষয়গুলোই অনুসরণ করতে হবে আর সুন্নাতগুলো অনুসরণ না করলেও চলবে। বরং আল্লাহর এ নির্দেশের মধ্যে রাসুলের সুন্নাত অনুসরণের কথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং রাসুলের সুন্নাতকে অবহেলা করার অর্থই হবে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা।

শরহে ফিকহে আকবর নামক কিতাবের ২২৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হানাফী ফিকাহবীদগণ ঐ ব্যক্তির প্রতি কুফরী ফতোয়া আরোপ করেছেন, যে ব্যক্তি রাসুলের কোন সুন্নাতকে অবজ্ঞা করে সব সময় পরিহার করে থাকে। তবে যারা সুন্নাতকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করে না, বরং সুন্নাতকে পালনীয় সওয়াবের কাজ বলে গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে স্বীকার করে, কিন্তু অলসতা বশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে সুন্নাত পালন করে না, অথবা সুন্নাত ছুটে যায় এবং এ কারণে অন্তরে অনুশোচনা করে, এমন লোকদের ওপর উল্লেখিত কঠোর ফতোয়া নিপতিত হবে না। কেননা, সুন্নাতের বিরোধী হওয়া এক ব্যাপার আর মাঝে মধ্যে কোন কারণে ছুটে যাওয়া ভিন্ন ব্যাপার।

সুন্নাত পরিহার সংক্রান্ত বিষয়ে মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যামূলক কিতাব মিরকাতুল মাফাতীহ–প্রথম খন্ডের ৪৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, অলসতা বশতঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রমাণ্য সুন্নাত পরিহার করা হলে সুন্নাত পরিহারকারী ব্যক্তি গুনাহের অভিযোগে তিরস্কৃত হবে। আর অবজ্ঞা বশতঃ সুন্নাত পরিহার করা হলে সুন্নাত পরিহারকারী ব্যক্তি গুনাহের অভিযোগে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সুন্নাতকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পরিপূর্ণভাবে সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে ফিকাহবিদ ইমামগণের উল্লেখিত মতামত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াতের যথাযথ আনুগত্যের প্রশ্নে অত্যন্ত গভীর ও ফলপ্রসু ব্যবস্থা–এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। পরিপূর্ণ আমলেই পরিপূর্ণ শান্তির আশা করা যায়।

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিসগণ সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও ক্রিয়া কর্মকেও সুন্নাত ও হাদীস নামে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকৃত অর্থে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও ক্রিয়া কর্মের মানদন্ড ব্যতিত নবী করীম (সাঃ) এর যথাযথ অনুসরণ ও অনুকরণ কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

মিশকাতুল মাসাবীহের শরাহ মিরকাতুল মাফাতীহ্–অষ্টম খন্ডের ১৩৯ পৃষ্ঠা–(১) কিতাবুল ওয়াফা (২) ইবনে মাজাহ্ (৩) জামেয়ে সগীর ও (৪) মুস্তাদরিকে হাকেম ইত্যাদি হাদীসের কিতাবাদি থেকে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) টাখ্নুর ওপর পর্যন্ত লম্বা কামিস পরিধান করতেন। আল্লাহর রাসুলের সাহাবায়ে কেরাম নবীর কাছ থেকে যা শুনতেন, নবীকে করতে দেখতেন, এসব বিষয় তাঁরা অন্যকে অবগত করা এবং পর্যালোচনা করেই ক্ষান্ত হতেন না, তাঁরা তা নিজেদের জীবনে বাস্তবে রূপদান করতেন।

নবী করীম (সাঃ) যখন কোন আকীদা ও নিছক তত্ত্বমূলক কথা বলেছেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম তা নিজেদের স্মৃতিতে বদ্ধমূল করে নিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী নিজেদের আকীদা বিশ্বাসের সৌধ নির্মাণ করেছেন। নবী করীম (সাঃ) যখন কোন আদেশ-নিষেধমূলক কথা বলেছেন, কোন আইন জারী করেছেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম সাথে সাথে তা কাজে পরিণত করেছেন। রাসুলের আদেশ-নিষেধ ও জারী করা আইনকে যতক্ষণ প্রতিদিনের জীবনে নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত না হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা তা চর্চা ও অভ্যাস করার ব্যাপারে সামান্য অবহেলা প্রদর্শন করেননি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেন, আমাদের মধ্যে যখন কেউ দশটি আয়াত শিক্ষালাভ করতো, তখন তার অর্থ অত্যন্ত ভালোভাবে অনুধাবন করা এবং তা অনুসারে কাজ করার পূর্বে সে আর দ্বিতীয় কিছু শেখার জন্য চেষ্টা করতো না। (জামেউল বায়ান)

অর্থাৎ যা শেখা হলো; তার মমার্থ অনুধাবন না করে এবং তা বাস্তব জীবনে কর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত না করে সাহাবায়ে কেরাম আরো কিছু শেখার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন না। শেখা হলো অনেক কিছু কিন্তু আমল করা হলো না–সাহাবায়ে কেরামের জীবন এমন ছিল না। ইসলামের মৌলিক বিধানসমূহ সাহাবায়ে কেরামের জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহর রাসুল বিশেষভাবে যত্ন নিতেন। মুসলিম জনগোষ্ঠী তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করছে কিনা, সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন।

www.pathagar.com

তিনি ইসলামের ব্যবহারিক নিয়ম পদ্ধতির অনুসরণের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। ইসলামের মৌলনীতি গুলো যেন মুসলমানদের প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়, এ জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। বোখারী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন–

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ–

তোমরা আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখো, ঠিক অনুরূপভাবে নামায আদায় করবে। (বোখারী)

একইভাবে হজ্জের ব্যাপারে তিনি বলেছেন–

خُذُوْا عَنِّىْ مَنَا سِكَكُمْ–

আমার কাছ থেকে তোমরা হজ্জ পালন করার নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করো। (মুসলিম)

পবিত্র কোরআনে নামায আদায় করার আদেশ, রোযা রাখার আদেশ, যাকাত আদায়ের আদেশ ইত্যাদি আদেশের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এসবের বিস্তারিত দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। সুতরাং আল্লাহর আদেশের বিস্তারিত দিক জানতে ও অনুসরণ করতে হলে তা আল্লাহর রাসুলের কাছ থেকেই জানতে হবে এবং নবী করীম (সাঃ) যেভাবে অনুসরণ করেছেন, সেভাবেই করতে হবে। কারণ রাসুল ছিলেন গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য শিক্ষক। প্রত্যেকটি কাজের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং সে কাজ বাস্তবে করে মানুষের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম সে নিয়মেই সে কাজ সম্পাদন করেছেন।

ইসলামী বিধানের নিয়ম-পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে পালন করছেন, রাসুল সেদিকে লক্ষ্য করতেন। কারো কোন ভুল হলে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। বোখারী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, একদিন তিনি মসজিদে নববীতে লক্ষ্য করলেন, একজন সাহাবীর নামায আদায় পদ্ধতি যথাযথভাবে সম্পাদিত হলো না। নামায সমাপ্ত করে সাহাবী যখন তাঁর কাছে এলেন তখন তিনি তাঁকে বললেন, তোমার নামায যথাযথভাবে আদায় করা হয়নি, যাও নামায যথাযথ নিয়মে আদায় করো।

সাহাবী সাথে সাথে চলে গেলেন নামায আদায় করার জন্য। নবী করীম (সাঃ) আবার বললেন, এবারও তোমার নামায আদায় পদ্ধতি ঠিক হলো না। সাহাবী

www.pathagar.com

পুনরায় নামায আদায় করলেন। এভাবে চারবার করার পরেও যখন সাহাবীর নামায আদায়ের নিয়ম ঠিক হলো না, তখন নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং নামাযে দাঁড়িয়ে উক্ত সাহাবীকে নামায আদায়ের পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসুলের কাছে থেকে ইসলামের আদর্শিক, নীতিগত ও বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হবার সাথে সাথে তা শুনতেন এবং মুখস্থ করে নিতেন এবং সে আয়াতের মর্ম তাঁরা রাসুলের কাছ থেকেই জেনে নিতেন।

শুধু তাই নয়, সাহাবায়ে কেরামও আল্লাহর রাসুলের প্রতিটি পদেক্ষপ, প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি স্পন্দনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। বোখারী ও আবু দাউদ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, কয়েকজন ব্যক্তি হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রাঃ) কে প্রশ্ন করেছিলেন, 'নবী করীম (সাঃ) জোহরের নামায আদায় করার সময় কি কোরআন তেলাওয়াত করতেন?' তিনি জবাব দিলেন, 'কোরআন তিলাওয়াত করতেন।' তাঁরা জানতে চাইলেন, 'আপনারা তো পিছনে থাকতেন, বুঝতেন কিভাবে যে তিনি কোরআন তিলাওয়াত করছেন?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমরা নবী করীম (সাঃ) এর শ্মশ্রুর কম্পন দেখেই অনুভব করতে পারতাম।'

মুসলিম ও আবু দাউদ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (সাঃ) জোহর ও আসরের নামাযে দাঁড়িয়ে কত সময় ব্যয় করতেন, তা আমরা অনুমান করে দেখতাম। আমরা দেখতাম, তিনি প্রথম দুই রাকা'আতে তিন আয়াত কোরআন তিলওয়াতের সমান সময় এবং শেষ দুই রাকাআতে তার অর্ধেক পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন।'

মুসনাদে আহ্মাদে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন লোক হযরত ওমর (রাঃ) কে প্রশ্ন করলেন, 'আমরা কোরআনে শুধু ভয়কালীন নামায ও নিজের বাড়িতে থাকাকালীন নামায সম্পর্কে উল্লেখ দেখতে পাই। কিন্তু ভ্রমণকালে কিভাবে নামায আদায় করতে হবে, তা দেখতে পাই না। কেন দেখতে পাই না?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমরা দ্বীন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। এ অবস্থায় আল্লাহ অনুগ্রহ করে নবী করীম (সাঃ)কে আমাদের জন্য রাসুল করে পাঠালেন। সুতরাং এখন আমরা তাঁকে যেভাবে দ্বীনের কর্মসমূহ সম্পাদন করতে দেখি, অনুরূপভাবে তাই করতে থাকি।'

সাহাবায়ে কেরাম এমন অনেক কাজেও রাসুলের করা কাজের হু-বহু অনুসরণ-অনুকরণ করতেন, যে কাজ অনুসরণ করা শরীয়াত অনুসারে অপরিহার্য নয়। তবুও সাহাবগণ তা আন্তরিকতার সাথে অনুসরণ করতেন। প্রকৃত পক্ষে

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরামের এমন অনুসরণের মাধ্যমেই নবী করীম (সাঃ) এর জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দিকও সংরক্ষিত হয়েছে, বর্তমান যুগের মানুষ তা জানতে পারছে। সুতরাং নবী করীম (সাঃ) এর সুন্নাত হিসেবে আমাদের সামনে যা রয়েছে, তা অনুসরণ করা আমাদের জন্য একান্ত অপরিহার্য। আহার করে আমাদের যখন জীবন ধারণ করতেই হয়, তাহলে সে আহারের পদ্ধতি নবী করীম (সাঃ) এর কাছ থেকেই গ্রহণ করা উচিত। দাড়ি যখন রেখেছি তখন তা রাসুলের অনুসরণেই রাখা উচিত। এভাবে রাসুলের সুন্নাত অনুসরণে সচতেনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করতে হবে।

যে নবী ও রাসুলদেরকে অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা এত তাগিদ দিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমাদেরকে এ কথা জানতে হবে যে, কেন এই রিসালাত ও নবুয়্যতের প্রয়োজনীতা। কেন মানুষের জন্য নবুয়্যত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কারণ নবী ও রাসূল ব্যতিত মানুষ কোনক্রমেই সত্য ও সঠিক পথ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম নয়।

কেন নবুয়্যতের প্রয়োজন

এই পৃথিবীতে মানুষের সর্বপ্রথম প্রয়োজন হলো নবুয়্যাতের। মানুষকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে। পশুর যেমন কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য নেই, মানুষ এমন নয়। মানুষের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। তাকে খলীফা হিসেবে এখানে প্রেরণ করা হয়েছে এবং কিভাবে সে খলীফা হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে, এ সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা এবং জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। মানুষের নিজের পরিচয় জানার জন্য, স্রষ্টার পরিচয় ও তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য, পৃথিবীতে শান্তি লাভ ও পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় জিনিসটির নাম হলো নবুয়্যাত ও রেসালাত।

পৃথিবীর একজন বিজ্ঞানী একটি জটিল মেশিন প্রস্তুত করলেন। তারপর তা বিশ্ব বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিলেন। অসংখ্য মানুষ তা ক্রয় করে বাড়িতে এনে দেখলো, এই মেশিনের ভেতরে অপারেটিং গাইড নেই। যে বিজ্ঞানী উক্ত মেশিন প্রস্তুত করেছেন, তিনি কাউকেই সে মেশিন পরিচালনা করতে শিক্ষাদান করেননি বা মেশিনের সাথে কোন Operating Guide দেননি। তখন বাধ্য হয়েই ক্রেতা সাধারণ যে কোম্পানীর কাছ থেকে মেশিন ক্রয় করেছে, সে কোম্পানীর কাছে ধর্ণা দেবে। কোম্পানী ধর্ণা দেবে মেশিনের প্রস্তুত কর্তার কাছে। অর্থাৎ মেশিনের স্রষ্টার দায়িত্ব হলো Operating Guide মেশিনের সাথে দিয়ে দেয়া।

www.pathagar.com

এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এই মানুষকে সহজ সরল ও সত্য পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব হলো মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার। পবিত্র কোরআনের সূরা নাহ্‌লে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ–

পৃথিবীতে যেহেতু বহু বাঁকা পথের অস্তিত্ব রয়েছে, সেখানে সত্য সহজ সরল পথ প্রদর্শন করা আমার দায়িত্ব। (সূরা আন নাহ্‌ল–৯)

অসংখ্য বাঁকা পথ বলতে ইসলামের বিপরীত মতবাদ মতাদর্শকেই বুঝানো হয়েছে। এই বাঁকা পথগুলোর ভেতর থেকে কোনটি সোজা-সরল পথ, তার সন্ধান দানের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালার। এ জন্য তিনি অসংখ্য নবী-রাসুল প্রেরণ করে তাদের মাধ্যমে মানুষকে সহজ-সরল পথের সন্ধান দান করেছেন। কত সংখ্যক নবী ও রাসুলকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে, তা কোরআন ও হাদীসে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। কোরআনে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে, এমন কোন জনপদ বা জনগোষ্ঠী নেই, যেখানে হেদায়াতকারী প্রেরণ করা হয়নি।

আল্লাহ তা'য়ালা কতক নবীদের নাম আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং যে সকল নবী-রাসূলের নাম মানুষকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি, তাদের নাম নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। অনেকে নবীদের নানা ধরনের সংখ্যা বলে থাকেন। আমরা তাঁদের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত নই বিধায় আমরা বলছি, তাদের সংখ্যা অসংখ্য অগণিত।

নবীদের সম্পর্কে আরেকটি কথা আমাদেরকে স্পষ্ট জেনে নিতে হবে যে, মানুষ ইচ্ছে করলে কাউকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করতে পারে না। কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নবী হতে পারে না। নবী নির্বাচিত করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার। এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য নবী প্রয়োজন। কারণ প্রাণী জগতের দিকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই, সকল প্রাণীর আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র লাভ করেছে। মানুষই হলো একমাত্র প্রাণী, যার আত্মরক্ষা করার মতো কোন অস্ত্র নেই। গরুর দিকে তাকালে দেখা যায়, সে আত্মরক্ষা করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দুটো তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী শিং লাভ করেছে। মৌমাছি আত্মরক্ষা করার জন্য বিষযুক্ত হুল পেয়েছে, হাতী লাভ করেছে শুঁড়, বাঘ লাভ করেছে থাবা, সর্প লাভ করেছে বিষযুক্ত তীক্ষ্ণ দন্ত। এভাবে দেখা যাবে প্রায় প্রতিটি প্রাণীই আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র লাভ করেছে। কিন্তু মানুষকে এদিক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মানুষকে যদি আত্মরক্ষা করতে হয় তাহলে পৃথিবীর কোন কিছুর সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

মানুষ ভীষণ এক দুর্বল জীব। অন্যান্য প্রাণীসমূহ যে দৃষ্টি শক্তি লাভ করেছে, মানুষ তা লাভ করেনি। রাতের নিকষ কালো অন্ধকারে মানুষ তার চোখ দিয়ে কিছুই দেখতে পায় না। মানুষ আলোর সাহায্য ব্যতিত কিছুই দেখতে পায় না, সে শক্তি তার নেই। এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর এমন সব প্রাণী রয়েছে যারা যে কোন অবস্থায় দেখতে পায়। অন্ধকার যতই গভীর হোক না কেন, বাঘ, কুকুর, বিড়াল, শৃগাল ইত্যাদি প্রাণীসমূহ দিনের আলোর মতই স্পষ্ট দেখতে পায়।

সুতরাং মানুষ ভীষণ দুর্বল প্রাণী–আর মানুষের এই দুর্বলতা সম্পর্কে মানুষ তেমন একটা অবগত নয়। কিন্তু যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষের যাবতীয় দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন। তিনি জানেন, এই দুর্বল মানুষগুলোকে ধোকা দিয়ে এক শ্রেণীর চতুর মানুষগুলো তাদেরকে শোষণ করবে, তাদের ওপরে প্রভুত্ব করবে, তাদেরকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং আল্লাহ মানুষকে আলোর দিকে পথ প্রদর্শনের জন্য আলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিশ্বনবী স্বয়ং হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই আলো। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে নিজের পরিচয় বিশ্ববাসীর সামনে এভাবে দিতে বলেছেন–

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ–

নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এসেছে আলো, আর এসেছে সুস্পষ্ট কিতাব। (সূরা মায়েদা–১৯)

সুতরাং স্বয়ং আল্লাহ হলেন মানুষের পথ প্রদর্শক। কেননা মহান আল্লাহ হলেন মানুষের রব বা প্রতিপালক। তিনিই হলেন আইন দাতা, বিধান দাতা, তথা মানুষের জীবনের যতগুলো দিক রয়েছে, সমস্ত দিকের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব হলো মহান আল্লাহর। কারণ পৃথিবীর মানুষের জন্য চিন্তা এবং চলার বহু ধরণের পথ অবলম্বন করা সম্ভব এবং বাস্তবে তার অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত পথের সবগুলো পথ কোন ক্রমেই সত্য হতে পারে না। সহজ সরল হতে পারেনা। পারে মাত্র একটি পথ। আর একমাত্র সঠিক এবং সহজ সরল ও নির্ভুল জীবন দর্শন তাই হতে পারে যা সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে একজন মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, সত্য পথ কোনটি তা অনুসন্ধান করে বের করা।

এই বিষয়টি মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তাঁর জীবন ধারণের জন্য এই পৃথিবীতে যা কিছু প্রয়োজন হবে, মহান আল্লাহ তাকে প্রেরণের পূর্বেই এখানে প্রস্তুত করে রেখেছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল বস্তু মানুষের

www.pathagar.com

প্রয়োজন পূরণের জন্য। কিন্তু এসব বস্তু মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যে নির্ভুল জীবন ব্যবস্থার, তা পূরণ করতে সক্ষম নয়। এই জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজন যদি মানুষের পূরণ না হয়, তাহলে মানুষের গোটা জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

একটি বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করে দেখার প্রয়োজন যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর সেরা সৃষ্টি মানুষকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করার পূর্বে, মানুষের জীবন ধারণের জন্য সমস্ত কিছুর আয়োজন করে রেখেছেন, সেই আল্লাহ্ মানুষের সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন যে জীবন ব্যবস্থার, সেই জীবন ব্যবস্থা দান করবেন না, এটা কিভাবে চিন্তা করা যায় ? কোন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এটা তো কল্পনাও করতে পারেন না। মহান আল্লাহ্ মানুষের এই প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেছেন তাঁর নবুয়্যাত ও রিসালাত ব্যবস্থার মাধ্যমে।

এখন কোন মানুষ যদি গোটা নবুয়্যত ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে আগ্রহী হন, তা তিনি হতে পারেন। সে স্বাধীনতা তার রয়েছে। সেই সাথে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তার কাছে বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করতে চায়, নবুয়্যত ব্যবস্থা অস্বীকার করার পরে মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ আর কি ব্যবস্থা করেছেন, তা দয়া করে জানিয়ে দিতে হবে। তিনি হয়ত এই প্রশ্নের জবাবে বলবেন, সত্য পথ অনুসন্ধান করার জন্যই তো মহান আল্লাহ্ তাঁর সেরা সৃষ্টি এই মানুষকে জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টি দান করেছেন।

আমরা আবারো তার কাছে বিনয়ের সাথে জানাতে চাই, সত্য সহজ সরল পথ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মানুষের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার প্রমাণ হলো, মানুষ ইতিমধ্যেই তার চিন্তা শক্তি প্রয়োগ করে বহু পথ ও মত আবিষ্কার করে রেখেছে। তারপরেও মানুষ আল্লাহর প্রতি এ অভিযোগ করতে পারে না যে, তিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেননি। তিনি আমাদের জীবন ধারণের জন্য সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা এই পৃথিবীতে করেছেন, কিন্তু আমরা কোন জীবন দর্শন অনুসরণ করবো, তা তিনি আমাদেরকে জানানোর ব্যবস্থা করেননি। এই অভিযোগ মহান আল্লাহর প্রতি করার কোন অবকাশ তিনি মানুষের জন্য রাখেননি।

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা তার জন্মের সাথে সাথেই করেছেন। কেবল মাত্র ব্যতিক্রম হলো মানুষ। মানুষকে বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান এবং স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন করে তিনি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এমন একটি স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করা, যে সৃষ্টি তার নিজের খেয়াল খুশী মত ভুল অথবা নির্ভুল বা যে কোন পথ গ্রহণ করতে পারে। জীবন ব্যবস্থা

www.pathagar.com

অনুসরণ করার ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন। মানুষের এই স্বাধীনতা ব্যবহার করার জন্য মানুষকে জ্ঞান নামক হাতিয়ার দান করা হয়েছে। তার ভেতরে বুদ্ধি এবং চিন্তার জগৎ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে।

মানুষের ভেতরে ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণের শক্তি দান করা হয়েছে। মানুষ যেন তার ভেতরের এবং এই পৃথিবীর বস্তু নিচয় ব্যবহার করতে পারে এমন শক্তি ও জ্ঞান দান করা হয়েছে। সেই সাথে তার মনের জগতে এবং তার দেহের বাইরের জগতে এমন সব বস্তু রাখা হয়েছে, এসব কিছু তার সত্য পথ গ্রহণের ব্যাপারেও সাহায্য করতে পারে আবার ভুল পথ গ্রহণের ব্যাপারেও সহযোগিতা করতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণী এবং বস্তুর ন্যায় মানুষকে জন্মগতভাবে জীবন ব্যবস্থা অবলম্বনকারী হিসেবে সৃষ্টি করে দিলে সৃষ্টির সমস্ত কিছুই অর্থহীন বেকার হয়ে যেত।

মানুষের যদি স্বাধীন ক্ষমতা না থাকতো অন্যান্য বস্তুর মত, তাহলে মানুষের পক্ষে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করা কোন ক্রমেই সম্ভব হত না। এ কারণে মহান আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে জীবন ব্যবস্থা অনুসরণকারী হিসেবে সৃষ্টি না করে এমন স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন, যেন মানুষের জন্য সত্য পথ প্রদর্শনকারীর প্রয়োজন হয়। এখানেই প্রয়োজন হয় নবুয়্যত এবং রিসালাতের। এই জিনিষ মানুষ গ্রহণ করে সত্য পথও অবলম্বন করতে পারে এবং তার স্বাধীনতাও বজায় থাকে। মহান আল্লাহ মানুষের প্রতি এতই অনুগ্রহশীল যে, তিনি পৃথিবীতে মানুষের চলার জন্যও পথ নির্দেশ দান করেছেন।

মানুষ মরুপথে চলবে, সে যেন পথ হারিয়ে না ফেলে এ জন্য আকাশের তারকা সৃষ্টি করে তাকে পথের সন্ধান দান করেছেন। মরুপথে এবং নৌপথে মানুষ দিক ঠিক রাখে আকাশের তারকা দেখে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাঁর মহান অনুগ্রহের কথা মানুষকে বারবার স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে মানুষ পথ চলবে সে কারণে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহর জন্য পাহাড়ের ভেতরে চলার পথ সৃষ্টি করেছেন। মরুপ্রান্তরে মানুষ যেন পানির তৃষ্ণায় ইন্তেকাল না করে, একারণে মরুভূমির বিভিন্ন স্থানে পানি সরবরাহকারী পান্থ পাদপ গাছ সৃষ্টি করেছেন। এমন ধরণের কতিপয় গাছ সৃষ্টি করেছেন, যে গাছের ভেতর থেকে মানুষ পানি লাভ করতে পারে।

মরুভূমিতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহর জন্য নানা ধরণের খাদ্য মওজুদ রেখেছেন। পাহাড়ে ঝর্ণা সৃষ্টি করে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহর পানির অভাব দূর করেছেন। এতসব ব্যবস্থা যে আল্লাহ মানুষের জন্য করেছেন, সেই মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহর

www.pathagar.com

জন্য পৃথিবীতে কোন জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজন পূরণ করবেন না, এটা কি মেনে নেয়া যায়? বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে বান্দাহ্ যেন পথ হারিয়ে না যায়, সাগর বক্ষে তাঁর বান্দাহ্ যেন পথ হারিয়ে না যায়, এ জন্য মহান আল্লাহ্ আকাশে তারকা প্রজ্জ্বলিত করেছেন, অথচ এই পৃথিবী নামক অন্ধকার গ্রহে মহান আল্লাহ্ মহাসত্যের তারকা প্রজ্জ্বলিত করবেন না এটা কি করে হয়?

মহান আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তু এবং প্রাণীর আকৃতি দান করেছেন এবং সমস্ত বস্তুকে তিনিই পথ প্রদর্শন করে থাকেন। পথ প্রদর্শনের এই দায়িত্ব একান্তভাবেই মহান আল্লাহ্ নিজের ক্ষমতায় রেখেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টি প্রতিটি বস্তু এবং প্রাণীকে তার অবস্থা এবং প্রয়োজন অনুসারে পথ প্রদর্শন করছেন। মহান আল্লাহর বিশ্বব্যাপী পথ নির্দেশকের মর্যাদার অপরিহার্য দাবী হলো এই যে, তিনি মানুষের সচেতন জীবনের পথ প্রদর্শনের জন্য এমন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন না, যে পদ্ধতি পশু প্রাণীর জন্য নির্ধারিত। যে পদ্ধতি প্রাণী জগতের জন্য উপযোগী, সে পদ্ধতি তিনি মানুষের জন্য অবলম্বন করেননি। তিনি মানুষের জন্য উপযোগী পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এই মানুষের ভেতর থেকেই একজনকে নবী বা রাসুল হিসেবে নির্বাচিত করে তাঁর মাধ্যমে পথ নির্দেশ দান করেন।

নবী এবং রাসুল মানুষের জ্ঞান বিবেক এবং বুদ্ধির প্রতি আবেদন জানিয়ে তাদেরকে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং মহান আল্লাহ শুধু এই পৃথিবী এবং এর ভেতরে যা কিছু আছে তার স্রষ্টাই নন, তিনি সমস্ত কিছুর পথ প্রদর্শক এবং করুণাময় শিক্ষকও বটে। তিনিই সমস্ত সৃষ্টিকে শিক্ষা দান করে থাকেন। ভূমিষ্ঠ হবার পরে মানব শিশুকে অনুগ্রহ করে তিনিই শিক্ষা দান করেন, তোমার গর্ভধারিণীর বুকের ওপরে আমি তোমার উপযোগী খাদ্য বহু পূর্বে প্রস্তুত করে রেখেছি। ওখানে মুখ দিয়ে চুষতে থাকো। উপাদেয় খাদ্য তুমি লাভ করবে। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকেই শিক্ষাদান করেন এবং পথ প্রদর্শন করেন।

নবী ও রাসূল সম্পর্কে ধারণা

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ –

মানুষকে আমি এমন এক অবস্থায় তার মায়ের গর্ভ থেকে এই পৃথিবীতে নিয়ে

www.pathagar.com

এসেছি, যে সময় তার কোন চেতনাই ছিল না। সেই সাথে তাকে আমি তিনটি জিনিষ দান করেছি। তাকে শ্রবণ শক্তি দান করেছি। দৃষ্টি শক্তিদান করেছি এবং চিন্তা করার মত মগজ দিয়েছি। (আল কোরআন)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সূরায়ে আস্‌সাজদার মধ্যে বলেছেন, মানুষের সৃষ্টির সূচনা তিনি করেছেন কাদা-মাটি থেকে। তারপর তার বংশধারা এমন এক বস্তু থেকে চালু করেছেন যা নিকৃষ্ট পানির মতই। এরপর তিনি দেহের যেখানে যে অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের প্রয়োজন তা সজ্জিত করে রুহ্ দান করেছেন। তারপর তিনি মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন, চোখ দিয়েছেন এবং হৃদয় দান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তার শরীরের ত্বকের ভেতরে স্পর্শ অনুভূতি দান করেছি। নাক দান করেছি ঘ্রাণ গ্রহণ করার জন্য। এভাবে তাকে আমি সুন্দর করে সাজিয়েছি। তার যা যেখানে প্রয়োজন আমি দান করেছি। তার মাতা-পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ভেতরে তার জন্য অসীম মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছি। সে পৃথিবীতে চোখ খুলেই দেখতে পায়, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তাকে প্রতিপালন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সমস্ত কিছুই তার সেবায় নিয়োজিত করেছি।

মানুষের জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন আমি তা দান করেছি। মানুষের ভেতরে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কোন যোগ্যতা কারো ভেতরে বেশী দান করেছি। আবার তা কারো ভেতরে কম দান করেছি। এমন না করলে কেউ কারো মুখাপেক্ষী হত না। একজন মানুষ আরেকজনের পরোয়া করতো না। মানুষের যোগ্যতার কোন মূল্যায়ন হত না।

যে জিনিষের প্রয়োজন যতবেশী মহান আল্লাহ্ তা অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবীর জন্য কর্মীর প্রয়োজন অধিক, মহান আল্লাহ তা অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। বড় বড় বিজ্ঞানী, সেনাপতি, তাত্ত্বিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন কম, সুতরাং আল্লাহ তা কম পরিমাণেই সৃষ্টি করেছেন। এ জাতিয় মানুষের সংখ্যা আল্লাহ্ ঘরে ঘরে সৃষ্টি করেননি। কারণ এই ধরণের মানুষের অবদান এই পৃথিবীতে শতাব্দীর পরে শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে। সুতরাং এই ধরণের দুর্লভ যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ পৃথিবীর জন্য যে কয়জন প্রয়োজন মহান আল্লাহ তাই সৃষ্টি করেছেন। তাদের একজনের যে অবদান, শতকোটি মানুষ ঐ একজন মানুষের চিন্তাধারা দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকে।

এভাবে নানা ধরণের বিদ্যায় পারদর্শী মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্য প্রকৌশলী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, স্থপতি, শাসক, শিল্পী, অর্থনীতিবিদ,

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদ, সেনাপতি, শিক্ষাবিদ, সমরবিদ, নানা ধরণের বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক তথা যে ধরণের গুণাবলী সম্পন্ন ও যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন আল্লাহ্ তা মানব জাতিকে দান করেছেন।

কিন্তু এসবের থেকে মানুষের যা হলো বড় প্রয়োজন, তাহলো মানুষের ভেতরে এমন ব্যক্তির জন্ম হতে হবে যিনি মানুষকে মহান আল্লাহর পথ প্রদর্শন করবেন। পৃথিবীর যে কোন ধরণের বা যে কোন যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষকে তাদের যোগ্যতা যেন আল্লাহর দেখানো বা তাঁর পছন্দ অনুযায়ী পথে প্রকাশ হয়, সে পথ দেখানোর জন্য ব্যক্তির প্রয়োজন। পৃথিবীর বড়বড় বিশেষজ্ঞদের কাজ হলো তারা পৃথিবীর ভেতরে কি কি বস্তু আছে এবং কোনটির গুণাবলী কি, কোনটির উপকারিতা কি, কোনটি কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, ব্যবহারে লাভ ক্ষতি কি ইত্যাদী বিষয় সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষকে অবগত করা।

কিন্তু সেই সাথে পৃথিবীর মানুষের জন্য এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন, যিনি এই মানব জাতিকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিবেন, এই পৃথিবীতে মানুষের আগমনের উদ্দেশ্য কি। কেন তাকে অন্য সৃষ্টি হতে পৃথক করে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। মানুষকে কোন শক্তির দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ কার আইন কানুন মেনে চলবে। যিনি পৃথিবীতে মানুষকে এত কিছু দান করেছেন, সেই দানকারীর ইচ্ছা কি। তিনি মানুষের কাছে কি চান। মানুষের জীবনের প্রকৃত সাফল্য কোন পথে আসতে পারে। ইত্যাদী বিষয় সম্পর্কে মানুষকে অবগত করবেন, এমন ধরণের একজন ব্যক্তির সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ্ মানুষের এই প্রয়োজন কি পূরণ করেছেন? মানুষের শরীর চুলকানের জন্য যে আল্লাহ্ মানুষের হাতে নখ দান করেছেন, এই নখ দিয়ে মানুষ কত প্রয়োজন পূরণ করে, বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়, এতটা ক্ষুদ্র বিষয় যে আল্লাহ্ উপেক্ষা করেননি। সেই আল্লাহ্ মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় দিক সম্পর্কে কি করে উপেক্ষা করতে পারেন? মহান আল্লাহ্ যেমন প্রতিটি কর্ম এবং জ্ঞানের প্রতিটি শাখার জন্য যোগ্যতা ও গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি এমন মানুষও তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, যাদের ভেতরে আল্লাহকে চেনা, জানার সবচেয়ে উন্নত যোগ্যতা বিদ্যমান ছিল। মহান আল্লাহ্ বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করেছিলেন। উন্নত চরিত্রের জ্ঞান দান করেছিলেন। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় আইন কানুন সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের শিক্ষক হিসেবে তাদেরকে প্রেরণ করেছিলেন। এই শ্রেণীর মানুষ

www.pathagar.com

যারা এসেছিলেন, তাঁরাই হলেন নবী বা রাসুল। সাহাবা কেরাম নবী করীম (সাঃ) কে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন?' রাসূল (সাঃ) জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি এসেছি শিক্ষক হিসেবে।'

পৃথিবীতে মানুষ যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবে, জন্মগতভাবেই তাদের ভেতরে ভিন্ন একটি প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। দশটি শিশুর ভেতরে যে শিশুটি পৃথিবী বিখ্যাত কবি হিসেবে বয়স কালে আত্ম প্রকাশ করবে, সেই শিশুটি আর নয়টি শিশুর থেকে ভিন্ন প্রকৃতি ও অভ্যাস নিয়ে বড় হতে থাকে। নবীদের ক্ষেত্রও ঠিক এমনি। তাঁরা জন্মগতভাবেই এই পৃথিবীতে ভিন্ন প্রকৃতি ও অভ্যাস নিয়ে আগমন করেন। একজন স্বভাব কবির কবিতা শুনে আমরা অনুভব করতে পারি যে, এই ব্যক্তি কাব্য ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতা নিয়ে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। অন্য মানুষ শতচেষ্টা করেও তার মত একছত্র কবিতা লিখতে পারবে না।

সুতরাং কোন মানুষ বয়স কালে কি ধরণের যোগ্যতা সম্পন্ন হবে, শিশুকাল হতেই তার ভেতরে সে যোগ্যতার স্ফুরণ ঘটতে থাকে। তার চলাফিরা আচার আচরণ ব্যবহার কথাবার্তা দেখে মানুষ অনুমান করতে পারে, আজকের এই শিশু বড় হয়ে একদিন বিখ্যাত একজন হবে। তাদের কার্যাবলীর দ্বারা মানুষ সহজেই তাকে চিনে নেয়। কারণ এ সকল মানুষ কাজের মাধ্যমে এমন অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ মানব সমাজে পেশ করেন, যে কাজ অন্যদের দ্বারা সংঘটিত হবার সম্ভাবনা নেই।

মহান আল্লাহ যে নবী এবং রাসূল প্রেরণ করেন, তাদের অবস্থাও ঠিক তেমনি। তাদের চিন্তার জগতে এমন সব কথা এবং চিন্তা চেতনার সৃষ্টি হয়, যা অন্য কোন মানুষ কোনদিন কখনো কল্পনাও করেনি। তিনি এমন সব কথা বলেন, অন্য মানুষ সে কথা সম্পর্কে কখনো কল্পনা করেনি। তিনি এমন বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে বিষয় সম্পর্কে পৃথিবীর অন্য মানুষের পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাঁর দৃষ্টি এমন সুক্ষ্ম বিষয়ের ভেতরে সহজেই প্রবেশ করে, যে বিষয় সম্পর্কে বিষেজ্ঞগণ যুগের পরে যুগ ধরে গবেষণা করেও সমাধানে পৌছতে পারেননি। সাধারণ মানুষ তাঁর মত কথা এবং কর্ম করতে ইচ্ছা করলেও পারে না।

নবীর চরিত্র ও প্রকৃতি এতই পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন যে, তিনি প্রতিটি ব্যাপারেই ভদ্রজনোচিত ও সত্যনিষ্ঠ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি কখনো ভুল কথা বলেন না। দৃষ্টিকটু কোন কর্ম করেন না। মানুষকে তিনি সব সময় উত্তম কথা ও কর্ম করতে আদেশ দান করেন। তিনি মানুষকে যা করতে আদেশ দান করেন, প্রথমে তা নিজে করেন। তিনি মুখে যা বলেন, তাঁর কাজের সাথে মিল থাকে। তাঁর কথা

www.pathagar.com

ও কাজের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ হয়না যে, তিনি তাঁর কোন ব্যক্তিস্বার্থ আদায় করবেন। তিনি অন্যের ভালো করতে গিয়ে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেন। কিন্তু নিজের কোন স্বার্থ আদায় করতে গিয়ে অন্যের সামান্য ক্ষতি করেন না। তাঁর গোটা জীবন প্রস্তুত হয় সত্যতা, ভদ্রতা, মনের পরিচ্ছন্নতা, উত্তম চিন্তা ও উন্নত পর্যায়ের মানবতার আদর্শে। শতকোটি চোখ দিয়ে অনুসন্ধান করলেও নবীর চরিত্রে সামান্যতম দোষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং তিনি যা বলেন, যা করেন মানুষের উচিত তা গ্রহণ করা এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা। কারণ পৃথিবীর অভিজ্ঞতা, নানা ধরণের পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ, সৃষ্টি জগতের প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণের মাধ্যমে নবী এবং রাসুলের প্রতিটি কথা ও কর্ম সত্য বলে প্রমাণিত।

মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য মহান আল্লাহ যাকে দায়িত্ব দান করেন, আল্লাহর বিধান মানুষের ভেতরে প্রচার করার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে যাকে মনোনীত করা হয়, তিনিই হলেন নবী বা রাসূল। এই দায়িত্বের অপর নামই হলো নবুয়্যত বা রিসালাত। এই ধারা মহান আল্লাহ শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। কারণ, তাঁর নবুয়্যত ছিল বিশ্বজনীন। তিনি হলেন বিশ্বনবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আদর্শই গোটা পৃথিবীর মানুষকে অনুসরণ করতে হবে।

কেন নবী ও রাসুলের আনুগত্য করতে হবে

নবী ও রসুল বর্তমানে পৃথিবীতে শারীরিকভাবে উপস্থিত না অনুপস্থিত, প্রশ্ন সেটা নয়। প্রশ্ন হলো নবী-রসুল যে শিক্ষা দান করেছেন, মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যে বিধান তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, তা বর্তমানে মওজুদ আছে কিনা। এই বিষয়টির ওপরে মানব জাতিকে গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। বর্তমানে নবীর আগমন আর ঘটবে না। কেননা নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ নবুয়্যতি ধারার সমাপ্তী ঘোষনা করেছেন। তাঁর আনিত বিধান বর্তমানে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। ইনশাল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

তাঁর গোটা জীবন মানুষের সামনে অবস্থান করছে। তাঁর সমস্ত কার্যবলী অবস্থান করছে। তাঁর আনিত বিধান এবং তাঁর কার্যবলী পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে তিনি ছিলেন বিশ্বনবী। সুতরাং তাঁকে অনুসরণ করা এবং তাঁর আনুগত্য করা তথা তাঁর আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। তাঁকে নবী বলে স্বীকৃতি দানের পর তাঁকে অনুসরণ না করা বা তাঁর আদর্শ গ্রহণ না করা মানব বুদ্ধির বিরোধী কাজ। কারণ তাঁকে নবী বলে স্বীকৃতি দানের অর্থই হলো আমরা একথার

www.pathagar.com

স্বীকৃতি দিলাম যে, তিনি যা কিছুই বলছেন মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বলছেন, তিনি যা করছেন তা মহান আল্লাহর ইশারায় করছেন।

এই অবস্থায় তাঁর কোন কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করার সুস্পষ্ট অর্থ হলো, মহান স্রষ্টা আল্লাহর কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করা। নবীর কোন কাজকে অপছন্দ করার অর্থই হলো, মহান আল্লাহর কাজকে অপছন্দ করা। নবীর কোন কাজের সমালোচনা করার স্পষ্ট ব্যাখ্যা হলো মহান আল্লাহর কাজের সমালোচনা করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা। সুতরাং বুঝা গেল, নবী সম্পর্কে মনের গহিনে সামান্য প্রশ্ন সৃষ্টি করার অর্থই হলো স্বয়ং আল্লাহ সম্পর্কে প্রশ্ন সৃষ্টি করা।

সুতরাং নবীকে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দানের পরে কোন ধরণের প্রশ্ন ব্যতীতই নবীর সমস্ত নির্দেশ মাথা পেতে গ্রহণ করা এবং তা অনুসরণ করা। নবীর কোন কথা বা নির্দেশ যদি আমাদের বুঝে না আসে, তার মানে এই নয় যে, নবীর কথা ভুল। বরং ভুল আমাদের ভেতরে। আমরা জ্ঞানের দৈন্যতার কারণে নবীর কথা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছি। মনে রাখতে হবে, নবীর প্রতিটি কথা ও কাজের মধ্যেই মানব জাতির উন্নতি নিহিত রয়েছে। নবীর কথার প্রকৃত তাৎপর্য যদি আমাদের বোধগম্য না হয়, তবুও তা আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। বরং এটা আমাদের জন্য অপরিহার্য।

নবী কোন ভুল কথা বলেন না। কেউ যদি ধারণা করে যে, নবী মাঝে মধ্যে ভুল কথা বলেন এবং ভুল করে থাকেন, তাহলে তার ঈমান বরবাদ হয়ে যাবে। কারণ নবী আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত হন এবং তাঁর নির্দেশেই কথা বলেন। আমাদের ভেতরেই ভুল রয়েছে বলে আমরা নবীর কথার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি না। নবীর যে কথা বা কাজ অনুধাবন করতে পারিনা, সেটা আমরা অনুসরণ করবো না, এমন কোন সুযোগ মানুষের জন্য অবশিষ্ট নেই। যিনি নবী নন, তিনি যতবড় আলেমই হন না কেন, তাঁর কোন কথা বা কাজের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে হবে, তাঁর নির্দেশের সাথে বা কাজের সাথে নবীর কথার বা কাজের সাদৃশ্য আছে কিনা তা অনুসন্ধান করে তবেই তা অনুসরণ করতে হবে।

একটি বিষয় অনুধাবন করতে হবে, যে ব্যক্তি কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ নন, সে কম্পিউটারের জটিল বিষয় বুঝতে পারবে না। কিন্তু কম্পিউটার বিশেষজ্ঞের কথা যদি সে একারণে না গ্রহণ করে যে, কম্পিউটার তার বোধগম্য হচ্ছে না। তাহলে তার জন্য এটা হবে বোকামীর পরিচয়। পৃথিবীর প্রতিটি কাজের জন্যই বিশেষজ্ঞের (Expert) প্রয়োজন হয়। কোন কাজের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করার পরে তার কাজে হস্তক্ষেপ করার কোন অবকাশ থাকে না।

www.pathagar.com

সুতরাং প্রতিটি মানুষ প্রতিটি কাজে বিশেষজ্ঞ হতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত কাজ প্রতিটি মানুষ বুঝতে পারে না। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তা আমাদের যাচাই করে তার ওপরে নির্ভর করতে হয়। এরপর সেই ব্যক্তির কাজে হস্তক্ষেপ করা বা তাকে বারবার উত্যক্ত করা যে, আমাকে প্রথমে এই বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে হবে, নতুবা আমি তোমার কোন কাজ বা কথা গ্রহণ করবো না। এমন কথা যারা বলবে, তাদেরকে মূর্খ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

কোন মানুষ যদি একজন ডাক্তারের কাছে যায় এবং সে ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে ব্যবস্থা পত্র (Prescription) প্রদান করে আর রোগী যদি ডাক্তারকে বারবার বলতে থাকে, আপনি এই ওষুধ কেন ব্যবহার করতে বললেন আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। ডাক্তার তখন বাধ্য হয়েই রোগীকে তার চেম্বার থেকে বের করে দেবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তেমনি একজন নবীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ। আমাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহ সম্পর্কে আমাদেরকে অতটুকুই জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যতটুকু জ্ঞান অর্জন করলে আমরা বুঝতে পারবো যে, কোন কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন আর কোন কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

মহান আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে জীবন পরিচালনার পদ্ধতি কি, তা আমরা জানিনা। জানার কোন মাধ্যমও আমাদের কাছে নেই। কিন্তু এটা আমরা জানতে ইচ্ছুক। সুতরাং এটা জানার জন্যই আমাদের প্রয়োজন নবীকে অনুসন্ধান করা। এই অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে সতর্কতার পরিচয় দিতে হবে। আমাদেরকে জানতে হবে, নবুয়্যতের ধারা কোত্থেকে শুরু হয়ে কোন পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। এই জ্ঞান যদি আমাদের না থাকে, বা এই জ্ঞানের ভেতরে যদি কোন গলদ থাকে তাহলে আমরা যে ভুল পথে পরিচালিত হবো এতে কোন সন্দেহ নেই।

নবী করীম (সাঃ) যে শেষ নবী এবং তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না, তাঁর আনিত জীবন বিধানই যে কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণ করতে হবে, এই জ্ঞানটুকু বর্তমান মানুষের জন্য পরিপূর্ণভাবে স্বচ্ছ থাকতে হবে। নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর পবিত্র সাহাবায়ে কেরামের সাথে যে কাজের কোনই সম্পর্ক ছিল না, সে কাজের বাইরের চেহারা যতই ইসলামের অনুরূপ হোকনা কেন, তা গ্রহণ করা যাবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, কোন নবী এবং তাঁর সাহাবাগণ মাইলের পর মাইল ভ্রমণ করে কারো কবরের কাছে গিয়ে কোন কিছুর জন্য কখনো ধর্ণা দেননি। সুতরাং এই কাজ কোন মুসলমানের জন্য করার কোন অবকাশ নেই। ঈমান রাখতে হবে যে, মানুষের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করার মালিক হলেন মহান আল্লাহ। তিনি কোন মাধ্যম ব্যতীতই তাঁর বান্দার আবেদন শোনেন, সে বান্দাহ যত বড় পাপীষ্ঠই হোক না কেন।

www.pathagar.com

নবীর প্রদর্শিত পথই একমাত্র সত্য পথ

জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির বিচারে যখন একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রকৃত সত্য জানার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে নেই। প্রকৃত সত্য অবগত হবার একমাত্র মাধ্যম হলো নবী বা রাসুল। আমরা এ কথাও জানি যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ও রাসূলগণ মানুষের জন্য সহজ সরল পথ প্রদর্শন করেন, তখন একথাও আমাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়, নবীর ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর যে কোন আদেশ পালন করা, তাঁর প্রদর্শিত পথ যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে অনুসরণ করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

নবীর বিধান থাকার পরেও যদি কোন ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশী মত চলে বা অন্য কোন মানুষের আদর্শ অনুসরণ করে, তাহলে সে যে পথভ্রষ্ট হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। মানুষের ভেতর থেকেই আরেকজন মানুষ যদি মানুষকে পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম হত, তাহলে নবী প্রেরণের তো কোন প্রয়োজনই হত না। জীবন ব্যবস্থা রচনা করার কাজ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই মহান আল্লাহ নবী প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন এবং নবীর মাধ্যমে জীবন ব্যবস্থা দান করেছেন।

একশ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে, যারা নবুয়্যাত এবং রিসালাতকে স্বীকৃতি দান করে। নবীকেও স্বীকৃতি দান করে। কিন্তু নবীর ওপর নির্ভর করে না এবং নবীর আনুগত্যও করে না। তাদের ধারণা হলো, নবীকে কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হবে বটে, তাঁর আনিত আদর্শও ছিল অদ্ভুত সুন্দর কিন্তু তা ছিল তাঁর যুগের উপযোগী। নবীর আদর্শ সার্বজনীন নয়। বর্তমানে চলার জন্য আদর্শ নির্মাণ করতে হবে বা নবীর আদর্শ ভেঙ্গে চুরে নতুন একটি আদর্শ দাঁড় করাতে হবে এবং সেই আদর্শ অনুসরণ করে বর্তমানে চলতে হবে। এদের জ্ঞানের দৈন্যতা দেখলে এদের ওপর করুণা হয়। আরেক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা দাবী করে নবীকে অনুসরণ করার কোন প্রয়োজনই নেই।

কারণ আমাদের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি দিয়ে আমরা সত্য পথের সন্ধান করতে সক্ষম। এই শ্রেণীর মানুষ মারাত্মক ভ্রমে নিমজ্জিত। এরা বুঝতে চায় না যে, জ্যামিতির সূত্রানুযায়ী একটি বিন্দু থেকে আরেকটি বিন্দু পর্যন্ত সরল রেখা মাত্র একটিই হয়। এছাড়া যত রেখা অঙ্কন করা যাবে তা সরল রেখা হবে না। সুতরাং নবীদের আনিত পথই হলো সহজ সরল পথ। এই পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ সহজ সরল হয় না এবং হতে পারে না। সুতরাং কোন মানুষ যদি নবীর আনিত সহজ সরল পথ ত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করে. ব্যক্তি তা করতে পারে। এ স্বাধীনতা (Freedom

www.pathagar.com

of choice) তার রয়েছে। কিন্তু এই পথ মানব মনের চাহিদা অনুসারে তাকে শান্তি দিতে পারবে না। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস এ কথার সাক্ষী। পৃথিবীর দু'একটি দেশে যেখানে নবীর আনিত আদর্শ ছিটে ফোটা বাস্তবায়িত রয়েছে, আর যেখানে সামান্যমতও নেই, এই দুই স্থানে সংঘটিত অপরাধের পার্থক্য দেখলেই অনুধাবন করা যায়, নবীর আনিত আদর্শ অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। মানুষ মুখে স্বীকৃতি না দিলেও তার মনের চাহিদা এবং বিবেকের দাবী হলো, সে সত্য সহজ সরল পথে চলতে আগ্রহী। যে পথে কোন কন্টক নেই, কোন বাধা নেই, কোন ধরণের সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু মানুষ পার্থিব স্বার্থে এবং অহমিকা বশতঃ সেই পথেই চলতে গিয়ে ধ্বংসের অতলে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

মানুষ দেখেও শিখে না। প্রাণী জগতের দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সে দেখতে পেত, একটি ইতর প্রাণীও তার গন্তব্যে পৌঁছার জন্য সহজ সরল পথ অনুসরণ করে। কিন্তু সৃষ্টির সেরা এই মানুষ বড়ই বিচিত্র। এরা সহজ সরল পথ দেখলে চিন্তা করে, এই পথে চলতে গেলে পার্থিব স্বার্থে আঘাত আসবে। আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। সুতরাং আমরা নিজেরাও এই পথে চলবো না, অন্য কাউকেই এই পথে চলতে দেব না। আল্লাহর কোন নেক বান্দাহ্ যখন এদেরকে সহজ সরল পথের দিকে সহানুভূতির সাথে আহ্বান জানায়, তখন সে ঘাড় বাঁকা করে থাকে। নিজের আবিষ্কার করা ভুল পথের ওপরেই সে দৃঢ় থাকে।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাপার যে, নবীকে অস্বীকার করে বা তাঁর আনুগত্য করতে অস্বীকার করে কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি সহজ সরল পথ লাভ করতে পারে না। তার কাংখিত শান্তি সে লাভ করতে পারে না। নবীকে ত্যাগ করেও কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। পৃথিবী এবং আলমে আখেরাতে শান্তি লাভ করতে হলে তাকে অবশ্যই নবীর ওপর ঈমান আনতে হবে এবং নবীকে অনুসরণ করতে হবে। এ ছাড়া বিকল্প কোন পথ মানুষের সামনে উন্মুক্ত নেই। কোন ব্যক্তি বা জাতি সহজ সরল পথ অবলম্বন করতে চায় অথচ সে ব্যক্তি বা জাতি একজন নবীর মত সৎ এবং সত্যনিষ্ঠ সত্ত্বার কথা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে, সেই ব্যক্তির বা জাতির যে বুদ্ধির বৈকল্য ঘটেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটলে, বুদ্ধি ভ্রষ্ট না হলে কোন ব্যক্তির পক্ষেই সত্য বিমুখ হওয়া যায় না। তার জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির দৈন্যতা সৃষ্টি হতে পারে, তার মনের জগতে অহংকার নামক নিকৃষ্ট স্বভাব বাসা বাঁধতে পারে, অথবা সে স্বয়ং বাঁকা স্বভাবের হতে পারে, যে কারণে তার মন মানসিকতা সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না।

www.pathagar.com

এ সমস্ত কারণেই সে তার পূর্ব পুরুষ যা করে এসেছে, তারই অন্ধ অনুসরণ করে। সমাজে বা বংশে শতাব্দী ধরে যে প্রথা চলে আসছে তা অনুসরণ করে। পূর্ব পুরুষ যা করে এসেছে এবং দেশ ও সমাজে কয়েক শতাব্দী ধরে যে প্রথা চলে আসছে, এ সবের বিরুদ্ধে সে কথা শুনতে চায় না। এই ব্যক্তি ধারণা করতে পারে, পৃথিবীতে আমি যা খুশী তাই করবো, যেভাবে খুশী জীবন যাপন করবো, আমি নবীকে অনুসরণ করলে আমার সে স্বাধীনতা থাকবে না। সুতরাং আমি নবীকে অনুসরণ করবো না।

নবীকে অনুসরণ না করার ওপরে উল্লেখিত কারণগুলো যদি কোন ব্যক্তি বা জাতির ভেতরে বিদ্যমান থাকে, তাহলে সেই জাতি বা ব্যক্তির পক্ষে কোন ক্রমেই সহজ সরল পথে চলা সম্ভব হবে না। ধর্মের নামে সে ব্যক্তি যতই পীরের পা ধরে পড়ে থাক না কেন, মাজারে মাথা ঠুকতে ঠুকতে সে ব্যক্তি যদি নিজেকে রক্তাক্তও করে ফেলে, তবুও তার পক্ষে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হবে না। নবীর প্রদর্শিত পথ ব্যতিত কোন মানুষের পক্ষে সত্য লাভ করা সম্ভব নয়।

মনে রাখতে হবে, নবুয়্যত বা রিসালাত দাবী করে বা চেষ্টা সাধনা করে লাভ করার কোন জিনিষ নয়। সুতরাং যিনি নবী প্রেরণ করেছেন, তিনিই আদেশ দান করেছেন নবীর আনুগত্য করার জন্য, নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য। নবীর প্রতি যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে না, নবীর আনুগত্য যে ব্যক্তি করে না, সে ব্যক্তি যে আল্লাহ্র প্রতি বিদ্রোহী এতে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

সাধারণ মানুষ যে দেশের নাগরিক এবং যে সরকারের প্রজা, সেই সরকারে নিযুক্ত প্রশাসকের আনুগত্য করতে হবে, এটা করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। কেউ সরকারকে মানবে আর সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসককে মানবে না, ব্যাপারটা পরস্পর বিরোধী। মহান আল্লাহ্ হলেন সমস্ত সৃষ্টির বাদশাহ। তার সৃষ্টি মানুষকে পথ প্রদর্শন করার জন্য তিনি যাকে খুশী নিযুক্ত করতে পারেন। তিনি যাকেই নিযুক্ত করেছিলেন, যার আনুগত্য করার জন্য মানুষকে নির্দেশ দান করেছেন। তার আনুগত্য করা সমস্ত মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

নিজেকে সবার আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে একমাত্র নবীর আনুগত্য করা প্রতিটি মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক। মানুষ যদি তা না করে তাহলে সে নিজেকে কিছুতেই আল্লাহ্র গোলাম হিসেবে পরিচয় দান করতে পারে না। একজন মানুষ স্রষ্টা আল্লাহ্কে স্বীকার করবে অথচ তাঁর প্রেরিত নবী রাসূলকে স্বীকার করবে না, এমন হতে পারে না। এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্কে স্বীকৃতি দেয়া না দেয়ার ভেতরে কোন পার্থক্য নেই।

www.pathagar.com

নবুয়্যাত ও রেসালাতের সূচনা

মহান আল্লাহ এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এখানে মানব জাতিকে প্রেরণ করেছেন। প্রথম মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছিল হযরত আদম (আঃ) কে। প্রথম সৃষ্টি মানুষ হযরত আদম (আঃ) কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁকে নবুয়্যাত দান করা হয়েছিল এবং তিনি নবী ও রাসূল ও বিজ্ঞানী ছিলেন। নবুয়্যাতের অবতারণা হয়েছিল হযরত আদম (আঃ) থেকেই। এই ধারার সমাপ্তি ঘটেছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত এসে। মুহাম্মদ (সাঃ) এর পরে কিয়ামত পর্যন্ত যে ব্যক্তি নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করবে, সে ব্যক্তি যে স্পষ্ট শয়তান এতে কোন সন্দেহ নেই।

মহান আল্লাহ হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর থেকে হযরত হাওয়া কে সৃষ্টি করলেন। তাঁকে হযরত আদম (আঃ) এর জীবন সঙ্গিনী হিসেবে মনোনীত করা হলো। তাদেরকে বেহেশ্‌তের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। সৃষ্টি করা হয়েছিল এই পৃথিবীর জন্য। সুতরাং তাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হলো। এরপর মহান আল্লাহ বংশধারা চালু করলেন। হযরত আদম (আঃ) এর সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করতে থাকলো।

মানব বংশের যাত্রা শুরু হলো। এই দু'জন মানুষ থেকে ক্রমশঃ মানব জাতির বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। কত বছরের ব্যবধানে মানব বংশ বৃদ্ধি লাভ করে বর্তমান অবস্থায় উপনিত হয়েছে, তার সঠিক হিসেব মহান আল্লাহই অবগত আছেন। গোটা পৃথিবীতে বর্তমানে যত মানুষ আছে, এবং অতীত কালে যারা ছিল, সবাই ঐ হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত জাতির ধর্মীয় বর্ণনা এবং ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে যে, বর্তমানে এই মানব জাতি হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের বংশধর। তাঁর থেকেই মানব জাতির বংশধারার অবতারণা হয়েছে। ডারউইনের থিয়রী অর্থাৎ The theory of evolution বহু পূর্বেই পরিত্যক্ত ঘোষনা করা হয়েছে। মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞান এ পর্যন্ত কোন নিশ্চিত বিশ্বাসে উপনীত হতে পারেনি। বিজ্ঞান এ কথাও বলতে সক্ষম হয়নি যে, এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল।

বরং অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা হলো, প্রথমে একজোড়া মানুষ থেকেই মানব বংশের যাত্রা শুরু হয়েছিল। পৃথিবীতে পূর্বে যত মানুষ ছিল এবং বর্তমানে যত মানুষ আছে, আগামীতে যত মানুষ আসবে, তা সবই হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত হাওয়া থেকে সৃষ্টি। বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কি Certificate দিচ্ছে তা আমাদের

www.pathagar.com

আলোচনা বা অনুসরণ করার বিষয় নয়। মহান আল্লাহ্ কি বলছেন তাই বিশ্বাস এবং অনুসরণ করার বিষয়।

পবিত্র কোরআনে এই মানব জাতিকে মহান আল্লাহ্ মানুষকে বারবার আদম সন্তান হিসেবে আহ্বান করেছেন। হযরত আদম (আঃ) কে দায়িত্ব দান করা হয়, তিনি যেন তাঁর সন্তানদেরকে ইসলামের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দেন। তাদেরকে তিনি যেন সর্ব প্রথমে এ কথা শিক্ষা দান করেন, এই পৃথিবী এবং এর ভেতরে যা কিছু দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান, সমস্ত কিছুর স্রষ্টা হলেন মহান আল্লাহ। তিনি অসীম ক্ষমতাবান। কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলে তাঁর আদেশ মাত্র তা সৃষ্টি হয়ে যায়।

কোন কিছু ধ্বংস করতে ইচ্ছা করলে সেটাও তাঁর আদেশ মাত্র ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি এক অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং সমস্ত কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী । তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি বরং তিনিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি কারো আইন মানতে বাধ্য নন, সে প্রয়োজনও তাঁর নেই। সমস্ত সৃষ্টি ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁর আইন মানতে বাধ্য। তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহী করতে হয় না, বরং সমস্ত সৃষ্টিকে তাঁরই কাছে জবাবদিহী করতে হয় এবং হবে। তিনি চিরঞ্জীব এবং সব ধরণের দুর্বলতা থেকে তিনি মুক্ত।

তাঁর আইন ব্যতীত আর কারো আইন গ্রহণ করা যাবে না বা অনুসরণ করা যাবে না। তাঁর ইবাদাত ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করা যাবে না। তাঁর কাছেই কেবল সাহায্য চাইতে হবে। অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না। তাঁর সামনেই মাথানত করা যাবে, অন্য কারো কাছে বা সামনে মাথানত করা যাবে না। কেবলমাত্র তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই জীবন পরিচালনা করতে হবে। নিজের খায়েস বা অন্য কারো মর্জ্জি অনুসারে জীবন অতিবাহিত করা যাবে না। জীবনের সকল কাজের জবাব আল্লাহ্র কাছে দিতে হবে। আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করলে তিনি পুরস্কার দান করবেন আর তাঁর আদেশ অমান্য করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

হযরত আদম (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে এই শিক্ষা প্রদান করলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে একটি দল আদি পিতার শিক্ষা অনুসারে জীবন অতিবাহিত করতে থাকলো। আরেকটি দল আদি পিতার শিক্ষা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে গেল। তাদের ভেতরে কেউ আকাশের চন্দ্র সূর্যকে মহাশক্তিমান কল্পনা করে তার পূজা করতে থাকলো। কেউ ধারণা করলো বৃক্ষ তরু লতাই হলো সর্বশক্তিমান। সুতরাং বৃক্ষ তরু লতা

পূজিত হতে থাকলো। কেউ পূজা করতে থাকলো নদী সাগর ইত্যাদীকে। কেউ মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করতে থাকলো। কেউ আগুনের কুন্ড নির্মাণ করে তার পূজা করা শুরু করে দিল।

ইতিমধ্যে গোটা পৃথিবীতে আদম সন্তান ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হলো। তারা তাদের ধর্ম হিসেবেও নানা ধরণের কল্পিত মতবাদ আবিষ্কার করে নিল। মানুষের নানা শ্রেণী ও বর্ণ, ভাষা হবার কারণে নিত্য নতুন প্রথার সৃষ্টি হলো। এভাবে মানুষ নানা বস্তুর পূজারী হবার ফলে মহান আল্লাহকে ভুলে গেল। হযরত আদম (আঃ) যে শিক্ষা দান করেছিলেন, মানুষ কালক্রমে তা ভুলে গিয়েছিল। পরিণতি যা হবার ছিল তাই হলো। যাবতীয় দুষ্কৃতি সমাজ জীবনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

সমাজের প্রতিটি স্তরে পুঞ্জিভূতাকারে অপকর্ম জমা হলো। এমন অনেক রীতি নীতিকে বিসর্জন দেয়া হলো, যা ছিল প্রকৃতই কল্যাণকর। আবার এমন অনেক রীতি পদ্ধতিকে একান্তই অনুসরণীয় করা হলো, যা মানব জাতির জন্য একান্তই ক্ষতিকর। পথ প্রদর্শকের অভাবে শত সহস্র ভ্রান্ত পথ ও মতের সৃষ্টি হলো। তারা সবাই দাবী করতে থাকলো, তাদের পথই একমাত্র অভ্রান্ত এবং অন্যদের পথ ও মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এভাবে শুরু হলো দলাদলি। পরিণতিতে দাঙ্গা সৃষ্টি হলো, রক্তপাত হতে থাকলো।

সৃষ্টির শুরুতে মানব জাতি কোন পথে চলতো এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা হলো–

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً، فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ، وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ، وَمَااخْتَلَفَ فِيْهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَائَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْالِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ، وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُاِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ–

www.pathagar.com

প্রথম দিকে সমস্ত মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। (উত্তর কালে এই অবস্থা বর্তমান থাকতে পারেনি, বরং পরস্পরে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।) তখন আল্লাহ নবী প্রেরণ করলেন। তাঁরা সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা ও বাঁকা পথের অনুসারীদের জন্য শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী ছিলেন এবং তাদের প্রতি সত্যগ্রন্থ অবতীর্ণ করেন, যেন সত্য সম্পর্কে মানুষদের মধ্যে যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল, তার চূড়ান্ত সমাধান করতে পারে। (এবং এসব মতপার্থক্য এ কারণে সৃষ্টি হয়নি যে, প্রথম দিকে মানুষকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত করা হয়নি।) মতপার্থক্য তারাই সৃষ্টি করেছিল, যাদেরকে মূল সত্য সম্পর্কে অবগত করা হয়েছিল। তারা উজ্জ্বল নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ লাভ করার পরেও শুধু এ কারণে সত্য ত্যাগ করে বিভিন্ন পন্থার আবিষ্কার করেছিল যে, তারা একে অপরে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতেই দৃঢ়সংকল্প ছিল। সুতরাং যারা নবীদের ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করলো তাদেরকে আল্লাহ নিজের অনুমতিক্রমে সেই সত্যের পথ প্রদর্শন করলেন, যে সম্পর্কে মানুষের ভেতরে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সত্যের পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা বাকারাহ-২১৩)

পবিত্র কোরআনের এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামের সূচনা হযরত আদম (আঃ) থেকে হয়েছিল। ইসলামের শত্রুরা বর্তমান মুসলিম সমাজে এ কথা প্রচলিত করে দিয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) হলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। এই কথাটি আদৌ সঠিক নয়। পবিত্র কোরআন এবং হাদিস এর বিপরীত কথা বলে। পৃথিবীতে প্রেরিত সমস্ত নবীর আদর্শ ছিল ইসলাম। তাঁরা সবাই ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত নেতা। প্রত্যেক নবীই ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। সর্বকালে সব দেশে মানব জাতির একমাত্র আদর্শ ছিল ইসলাম।

পবিত্র কোরআন সম্পর্কে যারা অনভিজ্ঞ এবং কোরআন বাদ দিয়ে যারা ইতিহাস রচনা করেছে, তারা উল্লেখ করেছে যে, 'অংশীদারিত্বের অন্ধকারময় জগতে ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মের গর্ভধারিণী মাতা হলো অংশীদারিত্ব। তারপর ধারাবাহিক বিবর্তনের মাধ্যমে শিরকের বা অংশীদারিত্বের অন্ধকার দূরিভূত হয়ে তাওহীদের তথা একত্ববাদের সৃষ্টি হয়। এভাবে মানুষের মধ্যে তাওহীদ বা একত্ববাদের ধারণার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে।'

ডারউইন সাহেব তার The theory of evolution-এর মাধ্যমে মানুষকে যে নাস্তিক্যবাদের দিকে নিয়ে যেতে চায়, ধর্ম সম্পর্কে উল্লেখিত কথাটিও সেদিকেই মানব জাতিকে নিয়ে যেতে চায়। অর্থাৎ তারা বুঝাতে চায়, আদম হাওয়া সব মিথ্যা

www.pathagar.com

কথা। মানুষ বিবর্তনের মাধ্যমে পানির পোকা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তারপর তারা বন্যদের মত জীবন যাপন করতে থাকে। মানব প্রকৃতি বড় দুর্বল। চরম অসহায় অবস্থায় পড়লে মানুষ একটা শক্তিকে কেন্দ্র করে বাঁচতে চায়। সুতরাং অসহায় অবস্থায় নিপতিত হয়ে মানুষ নানা ধরণের কল্পিত শক্তি আবিষ্কার করে। আর কল্পিত শক্তির নামই হলো স্রষ্টা। প্রকৃত স্রষ্টা বলতে কিছুই নেই।

মানুষ কখনো চন্দ্র সূর্যকে শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। তখন থেকেই তাদের পূজা শুরু হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন বস্তুকে শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে মানুষ তাদের পূজা করেছে আর এভাবেই ধর্মের আবিষ্কার হয়েছে। এসব কিছু থেকে আরেকদল মানুষ আবিষ্কার করেছে এমন এক শক্তিকে, যাকে দেখা যায় না এবং অনুভবও করা যায় না। তার নাম দিয়েছে আল্লাহ। এভাবেই একত্ববাদের সৃষ্টি হয়েছে। যুগে যুগে কিছু ব্যক্তি এই একত্ববাদের সাথে নতুন কিছু জুড়ে দিয়ে মানুষকে তার অনুসারী বানিয়েছে।

এক শ্রেণীর মানুষ নামের শয়তান উল্লেখিত কথাগুলোর জন্ম দান করেছে. যেসব কথার কোন ভিত্তি নেই। মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন, কোন অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মানব জাতির যাত্রা শুরু হয়নি। পৃথিবীতে একজন মহামানব প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন সম্মানিত নবী ও রাসুল এবং বিজ্ঞানী। এক আলোকিত উজ্জ্বল অবস্থা থেকে মানব জাতির সূচনা হয়েছিল এবং তারা যাত্রা শুরু করেছিল। তাঁরা সবই ছিল এক অভ্রান্ত পথের যাত্রী। তাদের ভেতরে কোন ধরণের দুষ্কৃতি ছিল না। তাদের ভেতরে কোন দলাদলি ছিল না। ইতিহাসের ধারা পরিক্রমায় এই মানুষ প্রকৃত সত্য থেকে ছিটকে পড়ে।

তারপর তাদের ভেতরে নানা মত ওপথের সৃষ্টি হয়। যারা এই নানা ধরণের মত ও পথের স্রষ্টা ছিল, তারা যে প্রকৃত সত্য জানতো না এমন নয়। সত্য জানার পরেও এক শ্রেণীর মানুষ নিজের বৈধ অধিকারের সীমা অতিক্রম করে পার্থিব সুবিধা লাভের জন্যই এই ধরণের বাতিল ভ্রান্ত পথের ও মতের জন্ম দান করেছিল। তারা নিজেদের ভেতরে অন্যায় অত্যাচার আর সীমা লংঘনের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী ছিল। তাদেরকে এ সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত করে পুনরায় আল্লাহর দেয়া সহজ সরল পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য মহান আল্লাহ নবী প্রেরণ করতে থাকেন।

এ সমস্ত নবীগণ পৃথিবীতে আগমন কিছু অনুসারী তৈরী করবেন তারপর একটি নতুন আদর্শের মাধ্যমে নিজের নামের অনুকরণে একটি ধর্মমত সৃষ্টি করবেন, ব্যাপার কিন্তু এমন ছিল না। মহান আল্লাহ এসব নবী বা রাসুলকে এই দায়িত্ব দান

করেছিলেন যে, হযরত আদম (আঃ) এর মাধ্যমে যে সত্য মানব জাতির জন্য দান করা হয়েছিল, সে সত্য মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। নবীগণ এসে সেই সত্য উদ্ধার করে মানুষকে পুনরায় সেই সত্যের অনুসারী তৈরী করবেন। সেই সত্য মানুষের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবেন, তা পরিষ্কার করে বর্ণনা করবেন। তারপর তাদেরকে একটি জাতিতে পরিণত করবেন।

নবী ও রাসুলগণই একমাত্র অনুসরণযোগ্য নেতা

এই পৃথিবীতে নবী ও রাসুলদেরকে প্রেরণ করা হয় পথভ্রষ্ট মানুষকে সত্য ও সহজ সরল পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে। তাদের প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে, পৃথিবীর মানুষকে সমস্ত দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়ে তাঁরই গোলামীর দিকে আহ্বান করা। একমাত্র আল্লাহকেই সমস্ত শক্তির উৎস হিসেবে গ্রহণ করা, তাঁকেই প্রতিপালক হিসেবে মান্য করা, একমাত্র আল্লাহকেই নিজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়াই হলো মানুষের কর্তব্য, এই কর্তব্য পালনের দিকেই মানুষকে আহ্বান করাই হলো পৃথিবীতে নবী রাসূলদের প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্বই সমস্ত নবী ও রাসূল পালন করেছেন। প্রতিটি নবীই তাঁর নিজের জাতিকে ভুলে যাওয়া পাঠ স্মরণ করিয়ে দেন। তাদেরকে তাঁরা শিক্ষা দান করেন, দাসত্ব করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর। নবী ও রাসুলগণ তাঁর অনুসারীকে মূর্তি পূজা এবং শিরক থেকে হেফাজত করেন। সমাজে প্রচলিত মহান আল্লাহর অপছন্দনীয় প্রথা থেকে তাদেরকে বিরত রাখেন। আল্লাহর পছন্দনীয় পন্থায় জীবন যাপন করার পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন এবং আল্লাহর আইন প্রচলিত করে তা মেনে চলার জন্য পরামর্শ দান করেন।

পৃথিবীর এমন কোন জনপদ বা নগরী নেই, যেখানে মহান আল্লাহ নবী প্রেরণ করেননি। প্রতিটি নবীর প্রচারিত আদর্শ ছিল ইসলাম। তবে স্থান কাল পাত্র ভেদে প্রতিটি নবীর শিক্ষা পদ্ধতি এবং আইন কানুনে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জাতির ভেতরে যেসব মূর্খতা অজ্ঞানতা কুসংস্কার এবং অনাচার প্রচলিত হয়ে পড়েছিল, নবী ও রসুলগণ সেগুলোর মূল উৎপাটনের ব্যাপারে অবিরাম সংগ্রাম করেছেন। যে সব ভ্রান্ত চিন্তা চেতনা জাতিকে গ্রাস করেছিল, এসব থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তাঁরা সংগ্রাম করেছেন।

জ্ঞান বিজ্ঞান, সভ্যতা সংস্কৃতির দিক দিয়ে জাতি যখন প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করছিল তখন নবীগণ তাদেরকে আইন কানুন দান করেছিলেন। তারপর ক্রমশঃ জাতি উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছে, সেই সাথে তাঁরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে

www.pathagar.com

শিক্ষা ও আইন কানুনও ব্যাপকভাবে দান করেছেন। মোট কথা নবী ও রাসুলগণ মানুষকে আল্লাহর গোলামে পরিণত করার জন্য ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন। নবী করীম (সাঃ) ইন্তেকালের মাত্র কয়েক মিনিট পূর্বেও মানুষকে নামাজের কথা স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন।

বিশ্বনবীর এই কাজ কোন নতুন কাজ নয়। এ কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বললেন–

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَاِلَهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ–

আপনার পূর্বে আমি যে রাসূল প্রেরণ করেছি, তাঁকে আমি ওহীর দ্বারা অবগত করিয়েছি যে, আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা শুধুমাত্র আমারই দাসত্ব করবে। (সূরা আম্বিয়া-২৫)

পৃথিবীতে যারা মনিব (Lord) সেজে বসে আছে, মানুষকে যারা নিজেদের তৈরী আদর্শ, মতবাদ, আইন-কানুনের বেড়াজালে বন্দী করে রেখেছে, তাদেরকে যেন সাধারণ মানুষ অস্বীকার করে, এই অনুপ্রেরণা মানুষের ভেতরে জাগ্রত করা এবং তাদেরকে সংগ্রাম মুখর করে গড়ে তোলাও নবীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তাঁর রাসুলের কাছে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُو االطَّاغُوْتَ–

প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর ভেতরেই আমি রাসুল প্রেরণ করেছি এই নির্দেশসহ যে, তোমরা সবাই এক আল্লাহর দাসত্ব করো এবং আল্লাহর দাসত্ব করতে বাধা দেয় বা নিজেদের দাস বানিয়ে রাখে এমন সব শক্তিকে অস্বীকার করো। (সূরা নাহল-৩৬)

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে জীবন বিধান রচনা করেছেন নবী এবং রাসুলগণ তা মানুষের কাছে পৌছে দেবেন। এ দায়িত্ব পালন করেন নবীগণ। আল্লাহ তাঁর আইন-কানুন নিজে এসে কোন মানুষের কাছে দিয়ে যান না। তাঁর নিয়মের অধিনেই তাঁর আইন-কানুন মানুষের কাছে আসে। আল্লাহর নিয়ম হলো তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকেই একজনকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করেন এবং তাঁর কাছে ফেরেশতার মাধ্যমে জীবন বিধান প্রেরণ করেন। পৃথিবীতে

www.pathagar.com

যত নবী এবং রাসুল এসেছেন তাঁরা তাদের গোটা জীবন ব্যাপী এই কঠিন দায়িত্ব পালন করে যান। এ দায়িত্ব পালনে তাঁরা সামান্যতম কোন অবহেলা প্রদর্শন করেন না। মুহূর্তের জন্য তাঁরা ভুলে যাননা, কোন দায়িত্বসহ তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সাঃ) কে আহ্বান করে বলেছেন–

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ–

হে রাসুল! তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তুমি সঠিকভাবে পৌছে দাও। যদি তুমি না পৌছাও তাহলে তুমি তোমার রেসালাতকে পৌছালে না। (সূরা আল মায়েদাহ্-৬৭)

নবীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো তাঁরা সাধারণ মানুষকে ঐ পথের দিকেই আহ্বান জানাবেন, যে পথকে আল্লাহ্ সিরাতুল মুস্তাকিম নামে অবিহিত করেছেন। এই পথের পরিচয় নবীগণ মানুষকে জানাবেন, এ পথে চলতে সাহায্য করবেন, মানুষ যেন এ পথে অগ্রসর হয়ে গন্তব্য স্থলে পৌছতে পারে সেভাবে তিনি সহযোগীতা করবেন। সাধারণ মানুষ আল্লাহর পরিচয় জানে না। সত্য মিথ্যার পার্থক্য তাঁরা বোঝে না। কোনটা কল্যাণের পথ আর কোনটা অকল্যাণের পথ তা মানুষ জানেনা। মানুষকে এসব ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দান করবেন নবীগণ। মানুষ যেন নির্ভুলভাবে সহজ সরল পথে চলতে পারে এ কারণেই মহান নবীদের কাছে ওহী অবতীর্ণ করেন। মহান আল্লাহ্ পাক ওহী প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন–

الٓرٰ، كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ، بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ–

এই গ্রন্থ আমি আপনার প্রতি এ কারণেই অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানুষকে ঘন অন্ধকারের ভেতর থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারেন। তাদের প্রতিপালকের আদেশ ক্রমে স্বতঃপ্রশংসিত মহাপরাক্রমশালী সর্বজয়ী আল্লাহর পথে। (সূরা ইবরাহীম-১)

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ্ নবী ও ওহী প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। বিশ্বনবীকে প্রেরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

www.pathagar.com

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ، وَ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا-

হে নবী! আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ প্রেরণকারী, ভয় প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জল আলোদানকারী প্রদীপ রূপে। (সূরা আল আহযাব-৪৫-৪৬)

নবী পৃথিবীতে এসে মানুষকে সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য বুঝিয়ে দিবেন। যারা নবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামী দলে শামিল হয়েছে, তাদেরকে তিনি পরকালে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করবেন এবং যারা ইসলামের বিরোধিতা করেছে, ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদেরকে তিনি পরকালে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করবেন। তিনি আল্লাহর আদেশেই মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান জানাবেন। তিনি নবুওয়তের আলো দিয়ে সমস্ত অন্ধকার দূরিভুত করবেন। মূর্খতার অন্ধকার বিদায় করে তাওহীদের জ্ঞানের মশাল প্রজ্জ্বলিত করবেন। তাঁরাই হবেন একমাত্র অনুসরণ যোগ্য নেতা। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে যেমন উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন তেমনিভাবে তাঁরা হলেন পবিত্র। সুতরাং তাঁরাই হলেন মানবজাতির পথ প্রদর্শক এবং একমাত্র আদর্শ নেতা। প্রশ্নাতীতভাবে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং তাকে অনুসরণ করতে হবে। এই নেতৃত্ব (Leadership) মানুষকে পরকাল সম্পর্কে অবহিত করবেন। পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে–এ সম্পর্কে মানুষকে অবগত করার দায়িত্ব হলো নবী রাসুলদের।

এই দায়িত্ব তাঁরা যথাযথভাবে পালন করেন। আদালতে আখেরাতে বিচারের পরে যে সমস্ত মানুষকে জাহান্নামের দিকে নেয়া হবে তখন জাহান্নামের দ্বাররক্ষী প্রশ্ন করবে–

اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا-

'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে থেকে কোন নবী রাসুল আসেনি, যারা এই জাহান্নামের কঠিন শাস্তি সম্পর্কে অবগত করেনি তোমাদেরকে? (সূরা ঝুমার-৭১)

মানুষের সমস্ত কাজের হিসাব মহান আল্লাহর কাছে পেশ করতে হবে, এ কথা মানুষকে জানানোর দায়িত্ব হলো নবী রাসুলের। কারণ আদালতে আখেরাতে মহান

www.pathagar.com

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদেরকে প্রশ্ন করা হবে-

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا-

'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসূল আগমন করেনি, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াত পড়ে শোনাবে এবং আজকের দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে দেবে? (সূরা আনয়াম-১৩০)

নবীগণ মানুষকে তাঁর আসল গন্তব্যের দিকে অগ্রসর করাবেন। মানুষকে জানাবেন, এই পৃথিবী তোমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়, পরকালের জীবনই হলো প্রকৃত জীবন এবং সে জীবন হলো অনন্তকালের। সুতরাং ঐ অনন্তকালে যেন তোমরা সুখে শান্তিতে থাকতে পারো, সে পাথেয় এই পৃথিবী থেকেই তোমাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে। অর্থাৎ নবী রাসূলগণ মানুষকে জড়বাদ আর নাস্তিক্যবাদী বস্তুবাদ থেকে সরিয়ে নৈতিকতাবাদীতে পরিণত করবেন। উল্লেখিত কাজ এবং দায়িত্বই হলো রাসূল ও নবীদের প্রধান কাজ।

নবী-রাসূলগণের সাথে বিরোধিতা

মহান আল্লাহ হলেন মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু। এর পরেই হলো নবীদের স্থান। অর্থাৎ আল্লাহর পরেই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু হলেন পৃথিবীতে আগমনকারী নবী ও রাসূলগণ। তাঁরা যখন দেখেন মানুষ সত্য পথ ত্যাগ করে ভুল পথে চলছে এবং পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। তখন তাঁরা অস্থির হয়ে পড়েন। মানব দরদী হিসেবে তাঁরা মানুষকে সংশোধন করার জন্য চেষ্টা সাধনা করতে থাকেন। এই মানুষ না বুঝে অথবা বুঝেও নবীর ওপর আঘাত করে, তাঁদেরকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে দেয়, তবুও তাঁরা সেই আঘাতকারী মানুষের কল্যাণের জন্য দোয়া করেন।

এই পৃথিবীর মানুষ তাদের এই পরম বন্ধুর সাথে বড় বিচিত্র আচরণ করে। নবী ও রাসূলগণ যখন মানুষের ভুল সংশোধন করার চেষ্টা শুরু করেন, তখন এই মানুষ তাদেরকে বিদ্রুপ করতে থাকে। নবীর কথা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদেরকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। শতশত মানুষের ভেতরে অপমানিত করে। কোন নবীকে হত্যা করে। কোন নবীর নাগরিকত্ব (Citizenship) বাতিল করে দিয়ে দেশ থেকে বের করে দেয়। কাউকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখে।

www.pathagar.com

কিন্তু নবী এবং রাসুলগণ পৃথিবীতে এই অবস্থার সম্মুখিন হয়েও তাঁরা তাদের দায়িত্ব পালন করা হতে সামান্যতম বিরত হন না। তাঁরা তাদের আন্দোলন পরিচালিত করতেই থাকেন। পৃথিবীতে আগমন করে অনেক নবীর অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁরা গোটা জীবন ইসলামী আন্দোলন করেছেন, কিন্তু তাদের কর্মী যোগাড় হয়েছে মাত্র দশ বিশজন লোক। কিন্তু তাঁরা হতাশ হননি। এক সময় তাদের শিক্ষা বিস্তার লাভ করেছে। বড়বড় জাতি তাদের শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

নবী ও রাসুলগণ যখন ইন্তেকাল করেছেন, তার কিছুদিন পরেই তাদের প্রচারিত শিক্ষা ও আদর্শের ভেতরে তাঁরই অনুসারীগণ সামান্য স্বার্থের কারণে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপরে যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, নবীর ইন্তেকালের পরে তাঁর সে কিতাবের ভেতরে পরিবর্তন করা হয়েছে। অনুসারীগণ নিজেদের কথা সেই কিতাবে নবীর কথা বলে লিপিবদ্ধ করেছে। আল্লাহর ইবাদাত করার বিভিন্ন নতুন পদ্ধতির কথা লিপিবদ্ধ করেছে।

কেউ কেউ স্বয়ং নবীর কবরের পূজা করা আরম্ভ করেছে। অনেকে এমন মন্তব্য করেছে যে, স্বয়ং আল্লাহ নবীর রূপ ধারণ করে আমাদের মাঝে অবতার হিসেবে আগমন করেছিলেন। অনেকে নিজেদের নবীকে স্বয়ং আল্লাহর সন্তান বলে ঘোষনা করেছে। তারা বলেছে, আমাদের নবী যেহেতু আল্লাহর পুত্র, আমরা সেই নবীর অনুসারী, সুতরাং আমারও আল্লাহর আত্মীয়। আল্লাহর ক্ষমতার সাথে আমাদের ক্ষমতাও মিশ্রিত রয়েছে।

অনেকে নবীর এবং তাঁর মায়ের মূর্তি নির্মাণ করে তার পূজা আরাধনা করা শুরু করেছে। আফসোস! যারা এসেছিলেন পৃথিবী থেকে মূর্তি উৎখাত করতে, আর তাদের ইন্তেকালের পরে তাঁর অনুসারীরা তাদের মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করা শুরু করেছে। নবীগণ তাঁর অনুসারীদেরকে যে বিধান দান করেছিলেন, সে বিধান তারা বিকৃত করেছে। সে বিধানের সাথে তারা তাদের মনগড়া নানা কাহিনী সংযোজন করেছে। এমনভাবে তারা তাদের নবীর শিক্ষা এবং জীবন বিকৃত করেছে, ঐ নবীর শিক্ষা যে কি ছিল, বর্তমানে তা খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুরহ ব্যাপার। নবীর প্রকৃত জীবন যে কেমন ছিল, তাও জানার কোন উপায় তারা রাখেনি। তাদের নবীর জীবনির নামে নানা ধরণের ভিত্তিহীন কাহিনী তারা রচনা করেছে। নবীর জীবন সংক্রান্ত নির্ভর যোগ্য কোন কিছুই জানার উপায় নেই।

এভাবে সেই নবীর অনুসারীগণ তাদের নবীর প্রবর্তিত ইসলামকে বিকৃত করে এক নতুন নামকরণ করেছে। গোটা পৃথিবীতে ধর্মের নামে যার অস্তিত্ব রয়েছে, সেসব

www.pathagar.com

ধর্মের বর্তমানে এই হলো অবস্থা। মহান আল্লাহ শুধুমাত্র ইসলামকে এই বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছেন।

এরপরেও নবীদের আন্দোলন বৃথা যায়নি। নবীর শিক্ষা এত বিকৃত ও পরিবর্তন করেছে, তবুও প্রতিটি জাতির ভেতরে সে নবীর শিক্ষা কিছুটা হলেও রয়ে গেছে। নবীর শিক্ষার কারণে বর্তমানে হাজার বছর পরেও সে নবীর অনুসারীদের ভেতরে কিছু ভলো মানুষের সৃষ্টি হচ্ছে। এটা সেই নবীর প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফসল। মানুষের পরম বন্ধু নবীগণ, তাদের সাথে এই মানুষ এই ধরণের অন্যায় আচরণ করেছে। নবী করীম (সাঃ) এর সাথে কি ধরণের আচরণ মক্কায় করা হয়েছিল, বদরের ময়দানে তিনি কি ব্যবহার লাভ করেছিলেন, ওহুদের ময়দানে এই মানুষ কিভাবে তাঁকে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল, বিশ্বনবীর জীবনীর পাঠক মাত্রই তা অবগত আছেন।

মানুষের প্রতি নবী ও রাসূলদের দাওয়াত

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সংশোধন করার জন্য যত নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন, তাঁরা সবাই মানুষকে একই দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিটি নবীই বলেছেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ নেই।' আমরা দেখি বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদগণ মানুষকে নিজের দলে আকৃষ্ট করার জন্য বা সরকারকে উৎখাত করার জন্য মুখরোচক কথাবার্তা বলে জনগণকে নিজের দিকে টানে। অথবা কোন সাময়িক সমস্যার দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষন করে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। তারপর ক্ষমতায় বসে নিজের আসল রূপ প্রকাশ করে।

পৃথিবীতে কোন নবী কিন্তু এমন করেননি। তাঁরা দেশের কোন সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেননি। অর্থনৈতিক মুক্তির শ্লোগান দিয়ে মানুষের সামনে অবতীর্ণ হননি। কৃত্রিম কোন বিষয় তাঁর জাতির সামনে টেনে আনেননি। তাঁরা সরাসরি বলেছেন−

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ−

হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ নেই। (আল কোরআন)

এই কথা শোনার সাথে সাথে নবীর পরিবার, সমাজ, দেশ কেন তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেছে তা চিন্তা করে দেখার বিষয়। ইলাহ শব্দ দিয়ে তাঁরা কি বুঝিয়েছেন যে,

www.pathagar.com

নবীদেরকে মানুষ নির্যাতন করেছে, হত্যা পর্যন্ত করেছে। প্রতিটি নবীর ওপরেই নির্যাতন করা হয়েছে শুধুমাত্র এই ইলাহ্ বলার কারণে, এখন আমাদেরকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, এই ইলাহ্ শব্দ দ্বারা আসলে কি বুঝায়।

যে শক্তি এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাইরের, ভেতরের সমস্ত প্রাণী ও অন্যান্য বস্তুর যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেন, আরবী ভাষায় সেই শক্তিকে ইলাহ্ বলে। মানুষের সমস্ত প্রয়োজন যিনি পূরণ করেন, সমাজ, পরিবার, দেশ পরিলচানার জন্য যিনি আইন দান করেন এবং যার আইন একমাত্র চলতে পারে তিনিই হলেন ইলাহ্। যে কোন প্রয়োজনে মানুষ যার মুখাপেক্ষী হয়, যিনি মানুষকে সাহায্য করবেন এবং মানুষ যার কাছে সাহায্য চাইবে তিনিই হলেন ইলাহ্। সুতরাং সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি, শোষকের দল, শাসকের দল যখন বুঝেছে, নবীর এই কথা গ্রহণ করলে নিজের কর্তৃত্ব বলতে আর কিছুই থাকবে না, সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহর জন্য ত্যাগ করতে হবে, তখনই তারা নবীর সাথে তথা ইসলামী আন্দোলনের সাথে শত্রুতা করেছে বর্তমানেও করছে।

পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, প্রতিটি নবীর সাথেই তৎকালীন সমাজের এবং শাসকের সাথে এই ইলাহ্ নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। কোরআনে বিবৃত এ সমস্ত কাহিনী অন্য কোন পৃথিবীর নয়, বরং যে পৃথিবীতে মানুষ বাস করছে, মানুষের সাথে যে পৃথিবী সম্পর্কিত সেই পৃথিবীরই ঘটনা এবং এ সমস্ত ঘটনা মানুষের সাথে সম্পর্কিত। নবী এবং রাসুলগণ যে দেশে এবং জাতির ভেতরে আগমন করেছেন, তাদের রাজনৈতিক সমস্যা ছিল, অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল, সাংস্কৃতিক সমস্যা ছিল তথা নানা ধরণের সমস্যা ছিল। সে সব সমস্যা সমাধানেরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নবী ও রাসুলগণ, তাদের অনুসারী ইসলামী আন্দোলনের নেতাগণ প্রতিটি দেশেই সব ধরণের সাময়িক ও স্থানীয় সমস্যাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র একটি সমস্যা সামনে রেখেছেন। সে সমস্যা হলো ইলাহ্ কেন্দ্রিক।

তাঁরা অন্য কোন সমস্যা জাতির সামনে তুলে না ধরে প্রধান সমস্যা অর্থাৎ সমস্ত ইলাহ্-এর দাসত্ব ত্যাগ করে মহান আল্লাহকে ইলাহ্ বলে স্বীকৃতি দিতে বলেছেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁর প্রথম আহ্বানেই বলেছিলেন, 'হে মানুষ! বলো আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ্ নেই। তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।'

সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়, পৃথিবীতে কোন সমস্যার সৃষ্টি তখনই হয়, যখন মানুষ আল্লাহকে রব হিসেবে, ইলাহ্ হিসেবে পরিত্যাগ করে। নিজেকে, সমাজের নেতাকে, প্রচলিত প্রথাকে, নিজের পরিবারকে, সমাজের আইনকে,

www.pathagar.com

দেশের শাসককে, দেশের নানা ধরণের নীতিকে, দৃষ্টির সামনের সাময়িক স্বার্থকে, ধর্মনেতাকে তথা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে নিজের মাবুদ বা ইলাহ্ তথা রব হিসেবে প্রধান্য দান করেছে, তখনই দেশে, সমাজে, ব্যক্তি জীবনে, রাষ্ট্র জীবনে নানা ধরণের সমস্যার আবির্ভাব ঘটেছে। এ কারণে নবী, রাসুল ও তাদের অনুসারী ইসলামী আন্দোলনের নেতাগণ দেশের, সমাজের সমস্ত সমস্যা উপেক্ষা করে প্রধান সমস্যার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

নবী বা রাসুলগণ জানতেন সমস্ত সমস্যার স্রষ্টা হলো মাত্র একটি। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান হলে অন্য সমস্যাসমূহ্ এমনিতেই মুছে যাবে। এই সমস্যার সমাধানের ওপর জীবনের অন্যান্য যাবতীয় সমস্যার সমাধান নির্ভরশীল। এ কারণে তাঁরা তাদের গোটা জীবন এই সমস্যা সমাধানের জন্যই ব্যয় করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ) যখন বনী ইসরাঈলদের কাছে আগমন করেছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন–

وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ، فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ، اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ، هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ–

তোমাদের প্রতি কিছু জিনিষ অবৈধ তথা হারাম করে দেয়া হয়েছে, আমি প্রেরিত হয়েছি সেগুলোকে বৈধ তথা হালাল করে দেয়ার জন্য। দেখো আমি তোমাদের রবের কাছে থেকে তোমাদের জন্য নিদর্শন বহন করে এনেছি। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আল্লাহ্ আমার এবং তোমাদেরও রব। অতএব তোমরা তাঁর দাসত্ব করো আর এটাই হলো একমাত্র সহজ সরল পথ। (সূরা আলে ইমরাণ-৫০-৫১)

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর জাতিকে কিভাবে আহ্বান জানিয়েছেন, কোন কথার দিকে আহ্বান জানিয়েছেন মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূল নবী করীম (সাঃ) কে ওহীর মাধ্যমে শুনিয়ে দিয়েছেন। তিনিও মানুষকে আল্লাহকে রব হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছেন। মহান আল্লাহর উলুহিয়াত এবং রবুবিয়াতই হলো প্রধান বিষয়। মানুষ মুখে আল্লাহকে স্বীকার করছে, তাঁর কালাম পাঠ করছে, লম্বা জুব্বা পরিধান করছে, মুখে দাড়ি রাখছে, নামাজ আদায় করতে করতে কপালে দাগ ফেলেছে, রোজা আদায় করতে করতে পেট পিঠের সাথে লাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সে ব্যক্তি মানুষের বানানো আদর্শ অনুসারে দেশের অর্থনৈকিত সমস্যার সমাধান করার জন্য চেষ্টা করছে।

www.pathagar.com

সে এমন রাজনীতি করছে, যে রাজনীতির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। সে নিজেকে এমন দলের সদস্য বানিয়েছে, এমন দলকে সমর্থন দিচ্ছে, ভোটের সময় এমন দলকে ভোট দিচ্ছে, যারা ইসলামী শাসন তথা কোরআন সুন্নাহ্র আইন কামনা করে না। এর পরিষ্কার অর্থ হলো, তারা আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজী, আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন, এই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হিসেবে সে নামাজ, রোজা, হজ্জ আদায় করছে। কিন্তু সে আল্লাহর রবুবিয়াত এবং উলুহিয়াত গ্রহণ করতে রাজী নয়। আল্লাহকে সে আইন দাতা এবং বিধান দাতা হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী নয়। Law Giver হিসেবে সে পৃথিবীর এক শ্রেণীর দার্শনিককে গ্রহণ করছে। এই ধরণের ব্যক্তিদের জন্য নিজেকে আল্লাহর গোলাম হিসেবে দাবী করার অবকাশ আল্লাহর বিধানে উপস্থিত নেই।

পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত আয়াত থেকে আমাদের সামনে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পৃথিবীর সমস্ত নবী এবং রাসুলের মতই হযরত ঈসা (আঃ) এর দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল তিনটি। তিনিও এই তিনটি বিষয়ের দিকে তাঁর জাতিকে আহ্বান করেছেন। তাঁর আহ্বানের প্রথম কথা ছিল, সমস্ত ক্ষমতার মালিক হলেন মহান আল্লাহ। অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব Sovereignty. supreme authority. supreme power যা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। এ কারণে দাসত্ব তাঁরই জন্য নিবেদিত। তাঁরই দাসত্ব করতে হবে। তাঁর আনুগত্যের ভিত্তিতে পৃথিবীতে মানব জীবনের সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালিত হবে। মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সভ্যতা সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হবে এই কথাটির ওপরে।

তাঁর আহ্বানের দ্বিতীয় কথা ছিল, সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন অধিপতির প্রতিনিধি হিসেবে আমার আদেশ মেনে চলতে হবে, আমার আনুগত্য করতে হবে। আমাকেই একমাত্র নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

হযরত ঈসা (আঃ) এর আহ্বানের তৃতীয় কথা ছিল, পৃথিবীতে মানব জীবনের বৈধ ও অবৈধের সীমারেখা মহান আল্লাহর আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট হবে। অর্থাৎ কোনটি হারাম তা আল্লাহর আইন বলবে। কোনটি হারাম সেটাও আল্লাহর আইন জানিয়ে দিবে। আল্লাহর আইনের মোকাবেলায় পৃথিবীর অন্য সমস্ত আইন বাতিল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ Law Giver হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ। কোন কাজ মানুষের করণীয় এবং কোন কাজ হতে মানুষ বিরত থাকবে, এ নির্দেশ দান করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। দেশ ও সমাজে কোন ব্যক্তির নির্দেশ চলবে না। আল্লাহর আইন দ্বারা দেশ, সমাজ পরিচালিত হবে।

www.pathagar.com

এক শ্রেণীর তথকথিত চিন্তাবিদ মনে করেন, প্রত্যেক নবী এবং রাসুলের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তাঁরা সবাই একই উদ্দেশ্যে আগমন করেননি। যারা এক কথা বলেন, হয় তাদের কোরআন বুঝার ক্ষমতা নেই অথবা তারা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এ কথা বলে থাকেন। প্রকৃত পক্ষে সমস্ত নবীর আহ্বান ছিল এক ও অভিন্ন। গোটা সৃষ্টি জগতের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী যিনি, সেই supreme authority-এর কাছ থেকে নিয়োগ পত্র নিয়ে যিনিই তাঁর প্রজাদের কাছে আগমন করবেন, তাঁর আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে যে, তিনি প্রজাদেরকে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত রাখবেন এবং স্বায়ত্ব শাসন পরিচালনা হতেও বিরত রাখবেন।

আল্লাহর আইনের মোকাবেলায় অন্যদের আইন বাতিল বলে ঘোষনা করবেন। আল্লাহর আইন গ্রহণ করলে কি পুরস্কার লাভ করা যাবে এ সম্পর্কে তিনি সুসংবাদ দান করবেন। আর যারা আল্লাহর আইন গ্রহণ করবে না, তাদেরকে তিনি ভয়ংকর শাস্তির কথা শোনাবেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

رُسُلاً مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَالرُّسُلِ–

আমি রাসুলদেরকে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছিলাম এ জন্য যে, তাদেরকে প্রেরণ করার পরে মানুষের কাছে আল্লাহর সামনে কোন কিছু বলার না থাকে। (সূরা নিসা-১৬৫)

মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তিনি কি উদ্দেশ্যে তাঁর নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন। মানুষের সামনে যেন তাঁরা আল্লাহর বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেন। আল্লাহর আইন তথা তাঁর দাসত্ব কেন করতে হবে, তা তাঁরা যুক্তি প্রমাণ দিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে দিবেন। কেননা, আল্লাহর আদালতে এ সমস্ত মানুষ যখন উপস্থিত হবে, তখন তাঁরা যেন এ কথা বলতে না পারে, আমাদের কাছে এমন কোন ব্যক্তি আসেনি, বা আমাদের কাছে এমন কোন মাধ্যম ছিল না, যার মাধ্যমে আমরা আপনার আইন সম্পর্কে অবগত হবো। আমরা যদি আপনার আইন সম্পর্কে অবগত হতে পারতাম তাহলে অবশ্যই আপনার আইন অনুসরণ করতাম।

এ সমস্ত কথা যেন কোন মানুষ আল্লাহর সামনে বলতে না পারে, এ কারণেই মহান আল্লাহ প্রতিটি জনপদে মানুষের কাছে নবী বা রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা আগমন করে মানুষের কাছে আল্লাহর আইন সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেছেন। যুক্তি প্রমাণ দিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন, এই এই কারণে আল্লাহর দাসত্ব করতে

www.pathagar.com

হবে। বিপুল সংখ্যক মানুষ তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। নবী ও রাসুলগণ ইন্তেকালের সময় আল্লাহর কিতাব তাঁর অনুসারীদের কাছে রেখে গেছেন। নবীর অনুসারীগণ নবীর শিক্ষা মানুষের ভেতরে প্রচার করেছেন। তাঁরা মানুষকে সত্য পথের দিকে আহবান করেছেন। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধন-প্রাণ দিয়ে ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত করেছেন। এখন কোন মানুষ যদি আল্লাহর আইন গ্রহণ না করে, পৃথিবীর কোন আইন প্রণেতার আইন গ্রহণ করে, তার চিন্তাধারা অনুসরণ করে দেশ সমাজ পরিচালিত করে, তাহলে নবী, রাসুল এবং তাদের অনুসারীগণ আল্লাহর কাছে অভিযুক্ত হবেন না।

গ্রেফতার হবে তারা, অভিযুক্ত তারাই হবে, যারা ইসলামী আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা করেছে, তাদেরকে বিদ্রুপ করেছে। তাদের প্রতি অত্যাচার করেছে। কেননা, তাদের কাছে আল্লাহর আইন ছিল, সে আইনের কিতাব তারা কাপড়ে জড়িয়ে যত্নের সাথে বিশেষ স্থানে রেখে দিয়েছে, অনুসরণ করেনি। সে আইনের কিতাব তারা ঝাড় ফুঁকের কাজে ব্যবহার করেছে। সওয়াবের আশায় তিলওয়াত করেছে, কিন্তু তার শিক্ষা ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়িত করেনি।

সেই সাথে ঐ সমস্ত লোকগুলোও গ্রেফতার হবে, যাদের কাছে আল্লাহর আইনের কিতাব ছিল, তারা দেখছিল, দেশ সমাজ আল্লাহর আইনের বিপরীত চলছে। অর্থাৎ আলেম সমাজ। এরা তো সবই জানে। জেনে বুঝেও তাঁরা যদি কোন প্রতিবাদ না করে, তাহলে তাঁরা অবশ্যই আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হবে। আল্লাহর নবী ও রাসুলগণ মহাসত্যের আহ্বায়ক, সেই সাথে তাঁরা মানষের আনুগত্য লাভের অধিকারী। তাদের আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَـا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِـاِذْنِ اللّٰـهِ–

আমি যে রাসুলই প্রেরণ করেছি, তাদেরকে এ কারণে প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর আদেশের ভিত্তিতে তাদের আনুগত্য করতে হবে। (সূরা নিসা-৬৪)

রাসুল বা নবী পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং মানুষ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে–এতেই মানুষের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। নবীকে বিশ্বাস করবে সেই সাথে মানুষ অন্য কারো আইন মেনে চলবে বা নিজের ইচ্ছামত জীবন যাপন করবে, এটা সম্ভব নয়। এ উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্ নবী বা রাসুল প্রেরণ করেননি। বরং নবী বা রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্যই হলো, জীবন যাপনের জন্য যে বিধান তিনি নিয়ে আসেন,

www.pathagar.com

পৃথিবীর সমস্ত বিধান ত্যাগ করে কেবলমাত্র সেই বিধান অনুসরণেই জীবন যা' ন করতে হবে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী রাসুল যে নির্দেশ প্রদান করেন, পৃথিবীর সবার নির্দেশ ত্যাগ করে তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে হবে।

এটাই হলো রাসুলকে রাসুল এবং নবীকে নবী বলে স্বীকৃতি দানে স্পষ্ট অর্থ। নবী রাসুলদেরকে স্বীকৃতি দান করবে, অপরদিকে মানুষের তৈরী করা আইন পালন করবে, মানুষের তৈরী করা মতবাদ মতাদর্শ দেশের বুকে বাস্তবায়ন করার

আন্দোলন করবে, ধর্মনিরপেক্ষ নীতিমালা অনুসরণ করবে, এ অবকাশ আল্লাহ দেননি। যারা এ ধরণের করে,তারা যে স্পষ্ট মুনাফিক এবং আল্লাহর দ্বীনের মারাত্মক শত্রু এতে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

নবী ও রাসুল ও তাঁদের অনুসারীদের আরো একটি দায়িত্ব হলো, তাঁরা আল্লাহর দেয়া মতবাদ মতাদর্শ পৃথিবীর সমস্ত মতবাদ মতাদর্শের ওপরে বিজয়ী করবেন। অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত আদর্শ, মতবাদ, মতাদর্শ, আইন কানুনের মোকাবেলায় ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবেন। আল্লাহর দেয়া আদর্শ রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে দেশ বা পৃথিবী শাসন করবে। মহান আল্লাহ বলেন–

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ–

আল্লাহ তাঁর নিজের রাসুলকে হেদায়েত ও সত্যদ্বীন (ভারসাম্য মূলক জীবন ব্যবস্থা) সহকারে প্রেরণ করেছেন যেন অন্য সমস্ত দ্বীনের (মতবাদ মতাদর্শের) ওপর তাকে বিজয়ী করার জন্য। আর এ ব্যাপারে মুশরিকরা যতই অসুবিধা অনুভব করুক না কেন। (সূরা তাওবা)

আরবী দ্বীন শব্দ সম্পর্কে সীরাতে সরওয়ারে আলমে বর্ণনা করা হয়েছে, 'দ্বীন শব্দটিকে আরবী ভাষায় এমন জীবন ব্যবস্থা বা জীবন পদ্ধতির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যার প্রতিষ্ঠাকারীকে সনদ ও অনুসরণ যোগ্য বলে মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করতে হয়।'

সুতরাং উল্লেখিত আয়াতে নবী ও রাসুল আগমনের উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি পৃথিবীতে আগমন করে মানুষের তৈরী করা সমস্ত মতবাদ মতাদর্শকে পরাজিত করে আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করবেন। পৃথিবীর সমস্ত আইন থাকতে আল্লাহর আইনের অধীনে। আল্লাহর আইন প্রচলিত কোন আইনের অধিনে থাকবে না বা এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর আইন বা বিধান পৃথিবীতে আগমন করেনি।

www.pathagar.com

অন্য কোন আইনের অধিনে আল্লাহর আইন সামান্য সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে অবস্থান করবে, এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর আইন আগমন করেনি।

পৃথিবীর সব ধরণের মতবাদ মতাদর্শ আল্লাহর আইনের অনুগ্রহ কুড়িয়ে টিকে থাকার হলে টিকে থাকবে আর না হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহর আইন যিনি নিয়ে আসেন, তিনি পৃথিবী ও আকাশের বাদশাহ তথা অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালীর প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেন। তিনি অর্থাৎ নবী বা রাসুল নিজের বাদশাহ মহান আল্লাহর আইনকে বিজয়ী হিসেবে দেখতে চান। পৃথিবীতে যদি কোন আদর্শ বা মতবাদ মতাদর্শ টিকে থাকতে চায়, তাহলে আল্লাহর আইনের দেয়া সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেই তাকে থাকতে হবে। আল্লাহর আইনের মুকাবেলায় পৃথিবীতে অন্য কোন আইন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, এমন ধরণের কোন আইনের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকবে না। নবী ও রাসুলদের আহ্বানের এই হলো মূল কথা।

মানব জাতির মুক্তির জন্যই নবীদের আগমন

পৃথিবীর ইতিহাস এ কথাই প্রমাণ করে যে, এই পৃথিবীর মানুষ যখন আল্লাহর আইনের মোকাবেলায় অন্য কারো আইনকে প্রাধান্য দান করেছে, যে দেশে বা যে স্থানে এই অবস্থা হয়েছে, সেখানেই নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের সমস্যায় মানুষ নিমজ্জিত হয়েছে। মানুষ যখন নিজের মনের চাহিদা অনুসারে জীবন পরিচালনা করেছে, মানুষ নামক নেতার আনুগত্য করেছে, তাদের আইন অনুসরণ করেছে, আল্লাহর দেয়া হেদায়াত ও পথনির্দেশ অমান্য করে অন্যের তৈরী আইন কানুন ও বিধানের ভিত্তিতে নিজেদের রাজনীতির ভিত্তি, অর্থনীতির ভিত্তি তথা সার্বিক জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত করেছে, তখনই প্রকৃত বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

গোটা পৃথিবীতে অশান্তি অনাচার দেখা দিয়েছে। মানুষ অত্যাচারিত হয়েছে, শোষণের শিকার হয়েছে, প্রতারিত হয়েছে, বঞ্চনার শিকার হয়েছে, জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ আর্তনাদ করা শুরু করেছে। মহান আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় তখন তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি মানুষকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে নবী বা রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা আগমন করে সার্বিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছেন। পূর্ব প্রতিষ্ঠিত জুলুমমূলক ব্যবস্থা উৎখাত করে মহান আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে সার্বিক বিপর্যয় রোধ করেছেন।

নবী বা রাসুল মানুষের গোটা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিতে চান। প্রচলিত রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিতে চান।

www.pathagar.com

কারণ কোন মানুষ যখন নিজেকে বিশ্ব জগতের স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে পেশ করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি মানুষের কাছে এই দাবী করবেন, তোমরা পরিপূর্ণভাবে আমার আনুগত্য করো। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বা নবী ও রাসুল পৃথিবীর কোন নেতার নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য আসেন না। পৃথিবীর কোন শাসকের অধিনে অবস্থান করার জন্য আগমন করেন না। এটা তাঁর নবুয়্যাত ও রিসালাতের মর্যাদার পরিপন্থী।

নবীগণ কোন শাসকের প্রজা হতে আসেন না। বরং তাঁরা আসেন সমস্ত মানুষের শাসক হিসেবে। রাজা, বাদশাহ্ এবং সমস্ত নেতাগণ নবীর আনুগত্য করবে, নবীর আনিত বিধানের কাছে মাথানত করবে, নবীর বিধান অনুসারে দেশ পরিচালনা করবে, এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা আগমন করেন। পৃথিবীর মানুষ নানা ধরনের বিশৃংখলতা করবে, বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, ফলশ্রুতিতে তাদের ওপরে নানা ধরনের শাস্তি অবর্তীণ হবে। তখন তারা যেন বলতে না পারে, এ সমস্ত কর্ম কান্ড করলে যে শাস্তি নেমে আসবে এ কথা আমরা পূর্বে অবগত ছিলাম না। যদি জানতাম তাহলে এ সমস্ত কর্মকান্ড হতে বিরত থাকতাম। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَلَوْلاَ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْ لاَ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلاً فَنَتَّبِعَ اٰيَاتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ–

(আর এটা আমি এ কারণে করেছি যে) এমন যেন না ঘটে যে, তাদের স্বীয় কর্ম ফলের দরুণ তাদের ওপরে যখন কোন আযাব এসে পড়বে তখন তারা এ কথা বলতে যেন না পারে, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের কাছে কেন কোন রাসুল প্রেরণ করোনি? (যদি রাসুল প্রেরণ করতে) আমরা তোমার বিধানের অনুসারী হতাম এবং বিশ্বাসীদের দলে শামিল হতাম। (সূরা কাসাস-৪৭)

পৃথিবীতে বা কোন জাতির কাছে যতক্ষণ আল্লাহ্‌র বিধান অবিকৃত থাকে এবং তা মানুষের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম বর্তমান ছিল, ততক্ষণ সে জাতির জন্য নবীর প্রয়োজন হয়নি। তবে আল্লাহ্‌র বিধান যখন বিকৃত করেছে, এর ভেতরে হ্রাস বৃদ্ধি করেছে তখন নবী রাসুলের প্রয়োজন হয়েছে, তাঁরা আগমন করেছেন। কোন ক্ষেত্রে যদি আল্লাহ্‌র বিধান বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয়ে যায়, সেই বিধানের সাথে মানুষের মনগড়া বিধান মিশ্রিত হয়ে যায়, তখন সেখানের অধিবাসীদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে

www.pathagar.com

বলার থাকে যে, কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা আমরা বুঝতে পারিনি। তোমার বিধান যেখানে বিকৃত ছিল, সেখানে সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য আমরা করতে পারিনি। কিন্তু মহান আল্লাহ মানুষকে তা বলার সুযোগ দান করেননি। সেখানে দ্রুত নবী বা রাসুল প্রেরণ করে তাদেরকে সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য দেখিয়ে দিয়েছেন।

এরপরেও যে ব্যক্তি বা জাতি ভুল পথে চলেছে, এ কারণে তাদেরকেই দায়ী হতে হবে। বর্তমান পৃথিবীতে কোরআন অবিকৃত অবস্থায় অবস্থান করছে, রাসুলের হাদিস অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে, গোটা বিশ্ব ব্যাপী তা প্রচারিত হচ্ছে, এ অবস্থায় পৃথিবীর কোন জাতির পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, প্রকৃত সত্য আমাদের জানা ছিল না বলেই আমরা ভুল পথে পরিচালিত হয়েছি। মুক্তির সঠিক পথ কোনটি আমরা জানতাম না বলেই ভ্রান্ত পথে মুক্তি অর্জনের চেষ্টা করেছি। তোমার ইবাদাতের সঠিক মাধ্যম আমরা জানতাম না বলেই মূর্তি পূজা করেছি, মাজার পূজা করেছি, পীরের পায়ে সেজদা দান করেছি, মাজারে মানত মেনেছি, আগুনের পূজা করেছি, পাথরে মাথা ঠুকেছি।

তোমার পক্ষ থেকে দেয়া রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান ছিল না, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ছিল না, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যার সমাধান ছিল না, ধর্মীয় সমস্যার সমাধান ছিল না, পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তার সমাধান ছিল না এ কারণে আমরা পৃথিবীর দার্শনিকদের কাছে থেকে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান গ্রহণ করেছি। পৃথিবীর কোন মানুষের জন্য এই অজুহাত পেশ করার কোন সুযোগ বর্তমানে নেই কিয়ামত পর্যন্তও থাকবে না। কারণ, কিয়মত পর্যন্ত এই কোরআন ও হাদীস ইনশাল্লাহ অবিকৃত থাকবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

সৃষ্টির শুরুতেই মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা দান করেছিলেন। মানুষ এর ভেতরে তাদের হীন স্বার্থের কারণে এর ভেতরে পরিবর্তন সাধন করে নানা ধরনের ধর্মমত আবিষ্কার করেছে। মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ–

আল্লাহর কাছে ইসলামই হলো একমাত্র মনোনীত দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)। যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছিল তাদের পক্ষে এই দ্বীন ত্যাগ করে অন্যান্য মত পথ গ্রহণ

www.pathagar.com

করার কারণ এই ছিল যে, তাদের কাছে সত্য জ্ঞান পৌছার পরে তারা পরস্পরের ওপরে বাড়াবাড়ি করার জন্য এমন করেছিল। (সূরা আলে ইমরাণ-১৯)

এ আয়াতের অর্থ পরিষ্কার। গোটা পৃথিবীতে যত নবী এবং রাসূল যেখানে যে ভাষায় আগমন করেছেন, তাদের ওপরে যে ভাষায় কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল, তা ছিল ইসলাম। তাদের সমস্ত শিক্ষাই ছিল নবী করীম (সাঃ) এর শিক্ষার অনুরূপ ইসলামী শিক্ষা। এই প্রকৃত ও আসল দ্বীনকে তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে বিকৃত করে এর ভেতরে পরিবর্ত পরিবর্ধন করে মানব গোষ্ঠীর ভেতরে যে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রসার ঘটানো হয়েছে, এর আসল কারণ এটাই ছিল যে, মানুষ তাদের বৈধ অধিকারের সীমারেখা লংঘন করে পার্থিব স্বার্থ সংক্রান্ত কিছু অবৈধ সুযোগ সুবিধা কামনা করছিল। এ কারণে তারা ইসলামী শিক্ষার ভেতরে বিশ্বাসগত পরিবর্তন সাধন করেছিল। নিয়ম নীতির পরিবর্তন করেছিল, ইসলামের নানা বিধানে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে একটি নতুন পথ আবিষ্কার করেছিল, যে পথ অবলম্বন করলে তারা পৃথিবীর জীবনে যেমন খুশী তেমনভাবে জীবন যাপন করতে পারবে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো সম্রাট আকবরের দ্বীনে ইলাহী।

মানুষ নিজেদের জীবন ব্যবস্থাকে ছিন্ন বিছিন্ন করে ফেলেছিল। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، كُلٌّ اِلَيْنَا رَاجِعُوْنَ–

আর তারা নিজেদের ভেতরে নিজেদের দ্বীনকে ছিন্ন বিছিন্ন করে ফেললো, তাদের সবাইকে আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা আম্বিয়া-৯৩)

সুতরাং আমরা পৃথিবীতে বর্তমানে যত ধর্মমত দেখছি, তা সবই যে মূল ইসলামকে এক শ্রেণীর মানুষ বিকৃত করে বিভিন্ন নাম দিয়ে ধর্ম তৈরী করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। মানুষ ছিল একই আদর্শের অনুসারী, এই মানুষকে বিছিন্ন করেছে আরেক শ্রেণীর মানুষ। এভাবে মানুষের ভেতরে দলাদলি সৃষ্টি করে পরস্পরে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়েছে।

নবুয়্যাত লাভের পূর্বে নবীগণ কেমন ছিলেন

অনেকে ধারণা করেন, নবী রাসুলগণ নবুয়্যত লাভ করার পূর্বেও তেমনি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যেমন জ্ঞান তাদের ছিল নবুয়্যত লাভ করার পরে। কিন্তু তাদের এই ধারণা ভুল। যে সব নবীর জীবনী আমরা জানতে পারি, বিশেষ করে নবী করীম (সাঃ) ব্যতীত আর কারো জীবনী অবিকৃত অবস্থায় পাওয়াও যায় না, তাদের জীবনীর

www.pathagar.com

দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁরা যে নবী হবেন, এই কথাটিও তাঁরা অবগত ছিলেন না। নবী করীম (সাঃ)ও জানতেন না, তিনি নবী হবেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ) কে আকাশের ঐ বিশাল সূর্যের সাথে তুলনা করেননি। তুলনা করেছেন একটা উজ্জ্বল প্রদীপের সাথে। এর কারণ হলো, একটি সূর্য আরেকটা সূর্য সৃষ্টি করতে পারেনা। সূর্য তার নিজের আলো দিয়ে কোন প্রদীপ জ্বালাতে পারে না। কিন্তু একটি প্রদীপ আরেকটি প্রদীপ জ্বালাতে পারে। প্রদীপ থেকে শতকোটি প্রদীপ জ্বালানো সম্ভব। সূর্য থেকে তা সম্ভব নয়।

এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) কে বলা হয়েছে উজ্জ্বল প্রদীপ। তিনি যে আলো প্রজ্জলিত করে গিয়েছেন কিয়ামত পর্যন্ত সে আলো থেকে হাজার কোটি প্রদীপ জ্বলতে থাকবে। এ প্রদীপ এমনি এক প্রদীপ–সে যে হাজার কোটি প্রদীপ জ্বালায়, নিজে অমর অক্ষয়। এ প্রদীপের আলো থেকে শত সহস্র কোটি প্রদীপ জ্বলবে কিন্তু তাঁর নিজের আলো বিন্দু পরিমাণ হ্রাস পাবে না।

এ কারণেই আল্লাহ্ এই প্রদীপকে পৃথিবীতে প্রেরণের একটা বিশেষ সময় নির্ধারণ করেছিলেন। আলোক শিখার প্রয়োজন হয় তখনই যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, নিকষ কালো ঘন আঁধার চারদিক যখন ছেয়ে ফেলে। সে সময়েও অন্ধকারের একটা আবরণ গোটা ধরণীকে আচ্ছাদিত করেছিল। সামান্যতম আলোর রেশ ছিল না কোথাও। দু'চোখ যে দিকে যায় সেদিকেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। দুঃসহ ভয়াবহ অন্ধকারের অবগুন্ঠন। শ্বাস রুদ্ধকর অসহনীয় পরিবেশ। ঘন অন্ধকারে মিথ্যে শক্তির সাবধানী চাপা পদক্ষেপ।

অন্ধকার পৃথিবীটা যেন কি এক ভয়াবহ নিঃসঙ্গতায় থম্ থম্ করছিল। অন্ধকার! চাপ চাপ বাধা কালো অন্ধকার শুধু। কালো ছায়া আবৃত করেছিল পৃথিবীর অন্ত প্রত্যন্তে। পাপে ভারাক্রান্ত পৃথিবী। পাপাচ্ছন্ন নিঃসঙ্গ বোবা পৃথিবী। অসহ্য অবর্ণনীয় একটা যন্ত্রণায় সমস্ত পৃথিবী যেন মুচ্ড়ে মুচ্ড়ে উঠছিল। পাপাচ্ছন্ন তপ্ত ধরিত্রীর বক্ষ হতে যেন অগ্নিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। পাপের প্লাবন, অন্ধকারের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল জগত জুড়ে। নিশা! মহানিশা! কারো মুক্তির যেন কোন আশাই নেই। নিষ্করুণ দৃষ্টিতে গোটা পৃথিবী তাকিয়ে আছে মহান আল্লাহর দিকে। কোন মূহুর্তে আসবেন সেই মহান মুক্তিদাতা।

রাতের অন্ধকার যত গভীর হয় সূর্যের আগমন কাল ততই ঘনিয়ে আসে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমনই এক সময় নির্ধারণ করেছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধুকে এই অন্ধকার পৃথিবীতে প্রেরণের, যে কোন দৃষ্টিতে সেটাই ছিল উপযুক্ত সময়। কারণ

www.pathagar.com

সে সময় কোথাও কোন আলোর দিশা ছিল না, সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সে মূহুর্তে পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল একটি আলোক বর্তিকার। আর আল্লাহ্ যথা সময়েই সে আলোক বর্তিকা প্রজ্জলিত করেছিলেন। আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর আকাশে আরোহণের পরে প্রায় পাঁচ শত বছরের মধ্যে গোটা পৃথিবীর কোথাও মহান আল্লাহ্ কোন নবী প্রেরণ করেননি।

ফলে মানুষ আল্লাহর বিধান ছেড়ে ধর্মীয় দিক থেকে বিভিন্ন ধরণের ভ্রান্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। কেউ প্রকৃতির পূজা করতো আবার কেউ নিজের হাতে মূর্তি বানিয়ে তার পূজা আরাধনা করতো। আবার কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস করতো বটে, কিন্তু সেই সাথে তারা এটাও বিশ্বাস করতো, আল্লাহ একা নন–তার অনেক সাঙ্গ-পাঙ্গ আছে। তার কাছে কোন দরখাস্ত পেশ করতে হলে কোন মাধ্যম ছাড়া পেশ করা যায় না। এভাবে তারা এক আল্লাহর সাথে অংশীদার বানিয়ে নিত।

ধর্মের নামে মায়া মমতাহীনভাবে আদম সন্তানকে হত্যা করা হত। এই হত্যা দৃশ্য দেখার জন্য শত সহস্র মানুষ সমবেত হত। মানুষকে বলী দেয়ার এই নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখে কারো মনে সামান্যতম করুণার উদ্রেক এই জন্য হত না, ধর্মের নির্দেশেই তা করা হচ্ছে। আর বলী হয়ে যাবার পরেই নিহত মানুষটা স্বর্গে পৌঁছে যাবে। এ ছিল ধর্মীয় অবস্থা।

আর রাজনৈতিক দিক ছিল আরো বিভৎস-করুণ। গোত্র ভিত্তিক শাসন ছিল কোথাও, কোথাও ছিল ঘৃণ্য রাজতন্ত্র, আবার কোথাও ছিল স্বৈরতন্ত্র। সূদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার কারণে শোষক স্ফিত হয়ে উঠছিল আর শোষিত কঙ্কাল সার হয়ে যাচ্ছিল। মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব কায়েম ছিল। স্বার্থবাদীদের প্রস্তুত করা আইন-কানুনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল মানবতা। গোটা পৃথিবী ধ্বংসের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। যেন সামান্য একটু স্পর্শ করলেই পৃথিবী ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে। গোটা পৃথিবীতে মিথ্যে শক্তির বিজয় কেতন স্বগৌরবে উড়ছিল। ন্যায় অন্যায়ের বিভেদ রেখা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

সেই শিশুকাল থেকেই নবী করীম (সাঃ) মূর্তির প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করতেন। তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যগণ তাকে কোন দিন কোন মূর্তির সামনে অগ্রসর করাতে পারেনি। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সেই পরম সত্তার সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এবং অনুধাবন করেছেন, দৃষ্টির সামনের মানুষগুলো যাদের সামনে মাথানত করছে, নিজের মনের আকাংখা পেশ করছে, বিপদে যার কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, তার কোনই ক্ষমতা নেই। বরং সে মূর্তিই আরেকজন

www.pathagar.com

মহাক্ষমতাশালীর অধিন। তাঁর গোত্র কুরাইশরা কা'বা এবং হজ্জের নেতৃত্ব হাতে পেয়ে যে চরম অনাচারের মধ্যে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করেছে। মক্কার বাইরে থেকে যারা হজ্জ করতে আসবে তাদেরকে কুরাইশদের পোশাক পরিধান করে কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করতে হবে, নতুবা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে প্রদক্ষিণ করতে হবে। হজ্জের অংশ হিসেবে সবাই আরাফাতের ময়দানে গেলেও কুরাইশরা যাবে না।

মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে নবী করীম (সাঃ) ছিলেন যাবতীয় পাপ ও পংকিলতার বহু উর্ধ্বে। পবিত্র কোরআন থেকে যেমন সূরা শুরার এই আয়াত–

وَكَذَالِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا، مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ–

আর এমন করেই হে নবী, আমি আমার নির্দেশে একটি রুহ্ আপনার দিকে ওহী প্রেরণ করেছি, আপনি কিছুই অবগত ছিলেন না কিতাব কাকে বলে, ঈমান কি জিনিস! কিন্তু সেই রুহ্কে আমি একটি আলো বানিয়ে দিয়েছি, যার সাহায্যে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে চাই পথ দেখাই। নিঃসন্দেহে আপনি সঠিক-সোজা পথের দিকে মানুষদেরকে পথ প্রদর্শন করছেন। (সূরা শূরা-৫২)

আবার সূরা কাসাসের এ আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَاكُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ–

আপনি তো কখনও এ আশায় অপেক্ষা করছিলেন না যে, আপনার ওপরে কিতাব অবতীর্ণ করা হবে। এটা তো নিছক আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যে, আপনার ওপরে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং আপনি আল্লাহদ্রোহীদের সাহায্যকারী হয়েন না। (সূরা কাসাস-৮৬)

পবিত্র কোরআনে সূরা দোহায় এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى–

এবং আপনাকে পথ অনভিজ্ঞ রূপে আমি পেয়েছি, পরে আমি হেদায়াত দান করেছি। (সূরা দোহা-৭)

www.pathagar.com

এ ধরনের অনেক আয়াত থেকেই আমরা জানতে পারি, মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন ওহী অবতীর্ণের পূর্বে নবীগণ যে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, সে জ্ঞান সাধারণ কোন মানুষের থেকে তেমন বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। যে বিষয়টা ছিল, তার ভেতরে আর সাধারণ মানুষের ভেতরে বিশাল পার্থক্য ছিল। নবুয়্যত লাভের পূর্বে সাধারণের থেকে তাদের জীবনধারা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। দৈনন্দিন সাধারণ কাজ কর্মে অন্য মানুষের সাথে সামঞ্জস্য থাকলেও তাদের কাজের ধরণ এবং মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ছিল গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের থেকে পবিত্র ও পৃথক।

কিন্তু আল্লাহ্ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং ওহী সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না বলেই ধারণা হয়। একদিকে এ কথার সাক্ষ্য পবিত্র কোরআন দেয় অপর দিকে সাক্ষ্য দেয় স্বয়ং নবীর অবস্থা। কেননা, ওহী সম্পর্কে যদি তাদের পূর্ণ জ্ঞান পূর্ব হতেই থাকতো, তাহলে প্রথম ওহী অবতীর্ণের সময় তাঁরা অস্থির হয়ে পড়তেন না।

পক্ষান্তরে ওহী আসার পূর্বে তাদের মনে এবং চিন্তার জগতে যে সমস্ত চিন্তার উদয় হত, সে চিন্তা কোন মিথ্যা ভিত্তির উপরে ছিল না। প্রকৃত সত্যের দিকেই তাদের চিন্তা ধাবিত হত। তাদের চোখ যা দেখতো, তাদের ঘুমের অবচেতন জগতে যে দৃশ্য এসে চোখের সামনে ধরা দিত, তা ছিল বাস্তব। মহান আল্লাহ্ ওহীর জ্ঞান দিয়ে তাদের সামনে মহা সত্যের এক আশ্চর্য পৃথিবীর দ্বার উন্মোচন করে দিতেন। তাদের বিশ্বাস দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হত।

অর্থাৎ নবীগণ ওহীজ্ঞানের পূর্বে পরিচালিত হতেন বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রাকৃতিক হেদায়াতের দ্বারা। তাদের বুদ্ধির জগৎ মহান আল্লাহ্ এমনভাবে গঠন করেছিলেন যে, কোনটা সত্য এবং কোনটা মিথ্যা তার পার্থক্য তাঁরা অনায়াসে বুঝে নিয়ে সেভাবে জীবন পরিচালিত করতেন। ইউরোপের অন্ধ ও বিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণ ব্যতীত কেউ বলতে পারবে না যে, কোন একজন নবীও তাদের গোটা জীবনে মূহুর্তের জন্য কোন মূর্তির সামনে মাথানত করেছেন।

কেন করেননি? কারণ তাদের বুদ্ধিই বলে দিত পৃথিবীর অন্যান্য জড়পদার্থের মতই এই মূর্তিও জড়পদার্থ। এসবের নিজস্ব কোনই ক্ষমতা নেই। গোটা পৃথিবীর দিকে তাদের দৃষ্টি সহজাত প্রবৃত্তির কারণেই নিপতিত হত এবং তাদের মন বলে উঠতো, এসবের পেছনে একজন মহাক্ষমতাবানের ক্ষমতা কার্যকর রয়েছে। সৃষ্টির কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি করা হয়নি। সাধারণ কোন মানুষের মনে এ ধরণের কোন চিন্তার উদয় না হলেও নবুওয়ত পূর্ববর্তী জীবনে নবীদের মনে হত। যারা উচ্চ পর্যায়ের সাধক ছিলেন বা সৃষ্টি জগৎ নিয়ে গবেষণা করতেন এবং সৃষ্টির সন্ধান করতে যেয়ে স্রষ্টার সন্ধান করতেন বা লাভ করতেন তাদের মনেও উল্লেখিত চিন্তার উদয় হত।

www.pathagar.com

এ কারণেই চিন্তাশীলগণ কোরআনের আলোকে বলেছেন, নবীদের নবুয়্যত পূর্ববর্তী জীবনের চিন্তাধারা নেতিকতার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পর্যায়ের মানুষের চিন্তাধারার অনুরূপ ছিল। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ আহ্বান করেছেন, তোমরা যে পৃথিবীতে বাস করছো, তোমরা যে দেহ নিয়ে পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করো, দৈনন্দিন জীবনে তোমরা যে সামগ্রী ব্যবহার করো, যে বীর্য তোমরা স্ত্রীর গর্ভে নিক্ষেপ করো এ সব নিয়ে তোমরা কেন চিন্তা গবেষণা করো না?

এ সব নিয়ে চিন্তা গবেষণা করলেই তোমরা অনুধাবন করতে পারবে, তোমাদের প্রকৃত স্রষ্টা কে। তোমরা অনুভব করতে পারবে, তোমাদেরকে বৃথা সৃষ্টি করা হয়নি। মহান আল্লাহ্ যাকে নবী হিসেবে তাঁর বান্দাদের সামনে প্রেরণ করবেন, তাদের মনে এসমস্ত চিন্তার উদয় হত এবং তারা মহা সত্য অনুধাবন করতেন। প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষণ চিন্তা গবেষণা এবং সহজাত জ্ঞানের প্রয়োগ করে নবীগণ চলতেন। বিভিন্ন নবীর নবুওয়ত পূর্ববর্তী জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই আমাদের সামনে সে সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

আমরা নবী করীম (সাঃ) এর নবুয়্যত পূর্ববর্তী জীবনে দেখতে পাই, সে সমাজে প্রচলিত কোন একটি প্রথার সাথে তিনি নিজেকে বিলীন করে দেয়া দূরে থাক, ক্ষণিকের জন্য তা গ্রহণ করেননি। তিনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মূহুর্তের জন্য ও অংশীদারিত্ব মেনে নেননি। মাতৃগর্ভ থেকে এই বিশাল পৃথিবীতে এসে চৈতন্য উদয়ের পরে তিনি ঐ সমস্ত বিশ্বাস নিজের অন্তরে এক মূহুর্তের জন্য স্থান দেননি, যে বিশ্বাসের বেষ্টনে তিনি পরিবেষ্টিত ছিলেন।

যে পরিবারে এবং পরিবেশে তিনি শিশুকাল থেকে চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন, অবাক করার বিষয় হলো, সে পরিবার এবং পরিবেশের সামান্য ছোঁয়া তাকে স্পর্শ করতে পারলো না। এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মানুষের জীবনে, আর তাঁর জীবনে কোনই পার্থক্য ছিল না। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম যে আদর্শ মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করেছিলেন, সে আদর্শে যে বিকৃতি করা হয়েছিল এবং ঘৃণিত নতুন প্রথার আমদানী করে তা অনুসরণ করা হত, ক্ষণিকের জন্য তিনি তা মেনে নেননি। কোন প্রতিমার (Statue) উদ্দেশ্যে বলিদানকৃত পশুর গোস্ত তিনি ভক্ষণ করেননি। বন্যার পানির ন্যায় যে সমাজে মদ প্রবাহিত হত, তাকে সে মদ স্পর্শ করতে পারেনি। নারী ভোগের প্রতিটি দ্বার যেখানে ছিল উন্মুক্ত, তিন সে দ্বারের দিকে নিজের অজান্তেও কখনো নিজের পদদ্বয় দূরে থাক–মূহুর্তের জন্য স্বীয় মনকে অগ্রসর করাননি।

www.pathagar.com

তাঁর গোত্র কুরাইশ গোত্র সে সমাজে আভিজাত্যের অভিমানে একটা বৈষম্য সৃষ্টি করে রেখেছিল। তাঁরা দাবী করতো সমস্ত মানুষের মধ্যে তাঁরা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং হজ্জের সময়ে অন্যদের মত তাদেরকে আরাফাতে যেতে আসতে হবে না। তাদের দাবী ছিল, কুরাইশরা শ্রেষ্ঠত্বের কারণে কা'বার বাইরে গিয়ে সাধারণ হাজ্জীদের মত আরাফাতে অবস্থান করতে পারে না, এটা তাদের মর্যাদার পরিপন্থী। কিন্তু তাঁরা এটা অবগত ছিল যে, মক্কা থেকে হজ্জের সময় আরাফাতে গমন করা ইবাদাতের অংশ। কিন্তু তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে এই ইবাদাতকে সংকীর্ণ করেছিল।

মক্কার অধিবাসীদের মধ্যে যারা কুরাইশদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে বা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, তাঁরাও আত্মীয়তার বা বন্ধুত্বের সূত্রে মর্যাদার দাবী উত্থাপন করে কুরাইশদের অনুকরণে হজ্জের ইবাদাতে সংকীর্ণতা এনেছিল। তাঁরাও আরাফাতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। আরেকটি প্রথা তাঁরা প্রবর্তিত করেছিল, কা'বা এলাকার বাইরে থেকে যারা আসবে তাঁরা তাদের সাথে নিয়ে আসা খাদ্য আহার করতে পারবে না এবং পোষাক পরিধান করতে পারবে না।

কা'বার সেবক কুরাইশরা, তাঁরা যে খাদ্য সরবরাহ করবে তা আহার করতে হবে এবং যে পোষাক সরবরাহ করবে তা পরিধান করতে হবে, সরবরাহ করতে অক্ষম হলে উলঙ্গ হয়ে কা'বা তাওয়াফ করতে হবে। সে সমাজের মানুষ এ সমস্ত বাতিল প্রথা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে অনুসরণ করতো। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের এ সব প্রথা কোন দিন গ্রহণ করেননি। নবুয়্যাত লাভের পূর্বে কুরাইশদের প্রবর্তিত প্রথা নিষ্ঠুর পায়ে দলিত মথিত করে তিনি আরাফাতে গমন করতেন। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম যে পদ্ধতিতে হজ্জ আদায় করেছেন, তিনি সে পদ্ধতি তথা আল্লাহর শিখানো নিয়মে তিনি হজ্জ সমাপন করেছেন। অর্থাৎ তদানীন্তন পৃথিবীতে প্রচলিত যাবতীয় অনাচার থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর দৃষ্টির সামনে বিরাজিত সমস্যার সমাধানের চিন্তায় নিজেকে লোকালয় থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিলেন। প্রায়ই তিনি নির্জনতা অবলম্বন করতেন। যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে তিনি চিন্তায় অস্থির থাকতেন, এসব সমস্যার সমাধান আল্লাহ্ তাকে ওহীর মাধ্যমে দান করবেন। সুতরাং ওহী নাজিলের সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে নবী করীম (সাঃ) এর নির্জনতা অবলম্বন ততই বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তিনি মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে একটা পাহাড়ে চলে যেতেন। সে পর্বতের হেরা নামক গুহায় বিশেষ ইবাদাতে নিমগ্ন হয়ে পড়তেন। এ সময়ে তিনি সত্য এবং সুন্দর স্বপ্ন দেখতেন। তিনি এমন স্বপ্ন দেখতেন তা যেন মনে হত তিনি তা বাস্তবে দেখছেন।

www.pathagar.com

পর্বতের গুহায় তিনি ইবাদাতের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা হাদিস শরীফে হযরত আয়িশা (রাঃ) এর বর্ণনায় এসেছে। বুখারী হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, হেরা গুহায় তিনি যে ইবাদাত করতেন তা ছিল চিন্তা গবেষণা ও উপদেশ গ্রহণ করা। তিনি বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যেতেন অথবা খাদিজা (রাঃ) স্বয়ং গিয়ে দিয়ে আসতেন বা লোক মারফত প্রেরণ করতেন। কোন সময় কয়েক দিনের খাবার তিনি একত্রে নিয়ে যেতেন।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ যে সময়ে তাকে অনুগ্রহ করে মানব জাতির জন্য নবী নির্বাচিত করলেন তখন তিনি নবুয়্যতের একটা অংশ হিসেবে নির্ভুল স্বপ্ন দেখতেন। এ সময়ে মহান আল্লাহ তাকে নির্জন বাসের প্রতি গভীর আগ্রহী করে তোলেন। তখন তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা দিনের আলোর মতই বাস্তবে পরিণত হত। একাকী কোন নির্জন স্থান সে সময়ে তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আরেকটি বর্ণনায় দেখা যায়, নবুয়্যাতের সূচনা লগ্নে তিনি বাইরে বের হলেই কোন নির্জন উপত্যকায় বা কোন নির্জন সমভূমিতে চলে যেতেন। সে সময়ে তিনি কোন জড়পদার্থে পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেতেন, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ! এ কথা শোনার সাথে সাথে তিনি চমকে উঠে তাঁর চারদিকে তাকিয়ে সালাম দাতার সন্ধান করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর আশেপাশে গাছ পাথর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতেন না। এভাবেই সময় তখন অতিবাহিত হচ্ছিল। আমাদের ধারণা, ওহী এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে ধারণ যেন নবী করীম (সাঃ) করতে পারেন, এ কারণেই নবুয়্যাতের পূর্বে কিছুদিন মহান আল্লাহ এ অবস্থা সৃষ্টি করেনবী করীম (সাঃ) এর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন।

হাদিসে দেখা যায়, যে সময়ে তিনি নির্জনতা অবলম্বন করতেন, তখন তিনি প্রচুর দান করতেন। অভাবীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করতেন। বাড়িতে ফিরে আসার সময়ে ক'বাঘরে এসে তিনি সাত বার বা ততোধিক বার তওয়াফ করতেন তারপর বাড়িতে যেতেন। এ সময়ে বিশ্বনবী যে সমস্ত স্বপ্ন দেখতেন তা শুধু মাত্র সে সময়ের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ ধরণের স্বপ্ন নবুয়্যাত লাভের পরেও তিনি তাঁর জীবনে বহুবার দেখেছেন।

হাদিসে কুদসী নামে যে হাদিসগুলো রয়েছে, তা অনেকেই এ পর্যায়ভুক্ত। এ ছাড়াও বিশ্বনবীর মনে বিভিন্ন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নানা কথার সৃষ্টি করে দেয়া হত। এরপর সেই রমজান মাসে তিনি হেরা গুহায় চলে গেলেন। এরপর সেই মহান রাত বিশ্বমানবতার সামনে এসে উপস্থিত হলো, যে রাতে নির্ভুল জীবন বিধান বিশ্বনবীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হতে থাকলো।

www.pathagar.com

সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এ সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে আমার সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর কাছে ছিল একখন্ড রেশমী কাপড়। সে কাপড়ে কিছু লেখা ছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, 'পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম আমি পড়তে পারি না। তখন তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর সে আলিঙ্গন এমন ছিল যে, আমার মনে হলো আমার প্রাণ বায়ু নির্গত হবে।

তিনি আমাকে পুনরায় বললেন, 'পড়ুন'। আমি পূর্ববৎ বললাম, আমি পড়তে পারিনা। তিনি সেই আগের মতই আমাকে এমন শক্তিতে জড়িয়ে ধরলেন যে, এবারেও আমার ধারণা হলো আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। আবারও তিনি আমাকে বললেন, 'পড়ুন'। এবার আমি বললাম, আমি কি পড়বো? তিনি বললেন–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ–

'পড়ুন আপনার রবের নাম সহকারে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাঁধা রক্তের এক পিন্ড হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন, আর আপনার খোদা খুবই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের দ্বারা জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দান করা হয়েছে যা সে অবগত ছিল না।' (সূরা আলাক)

নবী করীম (সাঃ) বলেন, 'তিনি যা পড়লেন আমিও তাকে তা পরে পড়ে শোনালাম। তখন তিনি বিদায় নিলেন। তারপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমি জাগ্রত হলাম। তখন আমার উপলব্ধি হলো সমস্ত ঘটনাটা এবং যা আমাকে পড়ানো হয়েছিল তা আমার স্মরণে জাগরুক হয়ে আছে।' ঐতিহাসিক এবং গবেষকগণ বলেন, বিশ্বনবীর সাথে বাস্তবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) যে আচরণ করবেন সে আচরণ তাঁর ঘুমের ভেতরে করার অর্থ হলো তা ছিল ঘটিতব্য ঘটনার ভুমিকা। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, এরপর নবী করীম (সাঃ) সে পাহাড়ের গুহা থেকে বের হয়ে এলেন। পাহাড়ের মাঝামাঝি অবস্থানে আসার পরে তিনি তাঁর মাথার ওপর থেকে এক অশ্রুত কন্ঠ শুনতে পেলেন। তাকে ডেকে বলা হচ্ছে, 'হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরাঈল!'

এ কন্ঠ শ্রবণ করে নবী করীম (সাঃ) ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, হযরত জিবরাইল (আঃ) একজন অপূর্ব সুন্দর মানুষের আকৃতি ধারণ করে আছেন, কিন্তু তাঁর দুটো পাখা রয়েছে এবং সে পাখা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

তিনি পুনরায় বললেন, 'হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনি আল্লাহর রাসুল এবং আমি জিবরাঈল!'

নবী করীম (সাঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। এরপর তিনি আকাশের যেদিকেই দৃষ্টি দিলেন সেদিকেই তাকে দেখতে পেলেন। সমস্ত আকাশ জুড়েই জিবরাঈল (আঃ) কে নবী করীম (সাঃ) বিরাজ করতে দেখলেন। নবী করীম (সাঃ) অবিচল থেকে সেই দৃশ্য দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখতে থাকলেন। তিনি তাঁর কদম মোবারক কোন দিকেই উঠাতে পারছিলেন না। তিনি দেখছিলেন তাঁর সন্ধানে তাঁর সহধর্মিনী লোক প্রেরণ করেছে, সে লোক তাঁর সন্ধান করছে কিন্তু তিনি সে লোককে বলতে পারলেন না তাঁর নিজের অবস্থানের কথা। লোকটি ফিরে চলে গেল। এরপর আকাশে আর কোন দৃশ্য দেখলেন না। তারপর তিনি ভীত কম্পিত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে গেলেন এবং হযরত খাদিজাকে বললেন, 'আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও! আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও!'

হযরত খাদিজা (রাঃ) তাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দিলেন। নবী করীম (সাঃ) এর ভীত কম্পিত অবস্থার অবসান হলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'হে খাদিজা! আমার এ কি হলো!' তারপর তিনি সমস্ত ঘটনা তাঁর স্ত্রীকে শুনিয়ে বললেন, 'আমার নিজের জীবনের ভয় হচ্ছে।' হযরত খাদিজা (রাঃ) তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'অসম্ভব! বরং আপনি সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহর শপথ! আপনাকে আল্লাহ কক্ষনো অপমানিত করবেন না। আপনি সব সময় সত্য কথা বলেন এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করেন তাদের হক আদায় করেন। মানুষের আমানত প্রত্যার্পণ করেন। অসহায় মানুষের বোঝা নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেন। গরীবদেরকে নিজে উপার্জন করে সাহায্য করেন। মেহমানের হক আদায় করেন এবং উত্তম কাজে সহযোগীতা করেন।'

এরপরে হযরত খাদিজা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) কে সাথে করে অরাকা ইবনে নওফেলের কাছে গেলেন। এ লোক ছিলেন বয়েসে বৃদ্ধ ও অন্ধ। তিনি ছিলেন খাদিজা (রাঃ) এর চাচাত ভাই। তিনি পৌত্তলিকতা সহ্য করতে না পেরে পরবর্তীতে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী এবং হিব্রু ভাষায় ইন্‌জিল লিখতেন। হযরত খাদিজা তাকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। তিনিও নবী করীম (সাঃ) কে প্রশ্ন করে সমস্ত ঘটনা জেনে নিলেন।

সবকিছু শুনে তিনি বলে উঠলেন, 'এ তো সেই ফেরেশতা যাকে মহান আল্লাহ

www.pathagar.com

হযরত মুসা (আঃ) এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। আফসোস! আপনার নবুয়্যাত যুগে আমি যদি যুবক থাকতাম! আফসোস! আপনার জাতি যখন আপনাকে বহিষ্কৃত করবে! সে সময়ে যদি আমি জীবিত থাকতাম!'

তাঁর এ সকল কথা শুনে নবী করীম (সাঃ) জানতে চাইলেন, 'আমার জাতি আমাকে বের করে দেবে?' আরাকা ইবনে নওফেল জানালো, 'অবশ্যই! আপনার ওপরে যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে, এ দায়িত্ব যার ওপরেই অর্পিত হবে অথচ তাঁর সাথে শত্রুতা করা হবে না, এমন কখনো হয়নি। সে সময় পর্যন্ত আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবো।'

ওহীর সূচনায় নবী করীম (সাঃ) ও হযরত খাদিজা (রাঃ) এর এ সব ঘটনা অকাট্য এবং স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর আগমনের মুহূর্তকাল পূর্বেও নবী করীম (সাঃ) অবগত ছিলেন না বা কল্পনাও করেননি তাকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। নবী পদের জন্য আকাংখা পোষণ করা তো অনেক পরের বিষয়, তাকে নিয়ে এমন ঘটনা ঘটবে এ ধরণের চিন্তাও তাঁর মনে কোনদিন জাগেনি। জিবরাঈল (আঃ) এর আগমন তাঁর কাছে ছিল সম্পূর্ণ আকস্মিক বিষয়। এ ধরণের একটা অলৌকিক ঘটনা কোন সাধারণ মানুষের সাথে ঘটলে সে মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হত, নবী করীম (সাঃ) এর মধ্যেও তাই হয়েছে। তাঁর এই প্রতিক্রিয়াই প্রমাণ করে যে, তিনি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন ছিলেন।

এ কারণেই দেখা যায়, তিনি যখন ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করলেন, তখন মক্কার লোকজন তাকে বিভিন্ন ধরণের অবাঞ্চিত প্রশ্ন করলেও এ কথা তাকে তাঁরা বলেনি, 'আপনি বহুদিন থেকে নবী হবার চেষ্টা সাধনা করছেন এবং একদিন আপনি এমন একটা কিছু দাবী করবেন এটা আমরা জানতাম।'

কিন্তু ইতিহাস বলে, তাঁরা এ ধরণের কোন প্রশ্ন কোনদিন করেনি। না করার কারণ হলো, তাদের সামনে বিশ্বনবীর গোটা জীবন ছিল। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তাঁরা তাকে দেখছিল। নবী করীম (সাঃ) এর ভেতরে তাঁরা এমন কোন কিছু দেখেননি, যার কারণে তাদের কাছেও মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়্যাত ছিল সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা। ফলে তাঁরা তাকে নানা প্রশ্ন বাণে জর্জরিত করলেও ঐ প্রশ্ন কখনো করেনি।

গোটা পৃথিবীর ভেতরে তখন একমাত্র নবী করীম (সাঃ)ই ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের ব্যক্তিত্ব। এ কারণেও তিনি এক মুহূর্তের জন্য মনে করেননি, তাঁর মত সৎ এবং পবিত্র মানুষের একটা কিছু হওয়া উচিত। নবী হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর মধ্যে সাধারণ কোন নেতা হবার প্রবণতাও ছিল না। তারপর তাঁর ওপরে প্রথম ওহী

www.pathagar.com

অবতীর্ণ হবার পরে তিনি এই গুরু দায়িত্বের কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। সাধারণ কয়েকজন মানুষের ওপরে নয়, বিশেষ কোন দেশ বা এলাকা অথবা শুধু মক্কার দায়িত্ব তাঁর ওপরে অর্পণ করা হয়নি। তাকে নির্বাচিত করা হয়েছে বিশ্বনবী–বিশ্বনেতা। তিনি শুধু গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য নির্বাচিত হলেন না, সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য নির্বাচিত হলেন। এ যে কত বড় দায়িত্ব তা আমরা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারি না। এই দায়িত্বের কথা চিন্তা করেও তিনি অস্থির ছিলেন।

নবী করীম (সাঃ) এর ক্ষেত্রেই যখন তাঁকে সেই শিশুকালে জানতে দেয়া হয়নি যে, তিনি নবী হতে যাচ্ছেন, তখন অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রে তো জানানোর প্রশ্নই ওঠে না। তবে এই পৃথিবীতে যাদেরকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল, তাঁরা সবই যে তৎকালিন সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত উঁচুমানের। তারপর ওহী অবতীর্ণ হবার পরে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তাদের অতিবাহিত হয়েছে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের চিন্তায়।

নবী ও রাসূলদের মানবিক সত্তা

আমরা পবিত্র কোরআন থেকে জানতে পারি, নবুয়্যত লাভ করার পূর্বে নবীগণ যে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, সেই জ্ঞানের দ্বারাই তাঁরা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে যেতেন। ওহীর আগমন তাদের অনুভূতি লব্ধ জ্ঞানকে বিশাল শক্তিতে পরিণত করে দিত। ওহী অবতীর্ণের পূর্বে তাদের মন মস্তিষ্ক যেসব সত্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য দান করতো, আল্লাহ্‌র ওহী সেগুলোর সত্য হবার বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করতো। পরম সত্যর সাথে নবীদেরকে চাক্ষুষ পরিচয় করে দেয়া হত, নবীগণ সেসব বিষয়ে মানুষের কাছে সাক্ষ্য প্রদান করতেন।

পবিত্র কোরআন বারবার মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছে, তোমরা চিন্তা গবেষণা করো, দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো, আমার নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করো। নবী রাসুলগণ নবুয়্যত লাভ করার পূর্বে তাই করতেন। সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করলে স্রষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা এভাবে চিন্তা গবেষণা করেই পরম সত্ত্বার সন্ধান লাভ করার চেষ্টা করতেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ওহী অবতীর্ণ হবার কারণে তারা প্রকৃত সত্যের পৃথিবীতে প্রবেশ করেছেন। মানুষকেও সেদিকেই আহ্বান করেছেন।

www.pathagar.com

ওহী অবতীর্ণ হবার পরে তাদেরকে এমন জ্ঞান দান করা হয়েছিল যে, যে জ্ঞান শুধু তাদের জন্যই মহান আল্লাহ নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ নবী রাসুলদেরকে অদৃশ্য জগতের জ্ঞান দান করেছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন, অদৃশ্য জগতের যতটুকু জ্ঞান মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন ছিল, আল্লাহ তাঁর অদৃশ্য জগতের জ্ঞান নবীকে ততটুকুই দান করেছিলেন। কিন্তু কোরআনের বর্ণনার মোকাবেলায় তাদের এই কথা টিকে না।

কোরআন দাবী করছে, নবীদেরকে অদৃশ্য জগতের এমন জ্ঞান ভান্ডার দান করা হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে সে জ্ঞান লাভ করার কোন উপায়ই নেই। পবিত্র কোরআনে হযরত ইয়াকুব (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে বলেছিলেন–

اِنِّیْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ–

মহান আল্লাহ আমাকে এমন সব বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন, আমি এমন সব বিষয় সম্পর্কে অবগত আছি যে, তোমরা সেসব বিষয় সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখো না। (সূরা ইউসুফ-৯৬)

অদৃশ্য জগতের অবস্থা সম্পর্কে নবীগণ যা জানেন এবং দেখেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে সে স্তর অতিক্রম করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, ‘হে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মত! আল্লাহর শপথ! আমি যা জেনেছি, তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে এবং কাঁদতে সবচেয়ে বেশী। (বুখারী)

তিনি তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, ‘আমি তোমাদেরকে পেছনে ঠিক তেমনভাবেই দেখি যেমনভাবে সামনে দেখি। (বুখারী)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সাঃ) কে দুটো পবিত্র চোখ দান করেছিলেন। তিনি সে চোখ দিয়ে সামনের দিকে দেখতে পেতেন। কিন্তু তাঁর পেছনে কোন চোখ না থাকলেও তিনি আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির কারণে পেছনেও দেখতে পেতেন। অর্থাৎ সামনে পেছনে তিনি একইভাবে দেখতেন। নবী ও রাসূলগণ অদৃশ্য জগতের যতটুকু সংবাদ মানুষকে জানিয়ে গেছেন, এ কথা ধারণা করার কোন কারণ নেই যে, তাঁরা অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে ঐ পরিমাণ জ্ঞানই রাখতেন।

বরং এর চেয়ে শত সহস্রগণ বেশী জ্ঞান তাদেরকে দান করা হয়েছিল অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে অকারণে তাদেরকে এই জ্ঞান দান করা হয়নি। এসব জ্ঞান তাদেরকে দান করা হয়েছিল তাদের দায়িত্বের কারণে। তাঁরা যে দায়িত্ব পালন করতেন, সে দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালন করতে গেলে অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে তাদের সীমাহীন জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ছিল। এই জ্ঞান তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সহায়ক হত। তাঁরা যা দেখতেন এবং বুঝতেন, তা সাধারণ মানুষের জানার বা বুঝার প্রয়োজন নেই। যতটুকু প্রয়োজন ছিল ততটুকু তাঁরা তাঁর অনুসারীদেরকে জানিয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষ ঐ অদৃশ্য জ্ঞান সহ্য করতে পারবে না। এ কারণেই মানুষকে আল্লাহ্ ঐ জ্ঞান সম্পর্কে কিছুই অবগত করেননি। আল্লাহর নবী হযরত মুসা (আঃ)-ই প্রথম দিকে সহ্য করতে পারেননি, নবী করীম (সাঃ)-ও প্রথম দিকে ঐ জ্ঞানের জগৎ দেখে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, তাহলে সাধারণ মানুষের সামনে ঐ জ্ঞানের সামান্য বিন্দু প্রকাশিত হলে এই মানুষের অস্তিত্ব থাকতো?

এই পৃথিবীতে নবী ও রাসুলগণ সবচেয়ে অধিক মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী এবং তাঁরা মানব জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ ব্যক্তিত্ব। একজন সাধারণ মানুষের জীবনে যে ঘটনা ঘটে তা হয়তঃ কোন গুরুত্ব বহন করে না। কিন্তু ঐ একই ঘটনা যদি কোন নবীর জীবনে ঘটে, তাহলে তা গুরুত্ব বহন করে। সে ঘটনা তাঁর অনুসারীদের জন্য অবশ্য করণীয় হয়ে দাঁড়ায়। নবীর জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাও মানুষের জন্য আইনে পরিণত হয়। এ কারণে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। কারণ নবী জীবনের সমস্ত কিছুই মানুষের জন্য অনুসরণীয়। নবী করীম (সাঃ) তাঁর পবিত্রা স্ত্রীদেরকে বলতেন, 'আমি তোমাদের সাথে যা করি, তা মানুষদেরকে জানিয়ে দাও। আমি দিনে যা করি এবং রাতে যা করি, সমস্ত কিছুই মানুষদেরকে জানিয়ে দাও।'

কারণ তাঁর জীবনের সমস্ত কিছুই মানুষ অনুসরণ করবে। তাদের জীবনের কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজও মহান আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত হতে পারে না। কোন নবী যদি কখনো কোন কাজ করেও থাকেন, তাহলে সাথে সাথে তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। কেনন, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি সমূহ শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাবেই নয়, মহান নবীর জীবন আদর্শ হিসেবেও মানুষের কাছে পৌছে যাবে, আর এই বিধানে আল্লাহর অপছন্দনীয় সামান্য কোন অংশ থাকতে পারবে না।

পৃথিবীতে প্রেরিত সমস্ত নবী ও রাসূল আল্লাহর কাছে একই মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন না। তাদের দায়িত্ব অনুযায়ী মহান আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন। তাদের মর্যাদা অনুসারে আল্লাহ তাদেরকে অদৃশ্য জগতের জ্ঞান দান করেছিলেন। পৃথিবী ও

www.pathagar.com

আকাশ মন্ডলী কিভাবে আল্লাহ পরিচালনা করছেন, এটা তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করানো হয়েছে। তিনি কিভাবে সৃষ্টি করেন এবং মৃত্যু ঘটান আবার মৃত থেকে জীবিত করেন তা প্রদর্শন করানো হয়েছে। এই পৃথিবী ও অদৃশ্য জগতের মাঝে যে পর্দা অন্তরায় হিসেবে রয়েছে, মহান আল্লাহ সে পর্দা তাদের দৃষ্টির সামনে থকে সরিয়ে এমন সব দৃশ্য দেখিয়েছেন, যে দৃশ্য অবলোকন করলে মানুষ জ্ঞান হারা হয়ে যেত।

এসব জিনিষের ওপরে মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করবে, নবীগণ মানুষকে এসব জিনিষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য আহ্বান জানাবেন। এ কারণেই নবীদেরকে আল্লাহ ঐসব জিনিষের সাথে চাক্ষুষ পরিচয় করে দিয়েছেন। অনেকে আবার নবীদের সাথে পৃথিবীর মানুষ দার্শনিকদের তুলনা করে থাকেন। দার্শনিকগণও তো এমন অনেক কথা বলেন, যা দেখা যায় না। অর্থাৎ নবী আর দার্শনিকদেরকে তারা এক কাতারে দাঁড় করাতে চান, সমতাবিধান করতে চান।

পৃথিবীর দার্শনিকগণ যা বলেন তা অনুমানের ভিত্তিতে বলেন। যেসব দার্শনিক মানুষ হিসেবে নিজের মর্যাদা সম্মান ও অবস্থান, জ্ঞানের পরিধি অবগত আছেন, তারা কখনো নিজের মতামতই চরম সত্য বলে রায় দান করেন না। কিন্তু নবী ও রাসুলগণ যা বলেন, তা নিজের চোখে দেখে এবং ওহীর জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেন। নবীগণ আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলেন না। কিন্তু দার্শনিকগণ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে। নবীদের চোখের সামনে গোপন জগতের পর্দা উঠিয়ে যা দেখানো হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত হয়েই কথা বলেন।

পবিত্র কোরআনে সূরা ইউসুফে মহান আল্লাহ হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর সন্তান হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) ঘটনা ক্রমে পিতার কাছে থেকে কয়েক বছর যাবৎ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। পিতা তাঁর সন্তানের কোনই সন্ধান জানতেন না। তাঁর অন্যান্য সন্তানগণ ব্যবসা উপলক্ষে যখন মিশর গিয়েছিল তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) মিশরের রাষ্ট্রপতি। তিনি জীবিত আছেন এর চিহ্ন স্বরূপ ভাইদের কাছে তাঁর শরীরের একটি জামা দিয়ে দিয়েছিলেন, যেন তাঁর পিতা সান্ত্বনা লাভ করেন।

সেই জামা নিয়ে যখন তাঁর ভাইগণ আসছিল তখন কয়েক শত মাইল দূরে অবস্থান করে হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ) এর শরীরের গন্ধ অনুভব করছিলেন। এ ধরনের ক্ষমতা মহান আল্লাহ তাঁর কোন নবীকে দান করেছিলেন। কিন্তু এরপরেও বড় কথা হলো সমস্ত নবীই মানুষ ছিলেন। তাদের ভেতরে মানবিক সত্ত্বা ছিল। তাঁরা আল্লাহর কোন অভিনব সৃষ্টি ছিলেন না। একজন মানুষকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা এটা কোন অস্বাভাবিক বিষয় ছিল না।

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষের এই পৃথিবীতে জীবন ধারনের জন্য যা প্রয়োজন হয়, নবী রাসুলদেরও তাই হত। তাঁরা ক্ষুধা অনুভব করতেন, তাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন হত। রক্ত মাংশে গঠিত ছিল তাদের শরীর। তাঁরাও বেদনা অনুভব করতেন। রোগাক্রান্ত হতেন। জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁরাও শ্রম দান করতেন। বিয়ে করে তাঁরাও সন্তান জন্মদান করতেন। আল্লাহর বিধান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনে তাদেরকেও যুদ্ধ বিগ্রহ করতে হয়েছে। কিন্তু তাদের মানবীয় এই সত্ত্বা পরিচালিত হত মহান আল্লাহর ইশারায়। কেননা, তাদের জীবনের সবটুকুই তাঁর অনুসারীদের জন্য ছিল অনুসরণীয়।

মুমিনদের জন্য নির্ধারিত যে গুণাবলী এবং পূর্ণমান, সে মানে প্রতিটি মুহূর্ত অবস্থান করা এই পৃথিবীতে কোন একজন মুমিনের জন্যও সম্ভব নয়। অর্থাৎ মুমিনের মান ওঠা নামা করে। যখন সে মহান আল্লাহর পজন্দনীয় কাজে লিপ্ত থাকে, তখন মুমিন হিসেবে সে পূর্ণমানে অবস্থান করতে থাকে। আর তাঁর দ্বারা যখন কোন সামান্য ভুল হয়ে যায়, তখন সে ঐ পূর্ণমান থেকে সামান্য নীচে অবস্থান করেন। অর্থাৎ আকাংখিত মানে প্রতিটি মুহূর্ত অবস্থান করা মানুষ হিসেবে মুমিনদের জন্য সম্ভব হয়না।

প্রশ্ন হলো, নবী ও রাসূলদেরও অবস্থা এমন হয় কিনা। এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পবিত্র কোরআন ও হাদিসে অনুসন্ধান করবো। আমরা পবিত্র কোরআনে দেখতে পাই, হযরত নূহ (আঃ) এর যুবক সন্তান যখন তাঁরই চোখের সামনে পানিতে ডুবে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করছিল, তখন হযরত নূহ (আঃ) এর ভেতরে মানবীয় দুর্বলতা ক্ষণিকের জন্য স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তাঁর সে সন্তান ছিল ইসলামের তথা আল্লাহর বিধানের শত্রু। মুহূর্ত কয়েকের ভেতরে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় তিনি যুবক সন্তানের মমতা হৃদয়ে স্থান দেননি।

এ ধরনের নানা ঘটনা বিভিন্ন নবীর জীবনে সাময়িকের জন্য ঘটেছে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ মুহূর্তের ভেতরে নবীকে সংশোধন করেছেন। একজন নবীর নিষ্পাপ হবার অর্থ এই নয় যে, নবীর দ্বারা পাপ সংঘটিত হবার কোন সম্ভাবনাই নাই। অথবা সব ধরনের পাপ করার ক্ষমতা, ভুল করার ক্ষমতা নবীর কাছে থেকে মহান আল্লাহ ছিনিয়ে নিয়েছেন। প্রকৃত বিষয় হলো, নবী ভুল করার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু তাঁর মানবিক আবেগ অনুভুতি, মানবিক গুণাবলী, ইচ্ছ,া আশা-নিরাশার অধিকারী হবার পরেও তিনি এমন আল্লাহ্ ভীরু ও সৎ হন যে, তিনি কখনো সচেতনভাবে কোন ভুল করেন না।

www.pathagar.com

প্রতিটি মানুষের ভেতরে যে খারাপ প্রবৃত্তি অবস্থান করছে, মানুষ যত খারাপ কাজ করে ততই সেই খারাপ প্রবৃত্তি শক্তি লাভ করতে থাকে। অর্থাৎ খারাপ কাজ বা পাপের কাজই হলো কুপ্রবৃত্তির খোরাক বা আহার। নবীর ভেতরে সেই শক্তি আহার না পেয়ে মৃত্যু বরণ করে। সুতরাং নবীর ভেতরে পাপ করার কোন আকাংখা সৃষ্টি হতে পারে না। তারপরেও তাঁর দ্বারা যদি কোন সামান্যতম ভুল হতে থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ সাথে সাথেই তা সংশোধন করার ব্যবস্থা করেন। কারণ কোন নবীর পদস্খলন শুধু তাঁর পদস্খলন নয়, গোটা উম্মতের পদস্খলন। নবী যদি মহাসত্য থেকে ভুলের দিকে বিন্দু পরিমাণ এগিয়ে যান, তাহলে গোটা পৃথিবী ভুলের দিকে কয়েক শত মাইল এগিয়ে যাবে।

নবী ও রাসুলগণ যে নিষ্পাপ ছিলেন এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। গুনাহ পাপ তথা নাফরমানীর কাজে জড়িয়ে পড়া, নিষিদ্ধ ও ঘৃণ্য হারাম কাজ করা হতে নবী রাসুলদেরকে মহান আল্লাহ রক্ষা করেছেন। এই সংরক্ষণ শুধুমাত্র নবী ও রাসুলদের জন্যই নির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত। মহান আল্লাহ এই গুণ ও বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র নবীদেরকেই দান করেছেন। তাদেরকেই এই বিশেষ গুণ দান করে মহান আল্লাহ সম্মানিত করেছেন। সৃষ্টির সমস্ত মানুষ হতে তাদেরকে বিশিষ্ট বানানো হয়েছে। সম্পূর্ণ এক ভিন্ন মর্যাদা তাদেরকে দান করা হয়েছে।

পাপ ও অবাধ্যতা থেকে আল্লাহর বিশেষ সংরক্ষণ লাভের এই সম্মান ও মর্যাদা শুধুমাত্র নবীদেরই রয়েছে। নবী-রাসুলগণ ব্যতীত এই গুণ বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব সৃষ্টি জগতে আর কোন মানুষের নেই এবং কোন মানুষের তা প্রাপ্য নয়। নবী ও রাসুলগণ এই সংরক্ষণ লাভ করেন শুধুমাত্র বড় বড় পাপ থেকেই নয়, ছোট ছোট পাপ থেকেও তাঁরা এই সংরক্ষণ লাভ করেন। এ কারণে তাদের দ্বারা কোন পাপ বা আল্লাহর সাথে সামান্যতম অবাধ্যতা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব।

নবী রাসুলগণ নিষ্পাপ মাসুম, কিন্তু এই অর্থ এই নয় যে, তাঁরা মানবীয় প্রকৃতিই হারিয়ে ফেলেছেন। মানুষ স্বভাবতঃই ভুল ভ্রান্তির প্রকৃতি সম্পন্ন। মানুষের ইচ্ছা শক্তি ও উদ্যম উদ্যোগ কোন কোন সময় দুর্বল হয়ে পড়তে পারে এ যেমন সত্য, তেমনি সাময়িক ক্রোধ বা অভিমানে ভারাক্রান্ত হয়েও নবী রাসুলগণ এমন কোন কাজ হঠাৎ করে বসতে পারেন, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, যিনি তাদেরকে নবী ও রাসুল নির্বাচত করেছেন, তিনি অপছন্দ করতে পারেন।

এ অবস্থায় মহান আল্লাহ তাদেরকে সংশোধন করে দেন। সে ভুলকে স্থায়ী হতে দেন না। সে ভুলের প্রতিক্রিয়া বা পরিণতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এসব ক্ষুদ্র ভুলের

www.pathagar.com

ওপরে নবীগণ স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন না। এমন হতে পারে যে, নবীকে আল্লাহ্ ভুল করার সুযোগ দিয়ে এ কথা প্রমাণ করেন যে, নবীগণ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নয়। কিন্তু এ কারণে নবীগণ যেমন পাপী হন না বা তাদের মর্যাদাও ক্ষুন্ন হয় না।

সাময়িকের জন্য নবীগণ যে ভুল করতে পারেন বা মহান আল্লাহ্র বলে দেয়া কথা ভুলে যেতে পারেন, তার বড় প্রমাণ হলো হযরত আদম (আঃ)। তিনি ভুল করেছেন- এ উপলব্ধি বোধ তাঁর ভেতরে সৃষ্টি হবার সাথে সাথে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন, মহান আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করে নবুয়্যাত দান করেছেন।

নবীগণ যাদু প্রভাবিত হতে পারেন। হযরত মুসা (আঃ) এর সামনে যখন ফিরাউনের যাদুকররা যাদু নিক্ষেপ করেছিল, তখন কার অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সূরা ত্বহায় বর্ণনা করা হয়েছে–

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى-

সহসা তাদের নিক্ষিপ্ত রশি ও লাঠিগুলো তাদের যাদুর প্রভাবে দৌড়াচ্ছে বলে মুসার মনে হলো। ফলে মুসা নিজ মনে ভয় পেল। (সূরা ত্ব-হা-২২)

আল্লাহ্ তাঁকে অভয় দান করে বলেছিলেন, কোন ভয় নেই। তুমিই বিজয়ী হবে। তোমার হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করো। তা এখনই তাদের মিথ্যা জিনিষগুলো গিলে ফেলবে। ওরা যা কিছু বানিয়ে এনেছে, তা যাদুকরের প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর যাদুকর কখনই সফলকাম হতে পারে না, তা ওরা যতই শক্তি দেখাক না কেন।

সে সময়ে সাধারণ মানুষ যেমন যাদুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, হযরত মুসা (আঃ)-এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। কোরআন বলছে, তিনি ভয় পেয়েছিলেন। এই ভয় পাওয়া ছিল তাঁর মানবীয় দুর্বলতা। কিন্তু তিনি এই ভয়ের ওপর স্থায়ী ছিলেন না। ক্ষণিকের ভেতরেই তিনি নিজেকে ভয় মুক্ত করেছিলেন। পক্ষান্তরে যাদু কোন নবীকে বিভ্রান্ত করতে বা তাঁর নবুয়্যতের প্রতি বিরূপ কোন ক্রিয়া করতে পারে না। স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) এর ওপর যাদুর প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। এ কারণে তিনি তাঁর জীবনে বেশ কষ্ট অনুভব করেছেন।

হযরত ইউনুস (আঃ) তাঁর জাতিকে আল্লাহর বিধান গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন। তারা অস্বীকার করেছিল। তিনি তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখালেন।

www.pathagar.com

বললেন, তিনদিনের ভেতরে আযাব আসবে। লোকজন আল্লাহর কাছে কাতর প্রর্থনা করেছিল। মহান আল্লাহ শাস্তি মওকুফ করে দিলেন। হযরত ইউনুস (আঃ) চিন্তা করলেন, তিনদিনের ভেতরে যখন আযাব এলো না, তখন এবার তাঁকে লোকজন মিথ্যাবাদী ধারণা করবে এবং তাঁকে হত্যা করবে।

তিনি আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা না করে দেশ ত্যাগ করলেন। আল্লাহর আদেশ ব্যতীত কোন নবীর জন্য তাঁর স্থান ত্যাগ করা নবুয়্যতের পরিপন্থী। সুতরাং মহান আল্লাহ তাকে গ্রেফতার করলেন। তিনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। তাঁকে বিশাল এক মাছ গ্রাস করেছিল। আল্লাহর কাছে তিনি ক্ষমা চাইলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। এ ধরনের অনেক কাহিনী থেকে প্রমাণ হয়, নবীগণ সাময়িক ভুল করলেও মহান আল্লাহ তা সংশোধন করে দিতেন। কিন্তু তাদের সে ভুল কোন মারাত্মক কিছু ছিল না। তা ছিল একেবারেই ক্ষুদ্র পর্যায়ের।

প্রতিটি নবীদের চরিত্রের সনদ পত্র মহান আল্লাহ দান করেছেন। নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষনা করেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ–

নিঃসন্দেহে রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য অতীব উত্তম আদর্শ রয়েছে, তাদের জন্য যারাই আল্লাহ ও পরকালীন মুক্তির ব্যাপরে আশাবাদী এবং যারা আল্লাহকে অধিক স্বরণ করে। (সূরায়ে আহ্যাব, আয়াত নং-২১)

নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ–

নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

সূরা ইয়াসিনের তৃতীয় আয়াতে বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ করে আল্লাহ নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে বলেছেন–

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ–

নিশ্চয়ই আপনি সবচেয়ে সহজ সরল এবং নির্ভুল পথের ওপরে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রেরিত নেতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-ও আল্লাহর কাছে অতীব মর্যাদাবান নবী এবং মানবতার জন্য উত্তম আদর্শ ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন–

www.pathagar.com

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِى اِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَه-

নিঃসন্দেহে ইবরাহীম এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে তোমাদের জন্য অতীব উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে। (সূরা মুমতাহিনাহ-৪)

সুরা মরিয়মে হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ একজন মর্যাদাবান নবী। একই সূরায় হযরত মুসা (আঃ), হযরত ইদরিস (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর প্রশংসা করেছেন। নবী ও রাসূলগণ মানব জাতির জন্য উত্তম আদর্শবান ব্যক্তি ছিলেন। এ কারণে মহান আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে বলেন-

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ-

এই নবী রাসূলগণই হচ্ছেন নেই সব লোক, আল্লাহ স্বয়ং যাদেরকে হেদায়েত করেছেন। অতএব তোমরা এই লোকদের হেদায়েত পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে চলো। (সূরা আনয়াম-৯০)

প্রত্যেক নবীই ছিলেন মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাঁরা মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করতেন। বদরের প্রান্তরে নবী করীম (সাঃ) সেজদায় অবনত হয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন। তিনি এ দাবী করেননি যে, আমি একাই যথেষ্ট, আমার সামনে যে কাফের আসবে সে জ্বলে পুড়ে ভষ্ম হয়ে যাবে। হযরত আইয়ুব আলায়হিস্ সালাম রোগে আক্রান্ত হয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন। তিনি স্বয়ং এ দাবী করেননি যে, আমি রোগ মুক্ত করতে সক্ষম।

হযরত ইউনুস (আঃ) বিপদগ্রস্থ হয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন, তিনি নিজে এ দাবী করেননি যে, আমি বিপদ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সক্ষম। পবিত্র কোরআনে তাদের এসব কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, মহান নবী ও রাসুলগণ ছিলেন আল্লাহর সর্ব শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান বান্দাহ। তাঁরাই যখন রোগে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়েছেন, বিপদগ্রস্থ হয়ে তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করেছেন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষও যেন তাই করে। কোন কবরের কাছে গিয়ে, মাজারের কাছে গিয়ে সেজদা দিয়ে পড়ে না থাকে। কোন মৃত মানুষের কাছে বা পৃথিবীর কোন শক্তির কাছে যেন সাহায্যের জন্য আবেদন না করে।

www.pathagar.com

বিশ্বনবীই হলেন একমাত্র আদর্শ নেতা

এ কথা উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট হবে না যে, রাসুলের ওপরে ঈমান আনলাম। অথবা এটাও যথেষ্ট হবে না যে, মুখমন্ডলকে শ্মশ্রুমন্ডিত করা, লম্বা জোব্বা পরিধান করা, মাথায় পাগড়ী পরিধান করে নামায, রোজা ও হজ্জ আদায় করা। বরং রাসুলকে গোটা জীবনের জন্য, জীবনের প্রতিটি বিভাগের জন্য একমাত্র আদর্শ নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে। নিজেকে পৃথিবীর কোন নেতার আদর্শের সৈনিক হিসেবে দাবী করা যাবে না। এ ধরনের দাবী যদি কেউ করে তাহলে তার ঈমান নিয়ে সংশয় দেখা দেবে। নিজেকে একমাত্র রাসূলের আদর্শের সৈনিক হিসেবে দাবী করতে হবে এবং সে দাবীর অনুকূলে রাসূলের আদর্শ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করতে হবে। তাহলেই মুমিন হওয়া যাবে। মহান আল্লাহ বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ–

নিশ্চয় রাসুলের মধ্যে নিহিত রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। (সূরা আহ্যাব-২১)

মহান আল্লাহ্ তাকে "সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী" বলে সনদ পত্র দিয়েছেন এবং সর্বকালের মানুষদের জন্য "একমাত্র উত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয় চরিত্র" হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রাণের শত্রু যারা ছিল সে সমাজে, তাঁরাও তাকে "আল আমীন" অর্থাৎ বিশ্বাসী এই উপাধিতে ভুষিত করেছেন। পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর মধ্যেও কালোদাগ থাকলেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চরিত্রে কোন কালোদাগ আবিষ্কার করতে পারেনি। Spotless character-এর অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন নিষ্কলুষ ও উজ্জ্বল চরিত্রের অধিকারী।

সাধরাণত মানুষ যাদেরকে নেতা হিসেবে পরম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে থাকে, কোন মানুষ কি কখনও সেই নেতার চরিত্র সম্পর্কে এই সনদ দিতে পারবে যে, তিনি কোন মিথ্যা কথা বলেননি। কোনদিন প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। তিনি কখনও জেনা-ব্যভিচার করেননি। তিনি কখন কারো সম্পদ অবৈধ উপায়ে ভোগ-দখল করেননি। তাঁর চরিত্র একেবারে নিষ্কলুষ। এই ধরনের সনদ কোন নেতা সম্পর্কে কেউ দিতে পারবে না।

একজন মানুষের চরিত্রের অপ্রকাশিত দিক সম্পর্কে জানার প্রথম সূত্র আমাদেরকে

www.pathagar.com

মনে রাখতে হবে। একজন মানুষের চরিত্র বাইরের জগতের কাছে অদ্ভুত সুন্দর বলে প্রমাণ হতে পারে। কিন্তু কোন মানুষের চরিত্র তাঁর স্ত্রী এবং একান্ত সেবকের কাছে অপ্রকাশিত থাকে না। স্বামীর চরিত্রের দুর্বল দিক তাঁর স্ত্রী জানে। স্বামী তাঁর যৌন জীবনে স্ত্রীর কাছে নির্লজ্জ কিনা, লজ্জাশীল কিনা, যৌন জীবনে স্বামী পশুর মত আচরণ করে কিনা, স্ত্রীর সামনে স্বামী বস্ত্রহীন হয়ে পড়ে কিনা, এ সমস্ত দিক বাইরে প্রকাশ না হলেও স্ত্রীর কাছে অপ্রকাশিত থাকে না। ব্যক্তির একান্ত সেবক জানে তাঁর মনিবের অভ্যাস, চলাফেরা, সে কোথায় কোথায় যায়, কি আহার করে, তাঁর আচরণ, কথাবার্তা, ভাষার মাধুর্যতা বা কাঠিন্য ইত্যাদী দিক সম্পর্কে সেবক বাইরের লোকজনের থেকে বেশী জানে।

নবী করীম (সাঃ) তাঁর স্ত্রীর কাছে যদি মানবশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত না হতেন, তাহলে তিনি কোন ক্রমেই ঈমান আনতে পারতেন না। আর খাদিজা (রাঃ) কোন অপ্রাপ্ত বয়সের নারী ছিলেন না। ইতোপূর্বে তাঁর জীবনে দু'জন স্বামী অতিবাহিত হয়েছে। তিনি নবী করীম (সাঃ) কে স্বামীরূপে লাভ করার পূর্বেই আগের স্বামীর সন্তানের জননী ছিলেন। তারপরেও গোটা মক্কায় তাঁর চরিত্র এবং বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে সুনাম ছিল। একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। অধিক বিচক্ষণ না হলে সাধারণ কোন জ্ঞান নিয়ে আন্তর্জাতিক মানের ব্যবসায়ী হওয়া যায় না। খাদিজা ছিলেন সেই পর্যায়ের ব্যবসায়ী। সুতরাং ব্যক্তি নির্বাচনে তাঁর মত নারী ভুল করতে পারেন না।

প্রতিটি মানুষের জীবনের দুটো দিক থাকে, দুটো চরিত্র থাকে। একটা হলো ব্যক্তিগত দিক বা চরিত্র, আরেকটা হলো সাধারণ দিক বা চরিত্র। Personal character and public character. এ দুটো চরিত্র কোন মানুষের কখনো একই ধরণের হতে পারে না। কিন্তু একমাত্র নবী করীম (সাঃ) ছিলেন ব্যতিক্রম ধরণের ব্যক্তিত্ব–অসাধারণ নেতা। যার দুটো চরিত্র ছিল না। তাঁর দিনের এবং রাতের চরিত্রে কোনই পার্থক্য ছিল না।

তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে আদেশ দিয়েছেন, 'আমি রাতে কি করি এবং দিনে কি করি, সমস্ত কিছুই মানুষকে ডেকে ডেকে জানিয়ে দাও।'

পৃথিবীর বুকে বিশ্বনবীর পূর্বে বা পরে এমন কোন মানুষের অস্তিত্ব ছিল, এমন কোন নেতার অস্তিত্ব ছিল না–না কিয়ামত পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করবে–যিনি তাঁর দাম্পত্য জীবনের সঙ্গিনীকে আদেশ দিবেন, 'তোমরা আমার দিন রাতের সবদিক সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দাও?' তাঁর চরিত্রে যদি কোন সামান্য কালিমা (Blackspot)

www.pathagar.com

থাকতো, তাঁর দাম্পত্য জীবনে যদি কোন ধরণের উশৃংখলতা মুহূর্তের জন্যেও হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে প্রকাশ পেত, তাহ্‌লে তিনি তাঁর স্বামীর দাবীর প্রতি–স্বামীর নেতৃত্বের প্রতি তথা নবুওয়তের প্রতি সর্ব প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করতেন না।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার মত একজন বয়স্কা, ঐশ্বর্যশালিনী, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, দাম্পত্য জীবনের পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নারীর সাথে এমন এক ব্যক্তিত্বের বিয়ের ব্যবস্থা মহান আল্লাহ্ করলেন, যার ছিল না কোন ধন-সম্পদ, বয়সে খাদিজার তুলনায় পনের বছরের ছোট অথচ তাকেই নির্বাচিত করা হবে বিশ্বনবী হিসাবে। এমন একটা অসম বিয়ের ঘটনার মধ্যেও একটা কারণ নিশ্চয়ই নিহিত আছে। গবেষকগণের ধারণায় সে কারণ হলো, নবী করীম (সাঃ) এর চরিত্রের নিষ্কলুষতার দিক। কেননা, খাদিজা (রাঃ) এর কাছে নবী করীম (সাঃ) এর কোন একটি দিকও অপ্রকাশিত থাকবে না, অন্য কোন পনের বিশ বছর বা সমবয়স্কা নারীর দৃষ্টিতে যা ধরা পড়তো না, খাদিজা (রাঃ) এর দৃষ্টিতে তা অবশ্যই ধরা পড়তো। এ কারণেই বোধহয় তাঁর মত মহিয়সী অভিজ্ঞতা সম্পন্না নারীকেই মহান আল্লাহ্ বিশ্বনবীর জন্য স্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। যে নারী দিনের আলোয় এবং রাতের অন্ধকারে অতি কাছে থেকে ঐ মহান ব্যক্তিকে দীর্ঘ পনের বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, যে ব্যক্তিকে বিশ্বনবী–বিশ্বনেতা হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেবে নির্বাচিত করা হবে।

একজন মানুষ নিজের স্ত্রী ব্যতীত পরিবারের সমস্ত সদস্য এমন কি পিতা-মাতা ও নিজের সন্তান-সন্ততির কাছেও ভেক ধরতে পারে, ভন্ডামি করতে পারে। এ সমস্ত কাজে সে সাময়িকের জন্য সফলও হতে পারে। নিজের স্ত্রীর কাছে এসব করে সফল হওয়া যায় না। প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, নবী করীম (সাঃ) এর কথা যে মানুষটি সর্ব প্রথম নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন তাঁর পনের বছরের জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদিজা (রাঃ)। দীর্ঘ পনের বছরে তিনি দেখেছিলেন, এই মানুষটি কত বিশাল উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। দীর্ঘ পনের বছর সংসার ধর্ম পালন করলেন যার সাথে, তাঁর সামান্য কোন ত্রুটিও তিনি দেখতে পাননি।

নবী করীম (সাঃ) এর সাথে ছিলেন তাঁর তের চৌদ্দ বছর বয়সের কন্যা, চাচাত ভাই আলী, যিনি সেই শিশুকাল থেকে বিশ্বনবীর সাথে ছিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ), তিনিও ছিলেন পনের বছর বয়সের। হযরত আনাস (রাঃ) শিশুকাল থেকেই নবীর খেদমতে ছিলেন। তাঁর একান্ত বন্ধুও ছিল, অসংখ্য আপন আত্মীয়-স্বজন ছিল।

www.pathagar.com

প্রাণের দুশমন চাচা আবু লাহাব ছিল। ওয়ারাকা ইবনে নওফল তিনিও ছিলেন মক্কার একজন বৃদ্ধ জ্ঞান তাপস। তিনিও নবী করীম (সাঃ) কে তাঁর শিশুকাল থেকে দেখেছেন। বিশ্বনবীর দাবীর প্রতি তিনিও সামান্য সন্দেহ পোষণ না করে বিশ্বাস স্থাপন করলেন। তাঁর কাছেও নবী করীম (সাঃ) এর উচ্চ সম্মান এবং মর্যাদা ছিল, তা না হলে তিনি তাঁর ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না।

সুতরাং রাসুলই হলেন একমাত্র অনুসরণযোগ্য আদর্শ নেতা। তাঁকে অনুসরণ করলেই সত্য সঠিক পথ লাভ করা যেতে পারে, তাঁর আদর্শের মধ্যে নিহিত রয়েছে যাবতীয় সমস্যার সমাধান। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا–

তোমরা রাসুলের আনুগত্য ও অনুসরণ করলেই সত্য সঠিক পথ লাভ করবে। (সূরা নূর–৫৪)

রাসুলকে আদর্শ নেতা হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর আনুগত্য করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। কেউ যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে আগ্রহী হয় তাহলে তাঁকে অবশ্যই রাসুলকে আদর্শ নেতা হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ–

যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করবে, সে-ই ঠিক আল্লাহ্র আনুগত্য করলো। (সূরা নিছা-৮০)

খণ্ডিতভাবে রাসুলের আদর্শ অনুসরণের অবকাশ নেই

রাসুলের ওপরে ঈমান আনার অর্থ হলো তাঁর আদর্শ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা। কারণ রাসুলই হলেন একমাত্র আদর্শ নেতা। রাসুলের আদর্শ কিছুটা অনুসরণ করা হবে আর কিছুটা অনুসরণ করা হবে না, অর্থাৎ রাসুলের আদর্শ খণ্ডিতভাবে অনুসরণ করা হবে, তাহলে মুমিন হওয়া যাবে না। নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ্-তাহলীল, জানাযা, দাফন-কাফন ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাসুলের আদর্শ অনুসরণ করা হবে আর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি, শ্রমনীতি, পরিবার পরিচালনায়, সমাজ পরিচালনায়, বিচার কার্য পরিচালনায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় রাসুলের আদর্শ ত্যাগ করে পৃথিবীর দার্শনিক চিন্তাবিদদের আদর্শ অনুসরণ করলে কোন ক্রমেই রাসুলের উম্মত হওয়া যাবে না।

www.pathagar.com

রাসুলের নেতৃত্ব প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত করতে হবে। জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে রাসুলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। রাসুল এ জন্য পৃথিবীতে আগমন করেননি যে, তাঁর আনিত আদর্শ তাঁরই অনুসারীগণ খন্ডিতভাবে অনুসরণ করবে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا–

আমার রাসুল তোমাদেরকে যা করতে বলেন তাই করো আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। (সূরা হাশর-৭)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً–

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো। (সূরা বাকারা)

উল্লেখিত আয়াতে ইসলামে প্রবেশ করো বলতে বুঝানো হয়েছে, পরিপূর্ণভাবে রাসুলের আনুগত্য করা। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ–

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। (সূরা নেছা)

এ আনুগত্য শুধু নামায-রোযার নয়, বরং তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে। পৃথিবীতে নবী ও রাসুলদের আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা। এ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে নবী করীম (সাঃ) নিজে রাজীনিত করেছেন। তাছাড়া সকল নবী-রাসুলগণ ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাজনীতি করেছেন। তাঁরা কেউ-ই ধর্মনিরপেক্ষ (Secularist) ছিলেন না। সুতরাং ইসলাম মানুষের জীবনের কোন খন্ডিত অংশকে নিয়ন্ত্রন করে না বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খন্ডিতভাবে রাসুলের নেতৃত্ব গ্রহণ করার কোন অবকাশ ইসলামে নেই। রাসুলের আদর্শ অনুসরণের ব্যাপারে যদি কারো মধ্যে কোন ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে মুসলমান হওয়া যাবে না। হযরত ওমর (রাঃ) এর কাছে একজন লোক এসে একটি মামলার নিস্পত্তি করে দেয়ার আবেদন পেশ করেছিল। সেই ব্যক্তি ঐ একই মামলা রাসুলের আদালতে পেশ করেছিল–কিন্তু রাসুলের দেয়া রায় তার মর্জ্জি মাফিক ছিল না।

www.pathagar.com

এ কারণে সে পুনরায় মামলাটি হযরত ওমরের কাছে পেশ করেছিল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লোকটির কাছে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এ মামলাটি প্রথম কার কাছে পেশ করেছিলে?'

লোকটি জানালো, 'আমি মুসলমান, আমি নামায আদায় করি, রোযা পালন করি, ইসলামের পক্ষে জিহাদেও যোগদান করি। একজন ইহুদী রাসুলের আদালতে আমার বিরুদ্ধে মামলা করলো আর রাসুল সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে ইহুদীর স্বপক্ষে রায় দিয়ে দিলেন। এ রায় সঠিক হয়নি। আপনি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ শুনে সঠিক ফায়সালা করে দিন।'

লোকটির কথাগুলো হযরত ওমরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর ধমনীর রক্ত দ্রুত বেগে প্রবাহিত হতে থাকলো। ক্রোধে তাঁরা চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি অপেক্ষা করো, আমি তোমার মামলার ফায়সালা করে দিচ্ছি।'

এ কথা বলে তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করে কোষমুক্ত তরবারী এনে বললেন, 'আল্লাহর বান্দা শোন, আল্লাহর রাসূল যে ফায়সালা করে দেন, তাঁর ফায়সালার সাথে যারা দ্বিমত পোষণ করে, তাদের ফায়সালা এভাবেই করে দিতে হয়।'

এ কথা বলে তিনি তরবারীর আঘাতে লোকটিকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। রাসুলের দরবারে সংবাদ পৌঁছে গেল, হযরত ওমর একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। চারদিকে এ সংবাদ জানাজানি হয়ে গেল। লোকজন বিরুপ মন্তব্য করতে থাকলো। আল্লাহর রাসুল স্বয়ং বিব্রতবোধ করতে থাকলেন, ওমর কেন এমন কাজ করলো।

রাসুলের যাবতীয় দ্বিধা সংকোচ দূর করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا–

তোমার রবের শপথ! লোকেরা কোনক্রমেই ঈমানদার হতে পারবে না, যদি না তারা, হে নবী! আপনাকে তাদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়ে বিচারক ও সিদ্ধান্তকারী

www.pathagar.com

হিসেবে মেনে নেয়, আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মনে কুণ্ঠাহীনতা বোধ করে এবং তা সর্বান্তকরণে মেনে নেয়। (সূরা নিছা-৬৫)

অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ) যাকে হত্যা করেছেন সে ব্যক্তি মুমিন নয়, সে ব্যক্তি হলো মুনাফিক। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করার পরে নিজেকে মুসলমান দাবী করে খন্ডিতভাবে নবীর নেতৃত্ব মানার কোন অবকাশ নেই, পরিপূর্ণভাবে নবীর নেতৃত্ব অনুসরণ করতে হবে। নবী করীম (সাঃ) যে আদর্শ পেশ করেছেন, সে আদর্শের কোন একটি দিকও ত্যাগ করা যাবে না। সে আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তাঁর আদর্শ যেমন বাস্তবায়িত করতে হবে ব্যক্তি জীবনে, তেমনি বাস্তবায়িত করতে হবে দেশ জাতি ও রাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে।

কোন মুসলমান যদি রাজনীতি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাঁকে অবশ্যই রাসুলের আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি করতে হবে। ইসলাম কোন মুসলমানকে এ সুযোগ দেয়নি যে, সে রাসুলের আদর্শের বিপরীত কোন মতবাদ মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতি করবে। এ ধরনের কোন রাজনীতির সাথে যে ব্যক্তি নিজেকে জড়িত করবে, নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করার তাঁর কোন অধিকার নেই।

শাসন ক্ষমতায় যিনি অধিষ্ঠিত, তাকেও রাসুলের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। শাসক হিসেবে আল্লাহর রাসুল কিভাবে দেশ পরিচালিত করেছেন, সেভাবেই দেশ পরিচালনা করবেন। সেনা প্রধান অনুসরণ করবেন আল্লাহর রাসুলকে। তিনি তাঁর বাহিনী পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখবেন, আল্লাহর রাসুল সেনা প্রধান হিসেবে কিভাবে তাঁর অধিনস্থ বাহিনী পরিচালিত করেছেন। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সর্ব প্রথমে অনুসন্ধান করতে হবে রাসুলের আদর্শকে। নবী করীম (সাঃ) কি ধরনের অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে দরিদ্রতা দূর করেছিলেন। রাসুলের সেই অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করতে হবে।

রাসুল যে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষগুলোকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রবান মানুষে পরিণত করেছিলেন, সেই শিক্ষানীতি অনুসরণ করতে হবে। শিল্পপতিগণ তাদের অধিনস্থ শ্রমিকদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাসুলের আদর্শ অনুসরণ করবেন। মসজিদের ইমামকে দেখতে হবে, আল্লাহর রাসুল ইমাম হিসেবে কিভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইমামকেও সেভাবেই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

দেশ ও জাতির নেতা হিসেবে আল্লাহর রাসুল যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, বর্তমানেও সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে। পরিবারের প্রধান হিসেবে তিনি

www.pathagar.com

যেভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন, স্বামী হিসেবে যেভাবে কর্তব্য পালন করেছেন, সেভাবেই কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে হবে। জাগতিক কোন বিপদ দেখা দিলে তিনি একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করতেন। মুসলমানদেরকেও যে কোন বিপদে, কামনা-বাসনা পূরণে কোন পীর-মাজারে নয়–একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

এভাবে জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহর রাসুলকে অনুসরণ করতে হবে এবং রাসুলের আদর্শ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জিহাদ করতে হবে। আর নবীর পরিপূর্ণ আদর্শ বাস্তবায়ন করার চেষ্টা–সংগ্রামের নামই হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। এই জিহাদ করতে হবে জান্ ও মাল দিয়ে। তাহলেই নবীর ওপরে ঈমান আনার ও তাঁকে অনুসরণ করার দাবী পরিপূর্ণ এবং যথার্থ বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী-রাসূল নবী করীম (সাঃ) কে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করার তাওফীক এনায়েত করুন- আমীন।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَبِيًّا وَّرَسُوْلاً–

আমি আল্লাহ্ তা'য়ালাকে রব হিসেবে, ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) কে নবী-রাসূল হিসেবে পেয়ে পরিতুষ্ট।

www.pathagar.com

জিহাদ
ঈমানের অপরিহার্য দাবী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জিহাদ ঈমানের অনিবার্য দাবী

ঈমান আনার পূর্বে একজন মানুষ থাকে তাগুতের গোলাম। সে তার প্রবৃত্তি অনুসারে জীবন-যাপন করে থাকে। জীবন পরিচালনার ব্যাপারে সে কোন নিয়ম-কানুনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। হালাল-হারামের সীমা রেখা অনুসরণের কোন তাগিদ তার ভেতরে সক্রিয় থাকে না এবং সে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এক জীব মনে করে। কে তাকে সৃষ্টি করেছে এবং কেন করেছে, এই পৃথিবীতে তাকে কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, এখানে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি, এসব প্রশ্ন নিয়ে সে চিন্তা-গবেষণা করতে মোটেও ইচ্ছুক থাকে না। পৃথিবীর পশু প্রাণী আহার করে, জৈবিক তাড়নায় বিপরীত লিঙ্গের সাথে মিলিত হয়, বংশ বৃদ্ধি করে, নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় পরস্পরে হিংস্রতায় লিপ্ত হয়, এভাবে এক সময় তার নির্ধারিত জীবন কাল শেষ হয়ে যায় এবং পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে।

ঈমানহীন মানুষের জীবনও ঠিক তেমনি হয়ে থাকে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি যাদের ঈমান নেই, তাদের জীবনধারার প্রতি লক্ষ্য করলেই উপরোক্ত কথার যৌক্তিকতা প্রতীয়মান হবে। জীবন পরিচালনার ব্যাপারে এদের সুনির্দিষ্ট কোন বিধান নেই। প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বশালী ব্যক্তিবর্গ যেসব নিয়ম-বিধান রচনা করে, এরা তা অসহায়ত্বের কারণে অথবা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনুসরণ করে এবং প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রচিত বিধান পরিবর্তন-পরিবর্ধনও করে। ব্যক্তি জীবনকে যেভাবে খুশী ভোগ করে। সামষ্টিক জীবনে নিজেদের স্বার্থের কারণে ভিন্ন জাতির সাথে যে কোন ধরনের দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়।

একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী কোন সত্ত্বার কাছে নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ডের জবাবদিহি করতে হবে–এ ধরনের কোন অনুভূতি এদের ভেতরে নেই। অর্থ-সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের কোন সীমারেখা এরা মানে না। জৈবিক ক্ষুধা মেটানোর ক্ষেত্রে এরা কোন নিয়ম-বিধান অনুসরণ করে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে এদের ওপরে কোন বিপদ-মুসিবত আপতিত হলে, রোগে আক্রান্ত হলে অথবা কোন ধরনের অসহায় অবস্থায় নিপতিত হলে নিজেদের কল্পিত কোন সত্ত্বার বেদিমূলে বা পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত যুক্তিহীন ধারণার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। মূর্তি নির্মাণ করে নিষ্প্রাণ মূর্তির কাছে নিজেকে নিবেদন করে, মৃত মানুষের কবর-মাজারে গিয়ে কাকুতি-মিনতি জানায় অথবা আল্লাহর বিধানের অধীন প্রাকৃতিক কোন শক্তির কাছে সাহায্য কামনা করে থাকে।

পক্ষান্তরে একজন মানুষ যখন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে, তখন সে নিজেকে আল্লাহর বিধানের সামনে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে।

www.pathagar.com

মস্তিষ্ককে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত করে। পূর্বপুরুষদের যাবতীয় প্রথা সে অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সমাজ ও দেশে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত আল্লাহ্ বিরোধী বিধানের প্রতি সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একমাত্র আল্লাহ্ ও রাসুলের প্রদর্শিত পথ ব্যতিত অন্য কোন ধরনের পথ ও মত সে অনুসরণ করতে ইচ্ছুক নয়। জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সে প্রতিটি পদক্ষেপে অনুসন্ধান করতে থাকে, তার মালিক, তার প্রভু, তার রব্ব, তার ইলাহ্, তার মা'বুদ, তার মুনিব আল্লাহ্ তা'য়ালা কিভাবে পদ নিক্ষেপ করতে বলেছেন।

একজন ঈমানদার মানুষের যখন আহারের প্রয়োজন হয়, তখন সে অনুসন্ধান করে তার রাসূল তাকে কিভাবে আহার গ্রহণ করতে শিখিয়েছেন। সে যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন তথা মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন অনুভব করে, তখন সে সেই নিয়মই অনুসরণ করে, যে নিয়ম তার নেতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। জৈবিক তাড়নায় এবং বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সে যখন নিজ অর্ধাঙ্গিনীর সাথে মিলিত হতে যায়, তখন সে উন্মত্ত হয়ে বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে পশু সুলভ আচরণের লিপ্ত না হয়ে, সেই নিয়মই অনুসরণ করে–যে নিয়ম তাকে রাসুল শিখিয়েছেন। এভাবে একজন ঈমানদার মানুষের জীবন হয় নিয়ন্ত্রিত তথা আল্লাহর আইনের অধীন।

মানুষ হিসাবে ঈমানদার মানুষ ও ঈমানহীন মানুষের ভেতরের প্রবৃত্তির কোন পার্থক্য নেই। ঈমানহীন মানুষের ভেতরে যেমন আবেগ-উচ্ছ্বাস, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, মায়া-মমতা, কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা, শক্তি রয়েছে, অনুরূপ ঈমানদার মানুষের ভেতরেও রয়েছে। পক্ষান্তরে ঈমানদার মানুষ্ এসব প্রবৃত্তি ব্যবহার করে আল্লাহর নির্দেশিত পথে আর ঈমানহীন মানুষ তা ব্যবহার করে তাগুতের পথে। ঈমানদার মানুষ যখন কারো প্রতি হৃদায়াবেগ অনুভব করে, তখন প্রথমেই অনুসন্ধান করে, এ ব্যাপারে তার আল্লাহ্ তার প্রতি কি নির্দেশ দান করেছেন।

কারো প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি হলে সে প্রথমে অনুসন্ধান করে, এই ক্ষোভ প্রকাশের আল্লাহর নির্দেশিত পথ কোনটি। প্রেমানুভূতি সৃষ্টি হলে সে ঐ পথেই তার অনুভূতিকে পরিচালিত করে, যে পথে তাকে তার মুনিব–আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পরিচালিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে কারো প্রতি আঘাত করতে হলে, সর্বপ্রথম সে জানতে চায়–আল্লাহ্ তাকে কিভাবে আঘাত করতে বলেছেন। উপস্থিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাসূল ও তাঁর সম্মানীত সাহাবা কেরাম কি ধরনের ভূমিকা অবলম্বন করেছেন।

www.pathagar.com

এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাকে কোন পথ ও মত, কোন নিয়ম-বিধান অনুসরণ করতে হবে, সে তা অনুসন্ধান করে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে। কোরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধানের বিপরীত কোন নিয়ম-নীতি ঈমানদার মানুষ অনুসরণ করে না। এভাবে ঈমানদার মানুষের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাকে জিহাদ করতে হয়। ঈমানদার তথা মুমিন জীবনে এই জিহাদ কোন একটি স্তরে বা সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ নয়। তাকে এই জিহাদ করতে হয় পৃথিবীর জীবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত। প্রতিটি কাজ ও কথা বলার ক্ষেত্রে তাকে জিহাদ বা মুজাহাদা করতে হয় এবং এই প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সে সময়ের বিবর্তনে আল্লাহর বান্দায় উন্নীত হয়। জিহাদ বা মুজাহাদা ব্যতীত ঈমান আনয়নকারী একজন মানুষ কোনক্রমেই আল্লাহর গোলামে পরিণত হতে পারে না বা কল্যাণকর শুভ পরিণতিও সে লাভ করতে পারে না। জিহাদ বা মুজাহাদার কাজ ঈমানদারকে নিজের কল্যাণের জন্যই করতে হবে। এর যাবতীয় কল্যাণের অধিকারী সে নিজেই হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন–

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ–

যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) সংগ্রাম-সাধনা করে, সে তো আসলে তা করে তার নিজের (কল্যাণের) জন্যেই। (সূরা আনকাবুত-৬)

যে ব্যক্তি ঈমান আনে, তাকে সর্বপ্রথমে তাগুতকে অস্বীকার করতে হয়। তাগুত হলো সেই শক্তি, যে শক্তি আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। এই তাগুত শত-সহস্র রূপে পৃথিবীতে বিদ্যমান। প্রচন্ড ঠান্ডার মৌসুমে আরামের শয্যা ত্যাগ করে ফজরের নামাজ আদায় করতে হবে, কিন্তু নিজের মন আরাম ত্যাগ করে নামাজ আদায় করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে মনের এই কামনা হলো তাগুত। ব্যক্তি ব্যবসায় লিপ্ত রয়েছে, নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে। ব্যবসার কারণে সে নামাজ আদায় করছে না, এই ব্যবসা তখন তাগুতে পরিণত হলো। ব্যক্তি সুদ পরিহার করতে আগ্রহী, কিন্তু রাষ্ট্র তাকে সুদ দিতে ও গ্রহণ করতে বাধ্য করছে, রাষ্ট্রের এই নিয়ম তাগুত হিসাবে ব্যক্তির সামনে দন্ডায়মান। ব্যক্তি অশ্লীল গান-বাজনা, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি পরিহার করে চলতে ইচ্ছুক, কিন্তু সমাজ ও দেশের প্রচলিত বিধান তাকে এসবের মুখোমুখি হতে বাধ্য করছে, দেশের এই প্রচলিত বিধান তাগুত। অর্থাৎ এসব নিয়ম-বিধান ব্যক্তিকে আল্লাহর বিধান অনুসরণে বাধার সৃষ্টি করছে। এসবই তাগুত আর এই তাগুতের বিরুদ্ধেই ঈমানদারকে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে জিহাদ বা মুজাহাদা করতে হয়।

www.pathagar.com

মুজাহাদা আরবী শব্দ এবং এই শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো, কোন প্রতিকুল বা বিরোধী নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান বা শক্তির মুকাবিলায় দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, সাধনা ও প্রচেষ্টা করা। আবার যখন কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট প্রতিকুল অবস্থা বা শক্তিকে চিহ্নিত না করে মুজাহাদা করা হয়, তখন মুজাহাদা শক্তির অর্থ দাঁড়ায় সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। একজন ঈমানদার মানুষকে এই পৃথিবীতে সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়ে জীবন পরিচালিত করতে হয় আর এরই নাম হলো মুজাহাদা। ঈমানদার ব্যক্তিকে শয়তানের সাথে জিহাদ বা সংগ্রাম করতে হয়। কারণ ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ একটি দল বিশেষ এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সূরা আলে ইমরাণের ১০৪ আয়াতে বলেন–

يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ–

যারা (মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে, সত্য ও) ন্যায়ের আদেশ দিবে আর (অসত্য ও) অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে। (সূরা আলে ইমরাণ)

মুজাহাদার মাধ্যমে ঈমানদার গোষ্ঠী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নির্দেশ দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। কারণ শয়তান তাকে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে সৎ কাজের মারাত্মক ক্ষতির ভয় প্রদর্শন করে এবং অসৎ কর্মের প্রভুত লাভ ও স্বাদ উপভোগের লালসা প্রদর্শন করতে থাকে। ঈমানদারকে নিজের দেহের অভ্যন্তরের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ-সংগ্রাম করতে হয়। কারণ এই কুপ্রবৃত্তিই ঈমানদারকে সর্বক্ষণ নিজের অশুভ ইচ্ছা, কামনা-বাসনা ও আকাংখার গোলামে পরিণত করার জন্য জিহাদ করে যাচ্ছে। ঈমানদার গোষ্ঠীকে নিজের আবাসস্থল থেকে শুরু করে গোটা বিশ্বের এমন সব মানুষের সাথে দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, যেসব মানুষের চিন্তা-চেতনা, মতবাদ, আদর্শ, মানসিক প্রবণতা, চারিত্রিক নীতি-নৈতিকতা, জীবনধারা, প্রথা, রাজনৈতিক বিশ্বাস, ধর্মীয় চেতনা, সাংস্কৃতিক নীতিমালা, অর্থনৈতিক মতবাদ, সামাজিক নীতি-পদ্ধতি ইত্যাদি তার চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতার বিপরীত। সম্পূর্ণ পরিবেশ তার জীবন বিধান পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক।

ঈমানদার ব্যক্তিকে এমন সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, যে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র আল্লাহর আনুগত্য, ইবাদাত, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা ও গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে নিজেরা মনগড়া বিধান রচনা করে তা জারী করে এবং সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পরিবর্তে অসুন্দর, অকল্যাণ ও অশুভ-অসততাকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ঈমানদারের এই জিহাদ, এই মুজাহাদা–এই

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা, এই দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ নয়। বা পৃথিবীর নির্দিষ্ট কোন ভূখন্ডের মধ্যেও আবদ্ধ নয়–আমৃত্যু তাকে এই জিহাদ করতে হয় এবং পৃথিবীর যে কোন ভূ-খন্ডেই সে অবস্থান করুক না কেন, সেখানেই তাকে এই জিহাদে লিপ্ত হতে হয়। জীবনের বিশেষ কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেও এই জিহাদ বা মুজাহাদা আবদ্ধ থাকে না, বরং জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরেই তাকে জিহাদ করতে হয়। ঈমানদারের জন্য এই জিহাদ বাধ্যতামূলক। ঈমানদারকে এভাবে কোন ধরনের বাহ্যিক অস্ত্র ব্যতিতই জীবনের প্রতিটি ময়দানে জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয়। এই ধরনের জিহাদ সম্পর্কে হযরত হাসান বাসরী (রহঃ) তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন–

ان الرجل ليجاهدو ما ضرب يوما من الدهر بسيف–

মানুষ এমন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, তাকে একটি মুহূর্তের জন্যেও তরবারী চালনা করতে হয় না।

অর্থাৎ ঈমানদারকে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে এমন জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয় যে, এই জিহাদে তাকে মাধ্যম হিসাবে কোন অস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় না। অবয়বধারী দৃশ্যমান অস্ত্র ব্যতীতই তাকে সবচেয়ে বড় অস্ত্র দিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জিহাদ চালিয়ে যেতে হয়। আর সেই বড় অস্ত্রের নামই হলো ঈমান। এ জন্য বলা হয় যে, ঈমান হলো একটি সুদৃঢ় বৃক্ষ আর সেই বৃক্ষের শিকড় হলো জিহাদ। শিকড় ব্যতিত যেমন বৃক্ষ টিকে থাকতে পারে না তেমনি জিহাদ ব্যতীত ঈমান টিকে থাকে না। শিকড় সতেজ থাকলে বৃক্ষের ওপরি ভাগের পত্র-পল্লব সতেজ থাকে, বৃক্ষ ফুল-ফল দান করে। শিকড় সতেজ না থাকলে বৃক্ষ ক্রমশঃ শুকিয়ে জ্বালানি কাঠে পরিণত হয়। শিকড় ব্যতীত বৃক্ষের অস্তিত্বই যেমন কল্পনা করা যায় না তেমনি জিহাদ ব্যতীত মুসলমানের জীবন কল্পনা করা যায় না। মুসলমানদের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে তার জিহাদী চেতনার ওপরে। এই চেতনা যতদিন মুসলমানদের মধ্যে শানিত ছিল ততদিন পৃথিবীতে এরা নেতৃত্বের আসনে আসীন ছিল।

মুসলমান জনগোষ্ঠী যেদিন থেকে তার ঈমান নামক বৃক্ষের শিকড় জিহাদের প্রতি উদাসিন হয়ে পড়েছে, মুজাহাদা ত্যাগ করেছে, তখন থেকেই তার ঈমানের মৃত্যু ঘটা শুরু হয়েছে। ফলে গোটা পৃথিবীতে তারা আজ ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। অঢেল সম্পদ ও বিপুল জনশক্তির অধিকারী হয়েও তারা অমুসলিমদের গোলামী করতে বাধ্য হচ্ছে। অমুসলিমরা যখন তাদের ওপরে বন্য হায়েনার হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তখন এরা মৃত লাভের ন্যায় নীরব ভূমিকা পালন করছে। নিজেদের স্বার্থে অমুসলিমরা অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা অনুসরণ করতে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে বাধ্য করছে।

www.pathagar.com

বর্তমান পৃথিবীতে শতকোটি মুসলমানদের এই করুণ পরিণতির একমাত্র কারণ হলো, তারা ঈমান নামক বৃক্ষের শিকড় জিহাদকে নিজেদের জীবন থেকে কেটে ফেলেছে। অমুসলিমরা জিহাদের যে ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে, সেই ব্যাখ্যাকে তারা একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করে জিহাদের অধ্যায়কে নিজেদের জীবন থেকে মুছে দিয়েছে। অমুসলিমরা এদেরকে বুঝিয়েছে, জিহাদ মানেই হলো সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং এই জিহাদ নামক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করতে হবে, এরাও অমুসলিম প্রভুদেরকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে নিজেদের যাবতীয় শক্তি জিহাদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছে।

পৃথিবীর মানচিত্রে যেসব ভূ-খন্ড মুসলিম দেশ হিসাবে পরিচিত এবং তার শাসকবৃন্দও আদম শুমারীর খাতায় মুসলিম নামে পরিচিত, সেসব দেশে আল্লাহর কোন বান্দাহ্ যখন আল্লাহর বিধানের বিপরীত চিন্তা-চেতনা, নিয়ম-নীতি, বিধি বিধানের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে, তখন মুসলিম নামধারী শাসকবৃন্দ এদেরকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, জাতীয় ঐক্য বিনষ্টকারী ও সর্বশেষে সন্ত্রাসী বিশেষণে বিশেষিত করে তাদের গলায় ফাঁসির রশি পরিয়ে দেয়।

মুমিনের জিন্দেগী ও জিহাদ

জিহাদ হচ্ছে ইসলামী জীবনের স্পন্দন, প্রাণশক্তি, অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এবং ঈমানের ঐকান্তিক দাবী। ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রকেই জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয়, এই জিহাদে আন্তরিকভাবে লিপ্ত না থাকলে কোন মুসলমানের পক্ষে ঈমানদার থাকা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। একজন মানুষ যে মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করে তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে, সেই মুহূর্ত থেকেই জিহাদ করা তার ওপরে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন থেকেই শুরু হয় তার জিহাদী জীবন। এই জিহাদ নিরবচ্ছিন্নভাবে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। ঈমান আনার মুহূর্ত থেকে আল্লাহ্ বিরোধী শক্তির সাথে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূচনা ঘটে, যে সংগ্রামমুখর জীবনের সূত্রপাত হয়, এই সংগ্রামী জীবন থেকে ঈমানদারের অবসর ঘটে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এই সংঘাত ও সংগ্রাম থেকে মুমিন জীবনে মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম গ্রহণ করার সামান্যতম অবকাশ নেই। নেই শৈথিল্য প্রদর্শনের কোন সুযোগ। কারণ যখনই সে জিহাদের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে, আল্লাহ্ বিরোধী তাগুতী শক্তি সেই মুহূর্তেই তার ঈমান হরণ করার লক্ষ্যে চথুরমুখী আক্রমন শুরু করবে।

ইসলাম গ্রহণ বা ঈমান আনার সাথে সাথেই যে জিহাদ শুরু করতে হবে, এ বিষয়টি

www.pathagar.com

আমরা দেখতে পাই নবী করীম (সাঃ) এর মক্কী জীবনে। নবুয়্যাত লাভ করার সাথে সাথে তিনি আল্লাহ্র দ্বীন মানুষকে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন। বিরোধিতার প্রচন্ড তান্ডব সৃষ্টি হলো এবং বিরোধী শক্তি তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য হুশিয়ার করে দিল। তাদের প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুসারে জীবন পরিচালনার জন্য নবী করীম (সাঃ) এর ওপরে চাপ সৃষ্টি করা হলো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও তাঁর রাসূলকে স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন–

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْ هُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا–

অতএব আপনি কাফিরদের (এ অভিযোগের) পেছনে পড়বেন না, আপনি এ (কোরআন) দিয়ে তাদের প্রচন্ড মোকাবেলা করুন। (সূরা ফুরকান-৫২)

এই আয়াতে 'জিহাদান কাবিরা' বলতে যা বুঝানো হয়েছে, তাফসীরকারগণ এর তিনটি অর্থ করেছেন। একটি অর্থ হলো, চূড়ান্ত প্রচেষ্টা–অর্থাৎ প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে প্রাণ দেয়ার মতো পর্যায়ে উপনীত হওয়া। আরেকটি অর্থ হলো, বড় ধরনের প্রচেষ্টা চালানো। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজের যাবতীয় উপায়-উপকরণ নিয়োজিত করা। জিহাদান কাবিরা তথা বড় ধরনের জিহাদের আরেকটি অর্থ হলো, ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার কোন একটি দিকও অপূর্ণ না রাখা এবং প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় ময়দান ত্যাগ না করা।

প্রতিপক্ষের অনুকূল শক্তি ময়দানে যেসব স্থানে সক্রিয় রয়েছে, ময়দানের সেসব স্থানে নিজের শক্তি নিয়োজিত করা এবং আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যেসব ক্ষেত্রে কাজ করার প্রয়োজন হয়–সেসব দিকে কাজ করা। যেখানে নিজের ব্যবহার ও মধুর আচরণ দিয়ে জিহাদ করার প্রয়োজন, সেখানে তা প্রয়োগ করা। যেখানে কথা দিয়ে বা বক্তৃতা দিয়ে জিহাদ করা প্রয়োজন, সেখানে তা করা। যেখানে লেখনী দিয়ে জিহাদ করার ক্ষেত্র রয়েছে, সেখানে লেখনী শক্তি প্রয়োগ করা। যেখানে অস্ত্র ধারণ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়, সেখানে অস্ত্র ধারণ করা। অর্থাৎ উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এখানে এ কথা স্পষ্ট স্মরণ রাখতে হবে যে, সূরা ফোরকানের উল্লেখিত আয়াত রাসুলের মক্কী জীবনে অবতীর্ণ হয় এবং এই আয়াতে যে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা কোনক্রমেই সেই জিহাদ নয়, যে জিহাদে রাসূল ও তাঁর সম্মানীত সাহাবা কেরাম বদর ও ওহুদের প্রান্তরে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। অর্থাৎ রাসুলের মদীনার জীবনে যে জিহাদের নির্দেশ এসেছিল, মক্কী জীবনের জিহাদ সেই জিহাদ নয়। মক্কী জীবনের এই জিহাদের অর্থ ছিল, ইসলাম বিরোধী শক্তিকে আদর্শ

www.pathagar.com

দিয়ে মোকাবিলা করা। অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে ইসলামী আদর্শের যথার্থতা উপস্থাপন করা এবং প্রচলিত আদর্শ ও ভাবধারার অসারতা দেখিয়ে দেয়া। রাসূল উপস্থাপিত আদর্শই যে মানবতার একমাত্র মুক্তি সনদ–এ কথা মানুষের চিন্তার জগতে প্রতিষ্ঠিত করা। সমাজ ও জাতি যে পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সে পথ যে ধ্বংস গহ্বরে মিলিত হয়েছে, এ বিষয়টি সমাজ ও জাতির কাছে পরিষ্কার করে দেয়া। এ জন্যই মক্কী সূরা সমূহে দেখতে পাওয়া যায় অখন্ডনীয় যুক্তি দিয়ে মানুষকে সত্য বুঝানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। গভীর মমতার সাথে মানুষকে সত্য গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

মক্কী জীবনে জিহাদের ধরণ ছিল সত্যবিরোধীদের সামনে কোন ধরনের অস্পষ্টতা বা জড়তার আশ্রয় গ্রহণ না করে স্পষ্ট ভাষায় মহাসত্য প্রকাশ করা, সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য নির্দেশ করা, ইসলাম বিরোধীদের সামনে ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য, বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করা। সত্যের শত্রুদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও বিরোধীতার প্রবল স্রোতের মুখে ক্লান্ত না হয়ে তাদেরকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাতে থাকা।

এটাই ছিল রাসুলের মক্কী জীবনের জিহাদ এবং এই জিহাদে অবিচল ও অটল ভূমিকা পালন করেছেন নবী করীম (সাঃ)। তাঁকে এবং তাঁর গুটিকতক মজলুম অনুসারীদেরকে নানা ধরনের প্রলোভন দেখানো হয়েছে, লোভ-লালসার গন্ডিতে আবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, অবশেষে তাদের ওপরে অবর্ণনীয় লোমহর্ষক নির্যাতন অনুষ্ঠিত করা হয়েছে, তবুও তাঁরা এই জিহাদ থেকে ক্ষণিকের জন্যেও বিশ্রাম গ্রহণের কল্পনাও করেননি বা সামান্য শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। আর এটাই হলো মুমিনের জিন্দেগীর বাস্তব রূপ।

ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি সর্বপ্রথম জিহাদ শুরু করে তার নিজের নফ্ছের বিরুদ্ধে। ইসলামের বিপরীত যাবতীয় চিন্তা-চেতনা, নীতি-পদ্ধতি, বিধি-বিধান, মতবাদ-মতাদর্শ পরিহার করার প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং এটাই জিহাদের সূচনা। মানুষের ভেতরে যে কুপ্রবৃত্তি রয়েছে, এই কুপ্রবৃত্তি বা নফছ কোনক্রমেই ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় না। পক্ষান্তরে এই নফ্ছকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর অনুগত করা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহর গোলাম হিসাবে জীবন পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। কেননা এই নফছ্ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শক্তি। মানুষের ভেতরের এই শক্তি মানুষকে অসৎ কাজে প্ররোচিত করতে থাকে, এর প্ররোচনা থেকে যে ব্যক্তি নিজেকে হেফাজত করতে সক্ষম, সে ব্যক্তির পক্ষেই আল্লাহর গোলাম হিসাবে নিজেকে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। ইসলামের বিপরীত শক্তির

www.pathagar.com

সাথে যে ব্যক্তি জিহাদ করে তাকেই হাদীস শরীফে মুজাহিদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রকৃত মুজাহিদের পরিচয় দিতে গিয়ে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ–

যে ব্যক্তি নিজের নফছ্কে আল্লাহর অনুগত বানানোর লক্ষ্যে জিহাদ করলো, সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুজাহিদ। (মুসনাদে আহ্মাদ)

সুতরাং মুমিনের জিন্দেগী শুরুই হয় তার নিজের নফ্ছের বিরুদ্ধে জিহাদের সূচনার মাধ্যমে। একজন মানুষ বাহ্যিক দিক দিয়েই শুধু মুসলিম হবে না, তার সমস্ত হৃদয় মনকে সে আল্লাহর বিধানের সামনে অনুগত করে দিবে, তার নফছ আল্লাহর বিধানের সামনে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে, কিন্তু তাকে নফছের সিদ্ধান্তের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে–আর এভাবেই সে মুমিন শ্রেণীতে উপনীত হবার সোপানে যাত্রা শুরু করবে। মুমিন হওয়ার শর্ত উল্লেখ করতে গিয়ে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنُ هَوَاهُ تَبْعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ–

তোমাদের মধ্যে কোন মানুষই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না–যতক্ষণ তার হৃদয়-মন, সমস্ত অন্তর আমার নিয়ে আসা আল্লাহর বিধানের অধীন না হবে। (বোখারী-মুসলিম)

শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতিই নয়–গোটা হৃদয়-মনকে আল্লাহর বিধানের সামনে নত করে দিতে হবে তথা নফছের বিরুদ্ধে অবিরাম জিহাদ পরিচালিত করে নিজেকে মুমিনের স্তরে উপনীত করে জান্নাত লাভের যোগ্য হিসাবে গড়তে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى، فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى–

আর যে ব্যক্তি তার মালিকের সামনে দাঁড়ানো (-র এ দিন)-কে ভয় করেছে এবং (এ ভয়ে) নিজের নফসকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রেখেছে, অবশ্যই জান্নাত হবে তার ঠিকানা। (সূরা নাযিয়াত-৪০-৪১)

বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জান্নাত লাভের শর্তই হলো নিজের হৃদয়-মন-

www.pathagar.com

মানসিকতাকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর বিধানের অধীন করে দেয়া। নফছ প্রদর্শিত পথের বিপরীত পথ অতিক্রম করা। সুতরাং একজন মানুষকে মুমিনের স্তরে উপনীত হতে হলে সর্বপ্রথমে তাকে নিজের নফছের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। এরপর তাকে জিহাদ করতে হবে সে যে পরিবেশে অবস্থান করে, সেই পরিবেশের সাথে। মনে রাখতে হবে, মানুষের ভেতরে আল্লাহদ্রোহী যে শক্তি অবস্থান করছে সে শক্তির নামই হলো কুপ্রবৃত্তি বা নাফছ এবং মানুষের দেহের বাইরে আল্লাহদ্রোহী যে শক্তি রয়েছে, তার নাম হলো শয়তান। ঈমানদারকে এই দুই শক্তির বিরুদ্ধেই জিহাদ চালিয়ে যেতে হয়। শয়তান অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য। এই শয়তান মানুষের অভ্যন্তরে নফছের ওপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে এবং মানুষের বাইরের পরিবেশকে নিজের অনুকুলে এনে তার আধিপত্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ জন্য ঈমানদার ব্যক্তিকে জিহাদের মাধ্যমে নিজের নফছকে আল্লাহর অনুগত বানিয়ে শয়তানের কর্তৃত্ব উৎখাত করতে হবে। তারপর বাইরের আল্লাহ বিরোধী পরিবেশের সাথে জিহাদ করে শয়তানের সাম্রাজ্যে ধ্বস নামিয়ে দিতে হবে।

মানুষের মধ্যে যারা শয়তানের মুরিদ হয়ে তার গোলামী করে, শয়তান এদের মাধ্যমেই তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই মানবরূপী শয়তানদের সাথেও মুমিনকে প্রতি নিয়ত জিহাদ করতে হয়। এই জিহাদ করার পূর্বে একজন ঈমানদারকে সর্বপ্রথমে সেই অবস্থান থেকে হিজরত করতে হয়, ঈমান আনার পূর্বে সে যে অবস্থানে ছিল। অর্থাৎ ঈমান আনার পূর্বে তাকে তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى، لَا انْفِصَامَ لَهَا–

তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি বাতিল (মতাদর্শ)-কে অস্বীকার করে, আল্লাহর (দেয়া জীবনাদর্শের) ওপর ঈমান আনে, সে যেনো এর মাধ্যমে এমন এক শক্তিশালী রশি ধরলো, যা কোনোদিনই ছিঁড়ে যাবার নয়। (সূরা বাকারা-২৫৬)

অর্থাৎ আল্লাহ বিরোধী শক্তি তথা তাগুতের সাম্রাজ্য থেকে মানুষকে প্রথমে হিজরত করে ঈমান আনতে হয় বা ইসলামী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়। এরপরই শুরু হয় জিহাদের পর্যায়। আর মুমিনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে হিজরত তখনই করতে হয়, যখন তার নিজের দেশে অবস্থান করে আল্লাহর গোলামী করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এভাবে

www.pathagar.com

যারা প্রথমবার কুফরীর জগৎ থেকে হিজরত করে ঈমান এনেছে এবং নিজের নাফছের বিরুদ্ধে, তার অবস্থানের পরিবেশের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে এবং সমাজ ও দেশে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে আল্লাহর নির্দেশিত পথে, তারাই আল্লাহর রহমত লাভ করবে। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে –

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

যারা ঈমান এনেছে, যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগৃহীত হবার আশা করতে পারে, আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু। (সূরা বাকারা- ২১৮)

মুমিন যে কোন অবস্থায় সত্য অবলম্বন করবে এবং এটাই তার জিহাদ। সত্য বলার ক্ষেত্রে সে কোন বিপদেরই তোয়াক্কা করবে না। নবী করীম (সাঃ) বলেন–

اِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ–

অত্যাচারী শাসকের সামনে ইনসাফ ও সুবিচারের কথা বলা বড় ধরনের জিহাদের শামিল। (তিরমিজী)

অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বললে তাকে জেলে যেতে হবে, তার বিরুদ্ধে নির্যাতনের খড়গ নেমে আসবে, এসবের কোন পরোয়া মুমিন করবে না। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ–

অত্যাচারী জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ। (আবু দাউদ)

মুমিনের জিন্দেগীতে আপোষ বলে কোন কথা নেই। বাতিল শক্তির সাথে সে বিন্দুমাত্র আপোষ ও তাদেরকে ভয়ও করবে না। সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকে। মুমিনের এই দুর্লভ গুণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ–

তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে, কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া তারা করবে না। (সূরা মায়িদা-৫৪)

www.pathagar.com

সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে স্থান কাল পাত্র কোন বিষয় নয়। পৃথিবীর যে কোন ভূ-খন্ডে মুমিন যাক না কেন, সেখানে যদি সত্য প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়, অবশ্যই সে তা করবে। হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এর হাতে আমরা বায়'আত করে ওয়াদা করেছিলাম যে, আমরা যেখানেই এবং, যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, সত্য কথা, ন্যায় ও ইনসাফের কথা বলবো এবং এ ব্যাপারে আমরা কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে বিন্দুমাত্র ভয় করবো না। (বোখারী)

ইসলামী বিধান অনুসরণ করার ব্যাপারে মুমিন কোন প্রতিকুল পরিবেশের পরোয়া করবে না। সর্বাবস্থায় সে সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলতেই থাকবে। এ ব্যাপারে সে কারো রক্তচক্ষু, কারো অভিযোগ-আপত্তি, কারো বিদ্রুপের কোন পরোয়া করবে না। পরিবেশ ও দেশের জনমত ইসলামের বিরোধী হলেও মুমিন সামান্য বিচলিত হবে না, সেই প্রতিকুল পরিবেশেই সে ঐ পথেই জিহাদ করতে থাকবে, যে পথ তাকে ইসলাম প্রদর্শন করেছে।

জিহাদই ঈমানের কষ্টি পাথর

মুসলিম হিসাবে দাবীদার একজন মানুষ ঈমানদার কি না, তা যাচাই করার একমাত্র মাধ্যম হলো জিহাদ। কারণ কুফর আর ইসলামের জিহাদ বা দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও সংঘাত হচ্ছে এমন একটি বিশেষ কষ্টি পাথর, এমনই এক মানদন্ড, যা প্রকৃত ঈমানদারের পরিচয় যেমন প্রকাশ করে দেয় তেমনি ঈমানের দাবীর ব্যাপারে কারা ভূয়া-মেকি, কৃত্রিম, তাদের পরিচয়ও সুস্পষ্ট করে দেয়। যে ব্যক্তি এই জিহাদ তথা ইসলামী বিরোধী শক্তির সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মন প্রাণ দিয়ে ইসলামের জন্য কাজ করবে এবং যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ, সমগ্র উপায়-উপকরণ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ও পালন করার কাজে নিয়োজিত করবে এবং কোন প্রকার আত্মদানেই কুণ্ঠিত হবে না, সেই ব্যক্তিই হলো প্রকৃত ঈমানদার।

আর যে ব্যক্তি বাতিল শক্তির সাথে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ইসলামের পক্ষ সমর্থন করবে না, ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শের জৌলুশ ও শক্তিমত্তা দেখে ভীতগ্রস্থ হয়ে ময়দান ত্যাগ করবে, ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের লক্ষ্যে জান-মাল উৎসর্গ করাকে বৃথা মনে করে কুণ্ঠিত হবে, তার এই আচরণই প্রমাণ করে দিবে যে, সে ব্যক্তি ঈমানের দাবীর ব্যাপারে মিথ্যা–সে মুনাফিক।

তাবুক অভিযানের সময় এই কৃত্রিম ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিদের পরিচয় রাসুল ও তাঁর সাহাবাদের সামনে আল্লাহ তা'য়ালা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। ঈমানের ব্যাপারে যারা মেকী, তারা তাবুক অভিযানের কথা শুনেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর

www.pathagar.com

রাসুল যখন এই অভিযানে জান-মাল দিয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য ঘোষণা দিলেন, তখন মেকি ঈমানদার তথা মুনাফিকী রোগে যারা আক্রান্ত ছিল, তাদের রোগ প্রকটভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো। তাদের নফছ ও শয়তান তাদেরকে বুঝালো, 'এই জিহাদে অংশগ্রহণ করলে মারাত্মক ক্ষতির মোকাবিলা করতে হবে। সুতরাং এই ক্ষতি থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখার জন্য রাসুলের কাছে অজুহাত পেশ করতে হবে যে, আমাকে এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, বর্তমানে আমার পক্ষে জিহাদে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়।' এরা রাসূলের আহ্বানের মোকাবিলায় শয়তানের পরামর্শকে প্রাধান্য দিয়ে রাসূলের কাছে কাকুতি-মিনতি করে আবেদন পেশ করেছিল, তাদেরকে যেন এই জিহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতি দেয়া হয়। এদের কৃত্রিম ঈমান সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিলেন–

لَايَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ، وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ، اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فِىْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ–

যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার, তারা তো কখনই তোমার কাছে আবেদন করবে না যে, জান-মালসহ জিহাদ করার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেয়া হোক। আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের ভালো করেই জানেন। এ ধরনের কোন আবেদন শুধুমাত্র তারাই করতে পারে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার নয়, তাদের মনে সন্দেহ রয়েছে আর তারা নিজেদেরই সন্দেহের আবর্তে পড়ে আবর্তিত হচ্ছে। (সূরা তওবা-৪৪-৪৫)

যারা প্রকৃতই তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করে, তারা যে কোন প্রতিকুল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে হলেও আল্লাহর পথে জিহাদ করে। ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে তাদের ওপরে যখন কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তখন তারা কোন ধরনের অজুহাত প্রদর্শন করে না। কোন ধরনের ওজর-আপত্তি ছাড়াই সে দায়িত্ব আন্তরিকভাবে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। আর তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি যাদের বিশ্বাস ঠুনকো, এসব ব্যাপারে যারা সন্দেহ সংশয়ের আবর্তে আবর্তিত হতে থাকে, তারা পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হলেও, এই আন্দোলন যখন বিপদের মোকাবিলা করতে থাকে

www.pathagar.com

বা এই আন্দোলনের ওপরে বাতিল গোষ্ঠী হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে, আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ওপরে নির্যাতন নেমে আসে, তখন এই মেকি ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ আন্দোলন থেকে ছিটকে পড়ে। এরা পথ খুঁজতে থাকে, কিভাবে আন্দোলনের কাজ থেকে দূরে অবস্থান করা যায়। আন্দোলন বিপদ-সঙ্কুল পথ অতিক্রম করার সময় যারা দৃঢ় প্রত্যয়ে আন্দোলনের কাজে সক্রিয় থাকে, তারাই প্রকৃত ঈমানদার। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَافُتِنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْا، اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

পক্ষান্তরে যাদের অবস্থা এই যে, ঈমান আনার কারণে যখন তারা নির্যাতিত হয়েছে, তারা বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে কষ্ট সহ্য করেছে এবং ধৈর্য ধারণ করেছে, তাদের জন্য অবশ্যই তোমার রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা নাহ্ল-১১০)

এসব লোকদের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করবেন। এই শ্রেণীর লোকদের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশী। আল্লাহর পথে যারা জিহাদ করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ، يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ، خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا، اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ–

আল্লাহর কাছে তো সেই লোকদের অতি বড় মর্যাদা, যারা ঈমান এনেছে, যারা তাঁর পথে নিজেদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করেছে এবং প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করেছে আর তারাই হচ্ছে সফলকাম। তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত ও সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী সুবিন্যস্ত রয়েছে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহর কাছে কাজের প্রতিফল দেয়ার অফুরন্ত সামগ্রী রয়েছে। (সূরা তওবা-২০-২২)

www.pathagar.com

ঈমান এনেছি–এ কথা বললেই ঈমানদারের দায়িত্ব-কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না, তাকে জিহাদে অবতীর্ণ হতে হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষা শুধু নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারীদেরকেই করা হয়নি বা হবে না, অতীতেও যারা কুফরী ত্যাগ করে ঈমান এনেছে, তাদেরকেও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই পরীক্ষা তথা জিহাদের ময়দানেই প্রমাণিত হয়, কে ঈমানের দাবীর ব্যাপারে দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। মহান আল্লাহ্ বলেন–

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَايُفْتَنُوْنَ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ–

লোকেরা কি এ ধারণা করেছে নাকি, 'ঈমান এনেছি' কেবলমাত্র এ কথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি। আল্লাহ্ অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যুক। (সূরা আনকাবুত-২-৩)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, পৃথিবী ও আখিরাতের জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য আমার যেসব প্রতিশ্রুতি রয়েছে কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র মৌখিক ঈমানের দাবীর মাধ্যমে তার অধিকারী হতে পারে না। বরং ঈমানের দাবীদার প্রতিটি ব্যক্তিকেই অনিবার্যভাবে কঠিন পরীক্ষার স্তর সাফল্যের সাথে অতিক্রম করতে হবে।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ، اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ–

তোমরা কি মনে করেছো তোমরা জান্নাতে এমনিতেই প্রবেশ করবে, অথচ এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারগণ? তারা সম্মুখীন হয়েছিল নির্মমতা ও কঠিন যন্ত্রণার, তাদেরকে অস্থির করে তোলা হয়েছিল। এমনকি রাসুল ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা

www.pathagar.com

চিৎকার করে বলেছিল আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? তখনই তাদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল এই মর্মে যে, জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য অত্যন্ত কাছে। (সূরা বাকারা-২১৪)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, ঈমানের দাবীদারকে নিজের দাবীর সত্যতার প্রমাণ পেশ করতে হবে। আমার জান্নাত এতটা মূল্যহীন নয় এবং পৃথিবীতেও আমার বিশেষ অনুগ্রহ এত সহজ লভ্য নয় যে, তোমরা শুধু মুখে আমার প্রতি ঈমান আনার কথা উচ্চারণ করবে আর অমনিই আমি তোমাদেরকে সেসব নিয়ামত দান করবো। আমার এসব নিয়ামত লাভ করতে হলে অবশ্যই পরীক্ষার ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। চার দেয়ালে আবদ্ধ থেকে পরীক্ষা দেয়া যায় না, পরীক্ষা দিতে হলে অবশ্যই পরীক্ষার ক্ষেত্র তথা আন্দোলনের ময়দানে নামতে হবে। তখন আমি দেখবো, কে আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন ধরনের ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ–

তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে জিহাদে প্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে ধৈর্যশীল? (সূরা ইমরান-১৪২)

আল্লাহ বলেন, আমার নিয়ামত লাভ করতে হলে অবশ্যই দুঃখ-কষ্ট মুসিবত সহ্য করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন, নিপীড়ন সহ্য করতে হবে, জেলে যেতে হবে, ফাঁসির রশি গলায় পরতে হবে, অর্থ-সম্পদের ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। বিপদ-মুসিবত ও সঙ্কটের মোকাবিলা করতে হবে। ভীতি ও আশঙ্কা দিয়ে এবং লোভ-লালসা দিয়েও তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। এমন প্রতিটি জিনিস যা তোমরা প্রিয় মনে করো ও পছন্দ করো, আমার সন্তুষ্টির জন্য তা কোরবান করতে হবে। আর এমন প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট যা তোমরা কামনা করো না, তোমাদের কাছে যা অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত, তা আমার জন্য অবশ্যই সহ্য করতে হবে। তারপরেই তোমরা আমার প্রতি ঈমানের যে দাবী করেছিলে, তার সত্য-মিথ্যা যাচাই হবে। এভাবে জিহাদের কষ্টি পাথরে ঈমান যাচাই করে নেয়া হবে।

www.pathagar.com

জিহাদ-আল্লাহর প্রদর্শিত পথে

ইতোপূর্বে আমরা মুমিন জীবনে জিহাদের অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। জিহাদের বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, ঈমান ও জিহাদ মুমিন জীবনে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। জিহাদ ব্যতিত একজন মানুষ মুমিনের স্তরে উপনীত হতে পারে না এবং ঈমানও টিকে থাকে না। জিহাদ ব্যতীত ঈমানের দাবীর ব্যাপারে নিশ্চিতও হওয়া যায় না। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান তথা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর, রাসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে একজন মানুষ নিজেকে এই মূল কাজ তথা জিহাদের জন্যই প্রস্তুত করে। ব্যক্তিকে সৎ চরিত্রবান বানানোর লক্ষ্যে ইসলাম যত বিধান দান করেছে, অর্থাৎ নামায আদায়, রোজা পালন, যাকাত আদায়, হজ্জ আদায়, নিজেকে শয়তানী কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখা ইত্যাদী যে কাজগুলো একজন মানুষকে করতে হবে এবং এ কাজের মধ্য দিয়েই মানুষ সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে।

বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পরিস্কার হতে পারে, যেমন সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীতে লোক রিক্রুট করার পর বিশেষ সময় পর্যন্ত তার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। যাবতীয় ট্রেনিং সম্পন্ন হবার পরই তাকে নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তেমনি একজন মানুষ যখন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে এবং নবীর নেতৃত্ব গ্রহণ করার পরে মুসলিম দলে শামিল হলো তখন নামায,রোজা, হজ্জ ইত্যাদীর মাধ্যমে তাঁর ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তাঁর ভেতরে ক্রমশঃ সেই যোগ্যতা সৃষ্টি হতে থাকে, যে যোগ্যতা থাকলে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। সৈনিককে যেমন ট্রেনিং দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়, তেমনি নামায রোজার মাধ্যমেও ট্রেনিং দিয়ে মানুষকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য প্রস্তুত করা হয়।

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও রাসুলের নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস–এবং এই বিশ্বাস অনুসারে জীবন পরিচালিত করার পর মানুষ আল্লাহর সাথে ঈমানের ব্যবসায় তৃতীয় স্তরে উপনীত হতে পারে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, একটি মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুসলমানদেরকে সুদক্ষ সুসংগঠিত যোগ্যতা সম্পন্ন একটি বাহিনীতে পরিণত করার জন্যই আল্লাহর ওপরে ঈমান আনতে বলা হয়েছে এবং রাসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আদেশ করা হয়েছে। মুসলমানদের মূল কাজই হলো মানুষকে পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির গোলামী থেকে মুক্ত করে, যাবতীয় শক্তির নেতৃত্ব-প্রভুত্ব, শাসন উৎখাত করে এক আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, এক আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত করা, সমস্ত মানুষকে আল্লাহর গোলামে পরিণত করা–এটার নামই হলো আল্লাহর পথে

www.pathagar.com

জিহাদ। আর জিহাদই হলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রাণশক্তি, ঈমানের মৌলিকভাবধারা, কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। এই জিহাদই হওয়া উচিত মুমিনদের একমাত্র সাধনা।

জিহাদ সম্পর্কিত ভ্রান্তি নিরসন

পৃথিবীতে ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মমত হিসেবে আগমন করেনি, এটা একটি বিপ্লবী বিশ্বাস, যুগান্তকারী বিপ্লবী একটি আদর্শ, একটি পরিপূর্ণ ও বিপ্লবাত্মক জীবন বিধান। ইসলামের বিপরীত যা কিছু মানুষের চিন্তার জগতে স্থান দখল করে রয়েছে আবহমান কাল থেকে তা নির্মম নিষ্ঠুর হাতে উৎপাটন করার লক্ষ্যে ব্যক্তিকে যেমন সক্রিয় ও সচেষ্ট হতে হয় তেমনি ব্যক্তির বাস্তব জীবন পরিচালিত করতে হয় যে কোন ধরনের প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তিকে সফলভাবে অতিক্রম করে ইসলামী আইন-বিধান তথা রাসূল নির্দেশিত নিয়ম নীতি অনুসারে।

তারপর সেই ব্যক্তিকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয় সামষ্টিকতার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পরিসরের দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের অঙ্গন থেকে বিশাল সামাজিক. রাষ্ট্রীয় জীবনের মহাসাগরের দিকে। এই যাত্রা পথে তাকে প্রতিটি পদক্ষেপে মোকাবেলা করতে হয় ইসলাম বিরোধী নিয়ম-নীতি, প্রথা, আইন-কানুন ও ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রবল প্রতিবন্ধকতা. সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এসব ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে মোকাবেলা করার নামই হলো জিহাদ। এই জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, ইসলাম বিরোধী শক্তিকে একের পর এক আঘাত হেনে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, ইসলাম বিরোধী যাবতীয় নিয়ম-প্রথা, আইন-কানুন উৎখাত করে সেখানে আল্লাহ তা'য়ালার একক সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তক আনিত পরিপূর্ণ জীবন বিধান ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করা।

আসলে এটাই হলো জিহাদের অব্যাহত ও সার্বক্ষণিক কার্যক্রম এবং ঈমানদারকে, একজন মুমিনকে সকল সময়ই জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয়। এই জিহাদে মন-প্রাণ দিয়ে, আন্তরিকভাবে লিপ্ত না থাকলে তার পক্ষে মুমিন থাকা, ঈমানদার কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। এ জন্য জিহাদই হলো ঈমানের ঐকান্তিক তাগিদ–জিহাদই হলো মুমিন জীবনের সর্বোচ্চ স্তর–একজন ঈমানদারের ইসলামী জীবনের অতুলনীয় বৈশিষ্ট হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। কারণ ইসলাম হলো মানুষের জীবনের শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট একটি বিশাল বৃক্ষের নাম। এই বৃক্ষের মূল নিহিত, গ্রথিত ও বিস্তৃত ঈমানের অতল গভীরে। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে ঈমানদারকে বাতিল সৃষ্ট প্রচন্ড

www.pathagar.com

ঝড়ের তান্ডবের সাথে সংগ্রাম করতে হয়, ঝড়ের প্রতিকূলতাকে জয় করতে হয়। বাতিল সৃষ্ট ঝড় তাকে আঘাত করলে তাকেও প্রত্যাঘাত করে ঈমান টিকিয়ে রাখতে হয়।

এটাই হলো একজন ঈমানদার ব্যক্তির প্রতি মুহূর্তের জীবন ধারা। এই জীবন ধারাকে এড়িয়ে যাওয়া বা অবহেলা করাই হলো আল্লাহর প্রতি ঈমানকে অস্বীকার করা, রাসুলের প্রতি ঈমানকে অস্বীকার করার শামিল। জিহাদ-ই জীবনধারার বিপরীত জীবনধারার নামই হলো বৈরাগ্যবাদী জীবন ধারা, আর বৈরাগ্যবাদের স্থান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ইসলামে দেননি।

মুসলমানদের জীবনই হলো জিহাদ-ই জীবন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্তমান পরিবেশে ইসলামী নিয়ম-নীতি সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়, এসব নিয়ম-নীতি আদর্শের বিপরীত কোরআন নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালিত করার নামই হলো জিহাদ-ই জীবন। এই জিহাদকে যারা অস্বীকার করে জীবন অতিবাহিত করতে চায়, তারা প্রকারান্তরে ইসলামকেই অস্বীকার করে। জিহাদকে অস্বীকার করে এই পৃথিবীতে কেবলমাত্র দু'ধরনের জীবন-যাপন করা যেতে পারে। একটি হলো চরম স্বেচ্ছাচারীতামূলক পশুসুলভ জীবন আরেকটি হলো বৈরাগীর জীবন। পক্ষান্তরে ইসলাম এই দুই ধরনের জীবন-যাপন প্রণালীকেই হারাম বলে ঘোষণা করেছে এবং মানব স্বভাবের সাথে এই দু'ধরনের জীবনের কোন সামঞ্জস্য নেই।

স্বেচ্ছাচারীতামূলক পশুসুলভ জীবন হলো এ পৃথিবীতে বৈধ-অবৈধের কোন সীমার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে যেমন খুশী তেমনভাবে জীবনকে পরিচালনা করা। বৈধ পথ অবলম্বন করা এবং অবৈধ পথ ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন জিহাদ। চাকরী জীবনে বেতন লাভ করা যায় এবং অবৈধ পথে অর্থ সংগ্রহ করা যায়। বেতন লব্ধ অর্থে দারিদ্র সীমার নিচে জীবন-যপন করতে হয়। আর অবৈধ অর্থ সংগ্রহ করলে অত্যন্ত স্বচ্ছলভাবে জীবন-যাপন করা যায়। চরম দারিদ্রতাকে হাসি মুখে স্বাগত জানিয়ে অবৈধ অর্থ সংগ্রহ থেকে বিরত থাকাও জিহাদ। যৌবনকে অবৈধ উপায়ে ভোগ করার যাবতীয় উপকরণ সম্মুখে উপস্থিত, এ অবস্থায় তা থেকে বিরত থাকাও জিহাদ। অবৈধ অঢেল অর্থের প্রলোভন, ভোগ-বিলাসের হাতছানি থেকে নিজেকে হেফাজত করাও জিহাদ। জিহাদের এ ধরনের অসংখ্য ক্ষেত্র রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে জিহাদে বিজয়ী হলেই মুমিন হওয়া সম্ভব। আর এই ধরনের মুমিনের পক্ষেই আল্লাহর সাহায্যের প্রতি প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাতিলের সামনে রক্তঝরা ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব।

জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে এ ধরনের অসংখ্য জিহাদের মুখোমুখি হতে হয়। এসব ক্ষেত্রে জিহাদ করতে ব্যর্থ হয়ে কোন ব্যক্তি যদি আত্মরক্ষার আশায় মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে, খানকার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখে, দ্বন্দ্ব মুখর পৃথিবীর জটিলতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে, কোন ধরনের সমস্যা নিয়ে মস্তিষ্ক পরিচালনা করতে অস্বীকার করে যে ধরনের জীবন-যাপন করে, সেই জীবন গ্রহণ করার নামই হলো বৈরাগ্যবাদ। পৃথিবীর বুকে কোন নবী-রাসুলই এ ধরনের বৈরাগী সৃষ্টি করার জন্য আগমন করেননি। তাঁরা আগমন করেছেন মানুষকে বিপ্লবী বানানোর জন্য। আল্লাহ্ বিরোধী পরিবেশ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে, মানুষের তৈরী করা আইন-কানুনের বিরুদ্ধে মানুষ বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহী ভূমিকা পালন করে তা উৎখাত করে আল্লাহর বিধান পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তথা জিহাদ করবে, এই ধরনের মানুষ তৈরী করার জন্যই নবী-রাসূল আগমন করেছিলেন।

ইসলামের এই জিহাদ সম্পর্কে অমুসলিম শক্তি মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। তারা ইসলামী জিহাদের স্বেচ্ছারমূলক বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেছে। যে মহান ও কল্যাণকর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসলমানদের জন্য জিহাদকে বিধিবদ্ধ করেছেন, সেই কল্যাণকর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে তারা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিয়ে গোটা পৃথিবী বাসীর দৃষ্টির অন্তরালে রেখে দেয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। তারা জিহাদের একটা বিকৃত কুৎসিত অবয়ব পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করে তার ওপরে যাবতীয় হিংস্রতার আবরণ, বীভৎসতার ছায়া, লোমহর্ষক পৈশাচিকতার পর্দা ও অমানবিকতার আচ্ছাদন দিয়ে দিয়েছে। তারা এই জিহাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে তাদের কুটিল কুৎসিত জঘন্য মানসিকতার সমস্ত আক্রোশ প্রকাশ করেছে।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) এর শাসনামলে ইসলামের সৈনকগণ জেরুজালেম বিজয় করলো। খলীফা সেখানে গমন করার পরে খ্রীষ্টানদের গির্জা পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। এমন সময় নামাজের সময় হলো। নামায আদায় করার স্থান নির্বাচন করার জন্য তাঁর দৃষ্টি এদিক ওদিক ঘুরে ফিরছিল। মুসলিম জাহানের খলীফার মনোভাব খৃষ্টান নেতৃবৃন্দ অনুভব করলেন। গির্জা প্রধান তাঁকে বললেন, 'আপনি আমাদের গির্জাতেই নামায আদায় করুন।' হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, 'না, এটা সম্ভব নয়। আমি যদি আজ গির্জায় নামায আদায় করি, তাহলে ভবিষ্যতে মুসলমানরা গির্জার ওপরে হস্তক্ষেপ করার একটা অজুহাত পেয়ে যাবে।'

www.pathagar.com

ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাসে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনাবলী স্বর্ণাক্ষরে দেদিপ্যমান রয়েছে। যারা প্রচার করে থাকে যে, **'ইসলাম শক্তির বলে বিস্তার লাভ করেছে'** মুসলমানদের এসব ইতিহাস কি তাদেরকে বিদ্রুপ করছে না? মুসলমানদের ইতিহাস সহনশীলতা আর প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার ইতিহাস। ইসলাম তার অনুপম আদর্শের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে।

এভাবে তারা জিহাদের অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ইসলামের যাবতীয় কল্যাণকর দিক, মহান মানবতাবাদী আন্দোলনকে মানুষের কাছে সংশয়াপন্ন করে ঘৃণিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ইসলামী আন্দোলন যারা আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন তাদের উপস্থাপিত ও প্রচারিত যাবতীয় মহামূল্যবান নীতি-আদর্শকে যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য সর্বমুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে অমুসলিম জনগোষ্ঠী বৈরী আচরণ করেছে। তাদের সাথে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংঘটিত সাধারণ দ্বন্দ্ব সংঘাতকে পূঁজি করে ইসলামের এই মহান জিহাদকে কলূষিত করতে ইসলামের শত্রুরা স্বয়ং এবং তাদের বশংবদ মুসলিম ধারী গোলামরা সক্রিয় রয়েছে। প্রায়দিনই পত্র-পত্রিকায় দাড়ি টুপিধারী রক্তলোলুপ দানবের চিত্র অঙ্কন করে ইসলামপন্থীদেরকে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং সেই সাথে এ কথা বুঝানো হচ্ছে যে, 'জিহাদ ইসলাম পন্থীদেরকে হিংস্র ও রক্তলোলুপ দানবে পরিণত করেছে।'

এরা কারণে অকারণে প্রচার করে থাকে যে, **'ইসলামপন্থীরা সহিংস এবং অত্যন্ত মারাত্মক চরিত্রের। মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাস থেকে রক্তের গন্ধ আসে। ইসলাম অস্ত্রের শক্তিতে প্রচারিত হয়েছে। ইসলাম মানুষকে হৃদয়হীন পশুতে পরিণত করে। অমুসলিমদেরকে হত্যার নির্দেশ নিয়েই কোরআনের আগমন ঘটেছে। এই পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট করার জন্যই ইসলামের আগমন। পৃথিবীর বুকে যতদিন কোরআন টিকে থাকবে ততদিন হিংস্রতা দূর হবে না।'**

এই ধরনের অমূলক-অশোভন ও হিংসা-বিদ্বেষমূলক প্রচারের কারণে গোটা পরিবেশকেই বিষাক্ত করে তোলা হচ্ছে এবং এ অপপ্রচারে প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই প্রায়দিনই ভারতের বুকে অমুসলিমরা মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে। পবিত্র কোরআনে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। পবিত্র কোরআনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার আবেদন জানিয়ে আদালতে মামলা করছে। ফিলিস্তিন, কাশ্মির, মেসেডোনিয়া, হার্জেগোভিনা,

www.pathagar.com

চেসনিয়া, বসনিয়া থেকে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অপচেষ্টা চলছে। মিথ্যা অজুহাতে আফগানিস্থান ও ইরাক দখল করে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করা হয়েছে।

এই অপশক্তির অপপ্রচারের কারণেই মুসলমানদের মধ্যেও একটি বিরাট অংশ মনে করে যে, **'বিভৎস একটি যুদ্ধ প্রক্রিয়ার নামই হলো জিহাদ।'** জিহাদ শব্দটি কর্ণকুহরে প্রবেশের সাথে সাথে তাদের মানস পটে ভেসে ওঠে শ্মশ্রু মন্ডিত, লম্বা জোব্বায় আবৃত, টুপি পাগড়ী পরিহিত একটি জনগোষ্ঠী, হাতে কোষমুক্ত বিশালাকারের শাণিত তরবারী নিয়ে রক্তলোলুপ হায়েনার মতই দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটছে আর নির্বিচারে অমুসলিম নারী, শিশু বৃদ্ধ তরুণ যুবকদেরকে হত্যা করছে। মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্বের প্রচার মাধ্যম নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে মুসলমানদেরকে সমগ্র পৃথিবীর সামনে হিংস্ররূপে উপস্থাপন করেছে। এ জন্য ফারসী ভাষায় একটি কথা বলা হয়ে থাকে যে-

و لکن قلم در کف دشمنست-

অলেকিন কলমদার কাফে দুশ্‌মনাস্ত। অর্থাৎ শত্রুর হাতের কলম ইচ্ছে মাফিক মুসলমানদের চরিত্র অঙ্কন করেছে।

মুসলমানদের প্রতিপক্ষ কলমের সাহায্যে ইসলামকে দেখিয়েছে একটি পশুসুলভ দানবীয় শক্তি হিসেবে। তাদের অপপ্রচারে এক শ্রেণীর মুসলমানরা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম সম্পর্কে কোন ধরনের জ্ঞানার্জন ব্যতীতই পাশ্চাত্যের শেখানো বুলি তোতা পাখীর মতই আওড়িয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ আর জড়বাদী জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত এক শ্রেণীর মুসলমানরাই ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচার করছে যে, জিহাদ মানে হলো ধর্মযুদ্ধ। মুসলিম নামধারী এসব ব্যক্তিদের আলোচনা শুনলে বা এদের রচিত গ্রন্থ পাঠ করলে মনে হয়না যে, এদের স্বাধীন কোন চিন্তা শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে। এদের হাতে আলো রয়েছে, কিন্তু তারা সে আলো জ্বালায় শত্রুর শিবিরে, এদের মুখে জিহ্বা আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা অন্যের কথা বলে। ডঃ আল্লামা ইাকবালের ভাষায়-

উনহিকা মাহফিল সাঁওয়ার তা হুঁ, চেরাগ মেরি হ্যায় রাত উনকি
উনহিকা মাত্‌লব কাহ্‌রাহা হুঁ, জবাঁ মেরী হ্যায় বাত্‌ উনকি।

অপরের অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হয়ে আমার প্রদীপ দিয়ে আমি তার রাতকে আলোকিত করি, আমি আমার জিহ্বা দিয়ে অপরের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি।

www.pathagar.com

জিহাদ ও যুদ্ধ সমান্তরাল নয়

ইসলামের দুশ্মনগণ আরবী 'জিহাদ' শব্দের অনুবাদ করেছে, Holy war. Religious war পবিত্র যুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধ। এরা বুঝাতে চেয়েছে, আরবী 'কিতাল' শব্দ ও 'হারব্' শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে, 'জিহাদ' শব্দ দিয়েও সেই একই অর্থ প্রকাশ করে। Holy war. Religious war শব্দের মাধ্যমে আরবী জিহাদ শব্দের শত ভাগের একভাগ অর্থও প্রকাশ পায়না। ইংরেজী ভাষা-ই শুধু নয়, পৃথিবীর বুকে এমন কোন ভাষা নেই, যে ভাষার একটি শব্দ দিয়ে আরবী জিহাদ শব্দের পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা যেতে পারে। মহান আল্লাহ্ স্বয়ং এই শব্দ নির্বাচন করেছেন। এই জিহাদ শব্দ যাবতীয় অসৎ ধ্যান ধারণা এবং ক্ষতিকর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইসলামের দুশমনরা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জিহাদ শব্দের অর্থ করেছে Holy war. Religious war. এর বাংলা অর্থ পবিত্র যুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধ। ইংরেজী Holy war শব্দের আরবী হলো 'হারবুম মুকাদ্দাসা'। পবিত্র কোরআন বা হাদীসে কোথাও এ শব্দের ব্যবহার নেই। Holy war শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলো ওরিয়েন্টালিষ্টরা- যখন থেকে তারা ইসলাম সম্পর্কে গ্রন্থ্ রচনা শুরু করে তখন থেকেই তারা এ শব্দটি ব্যবহার করতে থাকে। আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিম হিসেবে পরিচিত পন্ডিত ব্যক্তিগণও ওরিয়েন্টালিষ্টদের অনুরূপই জিহাদ শব্দের অনুবাদ করে বিভ্রান্তির মাত্রা আরো বৃদ্ধি করেছে।

১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসের ১৬ তারিখে টাইম ম্যাগাজিনে একটি আর্টিকেল ছাপা হয় এবং উক্ত আর্টিকেলের মাধ্যমে জানা যায় যে, বিগত দেড় শত বছরে ইসলামের দুশমনরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষাট হাজারের ওপরে বই লিখেছে। সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র বিশ ভাগ হলো মুসলমান। এই বিশ ভাগ মানুষের ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, 'ইসলাম অস্ত্রের শক্তিতে বিস্তৃতি লাভ করেছে।' অধিকাংশ অমুসলিম পন্ডিত সম্পূর্ণ জেনে বুঝেই এ কথা বলেছে যে, 'ইসলামের ইতিহাস থেকে রক্তের গন্ধ আসে।' এসব জ্ঞানপাপীদের সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক Deelecy Wolery তাঁর লিখিত Islam at the Crusade নামক গ্রন্থে সুন্দর কথা বলেছেন, 'ইতিহাসে এ বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, তরবারী হাতে নিয়ে মুসলমানরা পৃথিবীতে ইসলামকে বিস্তৃত করেছে এবং অত্যাচারের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন দেশ জয় করার অদ্ভূত কল্প-কাহিনী নিম্নমানের মিথ্যা ব্যতিত আর কিছুই নয়। তবুও এ মিথ্যা কল্প-কাহিনী বার বার মুখে মুখে ও মুদ্রিত আকারে ছড়ানো হয়েছে।' (পৃষ্ঠা- ৮)

www.pathagar.com

স্পেনের ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলমানরা দীর্ঘ আটশত বছর স্পেন শাসন করেছে। তরবারীর জোরে যদি ইসলাম বিস্তৃত হয়ে থাকে তাহলে সমগ্র স্পেনে একজন অমুসলিমের অস্তিত্বও থাকার কথা নয় এবং সমগ্র স্পেনে অগণিত মসজিদ নির্মিত হতো। খৃষ্টানরা স্পেন দখল করার পরে মুসলমানদেরকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে স্পেন থেকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে এবং প্রকাশ্যে আযান দেয়া দূরে থাক, আল্লাহ্ শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করতে দিতো না। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পরে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে মুসলমানরা মসজিদ নির্মাণ করতে চাইলে বাধা দেয়া হয়। পরবর্তীতে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আদালতের রায় মুসলমানদের পক্ষে এলে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। উক্ত মসজিদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে স্পেনের মাদ্রিদে সেদিন উপস্থিত থাকার সুযোগ দিয়েছিলেন।

মুসলমানরা প্রায় ৮০০ বছর ভারত শাসন করেছে। অস্ত্রের শক্তিতে ইসলামের প্রচার প্রসার হলে ভারতে একজন অমুসলিম এবং একটি মন্দিরেরও অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। বর্তমানে ভারতে ৮০% মানুষ অমুসলিম এবং ৮০% অমুসলিমদের অস্তিত্বই সাক্ষী দিচ্ছে, ইসলাম অস্ত্রের জোরে প্রচার হয়নি। বিগত চৌদ্দশত বছর যাবৎ আরব জাহান মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী সেখানে বর্তমানে প্রায় দেড় কোটি কপটিক খৃষ্টান অর্থাৎ যারা বংশ পরম্পরায় খৃষ্টান– বাস করে। আরব বিশ্বে এই দেড় কোটি খৃষ্টানের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়নি। রিডার্স ডাইজেস্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের সংখ্যা ছিলো ৪৭% আর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সংখ্যা ছিলো ২৩৫%। আমার প্রশ্ন, এখন কোন্ শক্তির বলে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটছে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে বর্তমানে সবথেকে জনপ্রিয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। আমেরিকার টুইনটাওয়ার ধ্বংসের পর মাত্র দুই মাসে সেখানে বিশ হাজার লোক ইসলাম কবুল করেছে। যে ইসলাম ও মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলে প্রচার করা হচ্ছে এবং কোরআনকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অনুপ্রেরণাদাতা, সেই কোরআন সম্পর্কে মানুষের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হলো, কোরআন কিভাবে সন্ত্রাসের অনুপ্রেরণা দেয়, এ বিষয়টি জানতে গিয়ে লোকজন কোরআন পাঠ করে প্রকৃত সত্য জেনে ইসলাম কবুল করলো। সুতরাং ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে যতোই বিভ্রান্তি ছড়ানো হোক, জিহাদ শব্দের যতোই অপব্যাখ্যা দেয়া হোক, প্রকৃত সত্য কখনোই গোপন করা যাবে না। প্রকৃত সত্যের সন্ধানী যারা, তারা জিহাদ শব্দের অর্থ অবশ্যই জানার চেষ্টা করবেন।

www.pathagar.com

জিহাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ হলো, যে কোন উদ্দেশ্যকে সফলতার শীর্ষে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা পরিচালিত করা হয়, এই চেষ্টাকে জিহাদ বলা হয়। অর্থাৎ কোন লক্ষ্যে পৌছার জন্য বা কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অথবা কোন কাজ সমাপ্ত করার জন্য চূড়ান্তভাবে চেষ্টা সাধনা করা। শত্রুতামূলক, আক্রমণাত্মক বা প্রতিহিংসামূলক যুদ্ধের ধারণা থেকে 'জিহাদ' শব্দ সম্পূর্ণ মুক্ত। এই শব্দটিই জানিয়ে দেয়, একজন ঈমানদারের প্রকৃত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবী থেকে যাবতীয় হিংসা বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা, অশান্তি, অত্যাচার, অশ্লিলতা, নোংরামী, জুলুম, অনিষ্ট ইত্যাদী দূরিভূত করা। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য যতটুকু চেষ্টা সাধনা, কর্ম তৎপরতা চালানো প্রয়োজন ততটুকুই সে করবে। সীমা লংঘন সে কোন ক্রমেই করবে না।

মহান আল্লাহ্ বিশ্বনবীর মাধ্যমে যে জীবন বিধান দান করেছেন, সেখানে যুদ্ধের বিধানের পরিবর্তে জিহাদের বিধান দান করা হয়েছে। যুদ্ধ এবং জিহাদ কোনক্রমেই এক জিনিস নয়। যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে প্রতিপক্ষকে চরম শিক্ষা দেয়া, কোন জাতিকে, দেশকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা, তাদেরকে শোষণ করা, বিজিত দেশের অর্থ-সম্পদ লুন্ঠন করে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করা। মোট কথা যুদ্ধের মাধ্যমে এক জাতি আরেক জাতিকে নিজের গোলামে পরিণত করে।

কিন্তু জিহাদের উদ্দেশ্য তা নয়। এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, আল্লাহর প্রভুত্ব যেখানে প্রতিষ্ঠিত নেই, সেখানেই যাবতীয় অশান্তি ফণা বিস্তার করেছে। এই অশান্তির মূলোৎপাটন করার লক্ষ্যেই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এই লক্ষ্যে পরিচালিত চেষ্টা-সাধনাকেই জিহাদ বলে। এই চেষ্টা সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে যদি অস্ত্র ধারণ করতে হয়, তবে সে পথই ইসলাম নির্দেশিত উপায়ে অবলম্বন করতে হয়। ইসলাম মুসলিম ব্যক্তিকে ইসলামের যাবতীয় বিধানের প্রতি স্বীকৃতি দিয়ে সেই বিধান অনুসারে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন-যাপনের আদেশ দিয়েছে।

ইসলামী বিধানের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে যে পথে, যে কোন পদ্ধতিতে, প্রক্রিয়াতে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা অতিক্রম করে লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসর হওয়ার জন্য ঈমানদারকে আদেশ দান করেছে। এ পথে ঈমানদারের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে তাঁর নিজের নফ্স, শয়তান, পরিবারের কোন সদস্য, সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি, দেশীয় ও সমাজের আচার-প্রথা, ধর্মের নামে প্রতিষ্ঠিত কোন শক্তি, রাজনৈতিক শক্তি, প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তি, এসব শক্তির বিরুদ্ধেও ঈমানদারকে জিহাদ করতে হয়।

www.pathagar.com

ইসলামী আদর্শকে নিজের জীবনের একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ বলে ঘোষণা দিয়ে সেই আদর্শ অনুসারে জীবন পরিচালনা করাকে যারা অপরাধ মনে করে, ইসলামের কিছু বিধান পালন করার ব্যাপারে কোন আপত্তি করে না এবং কিছু বিধান পালন করতে দেয় না অর্থাৎ খন্ডিত ইসলামকে পালন করার আদেশ দেয়, এই ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিরুদ্ধেও ঈমানদারদেরকে জিহাদ করতে হয়। আর এই জিহাদ করতে হয় আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতি একনিষ্ঠ ঈমান সহকারে এবং একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

এই জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায় সশস্ত্র জিহাদ। অনেকে সশস্ত্র এই জিহাদকে বাহ্যিক দিক দিয়ে যুদ্ধ বলেই ধরে নিয়েছেন, কিন্তু জিহাদ সশস্ত্র পর্যায়ে উপনীত হয়েও এর গোটা কাঠামোটি জিহাদই থাকে, যুদ্ধ বলতে যা বোঝায় সে পর্যায়ে উপনীত হয় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিহাদের সূচনা করেছিলেন, তখন সে সমাজে এবং তদানিন্তন পৃথিবীতে যুদ্ধের ধরন ও গোটা কাঠামো কেমন ছিল, ইসলাম তা পরিবর্তন করে জিহাদের কি ধরনের অবয়ব দান করেছিল, নিম্নের আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সশস্ত্র জিহাদ ও যুদ্ধের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

ইসলাম পৃথিবীতে যুদ্ধের ব্যাপারে কি নীতি প্রবর্তন করেছে আমরা তা সংক্ষেপে আলোচনা করবো। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির যুদ্ধনীতি এবং মুসলমানদের জন্য ইসলাম যে সশস্ত্র জিহাদের নীতি প্রদান করেছে, তার ভেতরে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। আল্লাহ্র রাসূল এমন এক নৈরাজ্যপূর্ণ পরিবেশে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের সূচনা করেছিলেন, যে সময়ে যাবতীয় পাশবিকতা মুখ ব্যাদান করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল। আল্লাহ্র নবী সেই নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। প্রচলিত যুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তন করে দিলেন। যুদ্ধ সম্পর্কে মানুষের সামনে এমন এক আদর্শ উপস্থাপন করলেন, যা ছিল মানুষের কাছে কল্পনার বিষয়।

তিনি মানুষকে এ কথা বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, যুদ্ধ সংঘাত প্রকৃত অর্থেই একটা জঘন্য কর্ম। প্রতিটি মানুষেরই উচিত এসব জঘন্য কর্ম থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে এই পৃথিবীতে যুদ্ধের চেয়েও ভয়ংকর কোন পাপাচার যখন অনুষ্ঠিত হয়, অত্যাচারিতের ক্রন্দন রোল আকাশ-বাতাস বিষাক্ত করে তোলে, অরাজকতা আর বিশৃংখলতায় পৃথিবী কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়, জালিম দাম্ভিক অত্যাচারীর দল পৃথিবীবাসীর জীবন দুর্বিসহ করে তোলে, সাধারণ মানুষের শান্তি এবং নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা রাখে না, তখন একমাত্র সেই অত্যাচারীর বিপর্যয় এবং ধ্বংস থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

এভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করলেও ইসলামে সেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, শত্রুকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া বা তার মারাত্মক কোন ক্ষতি করা। বরং উদ্দেশ্য হলো, সে যে ধ্বংস সাধন করছে, অত্যাচার করছে, মানুষের ক্ষতি করছে, অর্থাৎ তাকে ক্ষতিকর কর্ম থেকে বিরত রাখা। এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) যুদ্ধে এই নীতি প্রবর্তন করলেন যে, যুদ্ধে ঐ পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করাই বৈধ, যতটা শক্তি প্রয়োগ করলে অত্যাচার বন্ধ হবে, অনিষ্ট বন্ধ হবে, বিপর্যয় রোধ করা যাবে, যাবতীয় বিশৃংখলা রোধ করা যাবে। যুদ্ধে কোন ক্রমেই বাড়াবাড়ি করা যাবে না। যুদ্ধে সীমিত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

আর এই সীমিত শক্তিও প্রয়োগ করা যাবে শুধু মাত্র তাদের বিরুদ্ধে যারা অত্যাচারীকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে এবং যেসব শক্তি ক্ষতিকর। এর বাইরে সমস্ত জনশক্তি যুদ্ধের আওতা মুক্ত থাকবে, যুদ্ধের প্রভাব মুক্ত থাকবে। শত্রুর যে সব ধন-সম্পদ বা বস্তুর সাথে কোন ধরণের সম্পর্ক থাকবে না বা নেই, সে সব ধন-সম্পদ বা বস্তুর ওপরে কোন ধরণের আক্রমণ করা যাবে না। আক্রমণের লক্ষ্য হতে হবে একমাত্র শত্রু।

তদানীন্তন আরবদের কাছে যুদ্ধ ছিল জাতীয় একটা পেশা স্বরূপ। দৈনন্দিন জীবন যাপনের যে উপায়-উপকরণের প্রয়োজন, এ সবের মারাত্মক অভাব ছিল তাদের। এ ছাড়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত কোন আইন-কানুনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সামাজিক শৃংখলাবোধ এবং সমাজে পরস্পরে ছিল না কোন ঐক্য। এ সমস্ত কারণে তাদের মধ্যে দাঙ্গা, মারামারি, হত্যা, খুন-রক্তপাত এবং অপরের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার প্রবণতা গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল। কে কোথায় তাদের পশু চরাবে, এই পশু চারণ ক্ষেত্রের দখল সত্ব নিয়েও তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত।

এই যুদ্ধ কোন কোন সময় শত বছর ধরেও চলতো। প্রথমে যার সাথে যুদ্ধ শুরু হত, সে ইন্তেকালের পূর্বে তার উত্তরাধিকারীকে নির্দেশ দিয়ে যেত–অমুক গোত্রের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। এভাবে যুদ্ধের ধারাবাহিকতা চলতে চলতে শেষ পর্যায়ে যারা যুদ্ধ করতো, তারা বোধহয় জানতোও না, কেন তারা এই প্রাণক্ষয়ী যুদ্ধ করছে। এই যুদ্ধের কারণে প্রতিশোধ পরায়নতা,সহিংসতা, নির্মমতা, হিংস্রতা ও প্রতিহিংসা তাদের চরিত্রে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। পরিবারে পরিবারে, গোত্রে গোত্রে বছরের পর বছর ধরে হিংস্রতা ও যুদ্ধ চলতো। প্রতিপক্ষকে যে কোন উপায়ে ধ্বংস করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। মনের হিংস্র জিঘাংসা বৃত্তি নিবৃত্ত করার জন্য প্রতিপক্ষকে অত্যন্ত পৈশাচিকভাবে নির্যাতন করা হত।

ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষমতা ও শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেও যুদ্ধ শুরু করা হত। এ যুগে প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সন্ত্রাসীরা যেভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সে যুগেও

www.pathagar.com

তাই করা হত। এভাবে রক্তের নদী বইয়ে দেয়া হত। আরবের কবিগণ কাব্যে তাদের যুদ্ধংদেহী মানসিকতা ফুটিয়ে তুলতো।

সে যুগের আরব কবিদের কবিতা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় আরবদের রক্তের সাথে যুদ্ধ, দাঙ্গা, রক্তপাত জড়িয়ে ছিল। যুদ্ধের নামে তারা লোমহর্ষক কান্ড ঘটাতো। সংঘর্ষমুখর ছিল তাদের জীবন। যুদ্ধ তাদের কাছে এত প্রিয় ছিল যে, তারা বিশ্বাস করতো যে ব্যক্তি শত্রুর আঘাতে যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুবরণ করে না, বাড়িতে রোগ ভোগ করে মারা যায়, তার প্রাণবায়ূ নির্গত হয় নাক দিয়ে। আর যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর আঘাতে মারা গেলে তার প্রাণবায়ু নির্গত হয় ক্ষতস্থান দিয়ে। এ কারণে নাক দিয়ে প্রাণ বের হবে-এটা ছিল তাদের কাছে লজ্জার বিষয়। তাদের কবিরা গর্বভরে বলতো-'আমাদের কোন নেতা কোন দিন নাক দিয়ে মরেছে এ কথা কেউ বলতে পারবে না।'

যুদ্ধের আহ্বান শোনা মাত্র অস্ত্র হাতে ছুটে বের হওয়া আরবদের কাছে বড়ই মর্যাদার বিষয় ছিল। কার সাথে যুদ্ধ এবং কি কারণে যুদ্ধ করতে হবে-এ প্রশ্ন কেউ করতো না। এ প্রশ্ন উঠানো ছিল ভীরুতার নিদর্শন। কেউ এ প্রশ্ন উঠালে চারদিক থেকে তাকে ধিক্কার দেয়া হত। আরবের এক কবি বলেছেন- বনী মাজেন গোত্রের মানুষ এমনই শ্রেষ্ঠ বীর যে,.তাদের কোন ভাই কোন গোত্রের মানুষের হাতে প্রহৃত হলে বা অপমানিত হয়ে সাহায্যের আবেদন করলে তারা কোন প্রশ্ন না করেই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিত। আমার গোত্র এমনই ভীরু যে তারা যুদ্ধ করে সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারে না। কারো উট বা ঘোড়া ছিনিয়ে নিতে পারে না। আফসোস! কেন যে আমি এমন এক গোত্রে জন্ম গ্রহণ করলাম না, যে গোত্র লুটতরাজ করতে আর যুদ্ধ করতে জানে !'

রাতে বা দিনে হঠাৎ কোন জনগোষ্ঠীর ওপরে আক্রমণ করে তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে, সহায়-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া এবং নারীদেরকে ধরে এনে ভোগ করা, এটাই ছিল তাদের কাছে জীবিকা অর্জনের প্রিয় পথ এবং গৌরবের বিষয়। ছিনতাই করা অর্থ-সম্পদ তাদের কাছে ছিল সবচেয়ে পবিত্র সম্পদ। তারা যখন যুদ্ধে বের হত তখন তাদের ঘরের স্ত্রীগণ স্বামীদের কাছে থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতো যে, তারা কেউ শুন্য হাতে ফিরে আসবে না। সুন্দরী কুমারী মেয়েদের ধরে এনে তারা ভোগ করতো। যে যুদ্ধে কোন সম্পদ লাভ হত না, আরব বুদ্ধিজীবীদের কাছে তা ছিল ব্যর্থ যুদ্ধ।

অযথা তারা নিজেদের সাহসিকতা প্রচারের জন্যও যুদ্ধ শুরু করে দিত। একজনের পশুচারণ ভূমিতে আরেকজনের পশু চরতে দিত না, যে কূপ থেকে সে পানি নেয় অন্যজনকে সে কূপ থেকে পানি দিত না। একজন যেখানে বসবাস করছে তার আশেপাশে কাউকে বসবাস করতে দিত না।

www.pathagar.com

সে যে পোশাক পরবে তেমন পোশাক আর কেউ পরতে পারবে না। তার সামনে একমাত্র তার প্রশংসা করা ছাড়া আর কারো প্রশংসা করা যাবে না। সে যাকে ইচ্ছা হত্যা করবে প্রতিবাদ করা যাবে না। তাকে সেবা-যত্ন করার ব্যাপারে কেউ অনিহা দেখাতে পারবে না। কেউ তার সামনে মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারবে না। এসবের ব্যতিক্রম হলেই যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠতো। গোটা আরবে সে সময়ে যতগুলো বড়বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার সবগুলোই হয়েছে আভিজাত্যবোধের প্রতিযোগীতার ফসল হিসাবে।

বনু বকর এবং বনু তাগলাব গোত্রের মধ্যে যে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল তা অতি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বনু তাগলাব গোত্রপতি কুলাইব ইবনে রাবিয়ার পশুচারণ ভূমিতে বনু বকর গোত্রের এক অতিথির উট হঠাৎ করে প্রবেশ করেছিল। কুলাইব লোকটা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির ছিল। সে তার কূপ থেকে কাউকে পানি নিতে দিত না। তার পশুচারণ এলাকায় অন্য কারো পশু চরতে দিত না। সে যেখানে শিকার করতো অন্য কাউকে সেখানে শিকার করতে দিত না। তার উটের সাথে অন্য কারো উটকে সে পানি পান করতে দিত না। সে যেখানে আগুন জ্বালাতো তার আগুনের সামনে অন্য কাউকে আগুন জ্বালাতে দিত না।

তার উটের সাথে অন্যের উটকে দেখে সে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে ঐ উটের স্তন লক্ষ্য করে তীর ছুড়লো এবং সে তীর যথাস্থানে বিদ্ধ হলো। উটের মালিক তা দেখে আর্তনাদ করে উঠলো। সে নীরব না থেকে কেন আর্তনাদ করলো–এটাই তার অপরাধ। কুলাইব রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। এই সুযোগে একজন আরেকজনকে হত্যা করলো-শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। উভয় গোত্র নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ থামেনি।

ঘোড়ার দৌড়ের প্রতিযোগীতা নিয়ে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তা চলেছিল প্রায় ৫০ বছর ধরে। বনূ আবসের গোত্রপতি কায়েস ইবনে যোহায়েরের কাছে দাহেস ও আবরা নামে দুটো ঘোড়া ছিল। গোটা আরবে এই ঘোড়া দুটোর দৌড়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সুনাম ছিল। বনু বদরের গোত্রপতি হুজাইফা ইবনে বদরের কাছে বিষয়টা ভীষণ অসহ্য বোধ হলো। তারই মত আরেকজন গোত্রপতির ঘোড়া দ্রুতবেগে ছুটবে, এটা সে সহ্য করতে না পেরে এক চুক্তি করলো, তার ঘোড়ার সাথে কায়েসের ঘোড়ার প্রতিযোগিতা হবে। যে বিজয়ী হবে সে ১০০ উট পুরস্কার পাবে। প্রতিযোগিতায় কায়েসের ঘোড়া এগিয়ে যাচ্ছে দেখে হোজাইফার এক লোক কায়েসের ঘোড়ার মুখে আঘাত করলো। সাথে সাথে কায়েস হত্যা করলো হুজাইফার সন্তানকে। হুজাইফা হত্যা করলো কায়েসের ভাইকে। বেধে গেল যুদ্ধ। উভয় গোত্রের উট আর ঘোড়া নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ থামেনি। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল।

www.pathagar.com

পারস্পরিক হিংসা এবং ক্ষমতার অহংকারের কারণে আউস এবং খাজরাজ গোত্রের মধ্যে ১০০ বছর ধরে যুদ্ধ চলেছিল। খাজরাজ গোত্রের দলীয় প্রধান ছিল মালিক ইবনে আজলা। তার একভক্ত বনু কায়নুকার বাজারে অহংকার করে বলেছিল, খাজরাজ দলপতি মালিক ইবনে আজলা সবচেয়ে সম্মানিত এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তার এই কথা শুনেই আউস গোত্রের একজন তাকে হত্যা করে। তারপর তাদের মধ্যে এমন যুদ্ধ শুরু হলো যে, ইসলামের আগমন না ঘটলে এই যুদ্ধ যে আরো কত বছর চলতো আল্লাহই জানেন। ১০০ বছর পূর্ণ হলে নবী করীম (সাঃ) এই যুদ্ধ থামিয়ে দেন।

উকাজের মেলায় কেনানা গোত্রের বদর ইবনে মাসার উঠের পিঠে বসে তার পা দুটো সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষনা করলো, 'আমিই হচ্ছি গোটা আরবের ভেতরে সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ। আমি আহবান করছি, কেউ যদি আমার চেয়ে নিজেকে সম্মানিত মনে করে তাহলে সে যেন আমার পায়ে আঘাত করে।'

তার এই কথা শুনে বনু দাহমান গোত্রের একজন যুবক এসে তার পায়ে তরবারী দিয়ে আঘাত করলো। শুরু হয়ে গেল দুই গোত্রে যুদ্ধ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছিল কুখ্যাত ফুজ্জার যুদ্ধ। প্রথম এই ফুজ্জার যুদ্ধে দুই গোত্রের মিত্রপক্ষও পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, আরবে শেষ ফুজ্জার যুদ্ধের মত ভয়ংকর যুদ্ধ আর ঘটেনি। নবী করীম (সাঃ) এর পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার প্রায় ছাব্বিশ বছর পূর্বে হিরার বাদশা নোমান ইবনে মুনজের তার দেশ থেকে একটা বানিজ্য বহর উকাজের মেলায় প্রেরণ করার সময় আরবের এক গোত্রপতিকে বলেছিল– এই কাফেলার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে ? কানানা গোত্র প্রধান বারাদ ইবনে কায়েস বললো– আমি আমার গোত্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দিচ্ছি।

হাওয়াজের গোত্রের এক দলপতি উরয়াহ ঘোষনা করলো– আমি গোটা আরবের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করছি। কানানা গোত্রের বারাদ ঐ গোত্রের কথাটা সহ্য করতে পারলো না। উরয়াহ কাফেলা নিয়ে যাত্রা শুরু করার পরে পথে বারাদ তাকে হত্যা করলো। শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। দুই গোত্রে এমন যুদ্ধ বেধে গেল যে, উভয় পক্ষের মিত্রশক্তি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই ভয়ংকর যুদ্ধ আরবের অতীত যুদ্ধ সমূহকে ম্লান করে দিয়েছিল।

আরবদের বিশ্বাস ছিল, কেউ কাউকে হত্যা করলে সেই হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে নিহত ব্যক্তির আত্মা সাদা রংয়ের পাখি হয়ে পাহাড়-পর্বতে উড়তে

www.pathagar.com

থাকে আর বলতে থাকে– আমাকে পান করাও! আমাকে পান করাও! আবার কারো ধারণা ছিল, যে ব্যক্তি নিহত হয় তার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করলে সে ঐ জগতে জীবিত থাকে। আর প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে ঐ জগতে সে মরে যায়।

আবার কারো ধারণা ছিল, হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে নিহত ব্যক্তির কবর অন্ধকারে ছেয়ে থাকে। প্রতিশোধ গ্রহণ করা হলে তার কবর আলোকিত হয়। এই সমস্ত অমূলক বিশ্বাসের কারণে যুদ্ধের আগুন কখনো নির্বাপিত হয়নি।

যুদ্ধে যারা পরাজিত হত, তাদের মা-বোনদের সতীত্ব লুণ্ঠিত হতো বিজয়ী পক্ষের হাতে। প্রতিপক্ষকে ধরে তারা জীবন্ত পুড়িয়ে দিত। ইয়েমেনের বাদশাহ জুনওয়াছ তার দেশের অসংখ্য মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। ইমরুল কায়েছের ছেলে মুনজের ওয়ারা যুদ্ধে বন্দী নারীদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল। আমর ইবনে মুনজের তার একটা ভুলের কারণে প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে মান্নত করেছিল সে তার প্রতিপক্ষ বনু দারেম গোত্রের একশত লোককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করবে। তারপর সে তার দলবল নিয়ে ঐ গোত্রের ওপরে হামলা করে তাদের ৯৯জন লোককে গ্রেফতার করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে থাকে। সে সময় তার পাশ দিয়ে অন্য এক গোত্রের লোক যাচ্ছিল। তাকে ধরে সে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে তার মান্নত পূর্ণ করে।

যুদ্ধ বন্দীদের ধরে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। ইমরুল কায়েছের ছেলে মুনজের প্রতীজ্ঞা করলো, বন্দীদেরকে হত্যা করতে করতে যখন দেখবো এই পাহাড়ের চূড়া থেকে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত রক্তে লাল হয়েছে তখন হত্যা বন্ধ করবো। এভাবে কয়েক শত মানুষকে হত্যা করেও যখন পাহাড়ের নিচের অংশ রক্তে লাল হলো না তখন সে পাহাড়ের চূড়ায় রক্তের ওপরে পানি ঢেলে দিল। এরপর রক্তের সাথে পানি মিশে গড়িয়ে পাহাড়ের পাদদেশে নেমে আসে। ইমরুল কায়েছের পিতা হাজার ইবনে হাসে কয়েক শত যুদ্ধ বন্দীকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছিল।

প্রতিপক্ষকে ধরে তার হাত পা কেটে, চোখ উপড়ে কান কেটে উত্তপ্ত মরুভূমির ওপরে ফেলে রাখা হত। তাদের দেহ শিয়াল শকুন দিয়ে ভক্ষণ করানো হত। প্রতিপক্ষের মৃত দেহকে নানাভাবে বিকৃত করা হত। তাদের কান কেটে জুতার নিচে লাগিয়ে তা ব্যবহার করা হত। শত্রুকে হত্যা করে তার মাথার খুলিতে মদ পান করা হত। গর্ভবতী নারীর পেট চিরে সন্তান বের করে হত্যা করা হত।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে আরবদের কাছে যুদ্ধ ছিল তাদের আয় রোজগারের সর্বোত্তম মাধ্যম। মোট কথা, আরবদের কাছে যুদ্ধ ছিল তাদের পেশার

www.pathagar.com

মত। যুদ্ধহীন জীবন তাদের কাছে ছিল এক অকল্পনীয় বিষয়। এর কারণ হিসাবে ঐতিহাসিক এবং গবেষকবৃন্দ বলেছেন, তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্বাহের উপায়-উপকরণের দৈন্যতা, অর্থ-সম্পদ উপার্জন ক্ষেত্রের স্বল্পতা এবং সর্বোপরি তাদের সমাজে ঐক্য, সামাজিক আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত না থাকা।

এ ধরণের নানাবিধ কারণে তাদের রক্তের শিরায় শিরায় যুদ্ধ যেন মিশে ছিল। কারণে বা অকারণে যুদ্ধ, রক্তপাত, নরহত্যা এবং লুটতরাজ করা তাদের কাছে সম্মান ও মর্যাদার বিষয় হিসাবে পরিগণিত হত। ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন, চারণভূমিতে পশু চরানোর দখলদারী এবং নিজেদের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবৃত্তির জন্য প্রথমে যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল। এই ধরণের যুদ্ধ তাদের ভেতরে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হত ফলে তাঁরা যুদ্ধে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল। এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কারণে অকারণে যুদ্ধে জড়িত থাকার কারণে তাঁরা নররক্ত দর্শনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের চরিত্রে কল্পনাতীত পাশবিক বৈশিষ্ট্য সমূহ প্রকাশ পেয়েছিল।

যুদ্ধ সম্পর্কে নিজেদের ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তা-কল্পনাকে সার্থকভাবে প্রস্ফুটিত করার জন্য তাঁরা উপযুক্ত পরিভাষা, দৃষ্টান্ত, উপমা এবং রূপক-প্রতিকী শব্দ চয়ন করতো। যেমন ওয়াগা, মাগদাবাতুন, শাররুন, রওউন, হারব, ইহরাব, কারিহাতুন, মাহরুব, তাহরীব, হিয়াজ, হারিবা, হারাব ইত্যাদী শব্দ দ্বারা তাঁরা যুদ্ধকেই বুঝাতো। আরবের কাব্যেও যুদ্ধ সম্পর্কে নানা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

সাধারণত যুদ্ধ সম্পর্কে মানুষের মন-মস্তিষ্কে যে ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং এখন পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষের মধ্যে রয়েছে, যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলামের আদর্শ ও জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায় তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এসব ধারণার সাথে ইসলামী আদর্শের কোন রূপ সামঞ্জস্যতা নেই। নবী করীম (সাঃ) যে যুগে এসেছিলেন সে যুগে যুদ্ধের নানা পরিভাষা প্রচলিত ছিল। সেসব পরিভাষার অর্থও ছিল বড় বিচিত্র। এখানে কতকগুলো পরিভাষার উল্লেখ করছি।

আগুনঃ সে সময়ে আগুন শব্দ দিয়ে যুদ্ধকে বুঝানো হত।

বেষ্টনীঃ এই বেষ্টনী শব্দ দিয়েও তারা যুদ্ধকে বুঝাতো।

যাঁতা বা চাকিঃ যাঁতা বা চাকি শব্দ দিয়েও যুদ্ধের কথা বলা হত।

ওয়াগাঃ এই ওয়াগা শব্দের অর্থ হলো গোলযোগ করা। তারা ওয়াগা শব্দ যুদ্ধের পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার হত।

মাগদাবাতুনঃ এই শব্দের অর্থ হলো ক্রোধ বা অসন্তুষ্টি। এটাও যুদ্ধের একটা পরিভাষা।

www.pathagar.com

শাররুনঃ এ শব্দের অর্থ হলো অন্যায় বা খারাপ। এ শব্দটিও যুদ্ধের পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার হত।

কারিহাতুনঃ এ শব্দের অর্থ হলো কঠোরতা। এটাও যুদ্ধের একটা পরিভাষা।
রওউনঃ এর অর্থ হলো আতংক, এটা যুদ্ধের একটা পরিভাষা।

হিয়াজঃ এর অর্থ হলো আক্রোশ, এটাও যুদ্ধের একটা পরিভাষা।

এহরাবঃ এর অর্থ হলো দুশমনের ধন-সম্পদ লুঠ করার লক্ষ্যে কোন ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শন করা এবং এ শব্দটিও যুদ্ধের পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার হত।

হারবঃ এ শব্দের অর্থ হলো যুদ্ধ, আভিধানিক অর্থ হলো রাগান্বিত হওয়া।

মাহরুবঃ এর অর্থ হলো, যার ধন-সম্পদ লুঠ হয়েছে। এটাও যুদ্ধের একটা পরিভাষা।

তাহরিবঃ এ শব্দের অনেকগুলো অর্থ। এর মধ্যে একটা অর্থ হলো, অস্ত্র ধার দেয়া। এ শব্দটিও যুদ্ধের পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার হত।

হারিবাঃ এই শব্দের অর্থ হলো, যুদ্ধের সময় যে সমস্ত সম্পদ দখল করা হয় বা লুঠ করা হয় এবং এ শব্দটিও যুদ্ধের পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার হত।

হারাবঃ অন্যায়ভাবে কারো ধন-সম্পদ হস্তগত করা বা লুঠ করে নেয়া। এটাও যুদ্ধের একটা পরিভাষা। এ ধরণের বহু শব্দ যুদ্ধের প্রতীকী শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হত। কারণ তারা যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতো, সে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতো তাদের ভাষার মাধ্যমে। নবী করীম (সাঃ) ইসলামের যুদ্ধ নীতির ব্যাপারে তদানিন্তন পৃথিবীতে প্রচলিত একটি ভাষাকেও গ্রহণ করেননি।

মহান আল্লাহ্ তাঁকে শিখিয়ে দিলেন 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে জিহাদ। কারণ ইসলামে যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ, 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' এই শব্দের মধ্যেই সেই উদ্দেশ্য নিহিত। এই শব্দের মধ্যে দিয়েই নবী করীম (সাঃ) এর সকল যুদ্ধের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামের প্রকৃত ধারণা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মধ্যেই প্রবিষ্ট করা হয়েছে। জিহাদ আরবী শব্দ এবং 'জাহ্দাহ' শব্দ থেকে জিহাদ শব্দের উৎপত্তি। জাহ্দাহ্ শব্দের অর্থ হলো, চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, উদ্যমী হওয়া। যদি কোনো ছাত্র পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য চেষ্টা বা পরিশ্রম করে, তাহলে তাকে বলা যেতে পারে, ছাত্রটি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের আশায় জিহাদ করেছে। চাকরী পাবার জন্য কেউ যদি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় তাহলে তাকেও বলা হবে, লোকটি চাকরী লাভের জন্য জিহাদ করেছে। ভোট প্রার্থী যদি ভোট পাবার আশায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় তাহলে বলতে হবে, লোকটি

www.pathagar.com

নির্বাচনে বিজয়ী হবার জন্য জিহাদ করেছে।

আরবী অভিধান অনুযায়ী জিহাদ অর্থ কারো অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই- সংগ্রাম করা। আর জিহাদ শব্দের অর্থ হলো, চেষ্টা করা, সাধনা করা বা কোনো লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য বা কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অথবা কোনো কাজ সমাপ্ত করার জন্য চূড়ান্তভাবে চেষ্টা সাধনা করা। শক্রতামূলক, আক্রমণাত্মক বা প্রতিহিংসামূলক যুদ্ধের ধারণা থেকে 'জিহাদ' শব্দ সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইসলামে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য যুদ্ধের কোন অবকাশ নেই। নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করার কোন অবকাশ নেই। ইসলামে যুদ্ধ হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এই যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভেতরে নিজের বীরত্ব প্রকাশ, ব্যক্তিগত স্বার্থের কোন চিহ্ন নেই। কোরআন যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধ করতে আদেশদান করে একজন ঈমানদার মুসলিম যোদ্ধা তাই করে। এ কারণে ইসলাম তার পবিত্র উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধ সম্পর্কিত যাবতীয় আইন রচনা করে দিয়েছে। সে আইনে যুদ্ধের নীতিমালা, যুদ্ধের নৈতিক বিধি-নিষেধ, যোদ্ধাদের অধিকার ও কর্তব্য, সামরিক ও বেসামরিক মানুষদের মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের অধিকার, চুক্তিবদ্ধদের অধিকার, দূত ও যুদ্ধবন্দীদের অধিকার, যুদ্ধে যারা জয়ী হয় তাদের অধিকার সমূহ বিস্তারিত বিধান দান করা হয়েছে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই সশস্ত্র জিহাদের উদ্দেশ্য

নবী করীম (সাঃ) পৃথিবীতে প্রচলিত যুদ্ধের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাতিল করে একটা পবিত্র উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত করলেন। সে সময়ে যুদ্ধের যে পৈশাচিক এবং বিভৎস উদ্দেশ্য ছিল, তিনি তার কবর রচনা করলেন। তিনি এ লক্ষ্যে যোদ্ধাদের চরিত্র সংশোধন করলেন। শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে যুদ্ধের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের চিন্তা চেতনার জগৎ আচ্ছন্ন করেছিল, এ কারণে নবী করীম (সাঃ) সর্বপ্রথম চিন্তার পরিশুদ্ধি ঘটালেন।

ব্যবহারিক জীবনে বিপ্লব ঘটানোর পূর্বে মানুষের চিন্তার জগতে সর্বপ্রথম বিপ্লব ঘটানো হলো। যা ছিল মানুষের চেতনার অতীত, তাই বাস্তবে করে দেখানো হলো। যুদ্ধের বিষয়টি মানুষের বুদ্ধির অগম্য ছিল যে, যুদ্ধ যদি নিজের ক্ষমতা প্রকাশের জন্য না হয়, যুদ্ধ যদি কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য না হয়, যুদ্ধ যদি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য না হয়, যুদ্ধ যদি ধন-সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে না হয়, যুদ্ধ যদি সম্মান প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে না হয় তাহলে কেন নিজের প্রাণকে বিসর্জন দিয়ে এই যুদ্ধ করা হবে?

www.pathagar.com

এ সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে এক বিশাল মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুদ্ধ পরিচালিত হতে পারে তা ছিল মানুষের চিন্তা চেতনা, ধারণা কল্পনারও অতীত বিষয়। একটা অদৃশ্য স্বার্থের কারণে, অদেখা স্বার্থ অর্জনের জন্য নিজের প্রাণ কোরবান করা ঐ জাতির জন্য কোন সামান্য ব্যাপার ছিল না, যাদের কাছে প্রাণ কোরবান করার অর্থই ছিল ধন-সম্পদ অর্জন বা ক্ষমতার প্রকাশ ঘটানো বা প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা। অথচ সেই মানুষগুলোকেই নবী করীম (সাঃ) পবিত্র কোরআন দিয়ে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করলেন যে, তাদের কাছে গোটা পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদের তুলনায় অদেখা আখেরাতের স্বার্থ সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে উদ্দেশ্যে তাঁরা নিজের প্রাণ পর্যন্ত দান করতো।

নবী করীম (সাঃ) ঈমানদারদেরকে আল্লাহর পথে জিহাদের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জিহাদ করতে বলেছেন তা তাদের মন-মগজে প্রবিষ্ট করলেন। এ সম্পর্কে একটা হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত মুসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'কোন একজন লোক এসে নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! একজন যুদ্ধ করে সম্পদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে, একজন যুদ্ধ করে প্রশংসা এবং খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে, একজন যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের লক্ষ্যে। এদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করলো?' নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বললেন, 'যে ব্যক্তি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তথা তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে সেই ব্যক্তিই কেবল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।' (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'একজন লোক দরবারে নববীতে এসে জানতে চাইলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করে প্রতিহিংসার কারণে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে। কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করে তাদের জাতিয় আভিজাত্য প্রকাশের লক্ষ্যে। কিন্তু আল্লাহর পথে যুদ্ধ কি ধরণের যুদ্ধ?' আল্লাহর রাসূল তাঁকে জবাব দিলেন, 'যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে তাঁর যুদ্ধই হলো আল্লাহর পথের যুদ্ধ।'(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, 'আরেকজন লোক নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসে জানতে চাইলো–হে আল্লাহর নবী! যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ বৃদ্ধি এবং প্রশংসা লাভের জন্য যুদ্ধ করে, এমন লোক সম্পর্কে আপনার মতামত কি? সে কি সওয়াব লাভ করবে? নবী করীম (সাঃ) লোকটিকে জানালেন– এমন ধরণের লোক কোন সওয়াব অর্জন করবে না।'

www.pathagar.com

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহর নবীর উত্তর শোনার পরে প্রশ্নকারী অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। তারপর লোকটি চলে গেল এবং পুনরায় এসে ঐ একই প্রশ্ন করলো। আল্লাহর নবী তাকে পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন। এভাবে লোকটি চারবার এসে ঐ একই প্রশ্ন করেছিল। শেষের বার নবী করীম (সাঃ) লোকটিকে বলেছিলেন, 'শোন, যতক্ষণ কোন কাজ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা না হয়, ততক্ষণ সে কাজ আল্লাহ কবুল করেন না।' (বুখারী)

হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) একদিন বললেন– কোন মানুষ আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সে এই যুদ্ধ থেকে তাঁর উটকে বাঁধার জন্য একটি রশি সংগ্রহ করবে। সে ব্যক্তি শুধু ঐ রশিই লাভ করবে, কোন সওয়াব লাভ করবে না।

মুসিলম জীবনের প্রতিটি কর্ম অনুষ্ঠিত হতে হবে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। সে যুদ্ধ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং যুদ্ধ থেকে বিরতও থাকবে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য। নবী করীম (সাঃ) বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কর্ম একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সম্পাদন করা না হয় ততক্ষণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা কবুল করেন না।'

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, 'যুদ্ধ দুই ধরনের হয়। প্রথম ধরনের যুদ্ধ হলো, একজন কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে এবং নেতার আনুগত্য করে। নিজের উত্তম ধন-সম্পদ সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং কোন ধরনের বিশৃংখলতা সৃষ্টি করে না। সে জেগেই থাক বা ঘুমিয়েই থাক, সওয়াব সে অর্জন করবে।'

আরেক ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে, সুনাম ও প্রশংসা অর্জন করতে চায়, নেতার আদেশ পালন করেনা। পৃথিবীতে বিশৃংখলতা সৃষ্টি করে। সে কেবলমাত্র শাস্তি ব্যতীত আর কিছুই ভোগ করতে পারবেনা।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'একদিন নবী করীম (সাঃ) বললেন, কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির বিচার করা হবে। তার ভেতরে প্রথম ঐ ব্যক্তির বিচার করা হবে, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে নিজের প্রাণদান করেছিল। বিচারের জন্য নিয়ে আসা হলে তাকে মহান আল্লাহ তাঁর দেয়া অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সে ব্যক্তি তার স্বীকৃতিদান করবে। এরপর মহান আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন, 'তুমি আমার জন্য কোন কাজ করেছো?

লোকটি জবাব দিবে, 'আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণদান করেছি।' মহান আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছো, তুমি যুদ্ধ করেছিলে

www.pathagar.com

বীরত্ব প্রকাশের জন্য মানুষ যেন তোমাকে বীর হিসেবে আখ্যায়িত করে, তোমার প্রশংসা করে। তুমি তোমার উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করেছো। এসব কথা বলে আল্লাহ্ নির্দেশদান করবেন, একে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'কিয়ামতের দিন একজন মানুষ আরেকজন মানুষের হাত ধরে আল্লাহর সামনে এনে বলবে, হে আল্লাহ! এই লোক আমাকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, তুমি তাকে কেন হত্যা করেছিলে? লোকটি জবাব দেবে, আমি তাকে হত্যা করেছিলাম যেন প্রভুত্ব আপনারই জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাকে হত্যা করেছিলাম। আল্লাহ্ বলবেন, হ্যাঁ, প্রভুত্ব আমারই।

এরপর আরেকজন লোক আরেকটি লোকের হাত ধরে নিয়ে আসবে। আল্লাহর দরবারে আবেদন করবে, হে আল্লাহ! এই লোক আমাকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি কেন তাকে হত্যা করেছিলে? লোকটি জবাব দিবে, আমি কোন একজনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে হত্যা করেছিলাম। আল্লাহ্ বলবেন, প্রভুত্ব শুধু আমারই। অন্য কারো প্রভুত্ব নেই। তারপর তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে শাস্তিদান করা হবে।'

নবী করীম (সাঃ) ঈমানদারদেরকে যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখিত শিক্ষা এবং ধ্যান ধারণা দান করেছিলেন। এ সব শিক্ষার কোথাও নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এসব শিক্ষা মানুষের মন থেকে যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্বের প্রতিষ্ঠিত সব ধরণের ধ্যান ধারণা চিন্তা চেতনা মুছে দিয়েছিল। যুদ্ধ করে গণিমতের সম্পদ অর্জন, বীরত্ব অর্জন, প্রশংসা অর্জন, যুদ্ধের মাধ্যমে ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ বা জাতিগত শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ তথা পার্থিব যাবতীয় উদ্দেশ্যই নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছিল।

পার্থিব কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধ করা আল্লাহর রাসূল বৈধ করেননি। এসব স্বার্থকে যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরে শুধু অবশিষ্ট ছিল, পার্থিব স্বার্থের স্বাদ গন্ধহীন আখেরাতের সেই অদৃশ্য স্বার্থ। এই স্বার্থ অর্জনের জন্য যুদ্ধের ফলে কোন ধরণের বিশৃংখলা বা কোন মারাত্মক ধ্বংস সাধন হবে এমন চিন্তাই করা যায় না। এমনকি শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলেও তখনই সশস্ত্র জিহাদ করা যাবে, যখন অস্ত্র ধারণ না করলে পরিস্থিতি বিপজ্জনক হবার নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এ কারণে নবী করীম (সাঃ) যুদ্ধকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি ঈমানদারদেরকে শিক্ষাদান করেছেন, 'শত্রুর সাথে মোকাবেলা যেন করতে না হয় তোমরা এই

www.pathagar.com

কামনা করো। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে শান্তির জন্য দোয়া করতে থাকো। কিন্তু যদি শত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে তোমরা বাধ্য হও, তাহলে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করো। জেনে রেখো, আল্লাহর জান্নাত অবস্থান করছে তরবারীর ছায়ার নীচে।'

সশস্ত্র জিহাদ সম্পর্কে বিশ্বনবীর আদর্শ স্পষ্ট হয়ে গেল। যুদ্ধ অত্যন্ত খারাপ জিনিষ। কারো পক্ষেই যুদ্ধ কামনা করা উচিত নয়। আল্লাহর রাসুল জানিয়ে দিলেন, যুদ্ধ যেন করতে না হয় আল্লাহর কাছে এমন দোয়া করো। কিন্তু নরপিশাচের দল যদি তোমাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্যই করে, তাহলে তাদের সাথে এমনভাবে যুদ্ধ করবে যেন তারা তাদের অত্যাচারের হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। যে অশান্তি তারা সৃষ্টি করছে, তা যেন আর করতে না পারে। আর এই যুদ্ধ করতে গিয়ে তুমি যদি শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে প্রাণদান করো, তাহলে মনে রেখো, শত্রুর ঐ অস্ত্রের নীচেই তোমার জন্য রয়েছে আল্লাহর জান্নাত। অত্যাচারী জালিমের জুলুমকে স্তব্ধ করতে যেয়ে তাদের অস্ত্রের আঘাতের ভয়ে পালিয়ে এসো না।

সশস্ত্র জিহাদের এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ সৈনিকদের আচরণ যুদ্ধের ময়দানে কি ধরণের ছিল এ সকল বিবরণে ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ। যুদ্ধের ময়দানে শত্রু পক্ষের বুকের ওপর হযরত আলী (রাঃ) উঠে বসেছেন। ক্ষণিকের মধ্যে তিনি তাঁর তীক্ষ্মধার তরবারী শত্রুর বুকে প্রবিষ্ট করাবেন। পতিত শত্রু আলী (রাঃ) এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করলো। তিনি শত্রুকে হত্যা না করে তাকে ছেড়ে দিলেন।

বিস্ময়ে বিমূঢ় শত্রু উঠে দাঁড়িয়ে আলী (রাঃ) এর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অবাক কণ্ঠে জানতে চাইলো, 'আমাকে হত্যা না করে মুক্ত করে দিলে যে?'

তিনি স্থির শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'তোমাকে আমি হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলাম আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। কিন্তু যখন তুমি আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করলে, এরপর যদি তোমাকে আমি হত্যা করতাম আর আল্লাহ্ যদি আমাকে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করতো, আলী! তোমার মুখে লোকটি থুথু নিক্ষেপ করেছিল, এ কারণে তাকে তুমি হত্যা করেছিলে? আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দিতাম! এ কারণে আমি তোমাকে হত্যা না করে মুক্ত করে দিয়েছি।

হযরত আলী (রাঃ) এর কথা শুনে লোকটি তৎক্ষণাত ইসলাম কবুল করেছিল। থুথু নিক্ষেপের কারণে আলী (রাঃ) এর মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশ জাগতে পারে। এ কারণে তিনি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে হত্যা না করে মুক্ত করে দিলেন। ইসলামের সশস্ত্র জিহাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন, ব্যক্তিগত আক্রোশে যুদ্ধ করা যাবে না এবং যুদ্ধের ময়দানেও ব্যক্তিগত আক্রোশে কাউকে হত্যা করা যাবে না।

www.pathagar.com

ইসলামের শত্রুরা যখন যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল, তখন নবী করীম (সাঃ) ঈমানদারদের মধ্যে এভাবেই যুদ্ধের উদ্দেশ্যের পরিশুদ্ধি সাধন করেছিলেন। তাঁরা যুদ্ধের সেই উত্তপ্ত রক্তঝরা ময়দানেও নবীর শিক্ষার বাস্তবায়ন করেছেন। আক্রোশে অন্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা কোন গর্হিত কাজ করেননি, ইসলামের শিক্ষা বা আদেশের বিপরীত কিছুই করেননি। যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে এসেছেন, তাঁর বাইরে তাঁরা এক কদমও নিক্ষেপ করেননি।

রাসূল প্রদর্শিত সশস্ত্র জিহাদের পদ্ধতি

সশস্ত্র জিহাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) আল্লাহর পথের সৈনিকদেরকে শিক্ষাদান করে এবার শিক্ষা দিলেন যুদ্ধের পদ্ধতিসমূহ। আবহমান কাল থেকে যুদ্ধের ময়দানে যে নিয়ম এবং পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত, তিনি তার সবকিছুই রহিত করলেন ঈমানদারদের জন্য। তদানীন্তন যুগে যুদ্ধ চলাকালে যে সব পৈশাচিক পদ্ধতি বহাল ছিল, তিনি মুসলিম সৈন্যদেরকে জানিয়ে দিলেন, এসব পদ্ধতির কোন একটিও প্রয়োগ করা যাবেনা। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) শত্রু পক্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একভাগ সামরিক এবং আরেকভাগ বেসামরিক।

সামরিক লোকদের আওতায় তাদেরকেই আনলেন, যারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, প্রচলিত নীতি অনুযায়ী বা সাধারণ বুদ্ধি বিচারে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সামর্থবান বলে চিহ্নিত হয়। বেসামরিক লোকদের আওতায় আনলেন, যারা প্রচলিত নীতি অনুযায়ী বা সাধারণ বুদ্ধি বিচারে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সামর্থবান বলে চিহ্নিত হয় না। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি।

এই শেষোক্ত দলের মধ্যে রয়েছে শান্তি প্রিয় নিরীহ ধরনের লোকজন। ধর্মস্থানের সেবক, সংসারত্যাগী সন্নাসী, ধর্মস্থান, নারী, শিশু, পর্যটক, পাগল, ভিক্ষুক, আহত, বৃদ্ধ, অসুস্থ রোগী, অন্ধ এ ধরণের কোন লোকজনের ওপর আক্রমণ করা যাবে না। আল্লাহর নবী এই শ্রেণীর লোকজনকে হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষেধ করে দিলেন। অর্থাৎ যাদের দ্বারা কোন ক্ষতি হবার কোনই সম্ভাবনা নেই, কোন ক্রমেই তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা যাবে না।

একবার যুদ্ধের ময়দান পরিদশর্ন কালে নবী করীম (সাঃ) এক নারীর মৃতদেহ দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'এই নারী তো সামরিক বাহিনীর লোক ছিল না। তাকে হত্যা করা হলো কেন?'

www.pathagar.com

এরপর তিনি যুদ্ধের সিপাহ্সালার হযরত খালিদ (রাঃ) কে ডেকে তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দিলেন, 'কোন নারী বা শ্রমিককে হত্যা করা যাবে না।'

এই ঘটনার পর থেকে তিনি নারী এবং শিশুদেরকে হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষনা করলেন। সশস্ত্র জিহাদের ময়দান সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল ঘোষনা করলেন, 'কোন নারী, শিশু বা বৃদ্ধকে হত্যা করো না। গণিমতের সম্পদ (যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে শত্রু বাহিনীর কাছ থেকে যে সম্পদ দখল করা হয়) অপহরণ করো না। যুদ্ধে যা কিছু হস্তগত হয় তা সব একত্র করো। উত্তম কাজ করো এবং উত্তম আচরণ করো। যারা উত্তম কাজ করে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন।'

মক্কা বিজয়ের সময়ে নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষনা করেন, 'কোন আহত মানুষের ওপরে আক্রমণ করবে না। প্রাণের ভয়ে যারা পালিয়ে যাচ্ছে, এমন কোন মানুষের পেছনে ধাওয়া করা যাবেনা। যারা ঘরের দরোজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছে, তাদের ওপরে আক্রমণ করা যাবে না।'

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'কোথাও অভিযানে প্রেরণ করার সময় আল্লাহ্র রাসুল সৈন্য বাহিনীকে আদেশ দিতেন, তাঁরা যেন কোন ধর্মস্থানের নিরীহ সেবকদের ও আশ্রমের তপস্বী বা সাধক সন্নাসীদের হত্যা না করে।'

এক কথায় নবী করীম (সাঃ) এই নীতি ঈমানদারদেরকে শিক্ষা দিলেন যে, যুদ্ধের সাথে যারা জড়িত নেই, তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। তাদেরকেই এই শিক্ষাদান করলেন, যারা সামান্য কোন কারণে, অহংকার প্রদর্শনের জন্য, ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য বা যে কোন কারণে যুদ্ধ শুরু করে প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ করতো। প্রতিপক্ষের নারী, শিশু, রোগী, বৃদ্ধ তথা সমস্ত মানুষকে শেষ করে দিত, তাদের পশু সম্পদ, বৃক্ষরাজিসহ্ যাবতীয় কিছুই ধ্বংস করে দিত।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যাদের আচরণ নৃশংসতার শেষ পর্যায় অতিক্রম করেছিল, আর ইসলাম গ্রহণের পরে কোরআনের স্পর্শে এসে তাঁরাই যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করেছে, গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য তাদের আচরণ অনুসরণীয় হয়ে রয়েছে। আল্লাহ্র রাসুল ঘোষণা করলেন, সশস্ত্র জিহাদে সামরিক ব্যক্তিদের ওপরে আক্রমণ করা যাবে বটে কিন্তু সে আক্রমণের ক্ষেত্রেও নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে হবে। অবাধে আক্রমণ করা যাবে না।

সে যুগে আক্রমণের কোন নিয়ম নীতি ছিল না। রাতের অন্ধকারে বিশেষ করে শেষ রাতে মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় বিভোর থাকতো, সেই মুহূর্তে তারা হঠাৎ আক্রমণ করতো। আল্লাহ্র রাসুল (সাঃ) জানিয়ে দিলেন, অতর্কিত আক্রমন করা যাবে না।

www.pathagar.com

রাতের অন্ধকারে আক্রমন করা যাবেনা। রাতের অন্ধকারে শত্রুপক্ষকে ঘেরাও করে রাখলেও তাদের ওপরে কোন আক্রমণ করা যাবেনা।
হযরত আনাছ ইবনে মালিক (রাঃ) খয়বর যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, 'নবী করীম (সাঃ) কোন শত্রু গোষ্ঠীর কাছে রাত্রে পৌছলেও তিনি সকাল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না।'

সে যুগে যুদ্ধের আরেকটা বীভৎস নীতি ছিল যে, তারা আক্রোশে অন্ধ হয়ে প্রতিপক্ষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতো। এই ঘৃণ্য এবং নৃশংস প্রথার বিরুদ্ধে নবী করীম (সাঃ) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন, 'আগুনে পোড়ানের শাস্তি শুধু মাত্র আগুনের যিনি মালিক তিনি ব্যতীত আর কেউ দিতে পারে না।'

আগুনে পুড়িয়ে মানুষকে হত্যাই শুধু নয়, কোন প্রাণীকেও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা যাবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'একবার আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমাদেরকে যুদ্ধে যেতে বললেন। আমাদেরকে তিনি দু'জন লোকের নাম উল্লেখ করে আদেশ দিলেন, তাদেরকে ধরে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে। আমরা যাত্রা করা মাত্র তিনি আমাদেরকে ডেকে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছিলাম, তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে। কিন্তু আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করো না। আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া শুধু আল্লাহরই শোভা পায়। তোমরা লোক দুটোকে পেলে হত্যা করো।'

হযরত আলী (রাঃ) একবার বেশ কিছু নাস্তিককে ধরে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন। এ সংবাদ জানতে পেরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাকে ডেকে নবী করীম (সাঃ) এর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'আগুন আল্লাহর শাস্তি। এই আগুন দিয়ে কোন মানুষকে শাস্তি দিয়োনা।'

যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষকে নির্যাতন করে বা বেঁধে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। উবায়েদ ইবনে ইয়ালা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত আব্দুর রহমান ইবনে খালিদ (রাঃ) এর সাথে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমাদের সৈন্যরা শত্রু পক্ষের বারোজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলো। হযরত আব্দুর রহমান তাদেরকে বেঁধে হত্যা করতে আদেশ দিয়েছিলেন।

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) এ ঘটনা জানতে পেরে তাকে বলেছিলেন, আমি শুনেছি নবী করীম (সাঃ) কাউকে বেঁধে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর কছম! আমি মুরগীও বেঁধে জবাই করতে রাজী নই। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) এ কথা জানতে পেরে তাঁর ভুলের কাফ্ফারা স্বরূপ চারজন দাস মুক্ত করেছিলেন।'

www.pathagar.com

পূর্বে যুদ্ধই হত লুটতরাজ করার জন্য। আর নবী করীম (সাঃ) শিক্ষা দিলেন, যুদ্ধের পরে বিজিত অঞ্চলে কোন ধরণের লুটতরাজ করা যাবে না। খয়বর বিজিত হবার পরে কিছু সংখ্যক মুসলিম সৈন্য ইহুদীদের এলাকায় সম্পদ আহরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইহুদীদের গোত্রপতি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসে অভিযোগ করে রাগত কণ্ঠে বলেছিল, 'হে মুহাম্মদ (সাঃ)! গাধা হত্যা করা, গাছের ফল ভক্ষণ করা আর নারীদেরকে আঘাত করা তোমাদের জন্য কি শোভা পায়?'

এ কথা শোনার সাথে সাথে নবী করীম (সাঃ) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-কে আদেশ করলেন, মুসলিম বাহিনীর সকল সদস্যকে ডাকো।'

তিনি 'নামাজের জন্য সমবেত হও' বলে ডাক দিলেন। সমস্ত মুসলমান সৈন্য একত্রিত হলে নবী (সাঃ) দাঁড়িয়ে তাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি গর্বিত হয়ে এ ধারণা করেছে নাকি, আল্লাহর কোরআন যা নিষেধ করেছে এর বাইরে আর কিছু নিষেধ নয়? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে যে সব উপদেশ এবং আদেশ দিয়ে থাকি, যা নিষেধ করে থাকি, এসবও কোরআনের মতই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তোমাদেরকে আহলে কিতাবদের (ইহুদী-খৃষ্টান) বাড়িতে তাদের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা, তাদের নারীদের আঘাত করা লাঞ্ছিত করা, অনুমতি ব্যতীত তাদের গাছের ফল খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন। কারণ তাদের যেসব জিনিষ দেয়া প্রয়োজন ছিল তারা তা দিয়েছে।'

কোন এক যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর কয়েকজন সদস্য ছাগল ধরে এনে তা জবাই করে রান্না করেছিল। গোস্ত খাবে এমন সময় নবী করীম (সাঃ) জানতে পেরে সেখানে উপস্থিত হয়ে গোস্তের হাড়ি উল্টিয়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'জোরপূর্বক নিয়ে আসা জিনিষ-পত্র মৃত প্রাণীর গোস্তের মতই হারাম।'

যুদ্ধে জয়ী হয়ে পরাজিত সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে যা পাওয়া যায় তা নিয়মিতভাবে বন্টন করার আগে যদি কেউ গ্রহণ করে তাহলে তা হারাম হবে। কিন্তু বেসামরিক লোকদের কাছ থেকে কোন কিছু জোর পূর্বক গ্রহণ করা, বিজিত এলাকায় প্রবেশ করে শত্রু দেশের সাধারণ জনগণের কাছে থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়া আল্লাহর হারাম করে দিয়েছেন। লুটের সামান্য একটা রশিও তিনি হারাম করে দিয়েছেন।

যে জাতি যুদ্ধই করতো লুটতরাজ করার জন্য, তাঁরাই ইসলামের সশস্ত্র জিহাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজিত এলাকায় এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে, শত্রু দেশের জনগণ তাদের পবিত্র চরিত্র এবং সম্পদের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। তাঁরাও অনুভব করেছে, এদের যুদ্ধের লক্ষ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

www.pathagar.com

প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ করার সময় তাদের ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট করা, তাদের বৃক্ষ ধ্বংস করা, তাদের দেশের সম্পদ ধ্বংস করা, কোন কিছু আগুনে পুড়িয়ে দেয়া, গনহত্যা করা এসব সে যুগেও যেমন ছিল বর্তমানেও আছে। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) এসব করতে মুসলমানদের কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এসব কাজকে পবিত্র কোরআন 'ফাসাদ' বা অরাজকতা বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ–

সে যখন শাসক পদে অধিষ্ঠিত হয় তখন পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টি করা এবং ফসল বিনষ্ট করা ও গণহত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ্ অরাজকতা সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা বাকারা-২০৫)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সিরিয়া এবং ইরাকে সৈন্য প্রেরণ করার সময় যেসব নির্দেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে একথাও ছিল, 'কোন জনপদসমূহ্ ধ্বংস করা যাবে না। ক্ষেতের কোন ফসল বিনষ্ট করা যাবে না।'

অবশ্য সামরিক প্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন করে বা পুড়িয়ে ফেলার অনুমতি দান করা হয়েছে, কিন্তু প্রতিহিংসামূলকভাবে তা করা যাবে না। সে যুগে মুসলমানগণ বনী নজীর গোত্র অবরোধ করার সময় তা করেছিল। কিন্তু ধ্বংসাত্মক মন-মানসিকতা নিয়ে এসব করা যাবে না। যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের নিহত ব্যক্তির লাশ বিকৃত করা যাবে না। ইসলাম এ সম্পর্কে কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে এজিদ আনসারী (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (সাঃ) লুটের জিনিষ গ্রহণ করতে এবং লাশ বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন।'

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যখন যুদ্ধের জন্য সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করতেন তখন তিনি স্পষ্টভাবে নিষেধ করতেন, 'অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। গণিমতের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না। কোন লাশের বিকৃতি ঘটাবে না।'

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিলেন বন্দীদের হত্যা করা যাবে না। অথচ সে যুগে বন্দীদের নির্বিচারে হত্যা করা হত। বর্তমানেও ভিন্ন কৌশলে করা হয়। মক্কা বিজয়ের পরে আল্লাহর নবী যখন মক্কা শহরে প্রবেশ করেন তখন তিনি মুসলিম বাহিনীর প্রতি নির্দেশ জারী করেন, 'কোন আহত মানুষের ওপরে আক্রমন করা যাবে না। যে ব্যক্তি পালিয়ে যাচ্ছে তাকে ধাওয়া করা যাবে না। যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা যাবে না। যে ব্যক্তি ঘরের মধ্যে দরোজা বন্ধ করে অবস্থান করবে তার ওপরে হামলা করা যাবে না।'

www.pathagar.com

মুসলিম ইতিহাসের নিষ্ঠুর শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একজন বন্দীকে হত্যা করার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কে নির্দেশ দিয়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে বন্দী হত্যার অনুমতি দেননি। তবে নিদের্শ দিয়েছেন মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দিতে বা ক্ষমা করে দিতে।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের কথা ইসলামের সাধারণ নির্দেশের ব্যাপারে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক এবং প্রশাসন অবশ্যই এই ক্ষমতা সংরক্ষণ করে যে, ইসলামের ভয়ংকর শত্রু, মুসলমানদের ওপরে যে ব্যক্তি লোমহর্ষক নির্যাতন করেছে এমন ব্যক্তিকে, চরম বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি, চরম ক্ষতিকর কোন ব্যক্তি, দেশের মারাত্মক সর্বনাশকারী ব্যক্তি ইত্যাদী ধরণের লোকদেরকে বন্দী করে হত্যা করা যেতে পারে। নবী করীম (সাঃ) বদর যুদ্ধের বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে মুক্তিদান করেছিলেন কিন্তু উকবা ইবনে আবু মুইয়িতকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ইসলামী সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা আপোষহীনভাবে গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মিত্র শক্তিবর্গ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যে প্রহসন চালিয়েছিল ইসলামী সরকারের সে প্রহসন চালানোর অবকাশ নেই।

তদানীন্তন যুগে দূত হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করতো না। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) প্রতিপক্ষের কোন দূত বা প্রতিনিধিকে হত্যা করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। সে সময়ে মিথ্যা নবীর দাবীদার জাহান্নামি মুসাইলামার পক্ষ থেকে উবাদা ইবনে হারিস দরবারে রেসালাতে এমন এক নিকৃষ্ট বাণী নিয়ে আগমন করেছিল, যে বাণীর মাধ্যম আল্লাহর রাসূলের সম্মানের প্রতি আঘাত করা হয়েছিল। নবী করীম (সাঃ) তাকে বলেছিলেন, 'দূত হত্যা করা যদি হারাম না হত তাহলে আমি তোমার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করতাম।'

নবী করীম (সাঃ) নির্দেশ দিলেন, প্রতিপক্ষের সাথে কোন চুক্তি করে তা লংঘন করা যাবে না। প্রতিপক্ষের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করা, তাদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করা, চুক্তিবদ্ধদের সাথে অশোভন আচরণ করা স্পষ্ট হারাম ঘোষনা করলেন। তিনি আরো ঘোষনা করলেন, 'চুক্তিবদ্ধ মানুষকে হত্যা করবে সে জান্নাতের গন্ধও পাবেনা। পক্ষান্তরে জান্নাতের গন্ধ ৪০ বছরের পথের দুরত্ব থেকেও লাভ করা যাবে।'

নবী করীম (সাঃ) ঘোষনা করলেন, 'চারটি খারাপ গুণ এমন যে, যার ভেতরে তা দেখা যাবে সে সম্পূর্ণ মুনাফিক হয়ে যাবে। সে খারাপ গুণগুলো হচ্ছে, যখন কথা বলবে তখন মিথ্যা কথা বলবে। যখন কোন অঙ্গীকার করবে তখন তা ভঙ্গ করবে।

www.pathagar.com

যখন চুক্তিতে আবদ্ধ হবে তখন তা লংঘন করবে। যখন ঝগড়া করবে তখন অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করবে।'

বিশ্বাসঘাতক এবং চুক্তি ভঙ্গকারীদের সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) ঘোষনা করলেন, 'কিয়ামতের দিন প্রতিটি বিশ্বাসঘাতক এবং চুক্তি ভঙ্গকারীর জন্য একটা পতাকা থাকবে যা তার কর্ম ফলের প্রতীক হিসাবেই চিহ্নিত হবে। মনে রেখো, যে জননেতা বিশ্বাসঘাতক হয় তার চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর কেউ হতে পারে না।'

রোম সাম্রাজ্যের ওপরে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) একবার আক্রমন করতে যাচ্ছিলেন। অথচ তার সাথে রোমের চুক্তি বহাল ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তিনি চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথেই আক্রমন করবেন। কিন্তু আমর ইবনে আম্বাছা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সন্ধির মেয়াদকালে যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং রোমের দিকে বাহিনী প্রেরণকে চুক্তি ভঙ্গ হিসেবে আখ্যায়িত করলেন।

তিনি আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) কে বললেন, 'সর্বনাশ! আপনি এটা কি করতে যাচ্ছেন? চুক্তি মেনে চলুন!' আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এমন করছেন কেন , কি হয়েছে?' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রাসুলকে বলতে শুনেছি, 'যাদের সাথে কোন জাতির চুক্তি থাকবে তাদের উচিত চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চুক্তিতে কোন পরিবর্তন না করা। যদি প্রতিপক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা থাকে তাহলে সমতা বজায় রেখে চুক্তি শেষ হবার কথা জানানো উচিত।'

সে সময়ে যোদ্ধাদের একটা নীতি ছিল যে, তারা যে পথ দিয়ে গমন করতো সে পথে যাকে পেত তাকেই উত্যক্ত করতো। যে এলাকায় শিবির স্থাপন করতো সেখানে এমন এক বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করতো যে, পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণ অতিষ্ঠ করে তুলতো। যেখানে সেখানে শিবির স্থাপন করে মানুষের চলাফেরা বন্ধ করে দিত। আল্লাহর রাসুল একবার ঈমানদারদের সাথে নিয়ে অভিযানে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে সংবাদ এলো, মুসলিম সৈন্যদের কিছু লোকজন এমন বিশৃংখলতার সৃষ্টি করেছে যে, মানুষের মারাত্মক অসুবিধা হচ্ছে। সাথে সাথে তিনি ঘোষনা করলেন, 'যে ব্যক্তি স্থানীয় বেসামরিক লোকদের বিরক্ত করবে অথবা পথিকদের সম্পদ লুট করবে তার জিহাদ হবে না। তোমাদের এভাবে বিভিন্ন স্থানে ঘাটিতে ঘাটিতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়া একটা শয়তানের মত কাজ।'

রাসূলের এই আদেশের পর থেকে ইসলামের বাহিনীতে এমন সুশৃংখল অবস্থা বিরাজ করতো, তাঁরা কোন স্থানে শিবির স্থাপন করলে তাদের সংঘবদ্ধতার কারণে মনে হত যে, একটা চাদর বিস্তার করলে তার নীচে সবাই চলে আসবে। সে সময়ে যুদ্ধের ব্যাপারে আরেকটা নীতি ছিল, গোটা বাহিনী একটা মহা-শোরগোল সৃষ্টি করে পথ অতিক্রম করতো এবং যুদ্ধের ময়দানে নিজের খ্যাতি, বীরত্ব প্রকাশ করে ও শত্রুর প্রতি অশালীন ভাষা প্রয়োগ করে তাকে গালি দেয়া হত।

www.pathagar.com

মুসলিম বাহিনী এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে ইচ্ছুক হলে নবী করীম (সাঃ) তা নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন। তিনি ঘোষনা করলেন, 'কোন অবস্থাতেই অহংকার প্রকাশ করা যাবেনা। এমন কথাও বলা যাবে না যে কথায় অহংকার প্রকাশ পায়। অবশ্য ইসলাম নিয়ে গৌরব প্রকাশ করা যেতে পারে। কোন অশলীন ভাষা উচ্চারণ করা যাবেনা।'

হযরত আবু মুসা আসয়ারী (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে কোন অভিযানে বের হতাম। কোনস্থানে পৌছলে উচ্চকণ্ঠে আল্লাহর নাম জপতাম। এ অবস্থা দেখে আল্লাহর নবী নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা ধীর স্থিরভাবে চলবে। মধ্যম স্বরে আল্লাহর নাম ধরে ডাকবে। কারণ যাকে তোমরা ডাকছো তিনি বধির নন এবং অনুপস্থিতও নন। তিনি তোমাদের সাথেই আছেন অতি কাছেই আছেন।'

নবী করীম (সাঃ) যখন কোন অভিযানে বাহিনী প্রেরণ করতেন, তখন সে বাহিনীকে বলতেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে যাত্রা আরম্ভ করো। আল্লাহকে যারা স্বীকৃতি দেয় না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কিন্তু যুদ্ধে কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাৎ করো না। লাশ বিকৃত করো না। কোন শিশুকে হত্যা করো না।' এরপর তিনি বলতেন, 'শত্রুর সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করবে। ইসলাম গ্রহণ, জিজিয়া প্রদান ও যুদ্ধ। যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে কিছুই বলো না। যদি জিজিয়া প্রদান করতে সম্মত হয় তাহলে তাদের কোন কিছুর ওপর হস্তক্ষেপ করো না। এ দুটোর কোনটাই যদি না করে তাহলে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে যুদ্ধ করবে।'

হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর খেলাফতের সময় যখন সিরিয়াতে অভিযান চালিয়েছিলেন তখন তাঁর বাহিনীকে আদেশ করেছিলেন, 'নারী শিশু ও বৃদ্ধদেরকে কেউ যেন হত্যা না করে। লাশ যেন বিকৃত করা না হয়। সন্নাসী ও তপস্যকারীদের যেন কোন অসুবিধা করা না হয় এবং কোন ধর্মস্থান যেন ভাঙ্গা না হয়। ফসলের ক্ষেতের কেউ যেন ক্ষতি না করে এবং ফলবান গাছ যেন কেউ না কাটে। ফসলের ক্ষেত যেন আগুনে জ্বালানো না হয়। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কোন জনবসতির মধ্যে যেন আতংক ছড়িয়ে সে জনবসতী শুন্য করা না হয়। যুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে না এমন কোন পশু-প্রাণীকে যেন হত্যা করা না হয়। অঙ্গীকার যেন ভঙ্গ করা না হয়। যারা আনুগত্য স্বীকার করবে, তাদের প্রাণ ও সম্পদকে মুসলমানের প্রাণ ও সম্পদের মতই নিরাপত্তা দিতে হবে। যুদ্ধের ময়দান থেকে যেন পালানো না হয়। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যেন আত্মসাৎ করা না হয়।'

সংক্ষেপে এটাই হলো সশস্ত্র জিহাদের অবয়ব। ইসলামে সশস্ত্র জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি এবং কেন সশস্ত্র জিহাদ করতে হয় তা স্পষ্ট হয়ে গেল। আল্লাহর নবীর সশস্ত্র জিহাদের পদ্ধতি কি ছিল সেটাও স্পষ্ট হয়ে গেল। অথচ ইউরোপের যারা

www.pathagar.com

ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে সমালোচনা করেন, তারা মাত্র কিছুদিন পূর্বেও অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামঝি সময়েও অবগত ছিলেন না যে, কোন বাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণের পূর্বে তাকে নানা ধরণের আদেশ নিষেধ দান করতে হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর রাসূল সেই সপ্তম শতাব্দীতেই এই নীতি উদ্ভাবন করেছিলেন।

গোটা পৃথিবীর সমস্ত জাতির যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি যা ছিল এবং বর্তমানেও বহাল আছে, এসবের বিপরীত উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি আল্লাহর রাসূল দান করেছেন এবং বাস্তবে তা করেও দেখিয়েছেন। আর এমন এক জাতির মাধ্যমে তিনি তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন, যাদের কাছে ছিল না কোন ধরণের নিয়ম নীতির বিন্দুমাত্র চিহ্ন। যুদ্ধই ছিল যাদের জীবিকা নির্বাহের সর্বোত্তম মাধ্যম। অপরের সম্পদ লুট করে নেয়ার মধ্যে যারা গৌরব বোধ করতো। নারী শিশু অসহায় বৃদ্ধদের হত্যা করে যারা পৈশাচিক আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করতো। তাদের মাধ্যমেই আল্লাহর রাসূল মানুষের কল্পনার অতীত নিয়ম নীতি বাস্তবায়ন করেছিলেন।

ইসলামের সশস্ত্র জিহাদ নীতি অধ্যয়ন করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর রাসূল যুদ্ধকে যাবতীয় নারকীয়তা ও পৈশাচিক কর্মকান্ড থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে তখন হিংসাত্মক কার্যকলাপ ছিল যে কোন দেশে যুদ্ধের একটা অবিচ্ছেদ্য নীতি বা অংশ। হৈ চৈ শোরগোল করে, গালাগালি সহকারে যুদ্ধ করা, সৈন্যদের অরাজকতা বিশৃংখলা, সেনাপতির আদেশ অমান্য করা, চুক্তি ভঙ্গ করা, অঙ্গীকার রক্ষা না করা, লুটতরাজ করা, যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা, চুক্তিবদ্ধদের হত্যা করা, দূত হত্যা করা, আহতদের হত্যা করা, বেসামরিক লোকদের হত্যা করা, লাশ বিকৃত করা, লাশের অবমাননা করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা, রাহাজানি করা, ফসল বৃক্ষ তরু লতা ধ্বংস করা, যুদ্ধরত নয় এমন জনপদের ক্ষতি সাধন করা এ সবই নিষিদ্ধ করা হলো।

এভাবে যুদ্ধের একমাত্র পরিচয় অবশিষ্ট থাকলো, একজন বীর সৈনিক দুশমনের সবচেয়ে কম ক্ষতি সাধন পূর্বক তার পক্ষ থেকে অকল্যাণ বা ক্ষতিরোধ করে যে কাজের মাধ্যম, তাই হলো যুদ্ধ। নবী করীম (সাঃ) এর দশ বছরের সামরিক জীবনে তিনি প্রায় ত্রিশ লক্ষ বর্গ মাইল এলাকার শাসক হয়েছিলেন। এই বিশাল এলাকা তাঁর নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসার জন্য মুসলিম বাহিনী প্রতিপক্ষের মাত্র ২৫১ জনকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর পক্ষে শাহাদাতবরণ করেছিলেন মাত্র ১২০ জন মুজাহিদ।

সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে সন্ধান করলেও মানুষের প্রাণের প্রতি এমন নির্মল সম্মান প্রদর্শনের একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যুদ্ধ তো অনেক দূরের ব্যাপার, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচারী শাসন টিকিয়ে রাখার জন্যে পুলিশ বাহিনীকে দিয়েই

www.pathagar.com

শাসকগণ মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে হাজার হাজার নিরীহ জনগণকে হত্যা করছে। অবরোধের নামে তারা অসংখ্য নারী, শিশু, বৃদ্ধকে মৃত্যু গহ্বরে নিক্ষেপ করছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির যুদ্ধের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে বা তাদের দাঙ্গা মারামারির ঘটনা পত্রিকার পাতায় পাঠ করলে ঘৃণায় দেহ-মন কুঞ্চিত হয়ে যায়।

ইসলামে জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য অর্জনের জন্য চূড়ান্ত মাত্রায় শ্রমদান, কষ্ট স্বীকার নিজের যাবতীয় শক্তি সামর্থ্য নিঃশেষে প্রয়োগ করাই হলো জিহাদ শব্দের মূল তাৎপর্য। ঈমানদার ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্যেই হলো আল্লাহর জমিন থেকে যাবতীয় প্রভুত্ব উৎখাত করে আল্লাহ তা'য়ালার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই হলো জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'য়ালার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে তাঁর দেয়া বিধানের আনুগত্য করা, তাঁর রাসূলকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর আনিত বিধানের অধীনতা স্বীকার করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ শর্তহীনভাবে অকুণ্ঠিত চিত্তে অনুসরণ করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই হলো ঈমানদার ব্যক্তির জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোন প্রতিবন্ধক ও পরিপন্থী শক্তির মোকাবিলা করে দীর্ঘ মেয়াদী সংগ্রাম ও প্রাণান্তকর কষ্ট স্বীকার করা একান্ত আবশ্যক।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে হবে। হতে পারে তা বোধ-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে, অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে, চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই ধরনের চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রাখতে হবে। এসব ক্ষেত্রে জিহাদ করাকেই বলা হয় নফ্সের সাথে জিহাদ। এই নফ্সের সাথে যে ব্যক্তি জিহাদ করতে অক্ষম, তারপক্ষে জিহাদে আকবর তথা বাতিল শক্তির সাথে রক্তঝরা ময়দানে জিহাদ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পরিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং আন্তর্জাতিক জীবনে আল্লাহ তা'য়ালার একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই হলো জিহাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এবং এই জিহাদ করা প্রতিটি সচেতন মুসলিম ব্যক্তির জন্যই অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই কঠিন কাজ সমাধা করা কোন একক বক্তির পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পবিত্র কোরআনে ইসলাম বিরোধী যাবতীয় মতবাদ, মতাদর্শ, চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস, ঐতিহ্য-প্রথাকে 'ফিতনা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ফিতনাকে উৎখাত করার উদ্দেশে জিহাদ করা গোটা ঈমানদার জনগোষ্ঠীর জন্য একান্ত কর্তব্য বলে কোরআন ঘোষণা করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

www.pathagar.com

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ-

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না অরাজকতা ও বিশৃংখলা দূরীভূত হয় এবং আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয় ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। (সূরা বাকারাহ-১৯৩)

জিহাদ ইসলামী জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলামানদের পরস্পরের সাথে অথবা অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে যাবতীয় সম্পর্ক নির্ধারণের প্রধান অবলম্বন হলো এই জিহাদ। মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসরণের আদেশ দান করাও হলো জিহাদ। অমুসলিমদের কাছে ইসলামের শাশ্বত বাণী পৌছানো, ঈমান আনয়নের জন্য তাদেরকে উৎসাহ দান করাও হলো জিহাদ। যে কোন ধরনের মানবীয় প্রভুত্বমূলক শক্তি-ক্ষমতা, শাসন, নিয়ম পদ্ধতি ও বিধান উৎখাত করে আল্লাহ্ পাকের সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করাও জিহাদ। আর চূড়ান্ত পর্যায়ের জিহাদ হলো অত্যাচারিত বিশ্বমানবতাকে মানবীয় প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বজনিত যাবতীয় নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণ, বঞ্চনার ষ্টীম রোলার থেকে মুক্তি দান।

আল্লাহর সৃষ্টি এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'য়ালার গোলামী করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাও হলো জিহাদ। আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, আল্লাহকে যারা একমাত্র রব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে আর এ কারণে যারা নির্যাতিত হচ্ছে, তাদের জন্য তোমরা অবশ্যই যুদ্ধ করবে। নির্যাতিত ব্যক্তিদেরকে নির্যাতন থেকে উদ্ধার করার জন্য ঈমানদারকে চূড়ান্ত জিহাদে অবতীর্ণ হতে আদেশ দান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

وَمَالَكُمْ لاَتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا-وَاجْعَلْ لَّنَامِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا-وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا-

কি অজুহাত থাকতে পারে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেসব নারী, পুরুষ, শিশু বৃদ্ধদের জন্য সংগ্রাম করবে না, যারা শক্তিহীন হবার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে, অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে, নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং এ কথা বলে আবেদন করছে যে,

www.pathagar.com

আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে এই জালিম অধ্যুষিত জনপদ থেকে উদ্ধার করে নাও, অথবা তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্য এমন সাহায্যকারী বন্ধু পাঠিয়ে দাও যিনি আমাদেরকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দান করবে। (সূরা নিছা-৭৫)

গোটা বিশ্বের যে কোনস্থানে কোন মুসলমান অত্যাচারিত হতে থাকে আর অন্যান্য মুসলমানরা নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করবে এটা এক অসম্ভব বিষয়। ঐ সমস্ত মুসলিম শাসকদেরকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে, যারা মুসলমানদের ওপরে নির্যাতন দেখেও বোবার মতই নীরব থাকে। অত্যাচারিতদের সাহায্যে যথাযথ ভূমিকা পালন করা জিহাদের অন্যতম লক্ষ্য। মুসলমানদেরকে তাদের নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলে, তাদের ওপরে আক্রমণ করা হলে, সেখানে জিহাদ করতে হবে।

এই পৃথিবীতে নানা ধরনের মত পথ আবিষ্কার করে যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ-

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না অরাজকতা ও বিশৃংখলা দূরীভূত হয় এবং আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয় ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। (সূরা আনফাল-৩৯)

শয়তান কর্তৃক প্রবর্তিত আদর্শ সম্পূর্ণ উৎখাত করে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত না পর্যন্ত জিহাদ পরিচালিত করতে হবে। মুসলমানরা অমুসলিমদের সাথে যদি কোন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ থাকে, আর সে চুক্তি অমুসলিমরা বাতিল করে যদি অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও জিহাদ পরিচালিত করতে হবে। প্রতারণা বিশ্বাসঘাতকাত যারা করবে তাদের বিরুদ্ধেও সংগঠিত মুসলিম জনগোষ্ঠী জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

জিহাদে নিয়োজিত হবার শর্তাবলী

জিহাদ করা যাদের ওপরে অবশ্য কর্তব্য, তাদেরকে সর্বপ্রথমে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কারণ যে জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যে জিহাদে আত্মনিয়োগ করবে, সে বিধান সম্পর্কে যদি জিহাদকারীর কোন ধারণাই না থাকে, তাহলে তাঁর জিহাদে শিথিলতা আসতে বাধ্য।

www.pathagar.com

কেননা মানুষ যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কোন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে, উক্ত কাজ সম্পর্কে তাকে অবশ্যই পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হয়। মূল কাজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করে কাজ শুরু করলে সে কাজে সফলতা আশা করা বৃথা। এ জন্য জিহাদকারীকে সর্বপ্রথমে আল্লাহর ওপরে ঈমান আনতে হবে এবং দ্বিতীয়ত তাকে রাসূলের আনুগত্য করতে হবে ও রাসূলের নেতৃত্ব অনুসরণ করতে হবে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর সাথে ঈমানের ব্যবসার ব্যাপারে প্রথমে আল্লাহর প্রতি ঈমানের কথা বলেছেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে বলেছেন, নবীর প্রতি ঈমানের কথা। এ দুটো সম্পূর্ণ হবার পরে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর নির্দেশিত পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করতে বলেছেন।

জিহাদকারী জিহাদ করবে ইসলামের বিপরীত শক্তির সাথে। ইসলামের বিপরীত শক্তি কি, তা কত প্রকার, কোন ধরনের অবয়বে সে শক্তি ঈমানের ওপরে আক্রমণ করে, এই শক্তির উৎমূল কি, কারা এই শক্তির বিস্তৃতি ঘটাতে মদদ যোগায়, এসব বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জিহাদকারীকে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। জিহাদকারীর যদি জানাই না থাকে যে, সে কোন শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করছে, তাহলে সে জিহাদ করবে কিভাবে? ইসলামের বিপরীত বাতিল শক্তি তথা জাহিলিয়াত সম্পর্কে আল্লাহর পথের সৈনিকদেরকে ঐ পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যে জ্ঞান তার কাছে জাহিলিয়াতের পরিচয় প্রকাশ করে দেবে।

জিহাদকারী তাঁর জীবন বিধান ইসলাম সম্পর্কে যে জ্ঞান অর্জন করবে, এ জ্ঞান হতে হবে সম্পূর্ণরূপে নির্ভূল এবং যে কোন ধরনের সংশয় ও অস্পষ্টতা মুক্ত। একজন ব্যক্তি আল্লাহর পথের জিহাদকারী হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিবে আবার কোন ধরনের বিপদ দেখলে আল্লাহর কাছে সাহায্য না চেয়ে কোন মাজারে গিয়ে, পীরের দরবারে গিয়ে সাহায্যের জন্য ধর্ণা দিবে, এটা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়। আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, ঈমানদার যে কোন বিষয়ে আল্লাহর ওপরে নির্ভর করবে এবং সাহায্যে কামনা করবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। ঈমানদার ময়দানে যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সংগ্রাম করে, বিপদের মুখোমুখি হয় তখন আল্লাহ তা'য়ালা নীরব থাকেন না। আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন–

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ-وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا-وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا-

মুমীনদের শত্রুগণ আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত সুতরাং মুমীনদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা নিছা-৪৫)

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ-

www.pathagar.com

মুমিনদেরকে সাহায্য করা আল্লাহর জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়। (আল কোরআন)

এ জন্য জিহাদকারীর ঈমানে কোন ধরনের জড়তা বা সংশয় থাকলে তার পক্ষে জিহাদ করা সম্ভব নয়। যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা হচ্ছে, সে আদর্শ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান তাকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে। সেই সাথে তাকে ইসলামের বিপরীত আদর্শ সম্পর্কেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যেন কুফুরী শক্তির বাহ্যিক প্রকাশমান চাকচিক্য ঈমানদারকে প্রতারিত করতে সক্ষম না হয়। এ কথা মনে রাখতে হবে, ইসলামের বিপরীত আদর্শ সম্পর্কে কোন ধরনের জ্ঞান না থাকা ঈমানদারদের জন্য চরম ক্ষতির কারণ সৃষ্টি করে।

ইসলাম অচেতন মুসলিম সৃষ্টি করার জন্য আগমন করেনি। ইসলাম মানুষকে সচেতন করার জন্যই আগমন করেছে। জ্ঞান অর্জন করা ইসলাম মুসলিম নারী-পুরুষের ওপরে ফরজ করে দিয়েছে। কলুর বলদের চোখে যেমন ঠুলি পরিয়ে দিয়ে এক দিকেই ঘুরানো হয়, ইসলাম তেমন কলুর বলদ সৃষ্টি করতে চায় না। ইসলাম সম্পর্কেই জ্ঞান অর্জন করা হলো আর শয়তান দাড়ি টুপি লাগিয়ে বিছ্মিল্লাহ বলে ঈমানের গলায় ছুড়ি চালিয়ে দিল, ঈমানদার বুঝলো না যে তার ঈমান শেষ হয়ে গিয়েছে—এমন ধরনের অচেতন ঈমানদার জিহাদ করার উপযুক্ত নয়।

ঈমানদারকে পত্র-পত্রিকা পাঠ করতে হবে, রেডিও-টিভির সংবাদ জানতে হবে, ইসলামের বিপরিত আদর্শ সম্পর্কে সাধ্যানুসারে অধ্যয়ন করতে হবে, কুফুরী শক্তি কোন কোন ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রাণ প্রিয় আদর্শ ইসলামকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আক্রমণ করতে পারে, এসব দিক সম্পর্কে ঈমানদারকে অবশ্যই ধারণা অর্জন করতে হবে। তবে ইসলামের বিপরীত আদর্শ সম্পর্কে পান্ডিত্য অর্জন করা আল্লাহর পথের প্রতিটি সৈনিকের জন্য অবশ্য কর্তব্য নয় এবং সে ধরনের জ্ঞান অর্জন করা সবার পক্ষে সম্ভবও নয়। এই ধরনের জ্ঞান তাদেরকে অবশ্যই অজর্নন করতে হবে, যারা নেতৃত্বের আসনে আসীন। জিহাদকারীদের নেতৃত্বের ঝান্ডা যাদের হাতে রয়েছে, তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনা, মতবাদ-মতাদর্শ, আদর্শ সম্পর্কে পরিপূর্ণ সজাগ থাকতে হবে। নতুবা তার পক্ষে জিহাদকারীদের ওপরে নেতৃত্বদান করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

জিহাদের স্তরসমূহ

জিহাদ সম্পর্কে ইসলামের শত্রু গোষ্ঠী যে অপপ্রচার অপব্যাখ্যা গোটা পৃথিবী ব্যাপী প্রচার করেছে, এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। মানুষের মনে এ ধরনের ভুল ধারণা বদ্ধমূল করে হয়েছে যে, জিহাদ অর্থই হলো ভয়ঙ্কর ধরনের রক্তাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। জিহাদ বলতে প্রকৃত অর্থে যে কি বুঝায় তা ইতোপূর্বে

www.pathagar.com

আলোচনা করা হয়েছে। সশস্ত্র জিহাদ হলো জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়। একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অস্ত্র আর শক্তির ওপরই নির্ভর করা হয় না। বিশেষ করে ইসলামী আদর্শের ক্ষেত্রে এ কথা মোটেও প্রযোজ্য নয়।

ইসলাম পৃথিবীতে কোথাও শক্তির মাধ্যমে প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছে তার অনুপম আদর্শিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে। এ জন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা অবিরাম চেষ্টায় নিয়োজিত, তাঁদেরকে এ কথা জানতে হবে যে, কোন কোন পথে কিভাবে জিহাদ করতে হয় এবং এই জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটানো যায়, ইসলামী আন্দোলনের প্রভাবে জনগনকে প্রভাবিত করা যায়।

প্রতিটি মানুষের ভেতরেই নফ্স রয়েছে। এই নফ্স অত্যন্ত শক্তিশালী এবং মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো এই নফ্সকে মহান আল্লাহর গোলামে পরিণত করা। কেননা এই নফ্স মানুষের আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথে পরিচালিত করতে থাকে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ–

নিশ্চয়ই নফ্স নিশ্চিতভাবে অন্যায়, গর্হিত কর্ম সম্পাদন করতে আদেশ করে। (সূরা ইউসুফ-৫৩)

যারা আল্লাহর পথের সৈনিক হিসেবে কাজ করবে তাদেরকে সর্বপ্রথমে এই নফ্সকে আল্লাহর গোলামে পরিণত করতে হবে। নবী করীম (সাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ-ই প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তার মন-মানসিকতা, হৃদয়-অন্তর আমার নিয়ে আসা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের অধীন না হবে।' (বোখারী)

এই নফ্সের সাথে মানুষকে সময়ের প্রতিটি মূহূর্তে সংগ্রাম করতে হয়। জীবনের প্রতিটি বাঁকে এই নফ্স মানুষকে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের অপছন্দনীয় পথের দিকে লোভনীয় ভঙ্গীতে হাতছানি দিতে থাকে। এ জন্য এই নফ্সের সাথে সংগ্রাম করে যারা বিজয়ী হবে, নফ্সকে যারা আল্লাহর গোলামে পরিণত করতে সক্ষম হবে, সে ব্যক্তি একজন মুজাহিদ হিসেবে পরিগণিত হবে। নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের নফ্সকে আল্লাহর অনুগত বানানোর লক্ষ্যে জিহাদ করলো, সে একজন প্রকৃত মুজাহিদ।' (মুসনাদে আহমদ)

সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের কর্মী সর্বপ্রথম নিজেকে সেই চরিত্রের অলঙ্কারে সজ্জিত করবেন, যে চরিত্র নবী করীম (সাঃ) শিক্ষা দিয়েছেন। ঈমানদারের

www.pathagar.com

চিত্তাকর্ষক আকর্ষণীয় অনুপম চরিত্র মাধুর্যে কেউ যদি মুগ্ধ হয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ইসলামী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, তাহলে এটাও জিহাদ বলে পরিগণিত হবে। ঈমানদার তার প্রতিবেশীকে, চাকুরী ক্ষেত্রে সহকর্মীকে তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য দিয়ে মুগ্ধ করবেন, কর্মনিষ্ঠা দিয়ে, আমানতদারীর মাধ্যম্যে, অধিকার দানের মাধ্যমে তাঁর আদর্শের প্রতি, দলের প্রতি আকৃষ্ট করবেন। এসব কাজও জিহাদের মর্যাদা অর্জন করবে।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মী নিজের ভেতরের নফ্সকে আল্লাহর বিধানের অনুগত বানানোর পর তার প্রথম কর্তব্য হবে তার বাইরের পরিবেশকে আল্লাহর তা'য়ালার বিধানের অনুগত বানানোর জন্য জিহাদ করা। আর এই বাইরের পরিবেশের মধ্যে অগ্রাধিকার পাবে তার পরিবার এবং পরিবারের সদস্যবৃন্দ। নিজের নফ্সকে আল্লাহর বিধানের অনুগত বানানোর পর ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর প্রথম কাজ হলো সে তার পরিবারের সদস্যদেরকে আল্লাহর বিধানের অনুগত হিসেবে গড়ে তুলবে যেন তারা পরকালে নিজেদেরকে আল্লাহর জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا–

হে ঈমানরগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। (সূরা তাহরীম-৬)

এরপর ইসলামী আন্দোলনের কর্মী বৃহত্তম সমাজ-পরিবেশকে আল্লাহর বিধানের অনুগত বানানোর জন্য জিহাদ করবে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে নানা ধরনের বাধা বিপত্তির মোকাবিলা করতে হয়। এ দায়িত্ব পালন করা বড় ধরনের জিহাদ। এই জিহাদ কিভাবে পালন করা যেতে পারে এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) সুস্পষ্ট ধারণা দান করেছেন, 'তোমাদের যে কেউ আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোন কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখতে পাবে সে যেন তা তার হাতের শক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করে দেয়। যদি তাতে সক্ষম না হয় তাহলে মুখ দিয়ে তার বিরুদ্ধে কথা বলবে। তাতেও যদি সমর্থ না হয় তাহলে অন্তর দিয়ে ঐ ঘৃণ্য কাজের বিরোধিতা করতে হবে।' (বোখারী, মুসলিম)

এভাবেই জিহাদ করতে হবে। ক্রেতা-বিক্রেতা সততা প্রদর্শনের মাধ্যমে জিহাদ করবে, শ্রমিক তাঁর কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে জিহাদ করবে, ছাত্র তার কর্তব্য পালনের মাধ্যমে জিহাদ করবে, শিক্ষক তার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জিহাদ করবে অর্থাৎ ঈমানদার যেখানে যে অবস্থানে অবস্থান করছেন, তার সে অবস্থান থেকেই জিহাদ

www.pathagar.com

করে যাবেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্যই হবে এটা যে, সে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করবে। কিভাবে সে আকৃষ্ট করবে, এ কৌশল তার অবস্থানে থেকে তাকেই আবিষ্কার করতে হবে। এ ব্যাপারে তার মেধা ও চিন্তা শক্তিকে সে প্রয়োগ করবে।

মসজিদের ইমাম কিভাবে কোন পদ্ধতিতে মানুষকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট করবেন, এ কৌশল পরিস্থিতি অনুভব করে তাকেই নির্ধারণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহর দেয়া এই মেধা ও চিন্তা শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা যাবে না। কেউ যদি তার সাধ্যানুযায়ী মেধা ও চিন্তা শক্তিকে প্রয়োগ না করে, তাহলে আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হতে হবে।

ঈমানদার যে অবস্থানেই থাকবে, সে অবস্থান থেকেই ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ভূমিকা পালন করবে, তার এই ভূমিকাও জিহাদ বলে বিবেচিত হবে। একজন লেখক তাঁর লেখনীর মাধ্যমে জিহাদ করবেন। বক্তা তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে জিহাদ করবেন। ব্যবসায়ী তাঁর ব্যবসার মাধ্যমে জিহাদ করবেন। সংসদ সদস্য সংসদে ইসলামের পক্ষে ভূমিকা পালন করে জিহাদ করবেন। ইসলামকে উচ্চে তুলে ধরার লক্ষ্যে একজন ঈমানদার সামান্যতম সুযোগও হেলায় হারাবেন না। সুযোগ এলেই তিনি আল্লাহর বিধানের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবেন।

মুখের কথা দিয়ে যেখানে অন্যায় অবিচারের, ইসলামের বিপরীত কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায়, সেখানে তাই করতে হবে। যেখানে শক্তি প্রয়োগ করার পরিস্থিতি বিরাজিত, সেখানে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। যেখানে ইসলামের বিপরীত কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করার পরিবেশ যদি না থাকে, তাহলে সে কাজের প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করতে হবে এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ কিভাবে উৎখাত করা যায়, এ ব্যাপারে জনমত গঠনে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

জিহাদের প্রতিটি দিক কোন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে দেয়া যায় না। ঈমানদার ব্যক্তি যখন জিহাদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে, ইসলামের বিপরীত কর্মকান্ড বন্ধ করার ব্যাপারে মেধা ও চিন্তা শক্তি প্রয়োগ করে, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে, তখন তার সামনে জিহাদের বিস্তীর্ণ অঙ্গন উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ঈমানদার স্বয়ং অনুভব করে, কোন পথে কিভাবে তাকে জিহাদ করতে হবে। চোখ দুটো যদি আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে যায়, তখন এই চোখ দিয়ে যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাবে, সেদিকেই সে জিহাদের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখতে পাবে। কান দুটো যখন ইসলামের অলঙ্কারে সজ্জিত হবে, তখন এই কানে ইসলামের বিপরীত কিছু প্রবেশ করলে কানে জ্বালা শুরু হয়ে যাবে। ঈমানদারের মন-মানসিকতা গোটা পরিবেশের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। এই বিরোধী পরিবেশকে নিজের আদর্শের অনুকূলে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা বা জিহাদে সে আত্মনিয়োগ করবে। এভাবে ব্যক্তি তার অবস্থানে থেকে যোগ্যতানুযায়ী জিহাদ করবে। অবশেষে সংঘবদ্ধ শক্তি তথা ইসলামী আন্দোলন যখন রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, তখন যদি প্রয়োজন হয় অস্ত্র ধারণ করার–অস্ত্র ধারণ করতে হবে। আর এটাই হলো জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়।

ঐক্যবদ্ধভাবে জিহাদ করতে হবে

যারা আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে কোন প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকে তারাই কেবল ঈমানদার এবং এরাই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়। যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে প্রস্তুত, তাদের মধ্যে অবশ্যই তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, জিহাদকারীর মধ্যে এই চেতনা ও দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে যে, সে আল্লাহর পথেই সংগ্রাম করছে। তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত এমন পথে পরিচালিত হচ্ছে না, যে পথ আল্লাহর নয়। আল্লাহর পথ সে চিনতে ভুল করেছে কিনা, এ ব্যাপারে তার সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। সঠিক পথ কোনটি, এটা চিনতে ভুল করলে শয়তান তাকে এমন পথে পরিচালিত করবে যে, তার কাছে মনে হবে এটাই আল্লাহর পথ। প্রকৃত পক্ষে সেটা শয়তানের পথ।

আল্লাহর পথের সৈনিক জিহাদকারীর দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, তাহলো তারা উচ্ছৃংখল হবে না বরং আনুগত্য পরায়ণ হবে। সংগঠনের নিয়ম-নীতির বিপরীত পথে তারা অগ্রসর হবে না। এমন কোন কাজে তারা জড়িয়ে পড়বে না, যে কাজের দরুন সংগঠন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কোন ধরনের অনিয়মতান্ত্রিকতায় এরা বিশ্বাসও করবে না এবং অনিয়মতান্ত্রিকতাকে তারা প্রশ্রয়ও দিবে না। এরা অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে ও সুদৃঢ় সাংগঠনিকতা সুসংবদ্ধতা ও নিয়মানুগত্যতা সহকারে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করবে। সহযাত্রীর সাথে কোন ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি হলে আল্লাহ ও রাসুল প্রদর্শিত পথে সে মতানৈক্য দূর করবে।

জিহাদকারী তৃতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে, তাহলো এরা প্রতিপক্ষের তথা ইসলামের দুশমনদের মোকাবিলায় ইস্পাত-কঠিন প্রাচীরের মতই দুর্ভেদ্য হবে। বাতিল শক্তি শত-সহস্র বার আঘাত করে, প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারবে না। প্রয়োজনে এরা শাহাদাত বরণ করবে কিন্তু বাতিল শক্তির কাছে মাথানত করবে না। এই ধরনের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে রয়েছে,

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ্ তাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ–

আল্লাহ্ তো ভালোবাসেন সেই লোকদেরকে যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে সংগ্রাম করে যেন তারা ইস্পাত নির্মিত প্রাচীর। (সূরা আস্ সফ-৪)

একতাবদ্ধ হয়ে সংগঠনের মাধ্যমে যারা দ্বিন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করবে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে তাদের মধ্যে অবশ্যই ঐকান্তিক অনুরাগ থাকতে হবে। লক্ষ্য অর্জনের দৃঢ় ইচ্ছা বা সঙ্কল্পই সংগঠনের প্রতিটি নেতা-কর্মীকে আত্মদান ও জীবন কোরবান করার দুর্জয় আবেগে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে। এ কারণেই তারা প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় ইস্পাত কঠিন দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে অবিচল ও অটল হয়ে দৃঢ়পদে দন্ডায়মান থাকতে সক্ষম।

আল্লাহর পথে জিহাদকারী সৈনিকদের ভেতরে নৈতিক চরিত্রের উন্নতমান থাকা একান্তই অপরিহার্য। ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনের নেতা-কর্মী চারিত্রিক মান থেকে নিচে অবস্থান করলে তাদের কারো মধ্যে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা এবং সহমর্মিতা সৃষ্টি হবে না। কেউ কাউকে ভালোবাসবে না, একে অপরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে এবং ফলশ্রুতিতে কোন্দল সৃষ্টি হবে। আর এই কোন্দলই লক্ষ্য অর্জনের পথে বিরাট বাধার বিন্ধ্যাচল তুলে দিবে।

আল্লাহর পথে জিহাদকারী প্রতিটি ব্যক্তিকে নিষ্ঠাবান হতে হবে এবং পরস্পরের প্রতি গভীর আস্থা থাকতে হবে। নিষ্ঠা না থাকলে ইসলামী সংগঠনের কোন কর্মসূচী সুচারুরূপে বাস্তবায়িত হতে পারে না। জিহাদকারী প্রতিটি ব্যক্তির আকিদা বিশ্বাস একই সূত্রে গ্রথিত থাকবে আর এই বিষয়টিই প্রতিটি ঈমানদারকে ঐকমত্য ও ঐক্যবদ্ধ রাখে। এসব বিষয়ে যারা পূর্ণ ও সজাগ দৃষ্টি রেখে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, মহান আল্লাহ তাদেরকেই ভালোবাসেন এবং তাদেরকেই তিনি তাঁর নিয়ামত দান করবেন।

জিহাদ মৃত্যু ভীতি দূর করে

মহান আল্লাহর ওপরে ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তিকে জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হতে হয় এবং এই জিহাদই তার ভেতর থেকে মৃত্যুর ভয় দূর করে দেয়–মৃত্য ভীতি তার ভেতর থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। সত্য কথা বললে, সত্য প্রচার করলে বিরোধী

www.pathagar.com

শক্তি তাকে হত্যা করতে পারে, এ ধরনের ভয় তার ভেতরে থাকে না। ঈমানদার ব্যক্তি বীর মুজাহিদে পরিণত হয়–সে কাপুরুষ হয় না। তার আচার-ব্যবহারে নির্ভীকতা প্রকাশ পায়।

কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় ভয় হলো মৃত্যুকে। যে জিনিস ভীতি সৃষ্টি করে তা থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করা মানুষের স্বভাব। গভীর অরণ্যে হিংস্র জানোয়ার বাস করে। মানুষ এসব হিংস্র জানোয়ার অধ্যুষিত এলাকা এড়িয়ে চলে। বিদ্যুৎ যেন মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে না পারে, প্রাণহানি যেন না ঘটে–এ জন্য মানুষ বিদ্যুতের ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। অর্থাৎ সতর্কতা অবলম্বন করলে যা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, তা থেকে মানুষ সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তির হৃদয়ে এ কথা জাগ্রত থাকে যে, জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। এ দুটো জিনিস আল্লাহর গোলাম। মৃত্যুকে তিনি যখন আদেশ দান করবেন, তখনই সে তার কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসবে। মৃত্যু থেকে কোন ক্রমেই নিজেকে রক্ষা করা যাবে না।

মহান আল্লাহ যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, তা সবই একদিন মৃত্যু বরণ করবে। পৃথিবীতে একজন নাস্তিকও এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, একদিন তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। চোখের সামনে যা কিছুই দেখা যাচ্ছে, তা সবই একদিন মৃত্যু বরণ করবে তথা শেষ হয়ে যাবে। সমস্ত মানুষকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ–

অবশেষে প্রত্যক প্রাণীকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। এবং তোমরা সবাই নিজ নিজ কাজের প্রতিফল পুরোমাত্রায় কিয়ামতের দিন পাবে। সফল হবে মূলত সেই ব্যক্তি, যে সেদিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে ও জান্নাতে দাখিল হবে। বস্তুত এ পৃথিবীটা নিছক একটি বাহ্যিক প্রতারণাময় ব্যতীত আর কিছুই নয়। (সূরা আলে ইমরাণ- ১৮৫)

মৃত্যুও মহান আল্লাহর আদেশ ব্যতীত আসে না। মহান আল্লাহ যখন এ কাজে নিয়োজিত ফেরেশতার প্রতি অর্থাৎ মালাকুল মাউতের প্রতি নির্দেশ দান করেন, তখন তিনি তাঁর কাজ সম্পাদন করেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

www.pathagar.com

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً-

কোন প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত মৃত্যুবরণ করতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো নির্দিষ্টভাবে লিখিত রয়েছে। (সূরা ইমরাণ-১৪৫)

মৃত্যুর ক্ষেত্রে শুধু প্রাণীই নয়–পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই একদিন মৃত্যু বরণ করবে তথা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ -

সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, টিকে থাকবে শুধু তোমার মহীয়ান গরীয়ান রব-এর সত্তা। (সূরা রাহমান-২৬-২৭)

ঈমানদার ব্যক্তি জানে মৃত্যু আল্লাহর নির্দেশেই আগমন করবে। আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ ব্যতিত মৃত্যু কারো ওপর হামলা করতে পারে না। মৃত্যু মহান আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন। এর সময় ও স্থানও পূর্ব নির্ধারিত। এক মুহূর্ত পূর্বে বা পরে কারো মৃত্যু হবে না। নির্দিষ্ট সময়েই মৃত্যু এসে আলিঙ্গন করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لاَيَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلاَيَسْتَقْدِمُوْنَ -

মৃত্যুর সময় পূর্ব নির্ধারিত। এক মুহূর্ত পূর্বেও নয় এবং এক মুহূর্ত পরেও কেউ মৃত্যু বরণ করবে না। (আল কোরআন)

এই মৃত্যু কাউকে ক্ষমা করবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ-

মৃত্যু সে তো তোমরা যেখানেই থাকবে সকল অবস্থায়ই তা তোমাদেরকে গ্রেফতার করবে, তোমরা যত মজবুত দুর্গের মধ্যেই আত্মগোপন করো না কেন। (সূরা নিসা- ৭৮)

জীবের প্রাণ হরণের জন্য মহান আল্লাহ যে ফেরেশ্তাকে দায়িত্ব দান করেছেন, নির্দেশ লাভ করার পর তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَيُفَرِّطُوْنَ-

যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশ্‌তা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজেদের কর্তব্য পালনে তারা একবিন্দু ত্রুটি করে না। (সূরা আন'আম- ৬১)

মৃত্যুর কবল থেকে নিজেকে কোথাও অপ্রকাশিত রাখা যাবে না। আল্লাহ ছুব্‌হানাহু তা'য়ালা বলেন–

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ–

মরণ থেকে পালাও তুমি মরণ তোমায় লইবে ঘিরি, যদিও সুদূর আকাশ পানে লুকাও সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি

এ মহারোগের চিকিৎসক নাই, নেই সে ঔষধ জগতে, খুঁজিয়া কাতর হইলে কি হবে পারিবে না তারে ফিরাতে। (সূরা জুমু'আ-৮)

মৃত্যু যখন আসবেই তখন তাকে ভয় করে কি হবে। এ জন্য ঈমানদার মৃত্যুকে ভয় করে না। সে শুধু মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের পুজি সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। মৃত্যু কোথায় হবে, কি অবস্থায় হবে, সেটাও কেউ বলতে পারে না। মহান আল্লাহ মৃত্যুর স্থানও নির্ধারিত করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন–

وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ–

কোথায় কোন অবস্থায় কে মৃত্যুবরণ করবে, তা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কারো জানা নেই। (সূরা লুকমান)

গত ২০০০ সনের নভেম্বর মাসে আমি লন্ডনে অবস্থানের সময় একটি ঘটনার কথা শুনলাম। পত্রিকায় এ সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল। একজন লোক আট তলা বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে নিচে পড়ে গেল। অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, লোকটি ছিল সম্পূর্ণ অক্ষত। তার দেহের কোন অস্থি ভাঙ্গেনি বা রক্তপাত হয়নি। শুধুমাত্র দেহের ওপরে কয়েক স্থানে চামড়ায় সামান্য আঘাত লেগেছিল। এ অবস্থায় দ্রুত এ্যাম্বুলেন্স ডেকে লোকটিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো হাসপাতালে চেকআপের জন্য। এ্যাম্বুলেন্সে লোকটিকে উঠিয়ে শুইয়ে দিয়ে দরোজা এমন অসতর্কভাবে লাগানো হয়েছিল যে, তা যথাযথভাবে বন্ধ হয়নি। পথিমধ্যে প্রয়োজনে এ্যাম্বুলেন্সের চালক ব্রেক কষলো। ফলে একটা ঝাকুনির সৃষ্টি হলো। আর তখনই অসতর্কভাবে লাগানো দরজা খুলে গেল। সেই সাথে আটতলা থেকে পতিত অক্ষত লোকটি, যাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো চেকআপের জন্য–সে ছিট্‌কে গিয়ে রাস্তার ওপরে পড়ে গেল।

www.pathagar.com

ঠিক সেই মুহূর্তে আরেকটি গাড়ি এসে লোকটিকে রাস্তার সাথে মিশিয়ে দিয়ে গেল। ঘটনাস্থলেই লোকটি মৃত্যুবরণ করলো। আটতলার ছাদের ওপর থেকে লোকটি নিচে পড়ে গেল। চামড়ায় সামান্য আঘাত ব্যতীত লোকটি ছিল সম্পূর্ণ অক্ষত। সেখানে লোকটির মৃত্যু হলো না। দেহে তার অন্য কোন স্থানে কোন ক্ষতি হলো কিনা তা চেকআপের জন্য নিয়ে যাবার পথে ঐ অবস্থায় নিপতিত হয়ে লোকটির মৃত্যু হলো।

মৃত্যুর জন্য দুটো জিনিসের যোগাসূত্রের বা সংযোগের (Combination) অবশ্য প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট সময় আর দ্বিতীয়টি হলো নির্ধারিত স্থান। এসব বিষয় ঈমানদার ব্যক্তির দৃঢ় প্রত্যয় থাকে। আর এ কারণেই সে দুর্জয় মনোবলের অধিকারী হয়। ঈমান তার ভেতরে এক অজেয় মানসিক শক্তি সৃষ্টি করে। কোন ভয় তাকে স্পর্শ করতে পারে না। মুমীনের হৃদয় হয় মৃত্যুভীতি শূন্য। পৃথিবীর কোন শক্তি আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তার মৃত্যু ঘটাতে পারে এ কথা সে বিশ্বাস করে না।

ঈমানদার জানে, মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে না, তাহলে কেন সে মৃত্যুকে ভয় করবে। সে শয্যাশায়ী হয়ে মৃত্যুবরণ করাকে অবমাননাকর মনে করে। সে শহিদী মৃত্যু অনুসন্ধান করে। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাতিল শক্তির সাথে লড়াই করে সে মৃত্যুকে বরণ করতে যায়। সে বিশ্বাস করে, পৃথিবীতে শৃগালের মতো কয়েক শত বছর জীবিত থাকার মধ্যে কোন গৌরব নেই। সিংহের মতো বীরত্বের সাথে পাঁচ মিনিট জীবিত থাকার মধ্যে গৌরব নিহিত। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের মতো পঞ্চাশ বছর জীবিত থাকার মধ্যে লাঞ্ছনাই নিহিত থাকে, সিরাজ-উদ্দৌলার মতো কয়েক ঘন্টা জীবিত থাকাই হলো আত্মমর্যাদার বিষয়।

ঈমান আনার পরে মানুষের ভেতরে এ ধরনের আত্মমর্যাদা আর বীরত্ব, অজেয় মনোবল, নির্ভীকতা সৃষ্টি হয় বলে সে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সেই অনন্ত সুখের জীবনের জন্য উৎসর্গ করে দেয়। ঈমানদার সব সময় শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করে। সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানায়, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে কাপুরুষের মতো মৃত্যু দিও না। আমাদেরকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করো।'

ঈমানদার শয়নে স্বপনে জাগরণে শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করে। শাহাদাত বরণ করার ভেতরেই সে তার জীবনের সার্থকতা নিহিত রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। ঈমান মানুষের ভেতরে দুর্বিনীত সাহস আর প্রচন্ড বীরত্ব সৃষ্টি করে দেয় বলে, সে বাতিল শক্তির আধিক্য দেখে বিচলিত হয় না। কারণ তাঁর আল্লাহ তাকে বলে দিয়েছেন–

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا–

নিশ্চয় শয়তানের শক্তি অত্যন্ত দুর্বল। (সূরা নিসা)

www.pathagar.com

ঈমানদার জানে, ইসলাম বিরোধী বাতিল শক্তি দেখতে বিশাল হলেও তাদের কোন মনোবল নেই, সাহস নেই। এরা সেই অগণিত পাখির ঝাঁকের মতো। শুধু একটি মাত্র শব্দেই সব পালিয়ে যায়। ঈমানদার জানে তাঁর শক্তির উৎস হলো ঐ আল্লাহ–যিনি অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী শক্তি। আল্লাহ্ হলেন তাঁর অভিভাবক। আর বাতিল শক্তির অভিভাবক হলো শয়তান। আর শয়তানের শক্তি হয় মাকড়সার জালের মতই ভঙ্গুর। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا، وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ –

যেসব লোক আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্ত হলো মাকড়সার মতো। মাকড়সা নিজের জন্য ঘর নির্মাণ করে। আর সব ঘরের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল হলো মাকড়সার ঘর। (সূরা আনকাবুত-৪১)

ঈমানদার ব্যক্তি জানে, বাতিলের অভিভাবক হলো শয়তান আর মুমীনের অভিভাবক হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ ছুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা। এ কারণে মুমীন বাতিল শক্তির কোন পরোয়া করে না। আল্লাহ্র ওপরে ঈমান আনার কারণে মুমীন অকুতোভয় মর্দে মুজাহিদে পরিণত হয়। পৃথিবীর কোন শক্তিকে সে ভয় পায় না। ইতিহাসে এর অসংখ্য ঘটনা সোনালী অক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

বদরের যুদ্ধের প্রস্তুতি পূর্বে নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করে পরিস্থিতি ব্যখ্যা করলেন। নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম প্রাণ স্পর্শী ভাষন দান করলেন। ফলে উপস্থিত সকলেই আল্লাহ্র রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। বিশ্বনবী মদীনার আনসারদের দিকে এমন এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন সে দৃষ্টির উদ্দেশ্য তাঁরা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করেছিল।

নবী করীম (সাঃ) ইতোপূর্বেও আনসারদের কোন অভিযানে প্রেরণ করেননি। কারণ তাঁরা নবীর কাছে এই শর্তে বাইয়াত করেছিল যে, শত্রুপক্ষ মদীনা আক্রমন করলে তাঁরা প্রতিরোধ করবে, তখন তাঁরা যুদ্ধ করবে। আল্লাহ্র রাসুল (সাঃ) তাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ মাত্র মদীনার আনসাররা শাহাদাতবরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

মদীনার খাজরাজ গোত্রের নেতা হযরত সায়াদ ইবনে উবাদা (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে রাসূল (সাঃ) কে বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার ইশারাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ঐ আল্লাহ্র কসম! যাঁর হাতে আমাদের প্রাণ, আপনি ইশারা করলেই আমরা বিশাল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।'

www.pathagar.com

নবী করীম (সাঃ) হয়ত স্পষ্ট নির্দেশ দিতে বিব্রত বোধ করছিলেন। কারণ, বদরের রণপ্রান্তরে হক ও বাতিলের–দু'পক্ষেরই সৈন্য বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি দন্ডায়মান হবে। উভয় বহিনীর সৈন্যই পরস্পরের পরিচিত। শুধু পরিচিতই নয়–তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। রক্তের বন্ধনে একে অপরে জড়িত। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে আজ পিতার সাথে পুত্রের। চাচার সাথে ভাতিজার। ছোট ভাইয়ের সাথে বড় ভাইয়ের। সবার হাতেই রক্ত পিপাসু উন্মুক্ত তরবারী থাকবে। পিতা মহাসত্য ইসলামের পক্ষে আর পুত্র বাতিল শক্তি মিথ্যার পক্ষে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে মরণপণ সংঘাত হবে। একজন অপরজনকে এই পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় করে দেবার লক্ষ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েই বদরের রণপ্রান্তরে পরস্পরের মুখোমুখি দন্ডায়মান হবে।

কিন্তু কেন–কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পবিত্র রমজান মাসে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে এই প্রাণক্ষয়ী-রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে! এই যুদ্ধের কারণ হলো, মানুষের বানানো মতবাদ মতাদর্শ ও আইন-কানুনের ধারক-বাহকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠাকামীদের এ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে। নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের চিরদিনের জন্য স্তব্দ করে দেয়ার জন্যে বাতিল শক্তি মরণ কামড় দেবার উদ্দেশ্যে মারণাস্ত্র হাতে বদরের প্রান্তরে জমায়েত হবে।

একদিকে প্রতিপক্ষের তুলনায় মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। তেমন কোন অস্ত্রও নেই। অপরদিকে সন্তানের বিরুদ্ধে পিতাকে, পিতার বিরুদ্ধে সন্তানকে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে যুদ্ধের কলা-কৌশল শিক্ষা দিতে সিপাহসালার নবী করীম (সাঃ) ইতস্ততঃ বোধ করছিলেন। কিভাবে তিনি সন্তানকে আদেশ করবেন নিজের জন্মদাতা পিতার বুকে অস্ত্রের নির্মম আঘাত করতে ! কি করে তিনি পিতাকে আদেশ দিবেন তারই কলিজার টুকরা সন্তানের ওপরে নিষ্ঠুর হাতে তরবারীর আঘাত করতে !

মদীনার আনসার যুবক সাহাবী হযরত মিকদাদ (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)কে বললেন–

فَقَالَ نَقُوْلُ كَمَا قَالَ مُوْسٰى اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ
وَلٰكِنْ نُقَاتِلُ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَ خَلْفَكَ–

হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো সত্যের পক্ষে যুদ্ধ করছেন, কোথায় কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা কত সেটা বিবেচনার কোন বিষয় নয়। বরং আপনি আমাদেরকে আদেশ করুন আমাদেরকে কি করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে যেদিকে নিয়ে যেতে আদেশ করেন আপনি আমাদেরকে সেদিকে নিয়ে

www.pathagar.com

চলুন। আমরা হযরত মুছা (আঃ) এর উম্মতের মত বলবো না যে-হে মুসা! তুমি আর তোমার আল্লাহই যুদ্ধ করো, আমরা নিরাপদে বসে থাকি। বরং আমরা আমাদের শরীরে শেষ রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত আপনার আদেশ পালন করবো। আপনি আমাদেরকে যে দিকে নিয়ে যেতে চান আমরা আপনার আদেশে সেদিকেই যাবো। আল্লাহ্ আপনাকে যা করতে আদেশ করেছেন আপনি তাই করুন এবং আমাদেরকে পরিচালিত করুন। আমরা আমাদের চোখের শেষ পলক পড়া পর্যন্ত আপনার আনুগত্য করবো।'

হযরত মিকদাদ (রাঃ) এর এ ঘটনাটি বোখারী হাদীসের কিতাবুল মাগাযীতে এসেছে, হযরত ইবনে মাসুদ (রাঃ) বলেন-আমি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদের এমন একটি ঘটনা দেখেছি যা আমি করে থাকলে যে কোন সমপর্যায়ের জিনিষ থেকে তা আমার কাছে অধিকতর প্রিয় মনে করতাম।

যুবক সাহাবী হযরত মিকদাদের মুখে এ ধরণের উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা শুনে নবী করীম (সাঃ) ভীষণ খুশী হলেন। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, ইসলামী আন্দোলনে যুবকদের অবদানই সবচেয়ে বেশী। যুবকদের রক্তই হলো ইসলামের ভিত্তি (Foundation). যুবকরাই অকাতরে রক্ত দিয়ে ইসলামকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বদরের যুদ্ধের ইতিহাসে দেখা যায়, কুরাইশরা মক্কা থেকে যুদ্ধের জন্য প্রচুর জিনিষ পত্র এবং রসদ নিয়ে বদরের ময়দানে এসেছিল। তাদের বাহিনীতে ছিল এক হাজার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোদ্ধা। সবার কাছেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত অস্ত্র ছিল। এক হাজার যোদ্ধার মধ্যে একশতজন ছিল অশ্বারোহী। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ছিল এই সমস্ত অশ্বের পৃষ্ঠে। কুরাইশদের সেনাপতি ছিল ওৎবা ইবনে রাবিয়া। তাদের বাহিনীর খাওয়ার ব্যবস্থা হত এভাবে যে, উমাইয়া, আবু জেহেল, আব্বাস ইবনে আমর, নজর ইবনে হারিস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পালা করে দশটি উট জবেহ করে যোদ্ধাদের খাওয়াতো।

বদরের প্রান্তরে কুরাইশরা প্রথমে এসে পৌছেছিল। সুতরাং সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে তারা ঘাঁটি বানিয়ে দখল করেছিল। পানির কূপগুলো বা ঝর্ণাসমূহ সবই ছিল কুরাইশদের নিয়ন্ত্রণে। মুসলিম সৈন্যদের পায়ের নীচে ছিল শুধু বালু। আর কুরাইশদের পায়ের নীচে ছিল মাটি। মুসলিম সৈন্যদের পদ যুগল বালুর ভেতর ধ্বসে যেত। অর্থাৎ ইসলামী বাহিনী যে স্থানে অবস্থান করছিল, তা ছিল সম্পূর্ণভাবে সামরিক দিক দিয়ে অযোগ্য এবং অনুপযোগী।

যুদ্ধের এই স্থান দেখে হযরত হুব্বান ইবনে মুনজের (রাঃ) আল্লাহর রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যুদ্ধের জন্য যে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে, তা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর ভিত্তিতে না সামরিক কৌশল

www.pathagar.com

হিসাবে? নবী করীম (সাঃ) জানালেন, 'ওহীর ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করা হয়নি। এই স্থান আমি নির্বাচন করেছি।'

হযরত হুব্বান (রাঃ) তখন নবী করীম (সাঃ) কে পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ স্থান নির্বাচন করা ঠিক হয়নি। এখন আমাদের উচিত অন্যস্থানে সরে পড়া এবং পানির কূপগুলো দখল করা ও অন্য কূপগুলো অকেজো করে দেয়া। আমরা সে কূপের ওপরে চৌবাচ্চা বানিয়ে পানি সংরক্ষণ করতে পারবো।'

নবী করীম (সাঃ) সাহাবীর পরামর্শে তাই করলেন। সেদিন রাতে প্রচন্ড বৃষ্টি হলো। ফলে কুরাইশদের পায়ের নীচের মাটি হয়ে গেল কর্দমাক্ত এবং মুসলমানদের পায়ের নীচের বালু জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গেল। মুসলমানদের পানির কোন কষ্ট আর থাকলো না। বদরের যুদ্ধে মহান আল্লাহ এই বৃষ্টি দান করেও যে রহমত করেছিলেন, সে কথা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। বিশ্বনবী ছিলেন করুণার মূর্ত প্রতীক। তিনি যুদ্ধের ময়দানেও প্রাণের শত্রুর প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করেছেন। বদরের ময়দানে শত্রুকেও তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন পানি ব্যবহারের সুযোগদান করেছিলেন।

সাহাবায়ে কেরাম রাতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সে ঘুমের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের শারিরীক ক্লান্তি দূর করে দিয়ে শরীরকে সতেজ করে দিলেন। সে রাতে সবাই ঘুমালেও নবী করীম (সাঃ) ঘুমাননি। তিনি সারা রাত সিজদায় থেকে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন, 'হে আল্লাহ! আমার যতটুকু সম্বল ছিল, আমি তাই নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। বিজয়দানের মালিক আপনি। আপনি আজ সাহায্য করুন। আপনার সাহায্য না এলে আজ আপনার নাম নেয়ার মত আর একটা লোকও অবশিষ্ট থাকবে না।'

আল্লামা শিবলী নোমানী (রাহ) লিখেছেন, 'বিজয়দান করা হবে এ সংবাদ নবী করীম (সাঃ) কে দেয়া হয়েছিল। সমগ্র পৃথিবীর সকল বস্তু সে সময় আল্লাহর নবীকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল। আল্লাহর ফিরিশতারা সাহায্য করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তবুও আল্লাহর রাসূল কারণ সমৃদ্ধ পৃথিবীর নিয়ম নীতি অনুসরণ করে সামরিক নীতির প্রেক্ষাপটে মুসলিম সেনাবাহিনীকে বিন্যাস করেছিলেন। মক্কার মুসলমানদের পতাকা দিলেন হযরত মুনজির ইবনে উমায়ের (রাঃ) এর হাতে। মদীনার খাজরাজ গোত্রের আনসারদের পতাকা দিলেন হযরত হুবাব ইবনে মুনজির (রাঃ) এর হাতে। মদীনার আউস গোত্রের আনসারদের পতাকা দিলেন হযরত সায়াদ ইবনে মুয়াজ (রাঃ) এর হাতে।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আয়োজন সুসম্পন্ন। গভীর রজনী। মরুময় প্রান্তর। মাথার ওপরে তারা জ্বলা আকাশ। দূর নিহারিকা কুঞ্জের আলোকচ্ছটা মরুর বালুকা রাশির ওপরে

www.pathagar.com

নিপতিত হয়ে বালুকা কণাগুলো যেন চিক্ চিক্ করছে। আগামী কাল ঊষা লগ্নে পূর্ব গগনে তরুণ তপন উদিত হয়ে তার কিরণচ্ছটা বদরের প্রান্তর আলোকিত করার সঙ্গে সঙ্গেই রক্ত হীম করা রণদামামা ভয়ংকর শব্দে বেজে উঠবে।

পরদিন সকালেই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। সেদিন ছিল হিজরী দ্বিতীয় সালের ১৭ই রমজান। নবী করীম (সাঃ) পবিত্র হাতে একটি তীর নিয়ে সৈন্যদের বুহ্য রচনায় মনোনিবেশ করলেন। হাতের তীরের ইশারায় তিনি বুহ্য ঠিক করতে লাগলেন। এ অবস্থায় কোলাহল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মুসলিম বাহিনীর ভেতরে কোন কোলাহল ছিল না। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন, যেন কোন ধরণের শোরগোল না হয়। প্রচন্ড ঝড়ের পূর্বে সাগর যেমন শান্ত থাকে, তাওহীদের এই বাহিনীর অবস্থা ছিল ঠিক তেমনি। কারো ভেতরে উদ্বেগ নেই, শত্রু সংখ্যা তাদের তুলনায় তিনগুণ। এ কারণে কারো মনে দুশ্চিন্তা নেই। তাওহীদের এই ক্ষুদ্র বাহিনীর প্রতিটি সৈন্যর চেহারা থেকে আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার পবিত্র দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

গোটা দুনিয়াবাসীর কাছে সে দৃশ্য ছিল বড় অদ্ভুত। বদরের প্রান্তরের প্রতিটি অনু পরমানু দেখছিল, পৃথিবীর কোন সামান্য স্বার্থও তাদের সামনে উপস্থিত ছিল না, অথচ তাঁরা অকাতরে তাদের প্রাণ বিলিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত। কেউ তাঁর মা'কে সন্তানহারা করতে, কেউ তাঁর সন্তানকে পিতাহারা করতে, কেউ তাঁর স্ত্রীকে স্বামীহারা করতে প্রস্তুত। সীরাতে ইবনে হিশামে বর্ণনা করা হয়েছে, সকালে কুরাইশরা বালুর টিলার ওপার থেকে এপারে চলে এলো। আল্লাহর নবীর জন্য সাহাবা কেরাম পানির একটা চৌবাচ্চা নির্মাণ করেছিলেন। কুরাইশরা সে চৌবাচ্চার দিকে অগ্রসর হতে থাকলো। সাহাবাদের মনোভাব ছিল তাঁরা প্রতিপক্ষকে বাধা দান করবে। নবী করীম (সাঃ) তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে আদেশ দিলেন, 'তাদেরকে বাধা দিও না।'

নবীর জন্য নির্মিত চৌবাচ্চা থেকে কুরাইশরা পানি পান করতে থাকলো। তারা ধারণা করলো, এটা তাদের প্রাথমিক বিজয়। কারণ, মুহাম্মদ (সাঃ) এর চৌবাচ্চা থেকে তারা পানি পান করেছে। মুসলমানদের ক্ষমতা হয়নি তাদেরকে বাধাদান করা।

আসলে তারা তো তখন নবী করীম (সাঃ) এর চৌবাচ্চা থেকে পানি পান করেনি, তারা পান করেছিল মৃত্যুর শরবত। কারণ, যে সকল ব্যক্তি তখন ঐ চৌবাচ্চার পানি পান করেছিল, তাদের ভেতরে একজনও সেদিন বদরের প্রান্তর থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারেনি। হাকিম ইবনে হিজাম নামক একজন কুরাইশও চৌবাচ্চার পানি পান করতে এসেও সে পানি পান করেনি। সেদিন সে নিহতও হয়নি। পরবর্তীতে সে মুসলমান হয়েছিল। সেদিনের ঘটনাকে সে আজীবন স্মরণে রেখে

www.pathagar.com

প্রায়ই বলতো, 'মহান আল্লাহর কসম! বদরের দিনে আল্লাহ আমাকে হেফাজত করেছিলেন।'

তিনগুন বেশী সৈন্য সংখ্যা ও হাজার গুণ বেশী যুদ্ধের রসদ নিয়ে প্রতিপক্ষ সামনে মৃত্যু দূতের মতই দন্ডায়মান। সাহাবায়ে কেরামের একজনের চেহারাতেও কোন সামান্যতম প্রতিক্রিয়া নেই। যেন তাঁরা নিশ্চিত, আল্লাহ তাদেরকে এই বিশাল বাহিনীর ওপরে বিজয় দান অবশ্যই করবেন। এই সময়ে একজন সৈন্য বৃদ্ধি পেলেও তা ছিল মুসলমানদের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর সামান্য কিছুক্ষণ পরেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।

আল্লাহর রাসূলের দৃষ্টি মহান আল্লাহর সাহায্যের দিকে নিবদ্ধ। তিনি কখনো সেজদায় যাচ্ছেন, আবার কখনো দু'হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছেন। হযরত হুযায়ফা ইবনে আয়ামান (রাঃ) এবং হযরত হাবল (রাঃ) বদরের মুসলিম বাহিনীর দিকেই আসছিলেন। কুরাঈশরা তাদেরকে বাধা দিল। তাঁরা যখন ওয়াদা করেছিল, তাঁরা যুদ্ধে যোগদান করবে না, তখন তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। রাসূলের কাছে এসে তাঁরা ঘটনা জনালেন। নবী করীম (সাঃ) নির্বিকার চিত্তে জবাব দিলেন, 'আমরা যে কোন পরিস্থিতিতে অঙ্গীকার পালন করবো, এ সময়ে আমাদের জন্য প্রয়োজন একমাত্র মহান আল্লাহর সাহায্য।'

কুরাইশরা তাদের ভেতর থেকে ওমায়ের ইবনে ওহাব নামক একজনকে প্রেরণ করলো, মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা কত তা জানার জন্য। সে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা দেখে গিয়ে কুরাইশ নেতাদেরকে জানালো, 'আমার অনুমান তাঁরা তিনশতের বেশী হবে না। তবে একটা বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত হও যে, মদীনার উটগুলো তোমাদের জন্য নিশ্চিত মৃত্যু বহন করে এনেছে। কারণ, মুসলমানদের চেহারায় ভয়ের কোন চিহ্ন নেই। আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি, ওদের একজন নিহত হলে, তোমাদেরও একজন নিহত হবে। তখন তোমরা যদি বিজয়ীও হও, সে বিজয়ের মধ্যে কোন গৌরব থাকবে না। অতএব সময় থাকতে ফিরে যাওয়াই উত্তম।'

এভাবে অনেকেই সেদিন যুদ্ধ শুরুর কিছুক্ষণ পূর্বেও যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। স্বয়ং সেনাপতি ওৎবার ইচ্ছা ছিল না অহেতুক যুদ্ধ করার। কিন্তু আবু জেহেলের হঠকারিতা আর বৃথা অহংকারের জন্য কুরাইশদেরকে অকাতরে প্রাণ দিতে হয়েছিল। আসলে সেদিনটি ছিল আবু জেহেলের গর্ব অহংকার চূর্ণ বিচূর্ণ হবার দিন। এ কারণেই বুঝি সে প্রচন্ড আক্রোশে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। এই বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে তাওহীদের আওয়াজ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এটা যেন নির্ভর করছে এই সামান্য তিনশত তেরজন মানুষের ওপরে। এ কারণেই বুঝি মুসলিম মুজাহিদদের চেহারায় শাহাদাতের অদম্য নেশা। এরা

www.pathagar.com

যুদ্ধে এসেছে বাতিল শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আল্লাহর জমিনে আল কোরআনের রাজ কায়েম করার জন্য। মানুষকে মানুষের বানানো আইন-কানুনের জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর গোলামে পরিণত করতে। তাদের একমাত্র সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ। আর আল্লাহর ওপরে নির্ভর করেই তাঁরা এসেছে বদরের প্রান্তরে বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।

বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, অন্যান্য হাদিস গ্রন্থ, এবং বিভিন্ন ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সময়ে নবী করীম (সাঃ) এর অবস্থা কেমন ছিল। তাঁর গোটা মুখমন্ডলে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের পূর্ণ অনুরাগ পরিস্ফুটিত হচ্ছিল। একান্ত মনোনিবেশের অবস্থা তাঁর ভেতরে বিরাজিত ছিল। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বলছিলেন– হে আমার আল্লাহ! আজ তুমি তোমার অঙ্গীকার পালন করো। আজ যদি তুমি সাহায্য না করো তাহলে এই জমিনে তোমার নাম নেয়ার মত আর কেউ থাকবে না।' কখনো তিনি সিজদা দিয়ে বলছিলেন, 'আজ তুমি তোমার ওয়াদা পূরণ করো। হে আমার আল্লাহ! আজ যদি তোমার এই সামান্য সংখ্যক বান্দাহ এই ময়দানে বাতিলের হাতে শেষ হয়ে যায়, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তোমার এই পৃথিবীতে তোমার দাসত্ব করার মত আর কেউ থাকবে না।'

নবী করীম (সাঃ) এর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তাঁর কাঁধ মোবারক থেকে পবিত্র চাদর পড়ে যাচ্ছিল, সেদিকে তাঁর কোন অনুভূতি ছিল না। সাহাবা কেরাম নবীর এই অবস্থা দেখছিলেন। নবীর এই ব্যকুলতা সাহাবাদের মধ্যেও সংক্রামিত হলো। হযরত আবু বকর (রাঃ) নবীর এই অবস্থা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বললেন–যথেষ্ট হয়েছে, আপনি এত ব্যকুল হবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সাহায্য করবেন।

নবী করীম (সাঃ) এর দোয়া মহান আল্লাহ মঞ্জুর করলেন। বদরের প্রান্তরে মহান আল্লাহ ফিরিশতা প্রেরণ করে মুসলমানদের সাহায্য করলেন। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ، فَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ،
اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلاٰفٍ مِّنَ
الْمَلٰئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ، بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ
هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلاٰفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ،
وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ، وَمَا النَّصْرُ اِلَّا

www.pathagar.com

مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَائِبِيْنَ-

আর বদরের যুদ্ধের দিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন অথচ তখন তোমরা দুর্বল ছিলে। তাই আল্লাহ্কে ভয় করো যাতে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারো। (হে নবী) যে সময় আপনি মুমিনদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের জন্য এটি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ্ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। হ্যাঁ, তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং আল্লাহকে ভয় করো আর তারা (কাফিররা) যদি তোমাদের ওপরে আক্রমণ করে বসে তাহলে তোমাদের রব তোমাকে পাঁচ হাজার আক্রমণকারী ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করবেন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এ হচ্ছে একটি শুভ সংবাদ, এর দ্বারা যাতে তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। বস্তুতঃপক্ষে সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে যিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। এই ভাবেই আল্লাহ্ কাফিরদের দলবলকে ধ্বংস করে দেবেন আর তারা নিরাশ ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে। (সূরা ইমরান-১২৩-১২৭)

নবী করীম (সাঃ) তাঁর স্থানে বসে বারবার আল্লাহ্র কাছে সাহায্য কামনা করছিলেন। সীরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হঠাৎ করেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তারপর তাঁর তন্দ্রাভাব কেটে যেতেই তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ) কে বললেন, 'আবু বকর! সুসংবাদ শোন। আল্লাহ্ সাহায্য প্রেরণ করেছেন। ঐ দেখো, হযরত জিবরাইল একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তার লাগাম ধরে আসছেন। তাঁর কাপড়ের ভাঁজে ধূলা জমে রয়েছে।'

এ কথা বলেই নবী করীম (সাঃ) তাঁর স্থান ত্যাগ করে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। তিনি সাহাবাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'সেই মহান আল্লাহ্র কসম! যার হাতে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রাণ, আজ যে ব্যক্তি কাফিরদের সাথে ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে যুদ্ধ করবে এবং শুধু সামনের দিকেই অগ্রসর হতে থাকবে, কোন অবস্থাতেই পিছে সরে আসবে না, মহান আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দান করবেন।'

কোন বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্র নবী বলেছিলেন–

قُوْمُوْا اِلٰى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضُ-

www.pathagar.com

ওঠো এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত জান্নাতের দিকে এগিয়ে চলো। যে জান্নাত নির্মিত হয়েছে এবং নির্বাচিত করা হয়েছে, আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদদের জন্য।'

বনী সালামা গোত্রে উমাইয়া ইবনে হুমাম (রাঃ) বয়েসে ছিলেন একেবারে তরুণ। তাঁর চেহারায় তারুণ্যের উজ্জ্বলতা পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর মতই যেন দ্যুতি ছড়িয়ে দিচ্ছিল বদরের প্রান্তরে। তারুণ্যের সন্ধিক্ষণে শরীর থেকে তাঁর সুষমার দিপ্তী বদরের প্রান্তর যেন আলোকিত করেছিল। তিনি বসে খেজুরের ছড়া থেকে খেজুর খাচ্ছিলেন। প্রিয় নবীর কথা তাঁর কর্ণ কুহরে যেন মধু বর্ষণ করলো। তাঁর মুখ থেকে শব্দ বের হলো, 'বাখ্ বাখ্'।

হাদীস শরীফে ব্যবহৃত এই 'বাখ্ বাখ্'' শব্দ দুটো আরবী আঞ্চলিক ভাষার। আরবী অভিধানে এ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'আয় মা আ'যামাহু আয় মা আহছানাহু'। অর্থাৎ কি সুন্দর! কতই না চিত্তাকর্ষক! কত মূল্যবান! মর্যাদা আর সৌন্দর্যরাশি যেখানে অফুরন্ত! নবী করীম (সাঃ) সেই তরুণ সাহাবীর মুখে ঐ 'বাখ্ বাখ্' শব্দ শুনে তাঁর দিকে পবিত্র আঙ্গুলের ইশারা দিয়ে দেখিয়ে বললেন–

اِنَّكَ مِنْ اَهْلِهَا–

জান্নাতের অধিকারীদের মধ্যে তুমি একজন।

নবী করীম (সাঃ) এর মুখে এ কথা শুনে তরুণ সাহাবী উমাইয়েরের হৃদয়ে যেন খুশীর প্লাবন প্রবাহিত হলো। তিনি খেজুরগুলো দূরে নিক্ষেপ করে চিৎকার করে বললেন, 'হাতে এত খেজুর! এগুলো খেয়ে শেষ করতে তো অনেক সময়ের প্রয়োজন! এত সময় ধরে খেজুর খেতে থাকলে জান্নাতে যেতে দেরী হয়ে যাবে।'

এ কথা বলে তিনি দ্রুত ছুটে গেলেন শত্রুর বুহ্যের দিকে। প্রচন্ড বেগে তরবারী চালিয়ে তারপর এক সময় নিজে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে আল্লাহর জান্নাতে চলে গেলেন। যুদ্ধাবসানে আল্লাহর রাসূল তাঁর এই তরুণ সাহাবীর লাশের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর পবিত্র আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখিয়ে বললেন–তুমি আল্লাহর জান্নাতে যাবার আশায় খোরমা খাবার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তা ব্যয় করোনি, হাতের খোরমা ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়েছো, আমি আল্লাহর রাসূল সাক্ষী দিচ্ছি, অবশ্যই সে জান্নাত তোমার জন্য অবধারিত।

সুতরাং মুমীন ব্যক্তি কখনও মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর লক্ষ্য অর্জনের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। সে এ কথা বিশ্বাস করে, কোন বুলেটের ওপরে যদি তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোটা পৃথিবীর জনবল তাকে প্রহরা দিয়ে, নিরাপত্তা দিয়ে ঐ বুলেট থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না। আর যদি কোন বুলেটে তার

www.pathagar.com

নাম লিপিবদ্ধ না হয়ে থাকে, তাহলে গোটা পৃথিবীর মানুষ তার বক্ষদেশ লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো বুলেট বর্ষণ করলেও একটি বুলেটও তাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না। এই বিশ্বাসই ঈমানদারকে দুর্বার. দুর্বিনীত দুর্জেয় করে তোলে। আর এই ধরনের দুর্জেয় শক্তির অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব হতে পারে না। একজন মুমীন এই দুর্জেয় ঈমানের অধিকারী হয়েছে আল্লাহ্ তা'য়ালার ঘোষণা শুনে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ عَهْدٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ–

এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত বান্দার কোন ক্ষতি সাধন কেউ করতে সক্ষম নয়। (আল কোরআন)

মুমীন ব্যক্তি কোন ক্ষতির ভয় করবে না। ক্ষতি যদি তার হয়ই তাহলে সে এ কথাই বিশ্বাস করবে, স্বয়ং আল্লাহ্ তার তক্দীরে এটা নির্ধারণ করেছিলেন। বাহ্যিক কোন ক্ষতি দেখেও সে তার লক্ষ্য পথ থেকে একবিন্দু সরে আসবে না। হয় সে প্রাণ দান করে শাহাদাত বরণ করবে না হয় সে বিজয়ী হয়ে গাজীর মতই ফিরে আসবে। ঈমানদার ব্যক্তি জানে তাঁর নিজের বলতে কিছুই নেই। সবকিছু তার কাছ থেকে আল্লাহ্ তা'য়ালা ক্রয় করে নিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا–

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা মুমীনের কাছ থেকে তাদের হৃদয়-মন এবং তাদের ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে মারে এবং মরে। তাদের প্রতি জান্নাত দানের যথার্থ ওয়াদা করা হয়েছে। (সূরা তাওবা- ১১১)

মুমীনের প্রাণ, ধন-সম্পদ যা কিছু রয়েছে, এসব দান করেছেন আল্লাহ্ এবং ক্রয়ও করে নিয়েছেন আল্লাহ্। বিনিময়ে তাকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে জান্নাত দান করা হবে। একজন মানুষ যখন ঈমান আনে, তখন সে এই উপকারীতা লাভ করে যে, তার ভেতরে কোন ভীতি থাকে না। সংগ্রামের ময়দানে কোন ধরনের দুশ্চিন্তা তার ভেতরে বাসা বাঁধে না। তার আদর্শের ওপরে কেউ আঘাত করলে সে তা সহ্য করতে পারে না, সিংহ গর্জনে রুখে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

ভারতে যখন মুসলমানদের হৃদপিন্ড আল্লাহর কোরআনকে বাতিল করে দেয়ার আবেদন করে কোর্টে মামলা দায়ের করলো অমুসলিমগণ। তখন দিল্লীর জামে মসজিদের ইমাম বোখারী কোন শক্তির রক্তচক্ষু দেখে ভয় করেননি। তাঁর বক্তৃতার ক্যাসেট আমি শুনেছি। তিনি হিন্দু ভারতের কলিজার ওপরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'এ ভারত আমার। কুতুব মিনার আমরা বানিয়েছি। তাজমহল আমরা নির্মাণ করেছি। শীশমহল আমরা তৈরী করেছি। দেওয়ানে আম, দেওয়ানে খাস আমাদের। আমরা মুসলমানরা এই ভারত দীর্ঘ আটশত বছর শাসন করেছি। শ্রীহীন এই ভারতকে পত্র-পল্লবে ফুলে ফলে আমরাই সজ্জিত করেছি। সুতরাং ভারতের কোন বিচারক যদি 'কোরআনকে বাতিল করা হলো' বলে রায় ঘোষণা করে, তাহলে আমি সেই বিচারকের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আমার বাম হাত দিয়ে তার মুখের জিহ্বা টেনে ছিড়ে ফেলবো।'

ঈমান মানুষকে এভাবেই নির্ভীক করে তোলে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার অপরাধে (?) সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রাহঃ)-কে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হলো। তাঁর কক্ষের ভেতরে হিংস্র শিকারী কুকুর প্রেরণ করা হলো। কুকুর তাঁর দেহের গোস্ত ছিন্ন ভিন্ন করে খুব্লে তুলে নিবে, এ জন্যই ইসলামের দুশমনরা তাঁর ওপরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। কক্ষের বাইরে জালিমের দল অপেক্ষা করছিল সাইয়েদ কুতুবের আর্তচিৎকার শোনার জন্য।

দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হবার পরও যখন সামান্য শব্দ শোনা গেল না, তখন জালিমের দল কক্ষের দরজা উন্মুক্ত করে দেখতে পেল, আল্লাহর মুমীন বান্দা সাইয়েদ কুতুব (রাহঃ) মহান আল্লাহর দরবারে সেজ্দায় অবনত হয়ে রয়েছেন আর প্রেরিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরগুলো তাঁর চারদিকে বসে তাঁকে প্রহরা দিচ্ছে। পরবর্তীতে তাঁকে বিচারের নামে প্রহসন করে জালিমের দল ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শহীদ করে দিয়েছে। তাঁকে ফাঁসি দেবার পূর্বে জালিম সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন মাওলানা তাঁর কাছে এসে তাঁকে তওবা করে কালিমা পাঠ করার অনুরোধ করেছিলেন। তিনি সরকারের বেতনভুক্ত সেই মাওলানাকে নির্ভীক চিত্তে বলেছিলেন, 'মাওলানা সাহেব! আপনি সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে এসেছেন আমাকে কালিমা পড়ানোর জন্য। আপনি আমাকে কালিমা পড়িয়ে অর্থ লাভ করবেন। আর আমি কালিমা পাঠ করে এই কালিমার হক আদায় করবো বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম, এ কারণেই আমাকে আজ ফাঁসির রজ্জু গলায় ধারণ করে এ পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করতে হচ্ছে।'

ফাঁসির রজ্জু যখন তাঁর গলায় পরিয়ে দেয়া হচ্ছিলো তখন তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছিলেন, 'কোথায় কি অবস্থায় আমি মৃত্যুবরণ করছি এটা আমার চিন্তার বিষয় নয়,

www.pathagar.com

আমি যে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারছি, এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা।' এই হলো ঈমানের পরিচয়। ঈমানদার প্রাণ দান করতে পারে, কিন্তু বাতিলের সাথে আপোষ করতে জানে না। তাঁর ঈমান এতটা শক্তি তাকে দান করে যে, আপোষের কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'য়ালাকে কিভাবে সে সন্তুষ্ট করবে, এই চিন্তাই তাকে সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত আচ্ছন্ন করে রাখে।

জিহাদের সম্মান ও মর্যাদা

এ কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করে এসেছি যে, ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি মানুষকে আল্লাহ্র সৈনিকে পরিণত করার প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ হলেই একজন মানুষ ইসলাম প্রতিষ্ঠার উত্তপ্ত ময়দানে দৃঢ়পদে অবস্থান গ্রহন করতে সক্ষম হয়। নামায, রোযা ইত্যাদির ব্যাপারে যে ব্যক্তি যতটা উদাসীন এবং অমনোযোগী, সে ব্যক্তির ঈমান ততটাই দুর্বল। আর দুর্বল ঈমানের লোকদের দিয়ে জিহাদ অসম্ভব। এ জন্য আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে হলে যেসব পর্যায় অতিক্রম করে ময়দানে আল্লাহ্র সৈনিকে পরিণত হতে হয়, এসব স্তর অতিক্রম করে আসাটা বেশ কষ্টসাধ্য। এ কারণেই আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর সম্মান ও মর্যাদা সবচেয়ে বেশী।

আল্লাহ্র জমিনে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার কাজে যারা লিপ্ত, তাদের সম্মন ও মর্যাদার কোন তুলনা হয় না। নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, 'একটি সকাল অথবা একটি বিকাল আল্লাহ্র পথে অতিবাহিত করা পৃথিবী ও পর্থিব সমস্ত জিনিসের থেকেও উত্তম।' (বোখারী)

আল্লাহ্র দেয়া বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মসূচী বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা যারা করে, তাদের সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) নিশ্চয়তা দান করেছেন যে, 'যে বান্দার দুটো পা আল্লাহ্র পথে ধুলি ধূসরিত হবে, কঠিন জাহান্নামের আগুন তার ঐ পা দুটোকে কখনই স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না।' (বোখারী)

বোখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্র রাসুল বলেছেন, আল্লাহ্র কাছে প্রিয় কাজগুলোর মধে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অন্যতম প্রিয় কাজ। ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে কোন ব্যক্তি যদি বিরোধী শক্তির হাতে নিহত হয় তাঁর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ-بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّاتَشْعُرُوْنَ-

আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত তোমরা তা অনুভব করতে পারো না। (সূরা বাকারাহ্)

ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয় অথবা বিজয়ী হয় তাদের সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْيَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا-

যে ব্যক্তি আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে বিজয়ী হবে অথবা ইসলাম বিরোধিদের হাতে প্রাণ হারাবে তাদেরকে আমি বড়ো ধরনের পুরস্কারে ভূষিত করবো। (সূরা নিছা-৭৪)

আল্লাহর সাথে ঈমানের ব্যবসায় তিন নম্বরের মূলধন হলো আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা। আর এই জিহাদ যারা করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ছুবহানু ওয়াতা'য়ালা বলেন-

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ، ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার নীচ দিয়ে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত, আর চিরন্তন জান্নাতের উৎকৃষ্ট গৃহে তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন। এটাই হলো শ্রেষ্ঠ সফলতা। (সূরা সফ)

হযরত সাহ্ল ইবনে সাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, 'আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত প্রহরা দেয়া পৃথিবী ও পৃথিবীর উপরস্থ সমস্ত কিছুর থেকেও উত্তম। আর জান্নাতে তোমাদের কারো এক চাবুক পরিমাণ স্থান পৃথিবী ও তার উপরস্থ সবকিছু থেকে উত্তম। আর সন্ধ্যায় আল্লাহর পথে বের হওয়া অথবা সকালে বের হওয়া পৃথিবী ও তার উপরস্থ সমস্ত কিছু থেকে উত্তম।' (বোখারী, মুসলিম)

ইসলামী আন্দোলন কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনকারী আল্লাহর পথের সৈনিকের সম্মান ও মর্যাদা আকাশ চুম্বী। হযরত সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেন, 'একদিন ও একরাত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা দেয়া এক মাস যাবৎ রোযা পালন ও রাতে ইবাদাত করার থেকেও অধিক মূল্যবান। এ

www.pathagar.com

অবস্থায় যদি কেউ ইন্তেকাল করে তাহলে যে কাজ সে করে যাচ্ছিল ইন্তেকালের পরও তা তার জন্য জারী থাকবে, তার রিযিকও জারী থাকবে এবং কবরের পরীক্ষা থেকে সে থাকবে নিরাপদ।' (বোখারী)

হযরত ফাদালা ইবনে উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেন, 'ইন্তেকালের পর প্রত্যেক মৃতের কর্মধারা নিঃশেষ করে দেয়া হয়। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা দেয় তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করতে থাকবে এবং কবরের আযাব থেকে সে নিরাপদ থাকবে।' (বোখারী)

বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনের দেয়া কোন দায়িত্ব পালন করাও ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা দেয়ার শামিল। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদাও অনুরূপই হবে, যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা দেয়। হযরত উসমান (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন, 'আল্লাহর পথে একদিন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা দেয়া হাজার দিন অন্যান্য সওয়াবের কাজে নিয়োজিত থাকার চেয়েও উত্তম।' (আবু দাউদ-তিরমিযী)

জিহাদকারীর জিম্মাদারী স্বয়ং আল্লাহ্ গ্রহণ করেন

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে বের হয়েছে তার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ জিম্মাদার হয়ে যান। আমার পথে জিহাদ করা, আমার প্রতি ঈমান আনা ও আমার প্রেরিত রাসূলদেরকে সত্য বলে গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন কারণ যাকে আবাসস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য করেনি, আল্লাহ্ তার জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সেই ঘরের দিকে তাকে সফলভাবে প্রত্যাবর্তন করবেন সওয়াব সহকারে বা গনীমাত সহকারে, যেখান থেকে সে জিহাদের লক্ষ্যে বের হয়েছিল। আর মুহাম্মদের (সাঃ) প্রাণ যে সত্তার মুষ্টিতে তার শপথ! সে আল্লাহর পথে যে কোন আঘাত পাবে তা তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে এমনভাবে উপস্থিত হবে যেমন আঘাত পাবার দিন তার শারীরিক কাঠামো ছিল। তার বর্ণ হবে তখন রক্ত বর্ণ। তার গন্ধ হবে মিশ্‌কের গন্ধ। আর যে সত্তার হাতে মুহাম্মদের (সাঃ) প্রাণ তার শপথ! মুসলমানদের ওপর আমি এটা যদি কঠিন মনে না করতাম তাহালে যে সেনাদলটি আল্লাহর পথে জিহাদরত, তার থেকে আমি কখনও পশ্চাতে অবস্থান করতাম না। কিন্তু আমি এতটা স্বচ্ছলতা অর্জন করতে পারিনি যে, সবাইকে সওয়ারী দিতে পারি আর মুসলমানরা এতটা স্বচ্ছলতা অর্জন করতে পেরেছে। আর এটাও তাদের জন্য কষ্টকর হবে যে, তাদেরকে পিছনে রেখে আমি জিহাদে চলে

www.pathagar.com

যাবো। আর সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের (সাঃ) প্রাণ! অবশ্যই আমি ইচ্ছা পোষণ করি, আমি আল্লাহর পথে জিহাদে যাবো এবং শাহাদাতবরণ করবো, তারপর আবার জিহাদে যাবো এবং পুনরায় শাহাদাতবরণ করবো, তারপর পুনরায় জিহাদে গমন করবো এবং শাহাদাতবরণ করবো।' (তিরমিযী)

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা ইসলামী আন্দোলনে যোগ দিয়ে জিহাদ করে তাদের জন্য আল্লাহর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। হযরত মাআয (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, 'মুসলিম জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যে ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও আল্লাহর পথে জিহাদ করবে তার জন্য আল্লাহর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে আহত হয়েছে বা তাঁর শরীরে কোন আঁচড় লেগেছে, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি তেমন অবস্থা নিয়েই উপস্থিত হবে যেমন অবস্থা ছিল আঘাত সংঘটনের সময়। এর রং হবে জাফরানী এবং গন্ধ হবে মিশকের।' (বোখারী)

ইসলামী আন্দোলনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার কাজে যতটা সময় ব্যয় হবে, এই সময়ের উত্তম বিনিময় আল্লাহ্ দান করবেন। নবী করীম (সাঃ) বলেন, 'তোমাদের কারো আল্লাহর পথে অবস্থান করা নিজের ঘরে বসে সত্তর বছর ধরে (নফল) নামায আদায় করার চেয়েও বেশী উত্তম। আল্লাহ্ তোমাদের পাপসমূহ্ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, এটা কি তোমরা পছন্দ করো না? আল্লাহর পথে জিহাদ করো। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ক্ষণিকের জন্যও জিহাদ করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।' (আবু দাউদ)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুলকে জিজ্ঞাসা করা হলো, জিহাদের সমান সওয়াব লাভ করা যেতে পারে, এমন ধরনের সওয়াবের কাজ কোনটি? তিনি এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, সে কাজ করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এভাবে তাঁকে তিনবার প্রশ্ন করা হলে তিনি একই জবাব দিলেন। অবশেষে বললেন, আল্লাহর পথের সৈনিক জিহাদ করার জন্য বের হয়ে গেল আর তুমি তোমার কাছের মসজিদে গিয়ে বিরতি না দিয়ে নামায আদায় করতে থাকলে, ইফতার না করে দিনের পর দিন রোযা পালন করতে থাকলে। এমনটি করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি আল্লাহর পথে জিহাদ করার ব্যাপারে সমান সওয়াব অর্জন করাও সম্ভব নয়। (বোখারী ও মুসলিম)

জিহাদকারী সর্বোত্তম জীবনের অধিকারী

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'মানুষের জীবনের মধ্যে সর্বোত্তম জীবন হচ্ছে সেই ব্যক্তির যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য সব

www.pathagar.com

সময় প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং যখনই জিহাদের আহ্বান আসে তখনই সে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হত্যা ও মৃত্যুকে সে জিহাদের পথে অনুসন্ধান করে।' (মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে এক শত দরজা রয়েছে। আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ্ তা তৈরী করেছেন। তার একটি দরজার সাথে আরেকটির দুরত্ব হলো আকাশ ও জমিনের দুরত্বের সমান।' (বোখারী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে যাবতীয় বিধানদাতা বা রব্ব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মুহাম্মদকে রাসুল বা একমাত্র অনুসরণীয় নেতা হিসেবে অনুসরণ করেছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। হযরত আবু সাঈদের কাছে এ কথাটি বিস্ময়কর মনে হলো এবং তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসুল ! কথাটি আপনি আমাকে পুনরায় বলুন। রাসুল কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর বললেন, আরেকটি বিষয় রয়েছে যার সাহায্যে আল্লাহ জান্নাতে তাঁর বান্দাকে একশটি মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন। এই মর্যাদাসমূহের মধ্যে একটির থেকে আরেকটির ব্যবধান হবে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের ঐ বিশাল শূণ্য মার্গের সমান। এই মর্যাদা লাভ করবে কেবল মাত্র আল্লাহর পথের জিহাদকারী। (মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, দুই ধরনের চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছে আর যে চোখ আল্লাহর পথে বিনিদ্র রাত অতিবাহিত করেছে। (তিরমিযী)

ইসলামী আন্দোলনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য যে চোখ না ঘুমিয়ে রাত পার করেছে সে চোখ জাহান্নামে যাবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, এতটুকু সময়ও যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে যতটুকু সময় প্রয়োজন একটি উটকে দোহন করতে। তাহলে তার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত ওয়াজিব করে দিবেন। তবে শর্ত হচ্ছে তার জিহাদ হতে হবে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য। (তিরমিযী)

বর্তমানে মুসিলম জনগোষ্ঠী জিহাদী চেতনা শূন্য হয়ে পড়েছে। অথচ এই জিহাদী চেতনা-ই মুসিলম জনগোষ্ঠীকে সারা বিশ্বে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করেছিল। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদী চেতনা একজন মানুষের ভেতরে সক্রিয় থাকলে অরণ্যের হিংস্র জানোয়ারও তার আনুগত্য করে। ইতিহাস সাক্ষী, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনা নিয়ে ছুটে গেলেন আফ্রিকার দিকে। দিনের অবসান ঘটলো। আর কিছুক্ষণ পরেই রাত নেমে আসবে। মুসলিম বাহিনী আফ্রিকার গভীর জঙ্গলের কাছে শিবির স্থাপন করতে বাধ্য হলেন। সেনাপতি সা'দ (রাঃ) অনুভব করলেন, তাঁর অধিনস্থ বাহিনী এই শ্বাপদ সঙ্কুল স্থানে রাত অতিবাহিত করতে দ্বিধাবোধ করছেন। তিনি জঙ্গলের পাশে একটি মঞ্চ নির্মাণ করার আদেশ দিলেন। তারপর সে মঞ্চের ওপরে উঠে তিনি জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বন্য পশুদের লক্ষ্য করে বললেন–

يَاَيُّهَاالْحَشَرَتُ والسِّبَاعُ نَحْنُ اَصْحَابُ رَسُوْلَللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعُوْا فَاِنَّ نَازِلُوْنَ فَمَنْ وَجَدْنَا بَعْدَه قَتَلْنَاه–

'হে বনের হিংস্র প্রাণীর দল! আমরা আল্লাহর নবীর সাহাবী। আমরা এসেছি আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে। সুতরাং এই রাত্রির জন্য আমাদের নিরাপত্তার কোন অসুবিধা যেন না হয়। যদি কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের তরবারী তার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।'

ইতিহাস কথা বলে, হযরত সা'দ (রাঃ) এর এ কথা শোনার সাথে সাথে বনের হিংস্র প্রাণীদল তাদের শাবকসহ এলাকা ত্যাগ করে ইসলামের সৈনিকদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আজও যদি মুসলমানদের মধ্যে সেই জিহাদী চেতনা জাগ্রত হয়, সেই ঈমান যদি সৃষ্টি হয়, তাহলে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। জিহাদের ফযিলত সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনে ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। এসব বর্ণনা একত্রিত করলে বিশালাকারের গ্রন্থ রচিত হবে। মনে রাখতে হবে যে, মুসলমানদের জিন্দেগী হলো জিহাদী জিন্দেগী। জিহাদ ব্যতীত মুসলমানদের জীবনই কল্পনা করা যায় না। কারণ একজন ঈমানদারকে সিরাতুল মুস্তাকিমে চলার পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তার নফ্স, ইবলিস শয়তান, জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান। এসব শয়তানে বিরুদ্ধে তাকে সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত সংগ্রাম করতে হয়। যে পরিবারে, সমাজে সে বাস করে, সে সমাজে ইসলামের বিপরীত পরিবেশ বিরাজ করছে। এই পরিবেশের বিরুদ্ধে তাকে সংগ্রাম করে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য করতে হয়।

যে দেশে সে বাস করছে, সে দেশ পরিচালিত হচ্ছে ইসলামের বিপরীত আইন-কানুন দিয়ে। এসব আইন-কানুন পরিবর্তন করে আল্লাহর দেয়া আইন-বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তাকে জিহাদ করতে হয়। মুসলমান মুহূর্তের জন্যেও জিহাদী

কর্মকান্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে না। জিহাদে কোন ধরনের বি‍িতি নেই। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলমানকে জিহাদ চালিয়ে যেতে হয়। জিহাদের পথে থেকেই তাকে মৃত্যু যবনিকার ওপরে যাত্রা করতে হয়। আর এ কারণেই জিহাদের এত বেশী ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জানেই না যে, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি। আরেক শ্রেণীর মুসলমান যদিও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা রাখে, তবুও ময়দানে প্রতিকুল পরিবেশ দেখে চতুষ্পদ প্রাণী বিড়ালের স্বভাব গ্রহণ করেছে। বিড়াল যেমন আরামদায়ক বিলাসী জীবনে অভ্যস্থ, মুখরোচক খাদ্য আহার করবে, কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে হাঁটবে না, শীতের দিনে উষ্ণ জায়গা ছাড়া ঘুমাবে না, এই শ্রেণীর মুসলমানও বিড়ালের মতই আরামদায়ক জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। আল্লাহর রাসুলের সস্তা সুন্নাত এরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করবে, লাউ বা কদু খাবে, আহারের পরে মিষ্টি খাবে, ফজরের পরে ঘুমাবে, রাতেও দ্রুত ঘুমিয়ে পড়বে, নানা ধরনের তসবিহ-তাহলিল পাঠ করবে, নফলের পর নফল নামায আদায় করবে, নফল রোযা পালন করবে, এসব কাজে তারা অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে আর মূল কাজ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে।

এসব কাজ তো অবশ্যই করবে, কিন্তু যে মূল কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য এসব কাজ করতে হয়, সেই মূল কাজই যদি আঞ্জাম দেয়া না হয়, তাহলে এসব সস্তা কাজের কোন মূল্যায়ন করা হবে না। ময়দানে বাতিল শক্তি প্রবল ঝড় সৃষ্টি করেছে, আর মুসলমান ঘরের দরজা বন্ধ করে আল্লাহর নামের যিকির করছে। বাতিল সৃষ্ট ঝড় এসে তার বদ্ধ দুয়ারে আছ্ড়ে পড়ছে, সেদিকে তার চেতনা নেই, সে আল্লাহ নামের যিকিরে মগ্ন। ইসলামকে উৎখাত করার শ্লোগান দিয়ে মিছিল করা হচ্ছে, আর মুসলমান দাড়ি টুপি পাগড়ী পরিধান করে সেই মিছিলের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছে, তার ভেতরে প্রতিবাদের আগুন প্রজ্জলিত হচ্ছে না। আল্লাহর জান্নাত এসব মুসলমানদেরকে স্বাগত জানাতে মোটেও প্রস্তুত নয়। আল্লাহর জান্নাত অনন্ত সুখের অফুরন্ত সুখসামগ্রীসহ জিহাদকারীদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

জিহাদে ধন-সম্পদ ও প্রাণ নিয়োগ করতে হবে

আল্লাহ তা'য়ালার সাথে ঈমানদারদের ব্যবসার তৃতীয় মূলধন হলো আল্লাহর পথে জিহাদ এবং সেই জিহাদ হলো সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা। সূরা সফের উল্লেখিত আয়াতসহ জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে–

وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ-

আল্লাহর পথে জিহাদ করো ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে। (আল কোরআন)

আল্লাহর পথে জিহাদ করার ব্যাপারে প্রথমে প্রাণদানের কথা বলা হয়নি, প্রথমেই ধন-সম্পদের কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হলো, ধন-সম্পদ মানুষের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হয়ে থাকে এ কথা প্রমাণিত সত্য। কোন বাড়িতে ডাকাত আগমন করলে প্রথম ধমকেই বাড়ির মালিক তার কষ্টার্জিত ধনরাশি ডাকাতের হাতে তুলে দেয় না। ধন-সম্পদ রক্ষার জন্য দেহের শেষ শক্তি ব্যয় করে। অবশেষে ডাকাত দল বাড়ির মালিককে হত্যা করে তার কাছ থেকে সিন্দুক বা আলমারির চাবী হস্তগত করে। ধন-সম্পদ মানুষের কাছে অতি প্রিয় জিনিস। একজন মানুষ শারীরিক শ্রম দিয়ে সহজেই অপরের উপকার করতে পারে, কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে অর্থ দিয়ে উপকার করাটা বেশ কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এখানে আরেকটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, ধন-সম্পদ বলতে শুধু নগদ অর্থ, ভূ-সম্পত্তি, পশু-সম্পদ, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি বুঝায় না। মানুষের সন্তান-সন্ততি, জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শীতা, বিচক্ষণতা, কৌশল, বাগ্মিতা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বুঝায়। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এসবের ব্যবহার করতে হবে।

আর প্রাণ বলতেও শুধু রুহ্ বুঝায় না। পৃথিবীতে মানুষের আগমনকাল থেকে শুরু করে শেষ বিদায়ের দিন পর্যন্ত, এই গোটা সময়কালকেই মানুষের জীবন কাল বলা হয়। এই জীবন দিয়েই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ তথা ইসলামী আন্দোলন করতে হবে। গোটা জীবনকেই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওয়াক্ফ করে দিতে হবে। ঈমানদারের জীবনের লক্ষ্যই হবে, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে এ কাজে জীবনের প্রতিটি স্পন্দন ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা সাধনা করা।

আবেগ হঠাৎ আগুনের মতই প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে এবং সেই আবেগের বশবর্তী হয়ে গুলীর সামনে বুক টান করে দাঁড়ানো অসম্ভবের কিছু নয়। কিন্তু ধীর স্থিরভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধন-সম্পদ ও প্রাণ দান করা বড় কঠিন কাজ। পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই, যে কাজ যতটা কঠিন সে কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হলে তা থেকে অধিক লাভবান হওয়া যায়। আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ বলেই আল্লাহ তা'য়ালা এই কাজের বিনিময়ও দিবেন সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস দিয়ে এবং তার

www.pathagar.com

সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، لَايَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ، اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ، وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ، يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ، خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا، اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ-

তোমরা কি হাজীদেরকে পানি পান করানো, বায়তুল্লাহ্ শরীফের সেবা-যত্ন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করাকেই সেসব ব্যক্তির কাজের সমান বলে ধারণা করো, যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করেছে আল্লাহর, আখিরাতের প্রতি এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ করে? আল্লাহর কাছে এই দুই ধরনের লোকের সম্মান ও মর্যাদা কখনও এক নয়। আর আল্লাহ্ জালিমদেরকে কখনো পথ দেখান না। আল্লাহর কাছে তো কেবল তাদেরই বিরাট মর্যাদা রয়েছে, যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর জন্য নিজেদের আবাসস্থল ত্যাগ করেছে এবং তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ করেছে। আসলে এরাই হলো সফলতা অর্জন করেছে। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে রহমত, তাঁর সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য চিরসুখের উপকরণসমূহ বিদ্যমান। সেখানে তাঁরা অনন্ত কাল অবস্থান করবে। আল্লাহর কাছে উত্তম কাজের বিনিময় দেয়ার জন্য অফুরন্ত নিয়ামত রয়েছে। (সূরা তাওবা-১৯-২২)

ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে সাধারণত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভেতরে দুটো শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রথম শ্রেণী হলো, তারা ইসলামী বিধানের আরামদায়ক বিধিগুলো অনুসরণ করে থাকে। এরা নামায আদায় করে, রোজা পালন করে থাকে, সম্ভব হলে হজ্জ আদায় করে, কোরআন তেলওয়াত করে, তাসবিহ-তাহলিল পাঠ করে অর্থাৎ ইসলামের সেই দিকগুলো এরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে

থাকে, যেদিকগুলো অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কোন ধরণের আর্থিক ক্ষতি হবার এবং দৈহিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। মুসলমানের মধ্যে এই শ্রেণীর সংখ্যাই সর্বাধিক।

দ্বিতীয় শ্রেণী হলো, যারা আল্লাহর দেয়া ও রাসূল প্রদর্শিত আরামদায়ক বিধানগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করে এবং সেই সাথে ঐ বিধানসমূহও অত্যন্ত নিষ্ঠার ও আন্তরিকতা সহকারে পালন করে, যে বিধানসমূহ অনুসরণ করতে গেলে আর্থিক ক্ষতি, দৈহিক ক্ষতি এমনকি প্রাণ পর্যন্ত দান করতে হয়। কারাবরণ করতে হয়, প্রহৃত হতে হয়, সম্পদের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, মান-সম্মানের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, অপবাদের মুখোমুখি হতে হয় প্রয়োজনে শাহাদাতবরণ করতে হয়। মুসলমানদের মধ্যে এই শ্রেণীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। পক্ষান্তরে এই শ্রেণীর মুসলমান সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, অসংখ্য নবী রাসূল এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উল্লেখিত আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন, এই দুই শ্রেণীর মুসলমান সম্মান ও মর্যাদায় আল্লাহর কাছে কোনক্রমেই সমমানের নয়। তাদের মধ্যে বিশাল পার্থক্য বিরাজমান। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর মুসলমানদেরকে ইসলাম জালিম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আর জিহাদের রক্তঝরা ময়দানে জান-মাল অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে যাবতীয় নির্যাতন হাসি মুখে সহ্য করেছে, বাতিল সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার পরোওয়া না করে সামনের দিকেই অগ্রসর হয়েছে, তাদের উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা অনন্ত সুখের স্থান জান্নাতে চিরকাল অবস্থান করবে।

আল্লাহ তা'য়ালা যাদেরকে অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছলতাদান করেছেন, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে তাদেরকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর সাথে ঈমানের ব্যবসায় তৃতীয় মূলধনই হলো 'আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করতে হবে।'

আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হতে হবে। উন্মুক্ত অবারিত হস্তে দান করতে হবে। অর্থ-সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে জিহাদের কর্মকান্ড যদি ব্যবহৃত হয়, তাহলে আল্লাহর সাথে ঈমানের ব্যবসায় সফলতা অর্জন করা যাবে না বরং আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হতে হবে।

তাবুকের যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বনবী বসেছিলেন আর মদীনার মানুষ তাঁর সামনে নগদ অর্থ ও অলংকার দান করছিলেন। তাঁর সামনে অর্থ এবং অলংকার এতটা উচ্চতা লাভ করেছিল যে, নবী করীম (সাঃ) অর্থ ও

অলংকারের স্তুপের আড়াল হয়ে পড়েছিলেন। ইসলামের যে কোন কাজের প্রতিযোগিতায় হযরত আবু বকর (রাঃ) এগিয়ে থাকতেন। অনেক সাহাবা কেরামই সওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এদের ভেতরে হযরত উসমান (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। তিনি তাবুকের যুদ্ধে তাঁর সমস্ত সম্পদ থেকে দুই শত উট আর দুই শত রৌপ্যমুদ্রা দান করেছিলেন।

আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ১০০০ টি উট ৭০টি ঘোড়া ও ১০০০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা দান করেছিলেন। ভেবেছিলেন, এবার বোধহয় তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সওয়াব অর্জনের প্রতিযোগিতায় পরাজিত করতে পেরেছেন। (তিরমিজী, আবু দাউদ)

নবী করীম (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কি পরিমাণ দান করেছেন এই যুদ্ধে। তাঁর দানের কথা তিনি বিনয়ের সাথে জানালেন। আল্লাহর রাসুল এবার জিজ্ঞাসা করলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) কে। তিনি বিনয়ের সাথে জানালেন, ঘরে যা ছিল সবই দিয়ে দিয়েছি। রাসুল জানতে চাইলেন তাঁর ঘরে বর্তমানে আর কি অবশিষ্ট আছে। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, ঘরে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পবিত্র নাম ব্যতীত আর কিছুই নেই। হযরত উসমান (রাঃ) এবারও দানের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হলেন। (তিরমিজী)

জিহাদ বাস্তবায়নে দান করার মর্যাদা

কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যেমন ব্যক্তির একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব নয়–সংগঠন একান্ত প্রয়োজন, সংগঠিত শক্তির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটিয়ে প্রশিক্ষিত সুশৃঙ্খল জনশক্তির দ্বারা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তেমনি প্রয়োজন আদর্শ প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠন বা দল পরিচালনার জন্য অর্থশক্তি। এই অর্থ অদৃশ্য বলয় থেকে আমদানী হবে না, নিজেদের উপার্জিত ধন-সম্পদ থেকেই তা দান করতে হবে। এ কথা মনে রাখতে অর্থ হলো আদর্শ প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠনের প্রাণশক্তি। শিরা-উপশিরায় ধাবমান রক্ত যেমন মানব দেহকে সচল রাখে, তেমনি অর্থ সচল রাখে আদর্শ প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠনকে। অর্থই হলো সংগঠনের প্রাণশক্তি। এই অর্থ সরবরাহের দায়িত্ব হলো আল্লাহর পথের সৈনিকদের।

যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অর্থ ব্যয় করবে না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা সাবধান বাণী উচ্চারণ করে সূরা তওবায় বলেছেন, তাদের অর্জিত ধন-সম্পদ তাদের কোনই কল্যাণে আসবে না, বরং এসব সম্পদ জ্বালিয়ে তা দিয়ে

www.pathagar.com

তাদের কপালে কিয়ামতের ময়দানে সিল্ মারা হবে। অর্থ-সম্পদকে হিংস্র সরীসৃপের আকৃতি দান করা হবে আর সেই বিষাক্ত সরীসৃপ তাদেরকে দংশন করতে থাকবে। সে দংশনের যন্ত্রণা অনন্তকাল ধরে তারা ভোগ করবে।

জিহাদের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য যারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তাদেরকে আল্লাহ্ পাক সাতশত গুণবেশী বিনিময় দান করেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেন–

مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهٗ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ–

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে সামান্য কিছু পরিমাণ ব্যয় করবে তার জন্য সাতশত গুণ বেশী সওয়াব লেখা হবে। (তিরমিযী)

আল্লাহ্‌র এই পৃথিবীতে ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়ন করার সংগ্রামে যে অর্থ ব্যয় করা হবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার বিনিময়ে সাতশত গুণ অধিক সওয়াব দানকারীর আমল নামায় লিপিবদ্ধ করাবেন। মুসলিম গোষ্ঠীর ওপরে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যে, তারা জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন বিধান এই জমিনে বাস্তবায়ন করার সংগ্রাম করবে। তারা যদি তা না করে, তাহ্‌লে তারা কোন জালিম জাতির গোলামী করতে বাধ্য হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন–

هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ، وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ، وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ثُمَّ لَايَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ–

শোন, তোমরা তো তারাই, যাদেরকে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্যয় করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, এরপরও তোমাদের অনেকেই কৃপণতা প্রদর্শন করছো। যারা কৃপণতা প্রদর্শন করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত আর তোমরাই অভাবী-অভাবগ্রস্থ। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। অবশ্য তারা তোমাদের মত হবে না। (সূরা মুহাম্মদ-৩৮)

www.pathagar.com

অর্থাৎ তোমাদেরকে দান করার কথা বলা হচ্ছে তা আল্লাহর কোন কল্যাণের জন্য নয়, বরং দান করলে তোমাদেরই কল্যাণ হবে। আল্লাহর তোমাদের কোন সম্পদের মুখাপেক্ষী নয়, তার সম্পদের ভান্ডার কখনও শূণ্য হয় না। তিনিই ধনী আর তোমরা সবাই ফকীর। তোমাদেরকে যে আদর্শ বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাতে তোমাদেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এই আদর্শ যদি তোমরা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা না করো, তাহলে তখন তোমরা ভিন্ন জাতির গোলামী করতে বাধ্য হবে। তখন তোমাদের ভাগ্যে অবমাননা আর লাঞ্ছনাই জুটবে।

জিহাদী কর্মকান্ডে ব্যয় না করার পরিণতি

জিহাদ বা আল্লাহর পথে ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা প্রদর্শন করলে তাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهٗ، يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَه، كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ، وَمَآ اَدْرٰكَ مَالْحُطَمَةُ، نَارُاللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ، الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ–

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা অর্থ ব্যয়ে কৃপণতা প্রদর্শন করে যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে এবং তা গুণে গুণে রাখে, সে ধারণা করে তান এই ধন-সম্পদ অনন্তকাল তার কাছে থাকবে। কক্ষনো নয়। সে ব্যক্তিতো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি কি অবগত আছো, সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানটি কি? তা হচ্ছে আল্লাহর আগুন। প্রচন্ডভাবে উত্তপ্ত যা কলিজা পর্যন্ত স্পর্শ করবে। (সূরা হুমাঝা)

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেও না এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করো।' জিহাদের ক্ষেত্রে দান করার ব্যাপারে কৃপণতা প্রদর্শন করা যাবে না। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'তোমরা কৃপণতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো। কারণ কৃপণতার কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম)

যারা অর্থ-সম্পদ দান না করে জমা করে রাখে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ، يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا

www.pathagar.com

فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ، هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-

যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দিন। জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপাল, পৃষ্ঠদেশ ও পার্শ্বদেশে ছ্যাকা দেয়া হবে আর বলা হবে, এগুলোতো তোমরা সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এর স্বাদ আজ গ্রহণ করো। (সূরা তাওবা- ৩৫)

জিহাদী কর্মকান্ডে ব্যয়কারী উত্তম বিনিময় লাভ করবে

কী পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ দান করতে হবে–এ সম্পর্কে বলা যায় অর্থ-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি স্বয়ং ভালো জানেন যে, তিনি কি পরিমাণ দান করতে সক্ষম। আল্লাহ তার সক্ষমতা সম্পর্কে অধিক অবগত, সবার চোখকে ধোকা দিলেও আল্লাহর চোখতে তো ধোকা দেয়া যাবে না। এ কথা অনুভূতিতে জাগ্রত রেখেই দান করতে হবে। এক কথায় সাধ্যানুযায়ী অবশ্যই দান করতে হবে। সে দানের পরিমাণ যদি একটি খোরমা খেজুরের সমানও হয় তবুও তা দান করতে হবে। সাধ্যানুযায়ী ঈমানদার দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যা দান করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে তার উত্তম বিনিময় দিয়ে দিবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَاتُنْفِقُوْا مِنْ شَيْئٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ-

তোমরা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষে যা কিছুই ব্যয় করো না কেন, তার যথাযথ বিনিময় তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের ওপরে সামান্যতম বে-ইনসাফ করা হবে না। (সূরা আনফাল-৬০)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মুখর কর্মসূচী বাস্তবায়নে অর্থ ব্যয় করার মানেই হলো একটি লাভজনক বিরাট ব্যবসায় পূঁজি বিনিয়োগ করা। এটা এমনই এক ব্যবসা যে, যেখানে সামান্যতম ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা নেই। আর এই বিনিয়োগে লাভের পরিমাণ যে কত, তার নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ

حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاَئَةُ حَبَّةٍ، وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ، وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ-

যারা আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো–এমন একটি সজীব বীজ, যা থেকে সাতটি শীষ নির্গত হয় এবং প্রতিটি শীষে একশ' করে দানা হয়। তবে আল্লাহ্ যাকে এরচেয়েও অধিক বৃদ্ধি করে দেন। কারণ আল্লাহ্ তো প্রাচুর্য দানকারী-সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা)

যারা আল্লাহ্‌র পথে দান করে তিনি তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَّمَازَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّرَفَعَهُ اللّٰهُ--

দান-খয়রাতে সম্পদ হ্রাস পায় না বরং ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহ্ মানুষের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তাকে উন্নত করেন। (মুসলিম)

পবিত্র কোরআনে মুমিনের গুণাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ، اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا، لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ-

সেসব ব্যক্তি–যারা নামায আদায় করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই হলো প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। (সূরা আনফাল-৪)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে যারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে নিজের রহমতের বর্মে পরিবেষ্টন করে রাখবেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَيَتَّخِذُ مَايُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلٰوتِ الرَّسُوْلِ، اَلاَ اِنَّهَا قُرْبَةٌ

www.pathagar.com

لَّهُمْ، سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ–

আর তারা নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং রাসূলের দু'আ লাভের মাধ্যম বলে মনে করে। জেনে রেখো, অবশ্যই তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল-করুণাময়। (সূরা তাওবা-৯৯)

বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য অগণিত বস্তুর সাহায্য প্রয়োজন হয়। এই লক্ষ্য সামনে রেখে কোন আলোচনা সভার প্রয়োজন হয়। এই আলোচনা সভার স্থান দান করার মত ক্ষমতা যার রয়েছে তিনি তা দান করবেন, মাইক দানের ক্ষমতা যার রয়েছে, তিনি তা দান করবেন, খাদ্য দানের ক্ষমতা যার রয়েছে তিনি তা দান করবেন, মিছিল অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে মিছিলের উপকরণ দান করবেন, এ ধরনের অসংখ্য প্রয়োজনীয় বস্তু দানের ক্ষেত্র রয়েছে। এসব যারা দান করবেন, তিরমিযী হাদীসে নবী করীম (সাঃ) এসব দানকে উত্তম দান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বদর যুদ্ধের সৈনিক হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন, একজন লোক আল্লাহর রাসূলের কাছে লাগাম পরানো একটি উট নিয়ে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এই উটটি আল্লাহর পথে দান করলাম। রাসূল বললেন, তোমার এই লাগাম পরানো উটনীর বিনিময়ে আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে সাতশ' লাগাম পরানো উটনী দান করবেন। (মুসলিম)

সে সময় বর্তমান যুগের মত আধুনিক যান-বাহন থাকলে সাহাবায়ে কেরাম তাই অকাতরে দান করে দিতেন সন্দেহ নেই। সে যুগের সবচেয়ে উন্নত বাহন ছিল উট এবং সে উটের লাগামও অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করতে হতো। সাহাবায়ে কেরাম লাগাম ক্রয় করে উটের মুখে পরিয়ে তা দান করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানে যার যে বাহন রয়েছে, তাই দিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কর্মসূচী সফল করবেন। এই কাজে যারা সহযোগিতা করবেন, আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় অবশ্যই দিবেন।

আল্লাহর পথে দান করার অর্থ হলো সেই দানকে নিজের ও জাহান্নামের মাঝে আবরণ টেনে দেয়া। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ–

তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করো, যদিও তা খেজুরের একটি টুকরো দিয়েও হয়। (বোখারী-মুসলিম)

যিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করেন তার জন্য ফেরেশতাগণ উত্তম বিনিময় দানের দোয়া করে থাকে, আর যিনি সক্ষম হবার পরও দান করেন না, তার ওপরে অভিশাপ বর্ষন করে থাকেন। নবী করীম (সাঃ) বলেন–

مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُوْلُ الاخَرُ، اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا–

মানুষের জীবনে প্রতিটি দিনই দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। একজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার রাস্তায় ব্যয় করে তার জন্য উত্তম বিনিময় দাও। আরেকজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি দান করা থেকে বিরত থাকে তার সম্পদ ধ্বংস করে দাও। (বোখারী-মুসলিম)

ইবনে মাজাহ্ হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) বলেন অনিবার্য কোন কারণে যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে না পেরে জিহাদের কাজে অর্থ-সম্পদ প্রেরণ করে সে প্রতিটি টাকার বিনিময়ে সাতশ' টাকা ব্যয়ের সওয়াব অর্জন করবে। আর যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদসহ শারীরিকভাবে জিহাদে অংশ গ্রহণ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায়, তার প্রতিটি টাকার বিনিময়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করার সওয়াব দান করা হবে। এ কথা বলে আল্লাহর নবী কোরআনের সেই আয়াত তেলওয়াত করলেন, যে আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। (ইবনে মাজাহ্)

দ্বিন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীতে যে ব্যক্তি প্রবল ইচ্ছা থাকার পরও বৈধ কোন কারণে নিজে অংশ গ্রহণ করতে পারলো না কিন্তু যারা অংশ গ্রহণ করলো, তাদেরকে সে নানাভাবে সগযোগিতা করলো, জিহাদকারীর অনুপস্থিতিতে তার সহায়-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনকে দেখা-শোনা করলো, সে ব্যক্তিও সক্রিয়ভাবে জিহাদের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করার মতই সওয়াব অর্জন করবে। আল্লাহর রাসূল বলেন, 'যে ব্যক্তি জিহাদকারীকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করলো অথবা জিহাদকারীর অনুপস্থিতিতে তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করলো, তার জন্য ঠিক জিহাদকারীর অনুরূপ সওয়াব লিখিত হবে। কিন্তু সে কারণে যে জিহাদে গিয়েছে তার সওয়াব থেকে সামান্যতম হ্রাস করা হবে না।' (মুসনাদে আহমাদ)

www.pathagar.com

জিহাদই জান্নাত লাভের একমাত্র মাধ্যম

আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভের একমাত্র মাধ্যম হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা। কেবলমাত্র জিহাদই জাহান্নামের কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি থেকে মানুষকে হেফাজত করতে পারে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ، ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ–

হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে কি আমি এমন একটি ব্যবসার কথা বলবো, যা তোমাদের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (অর্থাৎ অবশ্যই বলবো এবং সে ব্যবসা হলো) তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণের সাহায্যে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা (প্রকৃতই) জ্ঞান রাখো। (যদি তোমরা এমন করো) আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার নীচ দিয়ে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত, আর চিরন্তন জান্নাতের উৎকৃষ্ট আবাসে তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন। এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম সফলতা। (সূরা সফ)

যে তিনটি বিষয়ের কথা আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান, রাসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ ও আল্লাহর পথে জিহাদ–এবং এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই তিনটি কাজ করা ব্যতীত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাত লাভ করা যাবে না, জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে না। এই তিনটি কাজ ব্যতীত অন্য কোন পথ কেউ যদি অবলম্বন করে, তাহলে সে ব্যক্তি যে পথভ্রষ্ট এবং জাহান্নামের পথের পথিক–এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

জান্নাত লাভের সহজ পথ শাহাদাত

শাহাদাত ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। শাহাদাতের মর্যাদা অসাধারণ। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা উত্তপ্ত ময়দানে বাতিল শক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে চেষ্টা-সাধনা করে যাচ্ছেন, তাদের সবারই শাহাদাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহর পথের সৈনিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো মানুষের কাছে এ কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধারা যে, মহান আল্লাহ্ মানুষের জন্য যে নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন, একমাত্র এটাই সত্য। ইসলামী আদর্শের বিপরীত যত মত ও পথ এ পৃথিবীতে রয়েছে তা চূড়ান্ত বিবেচনায় মিথ্যা। মুখের ভাষার মাধ্যমে যে ব্যক্তি এই দায়িত্ব পালন করলেন তিনি মৌখিকভাবে শাহাদাতের দায়িত্ব পালন করলেন। শাহাদাতের দায়িত্ব নানাভাবে পালন করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহর বিধান অনুসরণ করলো এবং অন্যদেরকেও এই বিধান অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানালো তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ–

আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানালো এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করলো এবং ঘোষণা করলো আমি একজন মুসলমান। (সূরা হামিম সেজ্দা-৩৩)

অর্থাৎ নিজে সে আল্লাহর সৈনিকের গুণাবলী অর্জন করলো এবং অন্যান্যদেরকেও আল্লাহর সৈনিক হবার জন্য আহ্বান জানালো। এভাবে করে একজন মানুষ তার মুখের ভাষা দিয়ে শাহাদাতের দায়িত্ব পালন করতে পারে। আল্লাহর পথের সৈনিক আল কোরআনের রঙে নিজেকে রঙিন করবেন অর্থাৎ তার জীবনের বিস্তীর্ণ দিকসমূহ কোরআনের বিধান অনুসারে সজ্জিত করবেন। তিনি মুখের ভাষা দিয়ে যে জীবন বিধানের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন, নিজের জীবনে সেই বিধানের বাস্তব প্রতিফলন ঘটাবেন। এটাকে বলা যেতে পারে আমালী শাহাদাত তথা কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সৈনিক হিসেবে সাক্ষ্যদান করা। চূড়ান্ত পর্যায়ের শাহাদাত হলো ইসলাম বিরোধী শক্তির অতর্কিত আক্রমণে বা আন্দোলনের ময়দানে ইসলামী আদর্শের ওপরে অটল অবিচল থেকে দুশমনের আঘাতে প্রাণদান করা। ময়দানে আল্লাহর পথের সৈনিক প্রতিটি মুহূর্তেই নিঃশঙ্ক চিত্তে অবস্থান করতে থাকে। কারণ

www.pathagar.com

তার জান-মাল সবই একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত। মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ–

আল্লাহ অবশ্যই জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনের জান-মাল কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, শত্রুদেরকে হত্যা করে এবং নিজেরা নিহত হয়। (সূরা তওবা)

নির্ভীক মুজাহিদদের জন্যই আল্লাহর জান্নাত

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ময়দান থেকে আল্লাহর পথের সৈনিকগণ মুহূর্তের জন্যও পিছু হটতে পারে না। বাতিল শক্তির তর্জন-গর্জন দেখে ভয়ে বা পার্থিব কোন ক্ষতির আশঙ্কায় কোন ব্যক্তি যদি পালিয়ে যায় বা নিষ্ক্রীয় ভূমিকা পালন করে তাহলে তার পক্ষে কোনক্রমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয় এবং পরিণামে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ، وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَه اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْمُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ، وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ-

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কাফিরদের মুখোমুখি হও তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না। যুদ্ধ কৌশল অথবা নিজেদের বাহিনীর সাথে একত্রিত হবার উদ্দেশ্য ব্যতিত কোন ব্যক্তি পিছু হটলে সে আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হবে আর ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা আনফাল-১৫-১৬)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, যারা নিজেদেরকে আল্লাহর পথের সৈনিক হিসেবে পরিচয় দিচ্ছো, তারা কোন অবস্থাতেই আন্দোলনের ময়দান থেকে পালিয়ে যেও না। এ ধরনের পলায়নপর মনোবৃত্তি যাদের তারা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।

এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, কোন কাপুরুষের পক্ষে আল্লাহর সৈনিক হবার কোন সুযোগ ইসলামে নেই এবং কাপুরুষদের জন্য আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হয়নি। যারা অকুতোভয়, নির্ভীক, ধন-সম্পদ এবং নিজের জীবনের কোন পরোয়া করে না, আল্লাহর বিধান তাদের জন্য-তারাই কেবলমাত্র আল্লাহর সৈনিক হবার যোগ্যতা

www.pathagar.com

রাখে। আল্লাহর জান্নাত কোন ভীরু কাপুরুষের জন্য নির্মিত হয়নি। সিংহ হৃদয় বীরদেরকেই আল্লাহর জান্নাত স্বাগত জানাবে। সুতরাং আল্লাহর পথের সৈনিকদেরকে অসীম সাহসী হতে হবে। আর এই সাহস মনের গহীনে সৃষ্টি করতে হলে আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীসহ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে। যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণ দানের একমাত্র সত্তা আল্লাহ, জীবন ও মৃত্যুর মালিক আল্লাহ, এই বিশ্বাস যার দৃঢ় হবে, তার মনে একমাত্র আল্লাহর ভয় ব্যতীত আর কারো ভয় স্থান লাভ করতে পারে না।

শাহাদাত আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার

শাহাদাত সবার ভাগ্যে জোটে না। আল্লাহর পথে শহীদ হতে চাইলেই শহীদ হওয়া যায় না। মহান আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদায় সকলকে ভূষিত করেন না। শাহাদাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক দূর্লভ পুরস্কার। এই পুরস্কার কেবলমাত্র তারাই লাভ করেন, স্বয়ং আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যাদেরকে নির্বাচিত করেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন। নানাভাবে বান্দাকে পরীক্ষা করা হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ–

মানুষ কি এ কথা মনে করে নিয়েছে নাকি যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? (আনকাবুত-২)

এই পরীক্ষা কি ধরনের হতে পারে, সেটাও মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারায় স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ، وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ، الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ، قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ، اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ–

আমি নিশ্চয় ভয়, বিপদ, অনশন, জান-মালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাসের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো। যারা এসব পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করবে তাদেরকে সুসংবাদ দাও। এবং বিপদ উপস্থিত হলে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহর জন্য, আল্লাহর

www.pathagar.com

কাছেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, প্রতিপালকের রহমত তারা লাভ করতে পারবে। আর প্রকৃত পক্ষে এসব লোকই সঠিক পথপ্রাপ্ত।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর সাধারণ বান্দাদের সাথে যেমন আচরণ করে থাকেন তেমন আচরণ কোন নবী-রাসূল বা তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের সাথে করেন না। তাদেরকে যে সমস্ত মহাপরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় তা কোন সাধারণ মানুষকে হতে হয় না। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'নবীদের প্রত্যেকটা দলকে তাদের নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা ও কঠিন কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়।'

এ কারণে ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, কোন নবীকে কঠিন পীড়া দিয়ে, কাউকে মাছের পেটে নিক্ষেপ করে, কাউকে করাত দিয়ে চিরে দ্বিখন্ডিত করে, কারো কাছে থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে, কাউকে আগুনে নিক্ষেপ করে, কাউকে তরবারীর আঘাতে দ্বিখন্ডিত করে আবার কারো ওপরে ভিন্ন ধরণের বিপদ মুসিবতের পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ্ পরীক্ষা করেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) বিশ্বনবীর পূর্ব পর্যন্ত অন্য নবীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নবী ছিলেন। পবিত্র কোরআনে তাঁর নামের সাথে খলীল উপাধি যুক্ত করা হয়েছে। ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম মহান আল্লাহ্র এমন এক বন্ধু যিনি তাঁর সমস্ত নিয়মের পরিবর্তন করেছেন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। নিজের পিতা-মাতাকে ও জন্মভূমি ত্যাগ করেছেন। নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তান ও স্ত্রীকে জনমানবহীন প্রান্তরে নির্বাসন দিয়েছেন। আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন। নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকেও কোরবানী করার লক্ষ্যে তাঁর গলায় ছুরি চালিয়েছেন। এ কারণেই তাকে খলীল বলা হয়েছে। তাঁর জীবনে আপন সন্তানকে কোরবানী দেয়ার পরীক্ষাই ছিল বোধহয় সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

আল্লাহর পথের সৈনিকদেরকে এসব পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হতে হয়। মহান আল্লাহ্ শাহাদাতের মর্যাদায় তাঁর যে প্রিয় গোলামদেরকে অভিষিক্ত করবেন, তাদের জন্য আল্লাহ্ শাহাদাত বরণের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন। বাতিল শক্তির সাথে ইসলামপন্থীদের এক সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায়। আল্লাহর পথের সৈনিকদেরকে পরীক্ষা এবং নির্বাচিতদেরকে শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করার লক্ষ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই উত্তপ্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। রাব্বুল আলামীন বলেন–

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، وَتِلْكَ

www.pathagar.com

اَلْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ–

এখন যদি তোমাদের ওপরে আঘাত এসে থাকে তবে ইতোপূর্বে তোমাদের প্রতিপক্ষের ওপরও এসেছিল। এটি সময়ের আবর্তন যা আমি মানুষের মধ্যে ঘটিয়ে থাকি। আর আল্লাহ্ জানতে চান তোমাদের মধ্যে করা প্রকৃত মুমিন এবং তিনি চান তোমাদের মধ্য থেকে কিছু শহীদ গ্রহণ করতে। (সূরা আলে ইমরাণ-১৪০)

সুতরাং শাহাদাত হলো মুমিন জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার। এই উপহার আল্লাহ অনুগ্রহ করে দান করেন। এই দান লাভ করতে হলে আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। হযরত ওমর (রাঃ) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে এই দেয়া করতেন–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ، وَجَعَ الْمَوْتِ فِىْ بَلَادَةِ الرَّسُوْلِكَ–

'হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদাত নছীব করো এবং মৃত্যুদান করো তোমার রাসূলের দেশে।'

মৃত্যু থেকে কোনক্রমেই নিজেকে রক্ষা করা যখন যাবে না, তখন সে মৃত্যু আল্লাহ্‌র পথেই হওয়া উচিত। এই কামনা ও চেষ্টা প্রতিটি মুমিনের অন্তরে জাগ্রত থাকতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে ওয়াদা করেছেন, যারা আল্লাহ্‌র পথে প্রাণদান করে তাদের কোন আমলই বৃথা যায় না। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ–

এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় আল্লাহ্‌র তাদের আমলসমূহ বৃথা যেতে দেন না। (সূরা মুহাম্মদ-৪)

গোটা জীবন ব্যাপী আল্লাহ্‌র পথে চেষ্টা-সাধনা করে জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা যতটা না আছে, আল্লাহ্‌র জন্য শাহাদাতবরণ করলে জান্নাত লাভ করা যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। শাহাদাতবরণ করলে আল্লাহ্ তার সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

لَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِ هِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ فَا

www.pathagar.com

سَبِيْلِى وَقَتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ-

সুতরাং যারা একমাত্র আমার জন্যই হিজরাত করেছে, তাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে এবং আমার যমীনে আমার দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করে প্রাণদান করেছে আমি তাদের সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দিব ও তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার নীচে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। (সূরা ইমরাণ- ১৯৫)

যার হৃদয়ে শহীদ হবার আকাংখা নেই তার মৃত্যু হবে মুনাফেকীর মৃত্যু। শহীদ হবার আকাংখা নিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। এ অবস্থায় যদি কেউ শয্যায় শুয়েও ইন্তেকাল করে তবুও সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। যার হৃদয়ে শহিদী তামান্না জাগ্রত রয়েছে, সে যদি মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করে, কলেরায় ইন্তেকাল করে তবুও সে আল্লাহর দরবারে শহীদের সম্মান লাভ করবে। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

اَلشُّهَدَاءَ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

শহীদ পাঁচ ধরনের, মহামারীতে মৃত্যুবরণ করলে, কলেরায় মৃত্যুবরণ করলে, পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করলে, দেয়াল চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করলে এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে বাতিল শক্তির হাতে নিহত হলে। (বোখারী)

নবী করীম (সাঃ) বলেন-

مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدُ-وَمَنْ مَاتَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدُ، وَمَنْ مَاتَ فِىْ الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدُ، وَمَنْ قُتِلَ مَاتَ فِىْ الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدُ-وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدُ-

যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার কারণে নিহত হলো সে শহীদ। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো সে শহীদ। যে

www.pathagar.com

ব্যক্তি মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলো সে শহীদ। যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলো সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করলো সে শহীদ। (বোখারী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন–

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِه فَهُوَ شَهِيْدٌ–

যে ব্যক্তি নিজের অর্থ-সম্পদ হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হলো সে ব্যক্তি শহীদ। (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আ'ওয়ার সায়ীদ ইবনে যায়িদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন–

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَلِه فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِه فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِه فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اَهْلِه فَهُوَ شَهِيْدٌ–

যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের দ্বীনকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণদান করে সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারায় সে ব্যক্তি শহীদ। (বোখারী ও মুসলিম)

শহীদগণ আল্লাহর রহমতের অধিকারী

জিহাদ এবং শাহাদাত কথাটি একটির সাথে আরেকটি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। জিহাদ চূড়ান্ত সফলতা এনে দেয় এবং মুমিন জীবনের একমাত্র কাম্য হলো শাহাদাত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ–

যদি তোমরা আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করো অথবা ইন্তেকাল করো, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রয়েছে অজস্র ক্ষমা ও রহমত। মানুষ যা কিছু সঞ্চয় করে তার থেকে এটি সবচেয়ে বেশী উত্তম। (সূরা আলে ইমরাণ-১৫৭)

www.pathagar.com

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বা সাহায্য করতে গিয়ে ইসলামী আন্দোলন বিরোধী শক্তির হাতে কেউ যদি নিহত হয়, তাকে মৃত বলতে আল্লাহ্ তা'য়ালা নিষেধ করেছেন। আল্লাহর গোলাম নয় এমন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার জীবনের সমস্ত কিছুই শেষ হয়ে যায়, তার যাবতীয় অর্জন হয় বৃথা। সমস্ত আমল ও কর্মকান্ড বিনষ্ট হয়ে যায়। মৃত্যুর পরে লাঞ্ছনামূলক জীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। আর ঈমানদার শাহাদাতবরণ করে সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করে সাফল্যমন্ডিত জীবনে প্রবেশ করে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا، بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ–

যারা আল্লাহর পথে জীবন দান করেছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তারা রিযিক লাভ করছে। (সূরা আলে ইমরাণ-১৭০)

জিহাদকারীর অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ্

ইসলাম বিরোধী শক্তি ময়দানে লড়াই করে, তাদের পেছনে কোন শক্তি থাকে না। আর ঈমানদার যখন ময়দানে লড়াই করে তাদের সাহায্যকারী থাকেন স্বয়ং আল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَايُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً، وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ–

আর ঐ মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে সংগ্রাম করো যেমনভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে সংগ্রাম করে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা তাওবা- ৩৬)

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ অনুভব করতে পারে না কোনটা তার জন্য কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণকর। এ কারণে মানুষ জিহাদকে কষ্টকর মনে করে থাকে। আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষের এ ধারণা খন্ডন করে বলেন–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ، وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا

www.pathagar.com

شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ-

জিহাদ তোমাদের ওপরে ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) তোমাদের কাছে কষ্টসাধ্য বিষয় বলে মনে হচ্ছে। হতে পারে তোমরা কোন জিনিস কষ্টকর মনে করো অথচ তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর হতে পারে তোমরা কোন জিনিস উত্তম মনে করো অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ্ অবগত আছেন এবং তোমরা জানো না। (সূরা বাকারাহ্-২১৬)

জিহাদের পথই হলো সবচেয়ে কল্যাণকর পথ। এ পথে পা বাড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয়ের আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া যাবে না। কোন ধরনে অজুহাত প্রদর্শন বা শিথিলতা প্রদর্শন করা যাবে না। কল্যাণের পথে উদাসীনতা প্রদর্শন করা চরম মূর্খতা বৈ আর কিছু নয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنْفِرُوْاخِفَافًا وَّثِقَالاً وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَا لِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ،

তোমরা ভারী অথবা ও হালকা যে অবস্থায়ই হোক (আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার) সংগ্রামে বেরিয়ে পড়ো এবং জিহাদ করো তোমাদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে। (সূরা তাওবা-৪১)

শহীদের সম্মান-মর্যাদা যে কত বেশী, তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। রাসুলের সাহাবায়ে কেরাম উপলব্ধি করেছিলেন–

وعن ابى بكر بن موسى الاشعرى قال سمعت ابى وهه بحضرة سالعدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رث الهيئة فقال ياابا موسى انت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا قال نعم فرجع الى اصحابه فقال اقرأعليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فالقاها ثم مشى بسفه الى العدو فضرب به حتى قتل

www.pathagar.com

আবু বাক্‌র ইবনে আবু মুছা আল-আশআরী (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতা আবু মুছা আশআরী (রাঃ) কে ইসলামের শত্রু বাহিনীর সামনে উপস্থিত অবস্থায় বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেন, জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত। এই কথা শুনে এলোমেলো চেহারার এক ব্যক্তি জানতে চাইলো, হে আবু মুছা! আপনি কি নিজে আল্লাহ্‌র রাসূলকে এ কথা বলতে শুনেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যঁ–আমি নিজে এ কথা শুনেছি। ঐ ব্যক্তি তাঁর সাথীদের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, আমি তোমাদের কাছ থেকে জীবনে মতই বিদায় গ্রহণ করার জন্য এসেছি এবং তোমাদেরকে আমার জীবনের শেষ সালাম জানাচ্ছি। এ কথা বলে লোকটি জিহাদের ময়দানের দিকে চলে গেল এবং লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করলেন। (মুসলিম)

وعن انس ان فتى من اسلم قال يارسول الله انى اريد الغزو وليس معى ما اتجهز به قال ائت فلانا فانه قد كان تجهز فمرض فاتاه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول اعطنى الذى تجهزت به ولاتجسى عنه شيئا فوالله لاتجبسى منه شيئا فيبارك لك فيه–

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আসলাম গোত্রের একজন যুবক দরবারে রেসালাতে আগমন করে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিন্তু আমার কোন সরঞ্জাম নেই। রাসূল (সাঃ) তাঁকে বললেন, তুমি অমুকের কাছে যাও। সে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল কিন্তু হঠাৎ করেই সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। যুবকটি রাসূল (সাঃ) এর উপদেশ অনুযায়ী চলে গেল এবং উক্ত লোকটিকে রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ জানালো। জিহাদে গমনেচ্ছুক রোগাক্রান্ত লোকটি যুবকের মুখে রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ শুনে সে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললো, আমি জিহাদে গমন করার লক্ষ্যে যেসব উপকরণ প্রস্তুত করেছিলাম, তা সবই একে দিয়ে দাও। তা থেকে একটি জিনিসও যেন অবশিষ্ট না থাকে। আল্লাহ্‌র শপথ! এসব উপকরণ থেকে তুমি একটি জিনিসও রেখে দিও না, আল্লাহ্ তা'য়ালা এতে তোমাকে বরকত দান করবেন। (মুসলিম)

www.pathagar.com

আল্লাহর পথে জীবন দান–জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ

গোটা জীবন ব্যাপী নামায আদায় করা হলো, রোযা পালন করা হলো তবুও জান্নাতের নিশ্চয়তা লাভ করা গেল না। অথচ ক্ষণপূর্বে ঈমান এনেই জিহাদে অংশগ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করলো এবং আল্লাহর জান্নাতের অধিকারী হয়ে গেল। মদীনার বনী সালাবা গোত্র ছিল ইহুদী গোত্র। এই গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিল মুখাইরীক। ওহুদের যুদ্ধের সংবাদ পেয়ে সে তাঁর গোত্রের লোকদেরকে আহ্বান করে বলেছিল, ওহে ইহুদীগণ! তোমরা উত্তম রূপে অবগত আছো যে, মুহাম্মদ (সাঃ) কে সাহায্য করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য।'

ইহুদীরা তাঁকে জানালো, 'আজ আমাদের ধর্মীয় দিন শনিবার। আজ কি করে আমরা যুদ্ধে যেতে পারি!' মুখাইরিক বললেন, 'তোমাদের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।'

হযরত মুখাইরিক (রাঃ) এর এ কথা বলার কারণ হলো, ইহুদীদের সাথে আল্লাহর নবীর চুক্তি ছিল, মদীনা আক্রান্ত হলে তারা রাসূলের সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে। মক্কার কুরাইশরা এসেছিলও মদীনা আক্রমন করতে। হযরত মুখাইরিক তাঁর গোত্রের লোকদেরকে কথাগুলো বলে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে ওহুদের ময়দানে ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করতে এসে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। যুদ্ধে রওয়ানা হবার পূর্বে সে তাঁর নিজের লোকদেরকে বলে এসেছিল, 'আমি যদি যুদ্ধে নিহত হই তাহলে আমার সকল সম্পদের মালিক হবে মুহাম্মাদ (সাঃ), তিনি যেভাবে খুশী সে সম্পদ ব্যবহার করবেন।'

নবী করীম (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করে যখন তিনি যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, তখন পর্যন্তও আল্লাহর রাসূল অবগত ছিলেন না, মুখাইরিক ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ জন্য মুখাইরিক (রাঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে যুদ্ধে যোগদান করার পরে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'মুখাইরিক ইহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি।' হযরত হুসাইন ইবনে আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, 'আমি মাহমুদ ইবনে আসাদ (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মুখাইরিক কি ধরণের মানুষ ছিলেন?'

তিনি তাঁকে বলেছিলেন, মুখাইরিক প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করতো। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) যেদিন ওহুদের দিকে যুদ্ধযাত্রা করলেন, সেদিন সে ইসলামের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারপর তরবারী নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে যুদ্ধে যোগদান করে এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ময়দানে স্পন্দনহীনের মতই পড়েছিল। এরপর তাঁর গোত্রের লোকজন তাঁকে অনুসন্ধান করতে এসে লাশের ভেতরে আহত অবস্থায় তাঁকে খুঁজে পায়। তাঁর

www.pathagar.com

গোত্রের অনুসন্ধানকারীরা পরস্পরে বলাবলি করতে থাকে, 'মুখাইরিক এখানে কি করে এলো? সে তো ইসলামকে পছন্দ করতো না?' তারপর আহত মুখাইরিককে তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কি কারণে এখানে যুদ্ধ করতে এসেছিলে? গোত্র প্রীতির কারণে না ইসলামের আকর্ষণে?'

হযরত মুখাইরিক (রাঃ) ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি ইসলামের আকর্ষণে যুদ্ধ করতে এসেছিলাম। আমি সত্যের সন্ধান লাভ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি। তারপর তরবারি নিয়ে রাসূলের কাছে এসেছিলাম। তারপর যুদ্ধ করে বর্তমান অবস্থায় উপনিত হয়েছি।'

এই কথাগুলো বলার কিছুক্ষণ পরেই হযরত মুখাইরিক (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেছিলেন। নবী করীম (সাঃ) হযরত মুখাইরিকের ঘটনা শুনে বললেন, 'অবশ্যই সে জান্নাতের অধিবাসী।'

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) অন্যান্য সাহাবাদেরকে বলতেন, 'আমাকে তোমরা বলতে পারো, কোন সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ সে জীবনে নামাজ আদায় করেনি?' অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম জবাব না দিয়ে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করতেন, 'কে সে মহান ভাগ্যবান ব্যক্তি?' হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) জানিয়ে দিতেন, 'সে ব্যক্তি হলো উসাইরিম আমর ইবনে সাবিত।'

উল্লেখ্য হযরত মুখাইরিকের প্রকৃত নাম ছিল হযরত উসাইরিম আমর ইবনে সাবিত। তিনি নামাজ আদায় করার সময় পাননি। কারণ ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি ওহুদের রণপ্রান্তরে ছুটে এসেছিলেন। নবী করীম (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেই তিনি শত্রুর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

وعن البراء قال اتى النبى صلى الله عليه وسلم، رجل مقنع بالحديد فقال يارسول الله اقاتل اواسلم قال اسلم ثم قاتل فاسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل قليلا واجر كثيرا-

হযরত বারাআ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি অস্ত্র সজ্জিত হয়ে এসে রাসূলের কাছে আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসুল ! আমি প্রথমে জিহাদ করবো না ইসলাম গ্রহণ করবো? রাসুল বললেন, প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করো তারপর জিহাদ করো। লোকটি ইসলাম গ্রহণ করলো তারপর জিহাদের ময়দানে প্রবেশ করে লড়াই করে শেষ

www.pathagar.com

পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করলো। আল্লাহর রাসূল লোকটি সম্পর্কে বললেন, এই ব্যক্তি খুব সামান্য আমল করলো কিন্তু বিশাল প্রতিদান লাভ করলো। (বোখারী, মুসলিম)

জান্নাতে শহীদের কামনা

আল্লাহ্ পাক তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য যে জান্নাত সৃষ্টি করেছেন, সে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, মানুষের কোন দৃষ্টি তা অবলোকন করেনি। কল্পনা প্রবণ কোন মন সে জান্নাতের পরিবেশ সম্পর্কে কল্পনাও করতে পারে না। এই জান্নাতে যে ব্যক্তি একবার প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করবে, সে আর কখনও সেখান থেকে বের হওয়ার কল্পনাও করবে না। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে যারা শাহাদাত বরণ করেছেন, তাদেরকে যখন জান্নাত দান করা হবে, তখন তাঁরা সে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে এসে পুনরায় শাহাদাত বরণ করার আকাংখা পোষণ করবেন। এ থেকে অনুভব করা যেতে পারে যে, শহীদদের সম্মান ও মর্যাদা কত বিশাল। এই মর্যাদা বার বার লাভ করার জন্য শহীদ আকাংখা পোষণ করবে।

وعن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم-قال ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شئ الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة-

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার কথা কল্পনাও করবে না-যদিও গোটা পৃথিবীর সমস্ত জিনিস ভোগ করার অধিকার তাঁর থাকবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে যে ব্যক্তি প্রান দান করেছে, সে যখন তাঁর সম্মান ও মর্যাদা দেখবে, সে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা পোষণ করবে এবং দশবার আল্লাহর পথে জীবন দান করতে চাইবে। (বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন নবী-রাসূলগণ। তারপরেই জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করবেন তাঁরাই যাঁরা এই পৃথিবীতে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাতিলের সাথে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী তিন ধরনের মানুষকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। এই

www.pathagar.com

লোকগুলো হবে, আল্লাহর পথে জীবন দানকারী শহীদগণ, ধৈর্যশীল ও পরম যত্নের সাথে আল্লাহর ইবাদাতকারীগণ এবং মনিবের হিতাকাংখী অনুগত ক্রীতদাস।

জান্নাতে শহীদগণ উড়ে বেড়াবে

সত্য-আর মিথ্যার প্রথম সংঘাত বদরের যুদ্ধে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের যাবতীয় পাপসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যোগ দেয়া কত বিশাল সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। সে সময়ের ইতিহাসে দেখা যায় যে, গোটা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র নগর রাষ্ট্র মদীনাতেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্ষুদ্র এই রাষ্ট্রটিকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারলেই পৃথিবী থেকে ইসলামকে বিদায় করে দেয়া যেত। ইসলাম বিরোধী শক্তি এ আশায় সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমে মদীনা আক্রমন করার লক্ষ্যে এগিয়ে গেল। সংঘটিত হলো ওহুদের প্রান্তরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। শহীদদের রক্তে ওহুদের প্রান্তর রাঙা হয়ে উঠলো।

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه انه لما اصيب اخوانكم يوم احد جعل الله ارواحهم فى جوف طير خضر ترد انهار الجنة تأكل من ثمارها وتاوى الى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش فلما وجدوا ماكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ اخوننا عنا اننا احياء فى الجنة لئلا يزهدوا فى الجنة ولاينكلوا عند الحرب فقال الله تعلى انا ابلغهم عنكم فانزل الله تعلى، وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا، بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ–

আল্লাহর রাসূলের চাচাত ভাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) তাঁর সাথী আল্লাহর পথের সৈনিকদেরকে জানালেন, তোমাদের যেসব ভাইয়েরা ওহুদের প্রান্তরে আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেছে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের রুহগুলোকে সবুজ পাখীর অভ্যন্তরে স্থাপন করে দিয়েছেন। তাঁরা জান্নাতের

www.pathagar.com

প্রবাহমান সরোবর–ঝরণাসমূহের ওপর দিয়ে উড়ে বেড়ায় এবং জান্নাতের ফল-মূল আহার করে। আল্লাহ্র আরশের ছায়ায় ঝুলন্ত ঝাড়বাতিতে গিয়ে আবস্থান করে যখন তারা এই ধরনের আরামদায়ক পরিবেশ লাভ করলো, আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁরা আপন মনেই বলে স্বাগতিকভাবে বলে উঠলো, 'আহ্! এমন কি কেউ নেই যে, জান্নাতে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে পৃথিবীতে জীবিত আমাদের ভাইদেরকে জানিয়ে দিয়ে বলে যে, এখানে আমরা কত সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছি। যেন তাঁরা এ সংবাদ জানতে পেরে জিহাদের ময়দান থেকে পিছু হটে না আসে এবং আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শিথিলতা প্রদর্শন না করে।'

শহীদদের মনের এই আকাংখার উত্তরে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁদেরকে জানালেন, 'আমি তোমাদের পক্ষ থেকে এই সংবাদ জানিয়ে দেবো।' এরপর আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন–

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا–بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ–

যারা আমার দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে জীবন দান করেছে তাদেরকে তোমরা মৃত মনো করোনা, বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে জীবিকা লাভ করছে।

শহিদী মৃত্যুর পূর্বক্ষণে জান্নাত দেখানো হবে

ইসলামী আন্দোলনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার ময়দানে যারা বাতিল শক্তির আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন, তাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নিয়ামত। এর পরেও বিশেষভাবে তাদেরকে ছয়টি অনন্য পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে। আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন–

يغفر له فى اول رفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر، ويامن من الفزع الاكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا ومافيهاويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع فى سبعين من اقربائه

www.pathagar.com

আল্লাহর পথের সৈনিকের রক্তের প্রথম ফোটা মৃত্তিকা স্পর্শ করার পূর্বেই তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং জান্নাতের আবাস স্থল তাকে প্রদর্শন করা হয়। কবরের ভয়াবহ আযাব থেকে তাকে নিরাপত্তা দান করা হয়। কিয়ামতের বিভিষীকা দেখে সবাই যখন ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়বে, তখন শহীদদেরকে কোন ধরনের ভয়-ভীতি স্পর্শ করতে পারবে না। কিয়ামতের ময়দানে তার মাথায় এমন মহামূল্যবান মুকুট পরিধান করানো হবে যে, সে মুকুটের ক্ষুদ্র একটি পাথরও এই পৃথিবী ও তার ভেতরে যা কিছু রয়েছে, তারচেয়েও অধিক মূল্যবান। জান্নাতে তার সাথী হিসেবে অসংখ্য হুর দেয়া হবে। তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের ভেতর থেকে সত্তর জনের ব্যাপারে তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে। (তিরমিযী)

عن ابى امامة عن النبى صلى الله عليه وسلم، ليس شيئ احب الى الله من قطرتين واثرين، قطرة من دموع فى خشية الله وقطرة دم تهراق فى سبيل الله، واما الاثران فاثر فى سبيل الله واثر فى فريضة من فرائض الله-

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম(সাঃ) বলেছেন, দুটো ফোটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তার একটি ফোটা হলো, আল্লাহর ভয়ে যে চোখ ফোটায় ফোটায় অশ্রু ঝরায়। এই অশ্রু বিন্দু আল্লাহ তা'য়ালার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এর কারণ হলো, মানুষ আল্লাহকে দেখেনি, তাঁর জান্নাত-জাহান্নাম দেখেনি। এসব না দেখেও গভীরভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাঁর ভয়ে আরামের শয্যা ত্যাগ করে গভীর রাথে নির্জনে আল্লাহর দরবারে অশ্রু ঝরিয়েছে। আরেকটি ফোটা হলো, আল্লাহর পথের সৈনিকের দেহের তপ্ত রক্তের ফোটা। লড়াইয়ের ময়দানে ইসলামের শত্রুগণ তাকে আঘাত করেছে, এই আঘাতে তাঁর শরীর থেকে যে রক্তের ফোটা গড়িয়ে পড়েছে, এই রক্তের ফোটা আল্লাহ অত্যন্ত পছন্দ করেন। ইসলামের শত্রুরা ঈমানদারের দেহে আঘাত করে যে চিহ্ন সৃষ্টি করেছে, এই চিহ্ন আল্লাহ অত্যন্ত পছন্দ করেন। ঈমানদার বান্দা ফরয ইবাদাত করেছে এ কারণে তাঁর দেহে যেসব চিহ্ন সৃষ্টি হয়েছে, এসব চিহ্ন আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত ভালোবাসেন। (তিরমিযী)

কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর রাসূলের চাচা হযরত হামযা (রাঃ) রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে উঠবেন। ওহুদের ময়দানে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী তাঁর বুক চিরে কলিজা

www.pathagar.com

চিবিয়েছিল। তাঁর নাক কান কেটে মালা বানিয়ে তা গলায় পরিধান করেছিল হিংস্র হায়েনার দল। তিনি এই অবস্থা নিয়ে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবেন। এভাবে অসংখ্য শহীদগণ কেউ তারবারির আঘাত নিয়ে, কেউ বর্শার আঘাত নিয়ে, কেউ বুলেটের আঘাত নিয়ে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবেন। তাদের সামনে নাদুস-নুদুশ চর্বি থলথলে দেহ নিয়ে ইসলামের সৈনিক দাবীদারগণ কিভাবে দাঁড়াবেন? দাবী করা হয় আমরা ইসলামের খাদেম, অথচ জীবনে তাকে কোনদিন অপবাদের মুখোমুখী হতে হলো না, ইসলামের শত্রু পক্ষের মুখপত্র পত্রিকাসমূহে তাঁর বিরুদ্ধে কোন লেখা প্রকাশ হলো না, জেলে যেতে হলো না, ময়দানে বাতিল শক্তি তাকে প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে এলো না, নাগরিকত্ব বাতিল হলো না, তার কুশপুত্তলিকা কেউ দাহ করলো না, আদালতে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা হলো না, ইসলামের পক্ষে জীবনে একটা মিছিল পর্যন্ত করলো না, অথচ নিজেকে রাসুলের আশেক, আল্লাহর সৈনিক, যুগের মুজাদ্দিদ, ওলীয়ে কামিল ইত্যাদি বলে প্রচার করা হয়। এসব লোককে কিয়ামতের ময়দানে ঐসব লোকদের সামনে লজ্জিত হতে হবে যারা ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে নির্যাতন সহ্য করেছেন।

শহীদগণ নবী-রাসূলদের কাতারে অবস্থান করবেন

আল্লাহর পথে যারা নিজের মূল্যবান প্রিয় জীবন বিলিয়ে দেন, জীবন-যৌবন, স্ত্রী-পুত্র সমস্ত কিছুর মমতা পরিত্যাগ করে যারা ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে বিরোধী শক্তির সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে মৃত্যুকে স্বাগত জানায়, তাদের সৌভাগ্য দেখে কিয়ামতের ময়দানে মানুষ ঈর্ষাবোধ করবে। কারণ নবী-রাসুলগণের কাতারে তারা স্থান লাভ করবে। স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে নিজের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, একবার আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে ভ্রমণে যাচ্ছিলাম। যখন আমরা হাররাতে ওয়াকীম নামক স্থানে উপনীত হলাম সেখানে পাহাড়ের উপত্যকায় বেশ কয়েকটি কবর দেখতে পেলাম। আমরা আল্লাহর রাসূলের কাছে জানতে চাইলাম: হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো কি আমাদের ভাইয়ের কবর! আল্লাহর নবী আমাদেরকে জানালেন, এগুলো আমাদের সাথী বন্ধুদের কবর। এরপর আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে আল্লাহর পথে নিহতদের কবরের কাছে গেলাম, তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, এগুলো আমাদের ভাইদের কবর।

শহীদদের কত বড় মর্যাদা! আল্লাহর পথে যারা জীবন দান করেছেন, স্বয়ং আল্লাহর হাবিব তাদেরকে নিজের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত উতবা ইবনে আব্দুস

www.pathagar.com

সুলামী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহর পথে নিহত মানুষ তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণী হলো, ঐসব মুমিন ব্যক্তি যারা নিজের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে থাকে এবং প্রয়োজনে বিরোধী শক্তির মোকাবেলা করতে করতে অকুতোভয়ে শাহাদাত বরণ করে। এসব লোক হলো পরীক্ষিত শহীদ, এরা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে। তাদের আর নবীগণের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য হলো, শহীদগণকে নবুওয়াতের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়নি আর নবীদেরকে নবুওয়াতের পদে অধিষ্ঠিত করে অধিক মর্যাদা দান করা হয়েছে। অর্থাৎ নবীগণকে যে সম্মান ও মর্যাদায় আল্লাহ্ তা'য়ালা অভিষিক্ত করবেন, শহীদগণকেও প্রায় অনুরূপ মর্যাদা দান করা হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী হলো ঐসব মুমিন যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে এবং মানবীয় দুর্বলতার কারণে পাপ তাকে মাঝে মাঝে স্পর্শ করেছে। তবুও তাঁরা জিহাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিরোধী শক্তির সাথে নির্ভীকভাবে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেছে। এভাবে সে নিজের পাপ মুছে ফেলেছে। কারণ জিহাদের অস্ত্রই সকল অপরাধ মুছে দেয়। এসব ব্যক্তি জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে তার ইচ্ছে মতো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে।

আরেক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, ইসলামের প্রতি যাদের অন্তরে রয়েছে সন্দেহ সংশয়। ইসলামকে এরা মোটেও ভালোবাসে না। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক, এ ধরনের তৎপরতা তাদের নেই। কিন্তু এরা তাদের মনের ভাব আল্লাহর পথের সৈনিকদের কাছে প্রকাশ করেও সাহস পায় না। জাগতিক সুবিধা লাভের আশায় এরা ইসলামী আন্দোলনের সহযোগী শক্তি হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে। এরা পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে জিহাদে অসন্তুষ্টির সাথে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। লোকজনকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদও দান করে থাকে। এরা যদি জিহাদের ময়দানে শহীদ হয় তবুও এরা জাহান্নামী। কারণ জিহাদের অস্ত্র মুনাফেকী মুছে দিতে সক্ষম নয়। (মুসনাদে আহমাদ)

শহীদগণ মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্ত

আল্লাহ্ পাক বলেছেন, প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ অস্বাদন করাবেন। মৃত্যুর সময় ঈমানের শ্রেণী অুনসারে মানুষ মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করবে। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন শহীদগণ। ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যারা ইসলামী আন্দোলন করে এবং জিহাদের ময়দানে বাতিলের আঘাতে শাহাদাত বরণ করে, তাদের কোন মৃত্যু যন্ত্রণা নেই। তাঁরা যন্ত্রণাবিহীন মৃত্যু লাভ করে থাকে।

www.pathagar.com

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مايجد الشهيد من مس القتل الاكمايجد احدكم من مس القرصة-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহর পথে জীবন দানকারী ব্যক্তি মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করে না, তবে তোমাদের কেউ পিঁপড়ের কামড়ে যেটুকু কষ্ট অনুভব করে কেবল সেটুকুই সে অনুভব করে মাত্র। (তিরমিযী)

জিহাদের ময়দানে আমরা দেখতে পাই, অবর্ণনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে শহীদ করে দেয়া হয়। আসলে তাঁরা কোন কষ্টই অনুভব করে না। ছোট্ট একটি পিঁপড়া দংশন করলে মানুষ যে কষ্ট অনুভব করে থাকে, আল্লাহর পথের সৈনিক শাহাদাত বরণ করার সময় সেই কষ্ট অনুভব করে থাকে। সুতরাং ইসলাম বিরোধী শক্তি লোমহর্ষক নির্যাতনের মাধ্যম্যে হত্যা করবে, এই আশঙ্কায় জিহাদের ময়দানে কর্মসূচীতে যোগদানের ব্যাপারে যারা শিথিলতা প্রদর্শন করে তাকে, তাদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রয়োজন শুধু ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছা। বাতিল শক্তিকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে অনেক বড়-বিশাল দেখা যায়। তাদের মিছিল-সমাবেশ দেখে মনে কত বিশাল এদের শক্তি। আসলে ঈমানদারদের 'আল্লাহু আকবর' গর্জনে ওদের কলিজায় কম্পন দেখা দেয়। ভয়ে ওরা ময়দান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

কোন বাড়িতে যদি কোন ব্যক্তি চুরি করার মানসিকতা নিয়ে প্রবেশ করে, তাহলে তার মন থাকে দুর্বল। সামান্য শব্দে সে চমকে ওঠে। চোরকে দেখে যদি সে বাড়ির ছোট্ট একটি শিশুও 'কে?' বলে আওয়াজ দেয় তখন চোরের কলিজায় কম্পন সৃষ্টি হয়। বাড়ির মালিক জেগে উঠে তাকে ধরবে এই ভয়ে সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক হলেন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন আর ঈমানদারদের অভিভাবক তিনিই। আল্লাহ তা'য়ালা এই যমীনের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব ঈমানদারকেই দান করেছেন। সুতরাং এই যমীনে ইসলাম বিরোধী শক্তি হলো চোরের মতই ভীরু, এদের মিছিল-সমাবেশ আকারে বড় হলেও গুটি কয়েক ঈমানদার যখন তাদের মোকাবিলায় 'আল্লাহু আকবর' বলে গর্জন করে ওঠে তখন তারা আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ইতিহাসে যেমন এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে বর্তমান ময়দানেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে শর্ত হলো একটিই, ঈমানদার হতে হবে- মুমিন হতে হবে।

www.pathagar.com

জিহাদ করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির মৃত্যু হবে মুনাফিকী স্বভাবের ওপরে

যার অন্তরে জিহাদ করার ইচ্ছা নেই, জিহাদের কামনা যে ব্যক্তি অন্তরে পোষণ করে না, সে ব্যক্তির মৃত্যু হবে মুনাফিকীর মৃত্যু। আর মুনাফিকের স্থান হবে জাহান্নামে কাফিরের পায়ের নীচে।

وعن ابى هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات ولم يغزولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق–

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদ না করে এবং জিহাদের কোন আকাংখাও অন্তরে পোষণ না করে মৃত্যুবরণ করলো, তার মৃত্যু হলো মুনাফিকী স্বভাবের ওপর। (মুসলিম)

শাহাদাতের তামান্না মুমিন হৃদয়ে জাগ্রত থাকে। যে হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না নেই, সেই হৃদয় মুনাফিকদের হৃদয়ের মতো। সুতরাং মনে এই আশা পোষন করতে হবে, আল্লাহ যখন মৃত্যু দান করবেন, তখন যেন শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন। মৃত্যু একটি কঠোর বাস্তবতা। এই মৃত্যু থেকে কোনক্রমেই নিজেকে লুকিয়ে রাখা যাবে না। তাহলে মৃত্যু যখন হবেই তখন শাহাদাতের মৃত্যুই আল্লাহর কাছে কামনা করতে হবে। হযরত সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) বলেন আল্লাহর রাসূল বলেছেন–

من سال الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه–

যদি কোন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থেই একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য দোয়া করে তাহলে সে যদি শয্যাশায়ী হয়েও মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে শহীদদের স্তরে পৌঁছে দিবেন। (মুসলিম)

وعن انس قال، قال رسول الله صلى الله عليه رسلم، من طلب الشهادة صادقا اعطيها ولو لم تصبه–

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি হৃদয়-মন দিয়ে আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের কামনা করে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে, যদিও তাঁর মৃত্যু অন্যভাবে হয়ে থাকে। (মুসলিম)

www.pathagar.com

আল্লাহর পথের সৈনিকদের মধ্যে শাহাদাতের তীব্র আকাংখা থাকা প্রয়োজন। এই আকাংখাই ঈমানদারকে জিহাদের ময়দানে অগণিত বাতিল সৈন্যদের বিরুদ্ধে তাকে বিজয়ী হতে সাহায্য করে থাকে। কেননা বান্দা যখন আল্লাহর জন্য ইসলামকে বিজয়ী করার ইচ্ছায় প্রাণদানের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন আল্লাহর সাহায্য অবধারিত হয়ে যায়। শাহাদাতের এই আকাংখা ঈমানদারকে দুর্বার দুর্বিনীত করে তোলে।

আল্লাহর পথে যারা জীবন দান করে তাদের জীবনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয় কিন্তু সে যদি ঋণগ্রস্থ থাকে, এই ঋণ ক্ষমা করা হয় না। কারণ ঋণ হলো অন্যের অধিকার, যার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে, সে যদি তা ক্ষমা না করে, তাহলে আল্লাহ তা ক্ষমা করেন না।

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يغر الله للشهيد كل ذنب الاالدين-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ ঋণ ব্যতিত শহীদের সমস্ত কিছুর গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। (মুসলিম)

জিহাদকারীকে সহযোগিতা করার সম্মান ও মর্যাদা

যিনি আল্লাহর পথের সৈনিক, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যে ব্যক্তি বা দল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা যারা করবে, তারা ময়দানে জিহাদ করার মতই সওয়াব লাভ করবে। বর্তমান ইসলামের বিপরীত পরিবেশে যারা ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছে, তাদেরকে যে কোনভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। অর্থ দিয়ে, যান-বাহন দিয়ে, থাকার জায়গা দিয়ে, খাদ্যদ্রব্য দিয়ে, বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে। কেউ যদি এভাবে সাহায্য করে, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকেও জিহাদকারীর অনুরূপ সওয়াব দান করবেন।

ছাত্র অঙ্গনে ইসলামী আন্দোলন করছে এমন অনেক তরুণ-যুবক রয়েছে, যাদের আর্থিক ক্ষমতা নেই শহর এলাকায় অবস্থান করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা। এদেরকে সাহায্য করার জন্য ঈমানদারদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। এদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে এরা একদিকে শহরে থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে সক্ষম হবে, তেমনি তারা স্থানীয় পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবে। এদেরকে যারা সাহায্য করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে উত্তম বিনিময় অবশ্যই দান করবেন। অপরকে সাহায্য করতে গেলে নিজের কিছুটা অসুবিধা হতে পারে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কোন অসুবিধাকে গুরত্ব না দিয়ে আল্লাহ্র পথের সৈনিকদের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

আল্লাহ্র পথের সৈনিকদেরকে যেদিক থেকেই হোক, যেভাবেই হোক সাহায্য করতে হবে। এই সাহায্যের অভাবেই অনেকে ময়দানে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা ইচ্ছা থাকার পরও পালন করতে পারেন না। রাসূলের সাহাবা কেরামের মধ্যে এ ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করার মনোভাব তীব্রভাবে জাগ্রত ছিল। হযরত জাফর (রাঃ) যখন শাহাদাত বরণ করলেন, তখন তাঁর পরিবারের প্রতি অগণিত সাহায্যের হাত এগিয়ে গিয়েছিল। তাঁর শিশু কন্যাকে লালন পালনের জন্য সাহাবায়ে কেরাম প্রতিযোগিতা শুরু করেছিলেন।

অর্থের অভাবে যারা জিহাদের ময়দানে যেতে অক্ষম হয়েছেন, সাহাবা কেরাম তাদেরকে সাহায্য করেছেন, যেন তাঁরা জিহাদের ময়দানে যেতে পারেন। যিনি আল্লাহ্র দেয়া জীবন বিধান দেশের বুকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, যার পক্ষে যেভাবে সম্ভব যতটুকু সম্ভব তাঁর পাশে, তাঁর পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ্র পথের সৈনিকের মনে যখন এ প্রত্যয় জন্মে—আমি শাহাদাত বরণ করলেও আমার সন্তান-সন্তুতি, আমার স্ত্রী, আমার বৃদ্ধা মাতা, আমার বৃদ্ধ পিতার কোন ধরনের অসুবিধার কারণ থাকবে না, আমার অসংখ্য ঈমানদার ভাই এসে তাদের পাশে অবস্থান গ্রহণ করবেন। তাঁরা স্নেহ, মমতা, প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে আমার সন্তানদেরকে আল্লাহ্র পথের সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলবেন। তাঁরা সেবা দিয়ে, খাদ্য-বস্ত্র দিয়ে, পানীয় দিয়ে, ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে আমার চেয়ে অধিক উত্তমরূপে তাদরে জীবন ধারণের, জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করবেন। তখন আল্লাহ্র পথের সৈনিক জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে কোন ধরনের কুণ্ঠাবোধ করবে না।

ঈমানদারদেরকে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সবার ঈমানী শক্তি এক রকম হয় না, সবার ঈমানী জজবাও সমান নয়। জাগতিক এসব চিন্তা জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনেককেই সংশায়িত, দ্বিধান্বিত, কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত করতেই পারে। এটা সহজাত, এটাই স্বাভাবিক মানবীয় দুর্বলতা। আর এই দুর্বলতার উর্ধ্বে যাঁরা উঠতে পারেন, তাঁরা অসাধারণ—অসামান্য।

www.pathagar.com

পিতা সর্বস্ব বিক্রি করে সন্তানের লেখা-পড়ার খরচ জুগিয়েছেন এ আশায় যে, তাঁর সন্তান একদিন উপযুক্ত হয়ে সংসারের অভাব দূর করবে। সেই সন্তান ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে জিহাদের ময়দানে প্রাণ দান করতে কুণ্ঠিত হতে পারে এতে অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু যখন সে অনুভব করবে যে, আমি যদি শাহাদাত বরণ করি, তাহলে আমার বৃদ্ধ পিতা আর বৃদ্ধা মাতার কোন সমস্যা হবে না। আমার অগণিত সাথী ভাই রয়েছেন, যাঁরা আমার মাতা-পিতার আকাংখা পূরণে এগিয়ে আসবেন। তখন সে ব্যক্তি সিংহ বিক্রমে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে। বর্তমান ময়দান জিহাদের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। সময়ের ডাকে সাড়া দেবার মত মর্দে মুজাহিদ অকুতোভয় তরুণ-যুবকের অভাব নেই আমাদের সমাজে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, তাদের কাজে লাগানোর মত, পৃষ্ঠপোষকতা করার মত, আর্থ-সামাজিক, নিরাপত্তা বিধান করার মত কোন ব্যবস্থা আমাদের মাঝে নেই।

ইসলামী আন্দোলনের রক্তঝরা ময়দানে অনেকে অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেন। কেউ চিরতরে পঙ্গুত্ব বরণ করেন। নিঃশেষে প্রাণদান করে শাহাদাত বরণ করেন। তাদের প্রতি আমরা সহানুভূতি জ্ঞাপন করি, পত্রিকায় তাদের প্রশংসা করে লিখি, বক্তৃতায় তাদের কথা বলি, তাদের অসহায় বৃদ্ধ মাতা, কর্ম ক্ষমতাহীন পিতা, এতিম শিশুদের কথা শুনে, শহীদের বিধবা স্ত্রীর আহাজারী শুনে আমরা কেউ দুঃখিত হই, কেউ দু'ফোটা অশ্রু ঝরিয়ে আমাদের ইতিকর্তব্য পালন করি। আমরা কেউ আল্লাহর পথের সেই সৈনিকের দুর্দশাগ্রস্থ পরিবারের দুর্দশা মোচন করার লক্ষ্যে কোন ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে যাই না। এটা ঈমানদারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট নয়।

আমাদের অবস্থা হয়েছে সেই কুকুর প্রেমিক এক ভ্রমণকারীর মতই। ধনাঢ্য ভ্রমণকারী তার প্রভুভক্ত কুকুরকে সাথে নিয়ে ভ্রমণে বের হয়েছিল। পথে খাদ্যের অভাবে অনাহারে কুকুরটি মুমূর্ষ হয়ে পড়লো। মৃতপ্রায় কুকুরটিকে নিয়ে এক বৃক্ষের নীচে বসে কুকুরের মনিব লোকটি অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিল। একজন পথিক সে পথ অতিক্রম কালে ভ্রমণকারীকে কাঁদতে দেখে তার কাঁদার কারন জানতে চেয়েছিল। কুকুরের মনিব কান্না জড়িত কণ্ঠে জানিয়েছিল, খাদ্যের অভাবে অনাহারে তার প্রিয় কুকুরটি মারা যাচ্ছে, এ জন্য সে কাঁদছে।

পথিক সেই ভ্রমণকারীর থলের দিকে ইশারা দিয়ে জানতে চেয়েছিল, থলেতে কি আছে। লোকটি জানিয়েছিল, তার থলেতে রয়েছে রুটি ও অন্যান্য খাদ্য। পথিক অবাক বিস্ময়ে কুকুরের মনিবকে বলেছিল, খাদ্যের অভাবে অনাহারে তোমার প্রিয়

www.pathagar.com

কুকুর মারা যাচ্ছে অথচ তোমার থলেতে রয়েছে খাদ্য। এ খাদ্য কুকুরটিকে খেতে দিলেই তো প্রাণে বেঁচে যায়। কুকুরের মনিব লোকটি পথিকের দিকে রোষকষায়িত লোচনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলেছিল, আপনি ভালো পরামর্শই দিচ্ছেন জনাব! আমি কুকুরের জন্য অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছি এতে আমার কোন অর্থ ব্যয় হচ্ছে না। কিন্তু ওকে খাদ্য দিলেই তো আমার অর্থ ব্যয় হবে। আমি অর্থ ব্যয় করতে পারবো না।

আজ অনেকের অবস্থা হয়েছে ঐ মনিবের মতই। আল্লাহর পথে যারা অকাতরে কোরবানী দিচ্ছেন, তাদের জন্য আমরা শুধু সহানুভূতিই জ্ঞাপন করি, তাদের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই না। আমাদের এ অভ্যাসের পরিবর্তন করতে হবে। প্রাণের চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নেই। আল্লাহর পথের সৈনিক সেই প্রিয় প্রাণটিই দান করে দেন। তাঁর বিপন্ন, বিধ্বস্ত, অসহায় পরিবারের প্রতি সব ধরনের সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব, ইসলাম যে মানবতা শিক্ষা দিয়েছে সেই মানবতার দাবী। এ দাবী আদায়ে মুসলমানদেরকে সক্রিয় হতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে দেশ ও সমাজে যে জুলুমের প্লাবন বয়ে যায়, জুলুমের সে স্রোত শুধু জিহাদকারীর প্রতিই আঘাত করে না, দেশের প্রতিটি মানুষকেই তা আঘাত করে।

এই জুলুমের গতি পথ রুদ্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন যারা করছেন, তাদেরকে অকাতরে সাহায্য করতে হবে। এই সাহায্যের বিনিময়ে আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত দান করবেন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

وعن زيد بن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا فى اهله بخير فقد غزا–

হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের সৈনিকদেরকে জিহাদের উপায়-উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছে সে ব্যক্তিও জিহাদ করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের সৈনিকের অনুপস্থিতি–অবর্তমানে তাঁর পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করেছে, তাঁরাও জিহাদ করেছে। (বোখারীও মুসলিম)

আল্লাহর পথে জিহাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে যে আলোচনা করা হলো, এতে করে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, জিহাদের কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়া না হলে কোন

www.pathagar.com

মানুষের পক্ষেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়–সম্ভব নয় আল্লাহর জান্নাত লাভ করা। প্রথম কাজ হলো আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীসহ তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং ঈমানের দাবী অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে হবে। দ্বিতীয় কাজ হলো, রাসুলের প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসুলকেই একমাত্র আদর্শ নেতা হিসেবে অনুসরণ করতে হবে। আর তৃতীয় কাজ হলো দেশ ও সমাজে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হবে কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে। তাহলেই বাতিলের মোকাবিলায় ময়দানে দৃঢ়পদে অবস্থান করা যাবে–অর্জন করা যাবে সফলতা।

নারীর জিহাদ

নিজের দেহের অভ্যন্তরের নাফছের সাথে, দেহের বাইরের পরিবেশের সাথে, শয়তানের সাথে এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও দেশের আল্লাহ বিরোধী বিধি-বিধানের সাথে পুরুষ যেমন জিহাদ করবে, নারীদেরকেও তেমনি জিহাদ করতে হবে। তবে জিহাদ যখন অস্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে উন্নীত হয়–সশস্ত্র জিহাদ করতে হয়, তখন নারীদেরকে এই কঠিন কাজ থেকে ইসলাম দূরে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছে। কারণ প্রকৃতিগতভাবে নারী ও পুরুষ দৈহিক ও মানসিক দিয়ে দিয়ে সমান নয়। ইসলামের বিপরীত মতামত, আদর্শ ও বিধি-বিধানের অসারতা প্রমাণ করে নারী সাহিত্য রচনা করবে, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করবে। পর্দার বিধানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে নারী লিখবে, ইসলামের বিধি-বিধান পালনে নারী তার সমগোত্রীয়দেরকে উদ্বুদ্ধ করবে, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দান করবে, ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটাবে, স্বামীর অবর্তমানে তার ঘর-সংসারের প্রতি যত্নবান হবে এবং সজাগ দৃষ্টি রাখবে, সন্তান-সন্তুতিদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত করে গড়ে তুলবে–এসবই হলো নারীর জিহাদ।

নারীর সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো, সন্তানদেরকে সে আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদ হিসাবে গড়ে তুলবে। নারীকে এমন চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে যে, সন্তান তার কোলে দৃষ্টি মেলেই যেন পূর্ণ ইসলামী পরিবেশ দেখতে পায়। সন্তানের মধ্যে ইসলামী চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। এ ব্যাপারে পিতার থেকে মায়ের দায়িত্ব অনেক বেশী। কারণ পিতা স্বাভাবিকভাবেই বাড়ির বাইরে অবস্থান করে। সন্তান অধিকাংশ সময়ে মায়ের সান্নিধ্য লাভ করে। মায়ের প্রভাবই সন্তানের ওপরে অধিক কার্যকর হয়ে থাকে। এ জন্য মা তার সন্তানকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দান করবেন,

www.pathagar.com

যেন সন্তান আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদ হিসাবে ময়দানে ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামের স্বর্ণালী যুগে কতিপয় নারী জিহাদের মর্যাদা ও ফযিলত অনুধাবন করে এই সম্মান ও মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে অস্থির হয়ে পড়েছিল। তাঁরা ধারণা করেছিল, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের তুলনায় পুরুণগণ অগ্রগামী। এ ধারণার বশীভূত হয়ে তারা আল্লাহর রাসূলের দরবারে অভিযোগের সুরে নিবেদন করেছিল, 'হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষরা তো সকল শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লুটে নিচ্ছে। তারা জিহাদ করে এবং আল্লাহর পথে বড় বড় ধরনের কাজের আঞ্জাম দিচ্ছে। আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদদের সমান প্রতিদান লাভের জন্য আমরা কোন ধরনের কাজ করবো?'

আল্লাহর দরবারে সম্মান ও মর্যাদা লাভের নারীদের এই আকুতি দেখে নারীমুক্তির অগ্রদুত নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন–

مَنْ قَعَدَتْ مِنْكُنَّ فِىْ بَيْتِهَا فَانَّهَا تَدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنَ–

তোমাদের মধ্য থেকে যে বাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থান করবে সে মুজাহিদদের মর্যাদা লাভ করবে।

আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'যে নারী তার স্বামীর সংসারে প্রতি যত্নবান, সন্তানদেরকে আল্লাহ ভীরু হিসাবে গড়ে তোলে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে নারী আল্লাহর জান্নাতের যে দরোজা দিয়ে খুশী প্রবেশ করবে।' নারীদের সম্পর্কে কোরআন ঘোষণা করেছে–

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى
وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ–

নিজের গৃহমধ্যে অবস্থান করো এবং পূর্বের জাহেলী যুগের মতো সাজসজ্জা দেখিয়ে বেড়িও না। নামাজ কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। (সূরা আহ্যাব-৩৩)

ঈমানদার পুরুষগণ তো তখনই দৃঢ়পদে ও স্থিরচিত্তে আল্লাহর দুশমনদের সাথে দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারবে যখন সে নিজের ঘর-সংসারের দিক থেকে পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে। তার অর্ধাঙ্গিনী-সহধর্মিনী তার সংসারের যাবতীয় কিছুর প্রতি সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখবে এবং সন্তানদেরকে ইসলামের মুজাহিদ হিসাবে

www.pathagar.com

গড়ে তুলবে-এই বিশ্বাস পুরুষকে জিহাদের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকার উদ্দিপনা যোগাবে। যে নারী তার স্বামীকে এই নিশ্চয়তা দান করবে, সে নারী সেই সম্মান ও মর্যাদাই অর্জন করবে, যে মর্যাদা তার স্বামী ময়দানে জিহাদ করে অর্জন করবে। তবে এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, নারীর নিজের বাড়ির মধ্যে অবস্থান করার অর্থ এটা নয় যে, তারা শিক্ষা অর্জন করবে না বা সমাজ-দেশের কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করবে না। তারা তাদের জন্য নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করবে, দেশ ও জাতির জন্য স্বীয় মেধা ও শ্রম দান করবে, জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখবে। এখানে আরেকটি বিষয় স্মরণে রাখতে হবে যে, ঈমানদার জনগোষ্ঠী তখনই হাতে অস্ত্র ধারণ করে জিহাদে লিপ্ত হয়, যখন সর্বসাধারণ এক বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় নিপতিত হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতি দাবী করে যে, জাতির সমস্ত শক্তি আত্মরক্ষায় নিয়োগ করা উচিত।

এই ধরনের পরিস্থিতি যদি কখনো সৃষ্টি হয়, তখন ইসলাম নারীকে সামরিক সেবায় অংশগ্রহণের অনুমতি দান করে। যার প্রকৃতিতে মায়ের অসীম মমতা দান করা হয়েছে, তার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়ার অনুমতি ইসলাম দেয়নি। নারীর হাতে অস্ত্র তুলে দেয়ার অর্থই হলো, মুজাহিদ তৈরীর কারখানা থেকে তাকে বের করে নিয়ে আসা এবং তার নারী প্রকৃতিকে নির্মমভাবে হত্যা করা। পক্ষান্তরে নারীকে ইসলাম তখনই অস্ত্র হাতে তুলে নিতে অনুমতি দিয়েছে, যখন তার জীবন, সতীত্ব ও সম্ভ্রম হারানোর আশঙ্কা দেখা দেয়। জিহাদের ময়দানে যেখানে অস্ত্রের ঝংকার ওঠে, সেখানে নারীদের কাছ থেকে আহত মুজাহিদদের জন্য নার্সিং গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে তাদের পর্দার বিধান কিছুটা শিথিল করা হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রে নারী-পুরুষের মৌলিক ও মানবিক অধিকারের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেনি, ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর জান-মাল ও মান ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করবে। নারী তার ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ রাখতে পারবে এবং রাষ্ট্র তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। বক্তৃতা ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নারীর থাকবে। সমিতি বা কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করার, সরকারের সমালোচনার, নারীদের দাবী পেশ করার এবং দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার থাকবে। নারীর ব্যক্তিগত মর্যাদা সংরক্ষিত থাকবে। শরীয়ত সম্পর্কিত বাধা নিষেধ ছাড়া অন্য কোন বাধা বা নিষেধ তার প্রতি প্রয়োগ করা হবে না। আইনের চোখে পুরুষের মতো নারীকেও সমান দৃষ্টিতে দেখা হবে, নারীর মধ্যেও বর্ণ, বংশ বা গোত্রের দিক দিয়ে

www.pathagar.com

কোন বৈষম্য রাখা হবে না। ধনী, গরীব, উচ্চ-নীচের মধ্যে বৈষম্য থাকবে না। ইসলামী রাষ্ট্রের 'বায়তুল মালে' পুরুষের ন্যায় নারীর পূর্ণ অধিকার থাকবে। প্রত্যেক অভাবগ্রস্থ নারীর দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে। এ ছাড়া পুরুষের ন্যায় নারী শিক্ষারও ব্যাপক ব্যবস্থা রাষ্ট্র করবে। রাষ্ট্রের যে কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছে আবেদন করার এবং তার সমালোচনা করার পূর্ণ অধিকার নারীর থাকবে।

নারীকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সহায়তা করতে হবে। রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় পরিষদের স্বতন্ত্রভাবে একমাত্র নারীদের দ্বারা নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি থাকবে এবং তারা নারীদের স্বার্থ ও ন্যায় সঙ্গত দাবীসমূহ পরিষদের সম্মুখে পেশ করবে। যাবতীয় নারী প্রতিষ্ঠান যেমন, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মুসাফিরখানা প্রভৃতি নারীর তত্ত্বাবধানে চলবে। পুরুষদের ক্ষেত্রে পুরুষের তত্ত্বাবধানে চলবে। সামরিক শিক্ষা, সামরিক কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ করার কঠিন দায়িত্ব ইসলাম নারীকে দেয়নি। এসব কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। তবে সামরিক অস্ত্রের ব্যবহার, প্রাথমিক চিকিৎসা, নার্সিং ইত্যাদি বিষয়ে তার জ্ঞানার্জন করা একান্ত প্রয়োজন। এসবের একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, যুদ্ধের সময় অত্যন্ত জরুরী পরিস্থিতিতে তারা যেন জাতির অন্ততঃ বেসামরিক জনসাধারণের এবং আরো বিশেষ করে নারী ও শিশুদের সেবা করতে সক্ষম হয়। প্রয়োজন হলে নারী যেন দেশের নিরাপত্তার জন্য কিছু সেবা দান করতে পারে, তারই যোগ্য করে তোলার জন্যই এই ব্যবস্থা।

এর অর্থ এটা নয় যে, নারী সেনাবাহিনী গঠন করে স্ফীত বক্ষা তরুণী-যুবতী নারীদের প্রকাশ্যে সর্বসম্মুখে দিনরাত প্যারেড ও মহড়া চলতে থাকবে। অর্ধনগ্ন যুবতী নারীর একটি বাহিনী ও জন্য পোষা হবে না যে, কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রীয় মেহমান আগমন করলে তার চিত্তবিনোদনের জন্য এ বাহিনী তাকে 'গার্ড অব অনার' দিবে। এটা ভোগবাদীদের বিকৃত মানসিকতা ও নারীর যৌবনকে লেহন করার কুরুচিরই পরিচায়ক। সুতরাং সশস্ত্র জিহাদ ব্যতিত পুরুষদের ন্যায় নারীকেও জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে জিহাদ করতে হবে।

প্রতিদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নারী ও পুরুষদের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করবেন না। কোরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান অনুসরণ করলে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে পুরুষগণ যে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে, নারীও অনুরূপ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে। আল্লাহর কোরআন বলছে–

www.pathagar.com

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقَاتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصّٰئِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَاتِ، اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا-

এ কথা সুনিশ্চিত যে, যে পুরুষ ও নারী মুসলিম, মু'মিন, আল্লাহর আদেশের অনুগত, সত্যবাদী, ধৈর্য-ধারণকারী, আল্লাহর সামনে বিনত, সাদকা দানকারী, রোযা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণকারী, আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত এবং প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। (সূরা আহ্যাব-৩৫)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের তথা নারী ও পুরুষের কোন কোন গুণাবলী পছন্দ করেন, তাঁর দরবারে কোন ধরনের গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে মূল্য ও মর্যাদা দেয়া হবে, উল্লেখিত আয়াতে তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এগুলো একজন ঈমানদারের মৌলিক গুণাবলী ও ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধ। এ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। কাজের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক। পুরুষদের জীবনের কিছু ক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদন করতে হয় এবং নারীদের কর্ম করতে হয় ভিন্ন ক্ষেত্রে। কিন্তু উল্লেখিত আয়াতে উপস্থাপিত গুণ ও বৈশিষ্ট্য যদি নারী ও পুরুষের মধ্যে একই মাত্রায় বিদ্যমান থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে উভয়ের সম্মান ও মর্যদা সমান এবং তাদের প্রতিদানও সমান। নারী রন্ধনশালায় নিয়োজিত আর পুরুষ দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইসলামী বিধান অনুসারে দেশ শাসন করলো, নারী সন্তান-সন্তুতি লালন-পালন করলো আর পুরুষ সশস্ত্র জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলো, এসব কারণে নারী ও পুরুষের মর্যাদা এবং প্রতিদানে কোন পার্থক্য হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا، وَمَنْ عَمِلَ

www.pathagar.com

صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ-

যে অন্যায় কাজ করবে সে যতটুকু অন্যায় করবে ততটুকুরই প্রতিফল লাভ করবে। আর নারী হোক বা পুরুষ–যে সৎ কাজ করবে সে যদি ঈমানদার হয় তাহলে তারা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে কোন ধরনের হিসাব ব্যতিতই রিযিক দেয়া হবে। (সূরা মু'মিন-৪০)

মানুষকে যে জিহাদে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে অগণিত নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন, তাঁরা সর্বাত্মকভাবে এবং নিজেদের শক্তির সবটুকু নিঃশেষ করে তাদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। সর্বশেষে নবী করীম (সাঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে আল্লাহর পথে জিহাদের সার্বিক দিক বাস্তবে প্রদর্শন করে আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেছেন এবং তাঁর উম্মতদেরকে এই জিহাদ মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বশক্তি দিয়ে পরিচালিত করার লক্ষ্যে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণ।

তবে এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে, জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বা জিহাদের নামে কোনো ধরণের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ইসলাম সমর্থন করে না, ইসলাম নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাসী, এটি সকল নবী-রাসূলদের বিঘোষিত নীতি এবং এ নীতি অবলম্বনেই ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত করতে হবে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সঠিক অর্থে আল্লাহর পথে জিহাদী জীবন-যাপন করার তাওফিক এনায়েত করুন– আমীন।

www.pathagar.com

নিজ পরিবারবর্গের প্রতি

আমার অসিয়্যত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

❑ যে কারণে লেখা হলো এই পুস্তিকা ❑

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ إِمْرِئٍ مُّسْلِمٍ لَهُ مَايُوْصَي فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ ووَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ (بخارى و مسلم)

"রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, কোনো মুসলমানের জন্য উচিৎ নয় যে, লিখিত অসিয়্যত ব্যতীত তার দু'টি রাতও অতিবাহিত হয়।" (বোখারী, মুসলিম)

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ أَنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيْهَا وَ أَنَّ اللّٰهَ يُبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ-

"আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো ইলাহ্ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ্ এবং তাঁরই রাসূল। এবং সেদিনটির আগমন সন্দেহাতীতভাবে এক মহাসত্য যেদিন আল্লাহ তা'য়ালা কবর থেকে সকলকেই পুনরুত্থিত করবেন।"

أُوْصِي مَا تَرَكْتُ مِنْ أَهْلِيْ وَذُرِّيَّتِيْ بِتَقْوَى اللّٰهَ وَاصْلاَحَ ذَاتَ الْبَيْنِ وَطَاعَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ، وَ أُوْصِيْ بِمِثْلِ مَا أُوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبِ (إِنْ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ)

"আমি অসিয়্যত করছি আমার উত্তরাধিকার, পরিবার-পরিজন ও সন্তান সন্ততিদেরকে আল্লাহভীতি অর্জনের মাধ্যমে কল্যাণের অধিকারী হতে এবং নবী করীম (সাঃ) এর পূর্ণ আনুগত্য করার জন্য।

আমি অসিয়্যত করছি ঠিক সেভাবে যেমনটি করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তান ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর বংশধরদেরকে। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য যে জীবন বিধান দান করেছেন তা অনুসরণ না করে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না।"

www.pathagar.com

اَلْمَوْتُ كَأسٍ كُلُّ نَاسٍ شَارِبُهَا
وَالْقَبْرُ بَابُ كُلُّ نَاسٍ دَاخِلُهَا–

কাব্যানূবাদঃ মৃত্যু নামক শরবতের পেয়ালা সকলেই বাধ্য পান করিতে
কবর সেই দরজা যা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে পরকালের জগতে।।

اگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہی
سامان سو برس کے ہیں پلکی خبر نہی

কাব্যানূবাদঃ এক পলকের নেই ভরসা
মরণ ঘাড়ের পরে।
বিপুল সম্পদ করিছো জড়ো
ভোগ- বিলাসের তরে।।

اَلاَ يَااَيُّهَا السَّاكِنُ الْقَصْرِ الْمُعَلّى
سَتُدْفَنْ عَنْ قَرِيْبٍ فِى التُّرَابِ–

কাব্যানূবাদঃ জীবনের লক্ষ্য ভুলিয়া
প্রাসাদ গড়িয়া আনন্দে মত্ত যারা।
মাটির তৈরী জীর্ণ কুটিরে হইবে ঠিকানা
মৃত্যুর আলিঙ্গনে যখন পড়িবে ধরা।।

হযরত আলী (রাঃ)

ائے تھے ہم مثل بلبل سائر گلشان کرچلے
لیلے مالی باغ اپنا ہم تو اپنی گھر چلے

কাব্যানূবাদ ঃ বুলবুল পাখীর ন্যায়, এসেছিনু হেথায়
বেঁধেছিনু বাসা বড় মমতায়।
খেলা হলে শেষ ছেড়ে পরিবেশ
যেতেই হবে নিয়তি যেথায়।।

www.pathagar.com

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ- (سورة السّجدة-١١)

'(হে নবী) আপনি এদের বলুন, জীবন হরণের ফিরিশ্তা- যাকে তোমাদের মৃত্যুর ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, (অচিরেই) তোমাদের জান্ কবজ করে নেবে। অতঃপর সবাইকেই তোমাদের মালিকের দরবারে ফিরিয়ে নেয়া হবে।' (সূরা সাজ্‌দা-১১)

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَه قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ- سورة ق-٣٧)

'এর মাঝে সে ব্যক্তির জন্য (যথেষ্ট) শিক্ষনীয় বিষয় আছে, যার কাছে রয়েছে একটি জীবন্ত মন, অথবা যে ব্যক্তি একাগ্র চিত্তে (সে শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ) শুনতে চায়।' (সূরা কাফ্, ৩৭)

فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ (سورة ق-٤٥)

'(হে নবী!) অতঃপর এ কোরআন দিয়ে আপনি সে ব্যক্তিকে সদুপদেশ দিন যে আমার শাস্তিকে ভয় করে।' (সূরা কাফ-৪৫)

কলিজার টুকরা সন্তান ও প্রিয় স্বজনেরা!

নীরবে- নির্জনে গভীর রাত জেগে পবিত্র কোরআন-হাদীসের প্রমাণ দিয়ে সাজিয়ে লেখা এ পুস্তকটি একবার নয়, বার বার মনোযোগ সহকারে পড়ে পুস্তকটি ভবিষ্যতে চলার পথের পাথেয় হিসেবে যত্ন করে রেখো।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الا عْلى وَالْوَلِيِّ الْمَوْلى، اَلَّذِى خَلَقَ
فَاحْيَاء وَحكَمَ عَلى خَلْقِه بِالْمَوْتِ وَالْفَنَاء، وَالْبَعْثِ الٰى
دَارِ الْجَزَاء، وَالْفَصْلِ وَالْقَضَاء، وَنَشْهَدُ اَن لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ
وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلى اٰلِه وَاَصْحَابِه وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاَحْسَانٍ اِلٰى
يَوْمِ الدِّيْنِ- اَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কোনো ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর সম্পাদন করার জন্য মৃত্যুকালে যে নির্দেশ দিয়ে থাকে শরীয়াতের পরিভাষায় তাকে ‘অসিয়্যত’ বলে। আরবী ভাষায় অসিয়্যতের আভিধানিক অর্থ আদেশ প্রদান বা ভার অর্পণ। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ‘কোনো মুসলমানের উচিত নয়, লিখিত অসিয়্যত ব্যতীত তার দুটো রাত অতিবাহিত হয়’। (আল হাদীস)

এটা এ জন্য বেশী জরুরী, কারণ যিনি মৃত্যুবরণ করছেন তার মৃত্যুর সময় আপন কেউ কাছে না-ও থাকতে পারে অথবা থাকলেও তার জবান বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা প্রয়োজনীয় কথা বলার মতো চিন্তা-চেতনা না-ও থাকতে পারে। সে জন্য অসিয়্যত লিখে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি শরীয়াতের সেই নির্দেশ অনুসরণ করছি মাত্র। এতে আপনজনদের ঘাবড়ে যাবার বা মন খারাপ করার কিছুই নেই।

www.pathagar.com

আমার পক্ষ থেকে যাদের জন্য লেখা এ অসিয়্যত

- মিসেস সালেহা সাঈদী (আমার জীবন সঙ্গিনী)
- মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী (জ্যেষ্ঠ পুত্র)
- শামীম বিন সাঈদী (মেজ পুত্র)
- মাসউদ বিন সাঈদী (সেজ পুত্র)
- নাসীম বিন সাঈদী (ছোট পুত্র)
- সাইয়্যেদা সুমাইয়া ফারাজীয়া (বড় পুত্রবধু)
- সুলতানা পারভীন হীরা (মেজ পুত্রবধু)
- মাওলানা সাইয়্যেদা মারজানা যাবীন জাফরী (সেজ পুত্রবধু)
- সাজেদা রেজাঈ ফাতেমা (ছোট পুত্র বধু)
- তাসনূভা তামান্না সাঈদী (নাতনী)
- ইশরাত লুবায়না সাঈদী (নাতনী)
- মাহ্দী হোসাইন সাঈদী (নাতী)
- মুনাওয়ার হাসনাইন সাঈদী (নাতী)
- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সাঈদী (নাতী)
- মাহীর মানাযীর সাঈদী (নাতী)
- ইউসুফ নাযীল সাঈদী (নাতী)

আমার ভাই-বোন

- আলহাজ্জ মোস্তফা আহ্সান সাঈদী
- মিসেস ফাতেমা জামাল (হাওয়া)
- মীম হুমায়ুন কবীর সাঈদী
- এবং এদের স্ত্রী, স্বামী ও সন্তান-সন্ততি।

এ রকম 'অসিয়্যত' লিখিত আকারে যে কোনো মুমিন ব্যক্তি তার আপনজনদের জন্য অনুসরণ করতে পারেন এবং এ কাজটি করলে নবী করীম (সাঃ)- এর একটি নির্দেশ পালনের সওয়াব আমলনামায় লেখা হবে।

www.pathagar.com

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়

প্রথমেই আমি বলে নিতে চাই এ পৃথিবী মানুষের জন্য এক ক্ষণস্থায়ী জায়গা, যার তুলনা চলে বাসের যাত্রী ছাউনি, ট্রেনের ওয়েটিং রুম বা এয়ার পোর্টের লাউঞ্জের সাথে। বাহন এসে গেলেই মাল-সামানা নিয়ে যাত্রী সাধারণকে তাতে আরোহন করতে হয়। কোনো নির্বোধ যাত্রীও ওয়েটিং রুমের মহব্বতে সেখানে বসে থেকে তার গন্তব্যে পৌছুবার বাস, ট্রেন, বিমান বা যে কোনো নির্ধারিত বাহন সে মিস্ করবে না। অনুরূপভাবে মানুষের জন্য অবধারিত তার শেষ গন্তব্য আখিরাত বা পরকাল; আর দুনিয়া হচ্ছে সে গন্তব্যে পৌছুবার জন্য সাময়িক ওয়েটিং রুম। মৃত্যু হচ্ছে তার নির্ধারিত বাহন এবং কবর হচ্ছে পরকালীন জগতে প্রবেশের ভয়াবহ প্রথম ধাপ বা প্রথম স্তর।

সবথেকে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে মানুষ তার চিরস্থায়ী আবাসস্থলকে বেমালুম ভুলে গিয়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া নামক ওয়েটিং রুমের জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়ে এর মহব্বতে পাগলপারা হয়ে বলতে থাকে, 'মরিতে চাহিনা আমি এই সুন্দর ভুবনে'। তারপরেও এর মায়া ত্যাগ করে এক সময় দুনিয়া ছেড়ে যেতেই হবে এটাই নির্মম বাস্তবতা। পবিত্র কোরআন মজীদে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ- (سورة العنكبوت- ٦٤)

'আর এই দুনিয়ার জীবন শুধু একটি মন ভুলানোর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল জীবনের ঘর তো পরকাল। হায়! এ কথাটি যদি এরা জানতো।' (সূরা আনকাবুত- ৬৪)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ- (سورت الانعام- ٣٢)

'দুনিয়ার এই জীবনটাতো একটি খেল-তামাশার বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে পরকাল অতীব কল্যাণময় তাদের জন্য যারা আজ ধ্বংসের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, এরপরও কি তোমরা বুদ্ধিমানের পরিচয় দিবে না?' (সূরা আনআ'ম- ৩২)

www.pathagar.com

وَفَرِحُوْا بِالْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَواةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ مَتَاعٌ- (سورة الرعد- ٢٦)

'আর এই লোকেরা দুনিয়ার জীবনে আনন্দ ফূর্তিতে নিমগ্ন হয়ে আছে, অথচ দুনিয়ার জীবন পরকালের তুলনায় সামান্য পরিমাণ সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।' (সূরা আর রা'দ-২৬)

اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَواةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَواةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ- (سورة التّوبة- ٣٨)

'তোমরা কি পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকেই পছন্দ করে নিয়েছো? (যদি তাই হয় তাহলে জেনে রাখো) দুনিয়ার জীবনের এসব উপকরণ পরকালে খুব সামান্যই পাওয়া যাবে।' (সূরা আত তাওবা-৩৮)

অর্থাৎ দুনিয়ার সংগৃহীত দ্রব্য-সামগ্রী পরকালে কেনো কাজে আসবে না। মৃত্যুর সাথে সাথে এসব সুখ-সৌন্দর্য্য থেকে তুমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অতএব দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে দূরে থাকা মুমিনের কাজ। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهُ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ- (رواه مسلم)

'দুনিয়া সবুজ-শ্যামল সৌন্দর্য্য মন্ডিত এক চাকচিক্যময় স্থান। আল্লাহ তা'য়ালা তাতে তোমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব দিয়েছেন। অতএব এখানে তোমরা কোন্ ধরণের কাজ করছো তা তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন।' (মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে নবী করীম (সাঃ) আরো বলেছেন–

عَنْ اَبِى مُوْسَى اَشْعَرِى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاخِرَتِه وَمَنْ

www.pathagar.com

اَحَبَّ اٰخِرَتَهٖ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَايَبْقٰى عَلٰى مَايَفْنٰى- (رواه بيهقى و ابن حبان)

'যে দুনিয়াকে ভালোবাসে সে তার আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালোবাসে সে তার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। অতএব যা ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল তার ওপর যা স্থায়ী তাকেই অগ্রাধিকার দাও।' (বায়হাকী, ইবনু হিব্বান)

পার্থিব জীবন ছায়ার মতোই ক্ষণস্থায়ী

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ اَثَّرَ فِى جَنْبِه فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ تَّخَذْنَا لَكَ وَطَاءً فَقَالَ مَالِى وَمَا لِلدُّنْيَا؟ مَا اَنَا فِى الدُّنْيَا اِلاَّ كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا- (رواه الترمذى)

'হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (সাঃ) খেজুর পাতার নির্মিত চাটাইয়ের ওপর ঘুমিয়ে গেলেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পর দেখা গেলো তাঁর পবিত্র শরীর মোবারকে চাটাইয়ের দাগ পড়েছে। এ দৃশ্য দেখে আমরা নিবেদন করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার জন্য একটি নরম তোষক বানিয়ে দিই। জবাবে তিনি বললেন, দুনিয়ার (ভোগ-বিলাসের) সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি দুনিয়াতে একজন নিছক পথচারীর ন্যায়। যে চলার পথে একটি গাছের ছায়াতলে বিশ্রাম গ্রহণ করে। এরপর তা ত্যাগ করে গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করে।' (তিরমিযী)

পার্থিব সুখ-সৌন্দর্য্যের জন্য পাগলপারাদের সতর্ক করে নবী করীম (সাঃ) আরো বলেছেন–

فَوَاللّٰهِ مَا لْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ اَخْشٰى اَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَا فَسُوْهَا كَمَا تَنَا

فَسُوْهَا فَتُلْهِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ– (رواه البخارى و مسلم)

'আল্লাহর কসম! তোমাদের জন্য আমি দারিদ্রের ভয় করিনা, বরং ভয় করছি তোমাদের সামনে পার্থিব প্রাচূর্য প্রসারিত করা হবে যেমন তোমাদের পূর্বপুরুষদের জন্য করা হয়েছিলো। এরপর তোমরা পার্থিব প্রাচূর্য্য লাভের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা লিপ্ত হয়েছিলো। এবং এটি তোমাদের ধ্বংস করবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছিলো।' (বোখারী, মুসলিম)

নবী করীম (সাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন–

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ اَوْعَابِرِسَبِيْلٌ– (رواه البخارى)

'তুমি দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা একজন পথচারীর মতো হয়ে থাকো।'

অর্থাৎ একজন মুসাফির কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্যই সফরে বের হয় অল্প কয়েক দিনের জন্য, প্রয়োজনীয় যা কিছু সহজে বহনযোগ্য বোঝা তা সাথে বহন করে। এ দুনিয়াতেও তদ্রুপ একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষের আগমন আর এখানে তার অবস্থানও হাতে গোণা কয়েকটি দিন মাত্র। ডাক পড়লেই এখান থেকে তাকে চলে যেতে হবে এ এক মহাসত্য। অতএব তাদের বিপুল পরিমান অর্থ-সম্পদের বোঝা বাড়িয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ছাড়া কোনো লাভ নেই। কবির ভাষায়–

دنیا میں جتنے کماؤگے هیرے اور موتی
یاد رکھو کفن میں جیب نہي ہوتی

অর্থাৎ 'দুনিয়াতে যত বিপুল পরিমান হীরা, মনি, মুক্তা অর্থ-সম্পদই উপার্জন করো না কেনো- মনে রেখো, কাফনের কাপড়ে পকেট থাকেনা। মরণের পরে সবকিছু ফেলে রেখে রিক্ত হাতেই ফিরে যেতে হবে, ওগুলোর কিছুই সাথে নেয়া যাবে না।'

প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবনের নির্ধারিত মেয়াদকাল জমাট বাঁধা বরফের মতো দ্রুত গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে পরে আফসোস করে কোনো লাভ হবে না। এই মর্মে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَالِيْ وَلِلدُّنْيَا اِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ فِي

www.pathagar.com

ظِلِّ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا- (رواه احمد و ابن ماجه)

'আমার এবং দুনিয়ার উদাহরণ হলো সেই পথিকের ন্যায় যে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করে। তারপর সেখান থেকে চলে যায়"। (আহ্‌মাদ, ইবনু মাজাহ্‌)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَشَرُّالنَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ، (رواه احمد والترمذى)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি উত্তম যে দীর্ঘ হায়াত পেয়েছে এবং সুন্দর আমল করেছে। আর সে ব্যক্তি নিকৃষ্ট যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে কিন্তু খারাপ কাজ করে জীবনকে বরবাদ করেছে'। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী)

মৃত্যু এক মহাসত্য- এ থেকে কেউ পালাতে পারবে না

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ-

'প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। তারপর তোমরা সকলে আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।' (সূরা আনকাবুত-৫৭)

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلٰقِيْكُمْ-

'(হে নবী!) এদেরকে বলুন, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছো, (একদিন) সে মৃত্যুর সামনা-সামনি তোমাদের হতেই হবে।' (সূরা জুমুয়া-৮)

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ-

'তুমি যেখানেই থাকো- তা যদি দূর্ভেদ্য দুর্গও হয় তবুও মৃত্যু তোমাকে স্পর্শ করবেই।' (সূরা নিসা-৭৮)

মৃত্যুর সময় এলে কেউ কাউকে বাঁচাতে পারবে না

فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ، وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ، وَنَحْنُ

www.pathagar.com

اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لاَّ تُبْصِرُوْنَ، فَلَوْلاَ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ، تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ-

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, 'এখন তোমরা যদি কারো অধীন না হয়ে থাকো এবং এই ধারণায় যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে মুমূর্ষ ব্যক্তির প্রাণ যখন তার কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়– আর তোমরা নিজেদের চোখে তা দেখতে থাকো যে সে মৃত্যুবরণ করছে, তখন তার নির্গমনকারী প্রাণকে ফেরৎ নিয়ে আসোনা কোনো? বরং তখন তোমাদের তুলনায় আমিই তার নিকটবর্তী হয়ে থাকি, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাওনা'। (সূরা ওয়াকিয়া-৮৩-৮৭)

দুনিয়া পূজারী লোকেরা মৃত্যুর সময় আফসোস করবে

পৃথিবীতে শুধুমাত্র ভোগ-বিলাসের উপকরণ যোগাড়ের জন্য যারা বৈধ-অবৈধ পথে অর্থ সম্পদ উপার্জনের লক্ষ্যে সারাক্ষণ ব্যস্ত থেকেছে, মৃত্যুর সময় তারা আক্ষেপ করে বলবে–

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ، لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلاَّ- (سورة المؤمنون، ١٠٠، ٩٩)

'তাদের যখন মৃত্যু আসে তখন তারা বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু সময় দাও, যাতে আমি কিছু সৎ কাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি।' (সূরা মু'মিনুন-৯৯-১০০)

দুনিয়া পূজারী লোকদের মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلاَ اَخَّرْتَنِىْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ، فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ-

'যে রিয্ক আমি তোমাদের দিয়েছি তাথেকে ব্যয় করো এর পূর্বে যে তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে যাবে আর বলবে, হে আমার রব! তুমি আমাকে আরো

www.pathagar.com

কিছুটা সময় দিলেনা কেনো? তাহলে আমি দান-সাদাকাহ্ করতাম এবং নেক্কার চরিত্রবান লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম।' (সূরা মুনাফিকুন-১০)

وَلَوْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا، وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ م بِمَا تَعْمَلُوْنَ–

'অথচ যখন কারো কর্ম সময় পূর্ণ হয়ে যাওয়ার মুহূর্ত এসে যায় তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে আর মোটেই অবকাশ দেন না। আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা'য়ালা সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল।' (সূরা মুনাফিকুন-১১)

মৃত্যুযন্ত্রণা অসহনীয় অবর্ণনীয়

মৃত্যুযন্ত্রণা অকল্পনীয়- অবর্ণনীয় কঠিন যন্ত্রণাদায়ক বিষয়। কম হোক বেশী হোক--এ যন্ত্রণা সবাইকে সহ্য করতেই হবে। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ–

'অতঃপর লক্ষ্য করো, এই মৃত্যুযন্ত্রণা পরম সত্য নিয়ে উপস্থিত। এ হচ্ছে সেই মহাসত্য যে মৃত্যু থেকে পালাচ্ছিলে'। (সূরা ক্বাফ-১৯)

'পরম সত্য উপস্থিত' অর্থাৎ এই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তোমার পরকালীন জীবনের দ্বার উন্মুক্ত হবে, যাকে তোমরা অনেকেই অস্বীকার বা মিথ্যা বলে মনে করতে।

মৃত্যু কোনো সহজ বিষয় নয়, তবে মুমিনের মৃত্যু কম কষ্টকর হবে এবং এতে থাকবে মুমিনের জন্য শান্ত্বনা ও অভয়বাণী। পবিত্র কোরআন মজীদে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُعَدُوْنَ– (سورة حم السّجد، ٣٠)

'নিশ্চয়ই যারা বলে আল্লাহ্ আমাদের রব অতঃপর এ কথার ওপর অবিচল থাকে; মৃত্যুর সময় তাদের কাছে ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয়ে বলে, ভয় করো না, চিন্তা করো না বরং তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো।' (সূরা হা- মীম আস্ সিজ্দা-৩০)

www.pathagar.com

মৃত্যুর সময় নবী করীম (সাঃ) পানিতে বার বার হাত ভিজিয়ে নিজের পবিত্র মুখমন্ডলে লাগাচ্ছিলেন আর বলছিলেন–

لَاالٰـهَ الاَّ اللّٰـهُ اِنَّ لِلْمَـوْتِ سَكَرَاتٌ– (رواه البخارى)

'আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, নিশ্চয়ই মৃত্যুতে রয়েছে বড়ই কষ্ট।'

মৃত্যুকালে মুমিনগণ ফিরিশ্তার কাছ থেকে সালাম পায়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰـهُـمُ الْمَلٰـئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُـوْنَ سَلَامٌ عَلَيْكُـمُ ادْخُلُـوا الْـجَنَّـةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُـوْنَ–

'সেই মুত্তাকীদের যাদের রুহ্ পবিত্র অবস্থায় থাকে ফিরিশ্তারা তাদের জান্ কবজ করার সময় বলে, শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের ওপর, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো তোমাদের আমলের বিনিময়ে।' (সূরা আন্ নাহ্ল-৩২-৩৩)

নাস্তিক, মুরতাদ, মুনাফিক, কাফির এবং মহান আল্লাহর বিধান লংঘনকারীদের মৃত্যুকালীন অবস্থা হবে উল্লেখিত বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। মৃত্যুর সময় থেকেই তাদের শাস্তি শুরু হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন–

وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَـرُوا الْـمَلٰـئِكَـةُ يَضْـرِبُوْنَ وُجُـوْهَـهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُـوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ، ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ– (سورة الانفال، ٥٠-٥١)

'তোমরা যদি সেই অবস্থা দেখতে যখন ফিরিশ্তারা কাফিরদের রুহ্ কবজ করছিলো; তারা ওদের মুখমন্ডলে ও পশ্চাতে আঘাত করছিলো আর বলছিলো, এখন আগুনে জ্বলার শাস্তি ভোগ করো। এটা সেই শাস্তি যা তোমাদের কৃতকর্মের পাওনা। নতুবা আল্লাহ তা'য়ালা তো বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।' (সূরা আন্ফাল- ৩২-৩৩)

মৃত ব্যক্তির পরকাল যাত্রা

মৃত্যুর পর মরদেহকে কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, কাউকে অনাড়ম্বর ভাবে আবার কাউকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার দিয়ে। কিভাবে দাফন করা হলো, জানাযায় কত সংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করলো, কতবার জানাযা হলো, কত বার তোপধ্বনি

www.pathagar.com

হলো বা কত ফুলের তোড়া দেয়া হলো, এগুলোর কোনোই গুরুত্ব নেই। কারণ এসব কর্মকান্ডের সাথে মৃত ব্যক্তির শান্তি বা অশান্তির কোনোই যোগসূত্র নেই।

মৃত ব্যক্তি নেক্কার হলে সে পছন্দ করে তাকে তাড়াতাড়ি দাফন করা হোক, আর বদকার হলে সে অস্থিরতা বোধ করে, কারণ উভয়েই তাদের পরিণতি সম্পর্কে অনুভব করতে পারে। এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِىْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا اَيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىْءٍ اِلاَّ الاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ، (رواه البخارى)

'নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, জানাযার লাশ যখন খাটিয়ার ওপর উঠিয়ে লোকেরা বহন করে কবরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন মৃত ব্যক্তি নেক্কার হলে সে বলতে থাকে, আমাকে নিয়ে দ্রুত চলতে থাকো (অর্থাৎ আমার দাফন ক্রীয়া দ্রুত সম্পন্ন করো) আর বদকার হলে সে চিৎকার করে বলতে থাকে আমাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছো? মানুষ ব্যতীত সবাই এ চিৎকার শুনতে পায়। যদি মানুষ তা শুনতে পেতো তাহলে জ্ঞানহারা হয়ে যেতো।' (বোখারী)

মৃত্যুর পর আখিরাতের জগতে প্রবেশের প্রথম মঞ্জিল কবরের ভয়াবহতা সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) আরো বলেছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقَبْرُ اَوَّلُ مَنَازِلِ الاخِرَةِ فَاِنْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرَ قَطُّ اِلاَّ وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ، (رواه احمد)

'আখিরাতের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে কবর হলো প্রথম মঞ্জিল। যদি কেউ কবর নামক মঞ্জিল সহজে অতিক্রম করতে পারে তার জন্য অবশিষ্ট মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করা

www.pathagar.com

সহজ হয়ে যায়। আর কেউ যদি কবরেই গ্রেফতার হয়ে যায় তাহলে এরপরের মন্‌জিলসমূহ তার জন্য আরো কঠিন হবে। আল্লাহর কসম! আমি যতটা লোমহর্ষক, বিভিষীকাময় ভীতিকর দৃশ্য দেখেছি এর মধ্যে কবর হচ্ছে সব থেকে বেশী ভয়ঙ্কর।' (আহ্‌মাদ)

কবর সম্পর্কে আরেকটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ- (رواه الترمذى)

'নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, কবর হলো জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্যে একটি গর্ত।' (তিরমিযী)

আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَتُ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقِى مَعَهُ وَاحِدُ يَتْبَعَهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقِى عَمَلُهُ- (رواه البخارى)

'মৃতের সাথে তিনটি জিনিস তার কবর পর্যন্ত যায়। এক. মৃতের পরিবার পরিজন। দুই. ধন-সম্পদ। তিন. আমল। কিন্তু তাকে দাফনের পর তার পরিবার- পরিজন ও ধন-সম্পদ ফিরে আসে। সাথে থাকে শুধু আমল।' (বোখারী)

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমরা কিভাবে আনন্দ-ফূর্তি করবো!

اَلْمَوْتُ مِنْ وَّرَاءِ نَا وَالْقَبْرُ اَمَامَنَا وَالْقِيَامَةُ مَوْعِدُنَا وَعَلى جَهَنَّمَ طَرِيْقُنَا وَبَيْنَ يَدَىِ اللّهِ مَوْقِفُنَا-

'মৃত্যু আমাদের পেছনে ধাবমান, কবর আমার সামনে মুখ হা করে আছে, কিয়ামত আমাদের প্রতিশ্রুত সময়সীমা, জাহান্নামের ওপর দিয়ে পুলসিরাত পারের কঠিন পরীক্ষা এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার সামনে দাঁড়িয়ে করতে হবে জবাবদীহীতা।'

সুতরাং পৃথিবী খেল-তামাশার জায়গা নয়, এ কথা সকলকে প্রত্যেক মুহূর্তে মনে রেখেই ক্ষণস্থায়ী এ জীবন অতিবাহিত করতে হবে। এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

www.pathagar.com

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللّٰهِ (رواه الترمذى)

'প্রকৃতপক্ষে সেই বুদ্ধিমান যে নিজের নাফ্সকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং নিজের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে সুন্দর করার জন্য নেক কাজ করেছে, পক্ষান্তরে নির্বোধ ও অক্ষম সেই ব্যক্তি যে নিজেকে নফ্সের অধীনে ছেড়ে দিয়ে অযথা আল্লাহ্র রহমতের আশা করেছে।' (তিরমিযী)

পরকালের প্রস্তুতির জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার প্রয়োজন

প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবনের মেয়াদকাল ফুরিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছে অথচ পরকালের জন্য নেকী সঞ্চয়ের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই চেতনাহীন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ اِلاَّ نَدِمَ قَالُوا وَمَا نَدَامَتُهُ؟ قَالَ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ اَنْ لاَيَكُوْنَ اِزْدَادَ وَاِنْ كَانَ مُسِيًاً نَدِمَ اَنْ لاَيَكُوْنَ اِسْتَعْتَبَ– (رواه الترمذى)

'এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে মৃত্যুর পরে অনুতাপ করবে না। (সাহাবায়ে কেরাম) প্রশ্ন করলেন, মৃতের সে অনুতাপ কি? জবাবে নবী করীম (সাঃ) বললেন, মৃত ব্যক্তি নেক্কার হলে সে লজ্জা বোধ করবে কেনো সে আরো নেক কাজ করলো না। আর গোনাহ্গার হলে সে লজ্জা বোধ করবে কেনো সে তার গোনাহের জন্য অনুতাপ করেনি।' (তিরমিযী)

কলিজার টুকরা সন্তান ও প্রিয় স্বজনেরা!

এতক্ষণ যা কিছু বর্ণনা করা হলো এটাই হলো মোহময় এ পৃথিবীর আসল চেহারা। মৃত্যুর বিভিষীকা ও পরকালের কঠিন বাস্তবতা সম্পর্কিত পবিত্র কোরআন- হাদীসের এ ধরণের অসংখ্য অকাট্য দলিল আমাকে অহরহ তাড়িয়ে বেড়ায়। আমি যে বিষয়ের যোগ্য নই মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাথেকে অনেক বেশী নে'মাত দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন, অসংখ্য মানুষের প্রাণঢালা ভালোবাসা দিয়ে আমায় ঋণী

www.pathagar.com

করেছেন, যার শোকর আদায় করা আমার মতো অধম বান্দার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তিনি যদি দয়া পরবশে কঠিন হাশরের ময়দানে আমাকে ক্ষমা করার ঘোষণা দেন সেটাই হবে আমার বড় পাওনা। আমার রব-এর মহান দরবারে এটাই আমার প্রাণ উজাড় করা আকুতি।

আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের করণীয়

পবিত্র কোরআন-হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী মৃত্যু এক অবশ্যম্ভাবী মহাসত্য। মৃত্যুর হাত থেকে আমরা কেউ রেহাই পাবোনা। সুতরাং আজ হোক কাল হোক বা কয়েক বছর পর হোক আল্লাহ্ তা'য়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে আমাকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। এ জন্যে আমার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য অগ্রিম কিছু অসিয়্যত লিপিবদ্ধ করে রাখা আমার একান্ত কর্তব্য।

আমার মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার পরিবারের যেসব সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনকে আমার পাশে থাকার সুযোগ দিবেন তাদের করণীয় ঃ

এক ঃ আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পারলেই নিজেরা একটু শব্দ করে আমাকে শুনিয়ে –

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ–

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ্' পড়তে থাকবে– যাতে করে আমার মৃত্যু কালেমা উচ্চারণের মধ্য দিয়ে নসীব হয়- আমীন, ছুম্মা আমীন- ইয়া রাব্বাল আলামীন! নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ كَانَ اٰخِرَ كَلَامِهٖ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، (رواه ابى داؤد)

'যার শেষ কথা হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (আবু দাউদ) এ সময়ে আমার মাথার কাছে বসে কেউ সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করবে। এতে মৃত্যুর কষ্ট কম হবে। (আল হাদীস)

দুই ঃ আমার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর সবাই পড়বে–.

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ–

'আমরা তো আল্লাহর জন্যেই, আমাদের তো (একদিন) আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।' (সূরা বাকারা-১৫৬)

www.pathagar.com

* এরপর আমার চোখ দুটো বন্ধ করে দিবে। মুখ হা- করা অবস্থায় থাকলে থুত্নীর নীচ থেকে মাথার ওপর নরম কাপড় দিয়ে আলতোভাবে বেঁধে দিবে। যাতে মুখ খোলা না থাকে। হাত- পা সোজা করে দিবে। মাথার নীচ থেকে বালিশ সরিয়ে ফেলবে এবং চেহারা কিব্লার দিকে কাৎ করে দিবে।

ধৈর্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে

* আল্লাহর শপথ! তোমরা কেউ-ই আমার জন্য শব্দ করে কাঁদবে না। মাথায়, কপালে, বুকে হাত মেরে আর্তনাদ বা হা-হুতাশ করবে না। নবী করীম (সাঃ) এ ধরণের জাহেলী আচরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আমার ইন্তেকালের পরে তোমরা যদি এ ধরণের জাহেলী আচরণ করো তাহলে আমার রুহের শাস্তি হতে পারে– নিশ্চয়ই তোমরা তা কামনা করবে না। আপনজনের বিয়োগ বেদনায় চোখে পানি থাকা স্বাভাবিক কিন্তু মুখে কোনো শব্দ থাকবে না। এ সময় তোমরা চরম ধৈর্য্যের পরিচয় দিবে এবং একে অপরকে ছবর করার জন্য উপদেশ দিবে। স্মরণে রাখবে, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সিদ্ধান্তের ওপর রাজী থাকা ব্যতীত গোলামদের কিছুই করার থাকে না।

আমার পরিবারে আমি কারো স্বামী, কারো পিতা, কারো ভাই, কারো চাচা, কারো মামা, কারো শ্বশুর এবং কারো প্রিয় দাদাজী। তোমাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে আমার করণীয় অনেক দায়িত্ব ছিলো। আমি সেসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পেরেছি বলে মনে হয় না।

এতদসত্বেও আমার চীর বিদায়ে তোমাদের জন্য কষ্টদায়ক হবে। আমাকে যে যতো বেশী ভালোবাসতে তার কষ্টের বোঝা ততো বেশী ভারী হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে এ বিষয়ে তোমাদের ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার পরিবারে তোমরা সবাই আমাকে ভালোবাসো এবং শ্রদ্ধা করো। সুতরাং আমার চীর বিদায়ে তোমাদের শোকের বোঝা কতটা ভারী হবে তা এখনই বুঝতে আমার কষ্ট হবার কথা নয়।

স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা ও হৃদয়ের কোমলতা মহান আল্লাহর দয়া বিশেষ। এথেকে যে বঞ্চিত সে আল্লাহর করুণা থেকেই বঞ্চিত। নবী করীম (সাঃ)-এর পুত্র হযরত ইবরাহীমের ইন্তেকালে রাসূল (সাঃ)-এর চোখের পানিতে দাড়ি মোবারক ভিজে ছিলো কিন্তু মুখে কোনো আওয়াজ ছিলো না এবং এটাই নবী করীম (সাঃ)-এর শিক্ষা। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নিম্নোক্ত বাণী স্মরণে রাখবে–

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ- وَمَنْ يُّؤْمِنْ م
بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَه، وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ-

www.pathagar.com

'আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত (কোনো) বিপদই আসে না; যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ তা'য়ালা তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন; আর আল্লাহ তা'য়ালা সকল বিষয়েই পরিজ্ঞাত।' (সূরা তাগাবুন-১১)

সুতরাং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত যে বিপদ আসার তা আসবেই, এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। তাই একথা বলা যাবে না যে, ঢাকায় চিকিৎসা না করায়ে সিঙ্গাপুর বা ব্যাংকক নিলে ভালো হতো বা এটা করলে ওটা হতো। এসব অভিযোগ বা অভিমান সূচক কোনো শব্দ উচ্চারণ করা যাবে না। ধৈর্য্যেই এখানে সর্বোচ্চ শক্তিশালী হাতিয়ার। আমার চির বিচ্ছিন্নতায় শুধু পড়তে থাকো–

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ–

'আমরা তো আল্লাহর জন্যেই, আমাদের তো (একদিন) আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।' (সূরা বাকারা-১৫৬)

হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে হারিয়ে পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলেছিলেন–

اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ–

'সে (আরো) বললো, আমি তো আমার (অসহনীয়) যন্ত্রণা, আমার দুশ্চিন্তা (-জনিত অভিযোগ) আল্লাহ তা'য়ালার কাছেই নিবেদন করি।' (সূরা ইউসুফ-৮৬)

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ، وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ–

'সুতরাং (এ অবস্থায়) পূর্ণ ধৈর্য্য ধারণ করাই আমার জন্যে ভালো; আল্লাহ তা'য়ালাই (হচ্ছেন আমার) একমাত্র সাহায্যস্থল।' (সূরা ইউসুফ-১৮)

বিপদে ছবরকারীদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ–

'তোমরা যদি ধৈর্য্য ধারণ করো তাহলে অবশ্যই ধৈর্য্য ধারণকারীদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে।' (সূরা নাহ্‌ল-১২৬)

বিপদ-মুসিবতে, শোকে-দুঃখে যারা ধৈর্য্য অবলম্বন করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন–

اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ، اُولٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ–

'যারা ধৈর্য্য অবলম্বন করেছে এবং আমলে সালেহ্ (নেক কাজ) করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদান।' (সূরা হূদ-১১)

সুতরাং আমার মৃত্যুতে হা-হুতাশ করার কিছুই নেই। কারণ যেটা স্বাভাবিক ছিলো, ঘটিতব্য ছিলো, যথার্থ ও অবশ্যম্ভাবী এবং অবধারিত ছিলো তাই ঘটে গেলো। আল্লাহ্ তা'য়ালা সবথেকে ভালো জানেন এবং তোমরাও আমাকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছো, আমি সারাটি জীবন আমার মনিব মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ভয় করে চলার চেষ্টা করেছি। পৃথিবীর বস্তুগত ধন-সম্পদের প্রতি আমি নির্লোভ থেকে জীবন ধারণের জন্যে হালাল উপায়ে যতটুকু সম্ভব হয়েছে তা উপার্জন করেছি। আমার পার্থিব উপার্জন আমি তোমাদের জন্যে রেখে শূন্য হাতে ফিরে যাচ্ছি। নবী করীম (সাঃ) বলেন–

اذَا مَاتَ الانْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ الاَّ مِنْ ثَلاَثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِه اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَه–

'যখন কোনো মানুষ মারা যায় তখন তিনটি আমল ছাড়া সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। এক. সাদাকায়ে জারীয়াহ্। দুই. এমন দ্বীনি জ্ঞান যা অপরের উপকার করে। তিন. এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।' (মুসলিম)

মৃত্যুর পরে এমন এক জগতের দিকে আমার যাত্রা, যেখানে আমাকে পৃথিবীর জীবনের সকল কর্মের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে। আমি জানিনা, আমার সর্বশেষ পরিণতি কি হবে! আমার মৃত্যুতে শুধু চোখের পানি না ফেলে তোমরা সকলেই আমার জন্যে মহান মালিকের দরবারে ফরিয়াদ জানাবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা যেনো আমার হিসাব সহজ করে দেন। যেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ পৃথিবীতে তাঁর দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ লাভ করেছেন, সেই তালিকার একেবারে নীচের দিকে হলেও যেনো তিনি একান্ত দয়া পরবশে আমার নামটি লিখে রাখেন।

এই পৃথিবীর জীবনে আমি তোমাদের মতো আপনজন কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকতাম। তোমাদের সকলের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, মায়া-মমতা আমাকে প্রতি ক্ষণে সিক্ত করতো। মৃত্যুর পর আমাকে একেবারে নিঃসঙ্গ- একাকী অবস্থায় কবরের জগতে প্রবেশ করতে হবে। যেখানে আমল ব্যতীত সঙ্গী বলতে আর কোনো কিছুই থাকবে না। আমার মালিক আমার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তার কতটা পালন করে জীবনে কি পরিমাণ পূণ্য সঞ্চয় করতে পেরেছি, আমার পূণ্য কাজসমূহের কতটুকুই বা আমার মনিব মঞ্জুর করেছেন, আমার মালিক আমার সাথে কি ধরণের

www.pathagar.com

আচরণ করবেন– এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা ও অদেখা এক জগতের মধ্যে ভীত-কম্পিত ও সন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্য দিয়েই আমার যাত্রা শুরু হবে।

আমি আতঙ্কিত, শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত, চিন্তান্বিত কিন্তু হতাশ নই। আশাবাদী– আমি অধিক আশাবাদী, আমার রব আমার মালিক করুণাময়, মেহেরবান, ক্ষমাশীল, তওবা কবুলকারী, অপরাধ ক্ষমাকারী আর এ জন্যেই আমি আশাবাদী। আমি তাঁর গোলাম এবং একমাত্র তাঁরই করুণার ভিখারী। তিনিই তো কোরআনের মাধ্যমে তাঁর গোলামদেরকে জানিয়েছেন–

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ– (سورة الزمر، ٥٣)

'(হে নবী) আপনি (তাদের) বলুন, হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছো, তারা আল্লাহ তা'য়ালার রহমত থেকে (কখনো) নিরাশ হয়ো না।' (সূরা ঝুমার-৫৩)

অকল্পনীয় কঠিন হাশরের ময়দানে বিচারের দিনে আমার মালিক, মুনিব, আমার রব, রহ্মানুর রাহীম, গাফুরুর রাহীম আল্লাহ্ তা'য়ালা একান্ত দয়া পরবশে পৃথিবীতে আমার জীবনকালে আমার দ্বারা সংঘটিত ভুল-ত্রুটি ও অন্যায়-অপরাধমূলক কাজসমূহ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে যদি তিনি একান্ত অনুগ্রহ করে আমার জন্য জান্নাত ভিক্ষা দেন, সেটা হবে আমার মালিকের পক্ষ থেকে আমার জন্যে মহাসৌভাগ্যের বিষয়।

জান্নাতে আমরা মিলিত হবো

তোমরা যদি পৃথিবীর জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে ঈমানের মওত লাভ করতে পারো, তাহলে আমরা সবাই আখিরাতের জীবনে জান্নাতে মিলিত হতে পারবো। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার ওয়াদা রয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ– (سورة الطور، ٢١)

'যেসব মানুষ নিজেরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও এ ঈমানের ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি (সেদিন জান্নাতে) তাদের সন্তান সন্ততিদের তাদের (নিজ নিজ পিতামাতার) সাথে মিলিয়ে দিবো'। (সূরা তুর-২১)

www.pathagar.com

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلَلٍ عَلَى الْاَرَائِكِ مُتَّكِئُوْنَ-

'তারা এবং তাদের স্ত্রীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনের ওপর হেলান দিয়ে বসবে'। (সূরা ইয়াসীন-৫৬)

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَاوَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ-

'(সে তো হচ্ছে) এক চিরস্থায়ী জান্নাত সেখানে তারা নিজেরা (যেমনি) প্রবেশ করবে, (তেমনি) তাদের পিতা-মাতা-তাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তারাও প্রবেশ করবে'। (সূরা আর রা'দ-২৩)

وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ-

'জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে (তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য) ফিরিশ্‌তারাও তাদের কাছে আসবে'। (সূরা আর রা'দ-২৩)

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ-

'(তারা বলবে) আজ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা যে পরিমাণ ধৈর্য্য ধারণ করেছো (এটা হচ্ছে তার বিনিময়), আখিরাতের ঘরটি কতই না উৎকৃষ্ট'। (সূরা আর রা'দ-২৪)

তিন ঃ আমার মৃত্যুর পর যথা সম্ভব দ্রুত গোসল ও কাফন- দাফনের ব্যবস্থা করবে। আমার আত্মীয়-স্বজন, ওলামায়ে কেরাম, জামায়াত-শিবিরসহ নেক্‌কার লোকদের খবর দিবে। যাতে তারা আমার জানাযায় অধিক সংখ্যক শরীক হতে পারেন। জানাযায় লোক বেশী হলে মাইয়্যেত বেশী দোয়া পায়।

চার ঃ ঢাকায় যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে বাড়ীর ছাদে পর্দা সহকারে গোসলের ব্যবস্থা করবে। গোসলের বিষয়াদি নেক্‌কার বিশ্বস্ত ও আমানতদার লোকদের দিয়ে সম্পন্ন করবে। যিনি কোনো মঙ্গলজনক অবস্থা দেখলে প্রকাশ করবে, আর মন্দ অবস্থা দেখলে গোপন করবে।

পাঁচ ঃ গোসলের পর পরিষ্কার পবিত্র সাদা কাপড়ে মিস্‌ক আম্বরের সুগন্ধি লাগিয়ে কাফনের ব্যবস্থা করবে এবং কিছুক্ষণের জন্যে আমার লাশ আমার পড়ার রুমে রাখবে, যাতে বাড়ির মহিলারা আমাকে শেষ বারের মতো দেখে দোয়া করতে পারে। আর যদি আমার শাহাদাতের মৃত্যু নসীব হয় তাহলে আমাকে গোসল না দিয়ে

www.pathagar.com

পরিহিত কাপড়সহ শরীরের ওপর লম্বা একখানা সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিবে– নতুন কোনো কাফনের প্রয়োজন হবে না।

ছয় ঃ আমার মৃত্যু যদি মক্কা শরীফ অথবা মদীনা মুনাওয়ারায় হয় তাহলে তা আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। ওখানেই কাফন- দাফন হবে। অন্যথায় আমার মৃত্যু যেখানেই হোক, আমার লাশ আমার প্রাণপ্রিয় দ্বীনী প্রতিষ্ঠান খুলনা দারুল কুরআন ছিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা ও মসজিদের মাঝখানে সংরক্ষিত স্থানে দাফন করবে ইনশাআল্লাহ। লাশের সাথে মহিলাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি কথা বলে রাখতে চাই, আমার মৃত্যুর পরে আমার নিজ সংরক্ষিত কিতাবাদির যেগুলো তোমাদের প্রয়োজন নেই, শুধু শুধু তা আলমারীতে না রেখে সেগুলো খুলনা দারুল কুরআন সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসায় ওয়াক্‌ফ করে দিবে এবং আমার ব্যবহৃত জামা-কাপড় যা তোমাদের পসন্দের তা রেখে অবশিষ্টগুলো আমার মুহাব্বতের ওলামায়ে কেরামকে হাদীয়া দিবে।

সাত ঃ দাফন কার্য্য সমাধা হলে আমার জন্য দোয়া ও ইস্তেগ্‌ফার করবে। একেবারেই শূন্য হাতে আমি আমার রব-এর কাছে ফিরে যাচ্ছি, আমার নিজের জন্য আমি ভীত-সন্ত্রস্ত। আমার রব আমার প্রতি যেনো রাজী- খুশী থাকেন সে জন্য বেশী বেশী দোয়া প্রয়োজন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِسْتَغْفِرُوْا لاَخِيْكُمْ وَسْئَلُوا لَهُ التَّثْبِيْتِ فَانَّهُ الاٰنَ يُسْئَالُ–

'তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো এবং তার (ঈমানের ওপর) অটল থাকার জন্য দোয়া করো। কারণ এ মুহূর্তে তাকে প্রশ্ন করা হবে'। (আবু দাউদ)

যেমন এই দোয়া করবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَه اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ عِنْدَ الْمَسَالَةِ، اللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْاٰخِرَةِ كَمَا ثَبِّتْهُ فِى الدُّنْيَا، اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَالْحِقْهُ بِنَبِيِّه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَ لاَتَضَلَّنَا بَعْدَهُ وَلاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَه وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ وَلِسَائِرِالْمُسْلِمِيْنَ–

www.pathagar.com

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি দয়া করুন, প্রশ্নের সময় তাকে দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! সেই মজবুত কথা (কালিমাহ্) এর ওপর তাকে আখিরাতে দৃঢ় ও অটল রাখুন, যেভাবে তাকে দুনিয়াতে রেখেছিলেন। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন, তাকে নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে মিলিত করুন। তার মৃত্যুর পর আমাদের পথভ্রষ্ট করবেন না, তার পুণ্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না, তার ইন্তেকালের পর আমাদেরকে ফিতনায় ফেলবেন না। তাকে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং সকল মুসলমানদের ক্ষমা করে দিন'।

মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়ার চাইতে শ্রেষ্ঠ হাদীয়া নেই

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا الْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ اِلاَّ كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ اَبٍ اَوْاُمٍّ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ فَاِذَا لُحِقَتْهُ كَانَ اَحَبَّا اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الاَرْضِ اَمْثَالَ الْجِبَالِ وَاِنَّ هَدْيَةَ الاَحْيَاءِ اِلَى الاَمْوَاتِ الاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ- (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

'হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, কবরে দাফনকৃত মৃত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির মতো- যে বাঁচার জন্য আর্তচিৎকার করতে থাকে। অনুরূপ উপায়হীন কবরওয়ালা অপেক্ষা করতে থাকে তার পিতা-মাতা, ভাই অথবা বন্ধু-বান্ধবের (আপনজনদের) পক্ষ থেকে কেউ তার জন্য রহমত মাগফিরাতের দোয়া করে। যদি কেউ তার জন্য অনুরূপ দোয়া করে তাহলে তা কবরবাসীর জন্য দুনিয়া এবং তার মধ্যস্থিত সব কিছুর চাইতে প্রিয়তর হয়। দুনিয়াবাসীদের পক্ষ থেকে যে দোয়া করা হয় তা কবরবাসীর জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে পাহাড় সমতুল্য করে দেয়া হয়। আর কবরবাসীর জন্য দুনিয়াবাসীর পক্ষ থেকে দোয়ার চাইতে শ্রেষ্ঠ হাদীয়া আর কিছুই নেই।' (বায়হাকী শুআ'বুল ঈমান)

www.pathagar.com

পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর সন্তানদের করণীয়

عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ اَبَوَىَّ شَىْءٍ بَعْدَ مَوْتِهِمَا اَبَرُّ هُمَا قَالَ نَعَمْ: خِصَالٌ اَرْبَعٌ الدُّعَاءُ لَهُمَا، وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِ هِمَا وَاَكْرِمُ صَدِيْقِهِمَا–

'হযরত আবি উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এক ব্যক্তি জানতে চাইলো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! পিতা-মাতার ইন্তেকালের পরও কি এমন কোনো পন্থা রয়েছে, যা অবলম্বন করলে আমি তাদের সাথে উত্তম আচরণ অব্যাহত রাখতে পারি? নবী করীম (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ পারো। এর চারটি পন্থা রয়েছে। এক. পিতা-মাতার জন্য দোয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা। দুই. তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ এবং বৈধ অসিয়্যত পূরণ করা। তিন. পিতার ঘনিষ্ঠজন, বন্ধু এবং মাতার প্রিয়জন ও বান্ধবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং (সাধ্যানুযায়ী) সেবা-যত্ন করা। চার. পিতা-মাতার আত্মীয়- স্বজনদের সাথে উত্তম আচরণ বজায় রাখা।' (আল আদাবুল মাফরুজ)

আট ঃ দাফন কার্য্য সম্পাদন করার পর আমার কোনো ঋণ থাকলে আমার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তা দ্রুত পরিশোধ করে দিবে। এটি তোমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এ বিষয়ে অবহেলা করলে তোমরা দায়ী থাকবে।

নয় ঃ আমার মৃত্যুর পর প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কুলখানী, চল্লিশা, কাঙালী ভোজ এবং মৃত্যুর তারিখে মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন ইত্যাদীর আয়োজন করবে না। হাদীস শরীফে এসবের কোনো অনুমতি নেই। তবে দোয়ার জন্য অনুষ্ঠান অবশ্যই করা উচিত। সন্তানদের কর্তব্য প্রতি নামাজ শেষে মৃত পিতা-মাতার জন্য এই দোয়া করা–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا، (سورة بنى اسرائيل،٢٤)

'হে আমার মালিক! আমার মাতা-পিতার প্রতি (ঠিক সেভাবেই) তুমি দয়া করো যেমন করে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন-পালন করেছিলো।' (সূরা বনী ইসরাঈল- ৩৪)

www.pathagar.com

আমার কবরে চাদর, আগর বাতি, মোমবাতি বা গম্বুজ শামিয়ানা ইত্যাদীর ব্যবস্থা করবে না। আমি আমার সারা জীবন শিরক্-বিদয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি; সুতরাং আমার কবরকে কেন্দ্র করে এ জাতিয় কিছু করা হলে যারা করবে তারাই আল্লাহ্র কাছে দায়ী থাকবে। কবরের ওপর শুধু ফুলের গাছ লাগিয়ে দিবে।

দশ ঃ আমি আল্লাহ্ তা'য়ালাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমার সাথে যারা অসদাচরণ করেছে, আমার গীবত- শেকায়েত করেছে, আমার সাথে অহেতুক শত্রুতা বা হিংসা পোষণ করেছে, আমি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিলাম। কারো কাছে আমার কোনো হক থাকলে আমি তাও ক্ষমা করে দিলাম। আমি আশা পোষণ করি, আমার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক রয়েছে তাদের কারো কোনো হক আমার ওপরে যদি থাকে তাহলে তারাও অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।

এগার ঃ আমি আমার স্ত্রী, সন্তান, পরিবার-পরিজন, ভাইবোন ও আত্মীয়- স্বজনকে গুরুত্ব সহকারে সেই অসিয়্যত করছি, যে অসিয়্যত করেছিলেন ইন্তেকালের সময়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (সাঃ)। সে অসিয়্যত হচ্ছে–

الصَّلٰوٰةَ اَلصَّلٰوٰةَ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ–

'নামাজ! নামাজ!! এবং তোমাদের অধীনস্থ (কাজের) লোক সম্পর্কে।'

তোমরা সঠিকভাবে সময় মতো ৫ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে জামায়াতে আদায় করবে, নামাজে কখনো অবহেলা করবে না। কাজের লোকদের প্রতি অবশ্যই সদ্ব্যবহার করবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ভয় করে চলবে। হালাল উপার্জন করবে। নিজে এবং পরিবার বর্গকে দ্বীনি আন্দোলনের সাথে শরীক রাখবে। ভাইভাই মিলে মিশে মুহাব্বত পূর্ণ পরিবেশে থাকবে। পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় এমন আচরণ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। দুনিয়ার জীবনের তুলনায় আখিরাতের জীবনকে প্রাধান্য দিবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى–

'কিন্তু তোমরা তো (সর্বক্ষণ) দুনিয়ার জীবনকেই আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকো। অথচ আখিরাতের জীবনই হচ্ছে চিরস্থায়ী ও উৎকৃষ্ট'। (সূরা আল আ'লা-১৬-১৭)

প্রত্যহ বুঝে কোরআন তিলাওয়াত, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলবে। আলেমদের সাথে মুহাব্বত ও সম্মানজনক সম্পর্ক রাখবে। সাধ্যানুসারে মেহমানদের আপ্যায়ন করবে। অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করবে।

www.pathagar.com

মায়ের প্রতি সদাচারণ করবে

বারো ঃ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাদের গর্ভধারিণী মা, তাঁর পায়ের নীচে তোমাদের জান্নাত। তাঁর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ তা'য়ালাকে বেশী বেশী ভয় করবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا-

'এবং তোমরা (তোমাদের) পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো; তাদের একজন কিংবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহ্লে তাদের (সাথে) বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং কখনো তাদের ধমক দিয়ো না, তাদের সাথে সম্মানজনক ভদ্রজনোচিত কথা বলবে'। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৩)

কারো কথায় মায়ের প্রতি অন্যায় আচরণ করবে না। আদবের সীমা লংঘন করবে না। তাঁর প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তোমরা সকলেই সজাগ- সতর্ক ও নিবেদিত থাকবে। কোনো ব্যাপারেই তাঁর যেনো কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে, এটি তোমাদের ফরজ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। মা-কে কষ্ট দিলে আল্লাহ্ নারাজ হবেন, কবীরা গোনাহ্ হবে সর্বোপরি নিজের তকদীর খারাপ হবে বিষয়টি মনে রেখো এবং এ বিষয়ে সকলকে সতর্ক করে দিও।

মায়ের খেদমতের গুরুত্ব কতখানি এ সম্পর্কিত বহু সংখ্যক হাদীসের মধ্যে দু'টি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ اَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَدْتُّ اَنْ اَغْزُوَ، وَقَدْ جِئْتُ اَسْتَشِيْرُكَ فَقَالَ هَلْ لَّكَ مِنْ اُمٍّ؟ قَالَ، نَعَمْ، قَالَ فَالْزَمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا- (ابن ماجه و النسائ)

'হযরত জাহিমা (রাঃ)-এর সন্তান হযরত মাবিয়া (রাঃ) বলেন, হযরত জাহিমা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে বললেন; হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে আমি আপনার সাথে

www.pathagar.com

পরামর্শ করতে এসেছি। নবী করীম (সাঃ) তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি জানালেন, জ্বী হ্যাঁ। নবী করীম (সাঃ) বললেন, ফিরে যাও এবং তোমার মায়ের খেদমতে লেগে থাকো। কারণ তাঁর পায়ের তলাতেই (তোমার) জান্নাত।' (ইবনে মাজাহ্, নাসাঈ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ، قَالَ اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ! قَالَ: ثُمَّ مَنْ قَالَ! اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ-

'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! মানুষের মধ্যে আমার নিকট থেকে সর্বোত্তম সেবা লাভের অধিকার কার? নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি আবার জানতে চাইলেন, তারপর কার? রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি পুনরায় জানতে চাইলেন, তারপর কার? রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি আবারো জানতে চাইলেন, এরপর কার? নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমার পিতার।' (বোখারী, মুসলিম)

তেরো ঃ আমার চার সন্তানকে বলছি, তোমরা আমার ভাই-বোনদের প্রতি মুহাব্বতপূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে এবং আমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, তাদের হক আদায় করবে। এবং পিরোজপুর- নাজিরপুর ও জিয়া নগরবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। কারণ পিরোজপুর জেলায়ই আমার প্রিয় জন্মস্থান। এখানকার অধিবাসীদেরকে আমি ভালোবাসি। বিনিময়ে তারা আমাকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিয়ে একাধিকবার জাতিয় সংসদে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন এবং অবহেলিত পিরোজপুর গড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমিও সততা ও স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে তাদের খেদমত ও উন্নয়নের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি, তবুও আমার প্রতি পিরোজপুর, নাজিরপুর ও জিয়ানগর বাসীদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার ঋণ অপরিশোধ্য। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে দ্বীন ও ঈমানের মহা সত্যের ওপর টিকে থাকার তাওফিক দিন।

www.pathagar.com

পরিবারভুক্তদের সাথে ভালোবাসার বন্ধন অটুট রাখবে

চৌদ্দ ঃ আমার মৃত্যুর পর আমার রেখে যাওয়া স্থাবর- অস্থাবর সম্পত্তি যেখানে যতটুকুন আছে শরীয়াত অনুযায়ী তোমরা সমভাবে বন্টন করে নিবে। ক্ষণস্থায়ী জীবনে এ ধ্বংসশীল সম্পদ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ বা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে দিবে না। ছোট ভায়েরা বড় ভাইকে মর্যাদা দিবে, কখনো বেয়াদবী করবে না এবং বড় ভাই ছোট ভাইদের অন্তর দিয়ে স্নেহ করবে, তাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের সংশোধনের চেষ্টা অব্যহত রাখবে। মনে রেখো, ত্যাগেই আনন্দ– ভোগে আনন্দ নেই। পুত্র বধুরা একে অন্যের প্রতি শ্রেণী মতে শ্রদ্ধা ও স্নেহ মমতায় আপন বোনের মতো থাকবে, কেউ কাউকে হিংসা করবে না। স্বামীর কাছে অহেতুক অভিযোগ করে বাড়ির পরিবেশ নষ্ট করবে না। এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন, হিংসা যে করে সেই জ্বলে পুড়ে মরে, যার প্রতি হিংসা পোষণ করা হয় তার কিছুই হয় না। তোমরা একে অন্যের সন্তানদের নিজের সন্তানের মতো আদর করবে। আদব শেখাবে মমতা দিয়ে। কারণ শ্রদ্ধা টাকার বিনিময়ে কেনা যায় না, উত্তম ব্যবহার দিয়ে সহজেই পাওয়া যায়।

পনের ঃ নামাজের ব্যাপারে তোমরা সামান্যতম অবহেলা করবে না। ছেলেরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে জামায়াতে আদায় করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের নামাজের জন্য সতর্ক করবে। শরীয়াতের ওজর ব্যতীত নিতান্ত অবহেলায় নামাজ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করার অধিকার হারায়। 'মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য নামাজ, নামাজ আদায় করা মুসলমানের কাজ আর নামাজ পরিত্যাগ করা কাফিরের কাজ'। (আল হাদীস)

কাজের লোকদের খাওয়া থাকায় বা ব্যবহারে কখনো কষ্ট দিবে না, তাদেরকে গাল মন্দ করবে না। তাদের সামর্থের অতিরিক্ত কোনো কাজের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ভয় করে চলবে।

চরিত্রহীন লোকদের বন্ধু বানাবে না

ষোল ঃ বন্ধু নির্বাচনে ভুল করবে না। বে-নামাজী, বে-পর্দা, মদ্যপ, জুয়াড়ী, মিথ্যাবাদী, ভোগবাদী, চরিত্রহীন লোকদের বিষধর সাপের মতো ভয়ঙ্কর মনে করে তাদেরকে এড়িয়ে চলবে। জীবনের স্পন্দন থাকা পর্যন্ত অসৎ চরিত্রের লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না। আমাদের মালিক মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ

مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً- يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فَلاَنًا خَلِيْلاً-

'সেদিন আত্মঘাতী (জালিম) ব্যক্তি আক্ষেপ করে নিজের দুটো হাত দাঁত দিয়ে কামড়াবে আর বলবে, হায়! আমার বদ নসীব, রাসূলের পথে চললে (আমার জন্য) কতইনা ভালো হতো। হায়! আমার বদ নসীব, অমুকের সাথে বন্ধুত্ব না করলে (আজ) কতই না উত্তম হতো!' (সূরা ফুরকান- ২৭-২৮)

কুল-কায়েনাতের মালিক মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেন–

اِنَّ جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ-

'আমি শয়তান (চরিত্রের লোকদের) ঐসব লোকের বন্ধু বানিয়ে দেই যারা ঈমানের পথে চলে না।' (সূরা আ'রাফ-২৭)

اَلْاَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ م بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ-

'সেদিন বন্ধুগণ একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে কেবলমাত্র মুত্তাকী ব্যতীত।' (সূরা যুখরুফ-৬৭)

পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ঈমানহারা ব্যক্তি ব্যতীত দুনিয়া পূজারী চরিত্রহীন লোকদের সাথে কেউ বন্ধুত্ব করে না। সুতরাং আল্লাহর কসম! তোমরা আল্লাহ্ বিমুখ, ফাসিক-ফুজ্জার দুনিয়া পুজারী শয়তান চরিত্রের লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না। তারা তোমাকে অবশ্যই জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। বন্ধুত্ব কার সাথে করতে হবে, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ-

'হে ঈমানগারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যপন্থীদের সাথে থাকো'। (সূরা তাওবা-১১৯)

পার্থিব জীবনে বন্ধু নির্বাচনের ব্যাপারে আমার চূড়ান্ত কথা হলো, পাপ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার মানসিক শক্তি অটুট রেখে কোনো পাপাসক্ত বদকার লোককে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা তথা দ্বীনের প্রভাবে প্রভাবিত করে তাকে পাপের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কারো সাথে হালকাভাবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা ক্ষতিকর নয়। কিন্তু এমন অবস্থায় যদি নিজের চরিত্র হারানোর আশঙ্কা থাকে বা পাপাসক্ত ব্যক্তির প্রভাবে নিজেই যদি

www.pathagar.com

প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে ঐ ধরণের লোকদের সঙ্গ অবশ্যই বর্জন করতে হবে। আবারো বলছি, আল্লাহর কসম! তোমরা এর ব্যতিক্রম করবে না। এ দুষ্ট চক্রের পেছনে সময় ব্যয় করবে না, এ শয়তান চরিত্রের লোকদের পেছনে সময় না দিয়ে ততক্ষণ স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গ দিও, লেখা-পড়া করো তা অবশ্যই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে।

اَسْتَوْدَعَ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ-

'আমি তোমাদের দ্বীন ও আমলের পরিণতি মহান আল্লাহর দরবারে সোপর্দ করছি।' (আল হাদীস)

وَمَا عَلَيْنَا اِلاَّ الْبَلٰغُ-

'তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে (আল্লাহর বাণী) পৌছে দেয়া ছাড়া আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই।' (সূরা ইয়াসীন-১৭।

হেদায়াতের মালিক কেবল আল্লাহ তা'য়ালা। আবু জাহেলরা সারা জীবন রাসূল (সাঃ) কে অতি নিকট থেকে চোখে দেখার পরও কপালে হেদায়াত জোটেনি। কিন্তু সহস্র মাইল দূর থেকে আসা হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) ও হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) এর কিসমতে সঠিক পথের সন্ধান মিলেছে। সুতরাং কারো কপালে হেদায়াত না থাকলে সে ক্ষেত্রে আমি অসহায়।

সতের ঃ আত্মীয়-স্বজনসহ সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার ঃ আমি আমার জীবনকালে আমার সামর্থ অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি এবং সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। আমার অবর্তমানে তোমরাও কোরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং মেহমানদের আপ্যায়ন করবে। আচরণ-ব্যবহারে ও কথা-বার্তায় কারো প্রতি সামান্যতম অহঙ্কার প্রদর্শন করবে না এবং কারো প্রতি অবজ্ঞা বা কাউকে অবহেলা করবে না। সকলের সাথে হাসি মুখে কথা বলবে, হাসি মুখে কথা বলাও সাদকার সমতুল্য সওয়াব। (আল হাদীস)

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির হক আদায় করবে

আঠারো ঃ নিজের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের সংশোধন তথা তাদের আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে যত্নবান থাকবে এবং তাদের হক আদায় করবে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

www.pathagar.com

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّاعِيَتِهِ-

'প্রত্যেক ব্যক্তিই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে'।

রাসূল (সাঃ)-এর এ সতর্ক বাণীর প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিবারভুক্তদের নামাজী, দ্বীনদার, ঈমানদার, সত্যবাদী, পর্দা পালনকারী, পরহেযগারী ও তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যহত রাখবে। নিজের ঘরকে ইসলামের দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলবে। প্রতি মাসে একবারের জন্য হলেও বাসায় পারিবারিক বৈঠক করে দ্বীনি আলোচনা করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا-

'হে ঈমানদাররা! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার বর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।' (আল কোরআন)

তোমরা নিজ স্ত্রীর হক আদায় করবে, কোনো ব্যাপারেই তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না। অধিকার হারা স্ত্রীর চোখের পানি স্বামীর জন্য অভিশাপ বয়ে আনে। নেক্কার সতী স্বাধ্বী মু'মিনা স্ত্রী তার স্বামী, সন্তান ও সংসারের প্রতি যে ত্যাগ স্বীকার করে, স্বামীর কৃতজ্ঞতা বোধ থাকলে স্ত্রীর প্রতি এ জন্যে আরো সদয় আরো যত্নবান হওয়া একান্ত জরুরী। মনে রাখা প্রয়োজন, স্ত্রী তার স্বামীর মাল-সম্পদের হেফাজত করে, সন্তানের প্রতি পালন করে, স্বামীর চাহিদা পূরণ করে, তার আমানত রক্ষা করে, স্বামী- সন্তান ও সংসারের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত অকাতরে বিলিয়ে দেয়, এমন স্ত্রী বা জীবন সঙ্গীনি সহধর্মিনীকে যে কষ্ট দেয়, তার হক, তার ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করে না সে স্বামী অবশ্যই অকৃতজ্ঞ।

এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন, স্বামী যেমন তার আত্মমর্যাদা বোধের কারণে নিজ স্ত্রীর সতর ও সৌন্দর্য্যের প্রতি অন্য পুরুষের নজরকে সহ্য করতে পারে না, অনুরূপ ভাবে স্ত্রীও তার স্বামীর সাথে অন্য কোনো নারী স্ত্রী সুলভ আচরণ করুক তা আদৌ সহ্য করতে পারে না। এ ধরণের স্বামী তার স্ত্রীর কাছে ঘৃণাই কুড়ায়, শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা পায় না। এর সুদূর প্রসারী প্রভাবে নিজ সন্তানগুলোও পিতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। পারিবারিকভাবে এমন সর্বনাশা পরিবেশ ও পরিণতি থেকে আল্লাহ তা'য়ালা সকলকে রক্ষা করুন।

উনিশ ঃ তোমাদের সন্তানদের হাফেজে কোরআন ও আলেমেদ্বীন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাস্তবমুখী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। সন্তানের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

www.pathagar.com

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَه مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ– (رواه الترمذى)

'কোনো পিতা-মাতা নিজের সন্তানকে যা কিছু প্রদান করে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান হলো উত্তম আদব, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।' (তিরমিযী)

وَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَدِّبُوا اَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثَ خِصَالٍ حُبِّ نَبِيِّكُمْ وَحُبِّ ال بَيْتِه وَتِلَاوَتِ قُرْاٰنٍ– (الطبران)

'হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহু রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের (প্রাথমিকভাবে তিনটি) বিষয়ে শিক্ষা দান করো, নবী করীম (সাঃ) এর (পরিচয়সহ) তাঁর প্রতি (নিজ প্রাণেরও অধিক) ভালোবাসা, তাঁর পরিবার বর্গের প্রতি ভালোবাসা এবং (বুঝে বিশুদ্ধভাবে) কোরআন তিলাওয়াত।' (তাবারাণী)

মানুষকে স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির সাথে তুলনা করে হাদীসে বলা হয়েছে–

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلنَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ– (رواه مسلم)

'নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির মতো মানুষ সম্পদের খনি।'

এ জন্যেই মানুষ জাতিকে মানব সম্পদ বলা হয়। সম্পদের বিপরীত শব্দ আপদ, আর আপদের বিপরীত হলো সম্পদ। ঠিক এ কারণেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে মানব সম্পদ। অশিক্ষা ও কুশিক্ষার কারণে এই মানুষগুলোই সম্পদ না হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য আপদে পরিণত হয়। যে শিক্ষা মানুষকে সম্পদে পরিণত করে সে শিক্ষার নাম অহীভিত্তিক শিক্ষা, যা মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ) নিকট অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা তথা বিএ, এমএ পাশ করলে শুধু পৃথিবীর বস্তুগত বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জন করবে কিন্তু সততা, স্বচ্ছতা, আমানতদারী এবং আল্লাহভীতি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা একেবারেই নগণ্য।

www.pathagar.com

সেক্ষেত্রে ফাযিল-কামিলের মান ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমান হওয়াতে সন্তানদের মাদ্রাসা শিক্ষিত করানোতেই উভয় জগতে লাভ বেশী। আমার কামনা তোমাদের সন্তানরা আলেমে দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। তাহলে মহান আল্লাহ তা'য়ালার অমোঘ নিয়মে তোমরাও যখন আমার পথের পথিক হবে তখন তোমাদের সন্তানরা ব্যথিত হৃদয়ে পরম মমতার সাথে চোখের পানি ফেলে তোমাদের কল্যাণ কামনা করে দোয়া করতে পারবে। কিয়ামতের ময়দানে কঠিন বিচারের দিনে আলেমের পিতামাতা হিসেবে উঠতে পারা সে এক মহাসৌভাগ্যের ব্যাপার।

সন্তানদের চরিত্র গঠনে কোরআনিক ফর্মূলা

তোমাদের সকলেরই হযরত লূকমান (আঃ)-এর ইতিহাস কম-বেশী জানা রয়েছে। হযরত লূকমান (আঃ) তাঁর প্রিয় সন্তানকে সেই সত্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন, যে সত্তা সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক, পরিচালক, প্রতিপালক ও হেফাজতকারী এবং সেই মহান সত্তার নাম 'আল্লাহ্'। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক পিতা মাতার এটা আবশ্যিক দায়িত্ব যে, তাঁরা তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে। হযরত লূকমান (আঃ) এই দায়িত্ব যথার্থ ভাবে পালন করলেন। আবশ্যিক এই দায়িত্ব পালন করার কারণে হযরত লূকমানকে অকল্পনীয় বিনিময়ে আল্লাহ তা'য়ালাও তাঁর নামে পবিত্র কোরআনের একটি সূরার নামকরণ এবং তাঁর ইতিহাস বর্ণনা করে তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির কাছে চিরন্তন করে দিলেন।

লক্ষ্যণীয়, পৃথিবীতেই যাকে এই অকল্পনীয় বিনিময় দেয়া হলো, পরকালে তথা আখিরাতে তাঁকে কি ধরণের বিনিময় দেয়া হবে তা কল্পনাই করা যায় না। হযরত লূকমান (আঃ)-এর অনুসরণে যে সকল পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে মহান আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে, আল্লাহ তা'য়ালাও সে সকল পিতা-মাতাকে দুনিয়া- আখিরাতে সম্মান-মর্যাদার আসন দান করে ধন্য করবেন। হযরত লূকমান (আঃ) সর্বপ্রথমেই তাঁর সন্তানকে শিক্ষা দিয়েছিলেন–

يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ–

'হে প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শির্ক করো না, কেননা শির্ক হচ্ছে সবথেকে বড় জুলুম।' (সূরা লূকমান-১৩)

* প্রত্যেকটি মানুষের জীবনই বিশেষ এক আকিদা-বিশ্বাসের অধীনে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে, এই বিশ্বাসই মানুষের সকল কাজের মূল প্রেরণার উৎস।

www.pathagar.com

ঠিক এ কারণেই হযরত লূকমান (আঃ) তাঁর সন্তানকে তাওহীদ শিক্ষা দিলেন এবং তাওহীদের ভিত্তিতেই জীবন গড়া ও পরিচালনায় অনুপ্রাণিত করলেন। আমি আশা করি তোমরাও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে তাওহীদ ভিত্তিক জীবন গড়া ও পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করবে।

হযরত লূকমান (আঃ) যে মহান সত্তার এক ও একক হওয়া সম্পর্কে নিজ সন্তানকে শিক্ষা দিলেন, এরপর তিনি সেই সত্তার অসীম জ্ঞান, কুদরত, বিরাটত্ব, ব্যাপকতা ও ক্ষমতা সম্পর্কেও জানিয়ে দিলেন–

يٰبُنَيَّ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ، اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ–

'হে প্রিয় বৎস! যদি তোমার কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণ ক্ষুদ্রও হয় এবং তা যদি কোনো শিলাখন্ডের মধ্যে বা আকাশসমূহেও লুকিয়ে থাকে, অথবা যদি তা থাকে যমীনের ভেতরে, তাও আল্লাহ্ তা'য়ালা সামনে এনে হাযির করবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা অবশ্যই সূক্ষ্মদর্শী এবং সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।'

* নিজ সন্তানকে উত্তম আদব আখলাকের অধিকারী হিসেবে গড়তে হলে অবশ্যই তার মধ্যে আপন স্রষ্টার ভীতি সৃষ্টি করতে হয় এবং হযরত লূকমান (আঃ) ঠিক সেই কাজটিই করেছিলেন। মহান আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতার প্রতি যে ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, সেই ব্যক্তির পক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর পাপেও জড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। আমি আশা করি তোমরাও তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও অধীনস্থদের মনে মহান আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাস্তব মুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

যে আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষ সৃষ্টি করে সৃষ্টির সকল কিছুই সেই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, একটি পলকও যে আল্লাহ্ তা'য়ালার করুণা ব্যতীত মানুষের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়, সেই আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতি মানুষের অবশ্যই দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সেই আবশ্যিক কর্তব্যের কথা হযরত লূকমান (আঃ) তাঁর সন্তানকে এভাবে শিক্ষা দিলেন–

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ–

'হে প্রিয় বৎস! তুমি নামাজ প্রতিষ্ঠা করো।'

www.pathagar.com

* আমি আশা করি তোমরাও যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে আদায় করবে তেমনি নিজ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকেও নামাজের ব্যাপারে যত্নবান রাখবে।

মানুষ একা বাস করতে পারে না, তাকে একটি দেশে এবং সমাজের অসংখ্য মানুষের সাথে বসবাস করতে হয়। এ কারণেই সে মানুষের অন্যের প্রতি এবং সমাজ ও দেশের প্রতিও রয়েছে তার বিরাট দায়িত্ব। সে দায়িত্ব হলো নিজের সমাজ ও দেশকে সত্য ও সুন্দর দিয়ে সাজানো এবং অন্যায় ও অসুন্দর থেকে মুক্ত রাখা। এই মহান দায়িত্বের কথাও হযরত লূকমান (আঃ) তাঁর সন্তানকে এভাবে শিক্ষা দিলেন-

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

(প্রিয় বৎস) 'মানুষদের ভালো কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখো।'

* সাধারণভাবে এই কাজটি একার পক্ষে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয় বিধায় সংগঠন প্রয়োজন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই কাজটি আঞ্জাম দেয়ার জন্যে অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-ঐশ্বর্য্য, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তা এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতার লোভ-লালসা ত্যাগ করে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপক ভিত্তিক সংগঠন জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হয়েছি। আমি আশা করি তোমরাও তোমাদের সন্তানদেরকে উক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্যে জামায়াতের সাথে কাজ করার মতো অনুকুল মন-মানসিকতা গড়ে তুলবে।

উক্ত দায়িত্ব পালন করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই নানা ধরণের বিপদ-মুসিবত আপতিত হয়। নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কেউ-ই বিপদ-মুসিবত থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি। 'সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ' এ কাজটি যারাই করেছেন তথা সমাজ ও দেশ থেকে অসুন্দরকে বিদায় করে সুন্দরের সমারোহ সৃষ্টিতে যারাই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তাদেরকেই নানা ধরণের বিপদ-মুসিবত পরিবেষ্টিত করেছে। এ কারণেই হযরত লূকমান (আঃ) তাঁর সন্তানকে শিক্ষা দিয়েছিলেন-

وَاصْبِرْ عَلَى مَا اَصَابَكَ-اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ-

(প্রিয় বৎস) 'তোমার ওপর কোনো বিপদ মুসিবত এসে পড়লে তার ওপর ধৈর্য্য ধারণ করো। বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করার এ কাজ নিঃসন্দেহে একটি বড়ো সাহসিকতাপূর্ণ কাজ।'

www.pathagar.com

* তোমরাও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে অসীম সাহস এবং প্রবল ধৈর্য্য সৃষ্টির ব্যাপারে অনুকূল ভূমিকা পালন করবে।

অহঙ্কার পতনের মূল এবং ইসলামের দৃষ্টিতে অহঙ্কারী ব্যক্তি ঘৃণিত। অহঙ্কারী ব্যক্তি অন্যান্য মানুষ থেকে নিজেকে পৃথক মনে করে, আল্লাহ্ তা'য়ালার অন্যান্য বান্দাদেরকে ছোটো জ্ঞান করে মানুষে মানুষে বিভেদ রেখা টানে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান। হাদীসে কুদ্‌সীতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'অহঙ্কারী ব্যক্তি যেনো আল্লাহ্ তা'য়ালার চাদর ধরে টানাটানি করে' এবং 'যার হৃদয়ে সরিষার দানা পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করা দূরে থাক, জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।' এ কারণেই হযরত লূকমান (আঃ) তাঁর সন্তানকে শিক্ষা দিলেন–

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ–

(প্রিয় বৎস) 'কক্ষনো অহঙ্কারবশে তুমি মানুষদের জন্যে তোমার গাল ফুলিয়ে রেখে তাদের অবজ্ঞা করো না।'

* তোমরাও যেমন অহঙ্কার মুক্ত আচরণের অধিকারী হবে এবং তোমাদের স্ত্রী ও সন্তাদেরকেও অহঙ্কার মুক্ত জীবন গড়ার শিক্ষা দিবে।

উদ্ধত স্বভাব, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করে এমনকি পরিবারেও ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। উদ্ধত অহঙ্কারী ব্যক্তির পক্ষে সমাজ, জাতি ও দেশকে ভালো কিছু দেয়া কখনো সম্ভব হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস এটা প্রমাণ করে যে, উদ্ধত অহঙ্কারী লোকদের দ্বারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে এবং এ ধরণের জালিমদেরকে আল্লাহ্ তা'য়ালা বরদাস্‌ত করেননি। ধ্বংসের অতলান্তে তলিয়ে দিয়েছেন। আর ঠিক এ কারণেই মানবতা বিবর্জিত এ নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য থেকে নিজ সন্তানকে মুক্ত থাকার নসিহত করে হযরত লূকমান (আঃ) বলেছেন–

وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرْحًا–اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ–

(প্রিয় বৎস) 'আল্লাহর যমীনে কখনো ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে বিচরণ করো না; কেননা আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রত্যেক ঔদ্ধত অহঙ্কারীকেই অপছন্দ করেন।'

* তোমরা নিজেরা যেমন এ নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকবে এবং নিজ সন্তানদেরকেও ঐ নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকার শিক্ষা দিবে।

একেবারে নরমপন্থা ও চরমপন্থা এ দুটোই মানুষের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর। এ

www.pathagar.com

দুটো পন্থা অবলম্বনকারী নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মানব সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং পৃথিবীতে ডেকে আনে বিপর্যয়। এতে করে সকল সৃষ্টিই কম বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জন্যেই ইসলাম মানুষকে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মধ্যম পন্থা অবলম্বনের তাগিদ দিয়েছে। হযরত লূকমান (আঃ)ও তাঁর সন্তানকে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে পৃথিবীতে চলাফেরার নসিহত করে বলেছেন–

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ–

(প্রিয় বৎস! যমীনে চলার সময়ে) 'তুমি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো।'

* তোমরাও যেমন মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে এবং তোমাদের সন্তানদেরকেও চলাফেরায়, আচার-আচরণে, কথা-বার্তায়, ওঠা-বসায় তথা সার্বিক দিকে মধ্যম পন্থা অবলম্বনে অনুপ্রাণিত করবে এবং একেবারে নরম ও চরমপন্থার ক্ষতিকর দিকসমূহ তাদের সামনে তুলে ধরবে।

মিষ্টভাষীকে সকলেই পছন্দ করে, যার মুখের ভাষা মিষ্ট নয়, অন্যান্য মানুষ তাকে এড়িয়ে চলে। আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে, শ্রুতি মধুর ভাষায় যারা কথা বলে, অনেকেই প্রয়োজনীয় কাজ ত্যাগ করে হলেও উক্ত ব্যক্তির সান্নিধ্যে অবস্থান করে। এই গুণ-বৈশিষ্ট্য নবী করীম (সাঃ)-এর মধ্যে সকল মানুষের তুলনায় এত বেশী মাত্রায় ছিলো যে, ক্ষুধার্ত সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পবিত্র মুখ মোবারক থেকে উচ্চারিত শব্দ শুনেই ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থান করেছেন। সুন্দর এই গুণ- বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবার নসিহত করে হযরত লূকমান (আঃ) নিজ সন্তানকে শিক্ষা দিয়েছেন–

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اِنَّ اَنْكَرَ الاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ–

(প্রিয় বৎস) 'তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো, কেননা সব আওয়াযের মধ্যে সবচাইতে (কর্কশ) এবং অপ্রীতিকর আওয়ায হচ্ছে গাধার আওয়ায।' (সূরা লূকমান-১৯)

* সুতরাং নিজ সন্তানদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিবে, তারা যেনো চলাফেরায়, কথাবার্তায়, আচার-আচরণে তথা সার্বিক দিক দিয়ে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং আকর্ষণীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে। আমি আশা করি, তোমরাও যদি তোমাদের সন্তানদেরকে এ ধরণের উত্তম শিক্ষা দিতে পারো, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকেও দুনিয়া- আখিরাতে উত্তম বিনিময় দান করবেন।

www.pathagar.com

বিশ ঃ তোমরা তোমাদের কন্যা সন্তানদের বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে যতটা পাত্রপক্ষের শারীরিক সৌন্দর্য ও অর্থ-সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দিবে; ততোধিক সতর্কতার সাথে খোঁজ নিবে পাত্রের দ্বীনদারী, পরহেযগারী, আল্লাহভীতি, বংশ মর্যাদা, শিক্ষা, রুচিবোধ, বিনয়-নম্রতা, চারিত্রিক সৌন্দর্য ও আচার, আচরণ-ব্যবহার সম্পর্কে। এ ক্ষেত্রে পাত্র এবং তার পরিবারের ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততার দিকটিও প্রাধান্য দিবে। এরপর মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সাহায্য কামনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। পুত্র সন্তানদের জন্য পাত্রী নির্বাচনেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

একুশ ঃ আমার মা যদি আমার থেকে অধিক হায়াত লাভ করেন, তাহলে তোমরা চার ভাই এবং আমার দু'ভাই এক বোন সম্মিলিতভাবে আমার মায়ের খেদমতের দিকে সতর্ক-সজাগ দৃষ্টি রাখবে। তাঁর প্রয়োজন পূরণে তিনি যেনো সামান্যতম কষ্ট অনুভব না করেন– এ ব্যাপারে তোমরা সকলেই দায়িত্ব পালনে সজাগ থাকবে।

সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলবে

বাইশ ঃ মু'মিন ব্যক্তির সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য 'তাক্ওয়া।' এই একটি বৈশিষ্ট্য মু'মিনকে আল্লাহর নিকট ফিরিশ্তার চাইতেও মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়। আর এটির অভাবে ব্যক্তি শয়তানের চাইতেও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। পবিত্র কোরআন মজীদে 'তাক্ওয়া' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। 'তাক্ওয়া' শব্দের অর্থ সাধারণতঃ আল্লাহভীতি বলা হয়ে থাকে। অথচ ভয়-ভীতির আরবী হচ্ছে خَوْفٌ (খাউফ) অথবা خَشْيَةٌ (খাশিয়াহ্)। 'তাক্ওয়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ শুধু ভয় করা নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে বেছে চলা, সতর্কতা অবলম্বন করা, বিরত থাকা ইত্যাদি। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ–

'হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, প্রত্যেক ব্যক্তির ভেবে দেখা উচিত সে পরকালের জন্য কি সঞ্চয় করেছে। আল্লাহকে ভয় করো, সন্দেহ নেই তিনি তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।' (সূরা হাশর-১৮)

www.pathagar.com

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لاَّ تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا-

'বাঁচার চেষ্টা করো সেইদিন থেকে, যেদিন কেউ কারো কাজে লাগবে না।' (সূরা বাকারা-১২৩)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ-

'আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো তোমাদেরকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।' (সূরা বাকারা-২০৩)

এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْلَمُوْنَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَالتَّقُوا النِّسَاءِ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ- (رواه مسلم)

'হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, দুনিয়া অবশ্যই মধুময় ও আকর্ষণীয়, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে এর প্রতিনিধি বনিয়েছেন। যাতে করে তিনি দেখে নেন তোমরা কেমন কাজ করো। কাজেই তোমরা দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও এবং নারীদের ফিত্না থেকে সতর্ক থাকো। কারণ বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিত্না নারীদের থেকেই সৃষ্টি হয়েছিলো।' (মুসলিম)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন-

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُو الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ-

'তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আমার কিতাব দান করেছিলাম, তাদেরকেও এই উপদেশ দিয়েছিলাম। আর এখন তোমাদেরকেও একই উপদেশ দিচ্ছি যে, (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে ভয় করে কাজ করো।' (সূরা নিসা-১৩১)

www.pathagar.com

সুতরাং তোমাদের প্রতি আমার নসিহত হচ্ছে, রাতের আঁধারে, দিনের আলোকে, প্রকাশ্যে, গৃহাভ্যন্তরে অথবা গৃহের বাইরে, দেশে অথবা বিদেশে, সম্মিলিতভাবে অথবা একাকীত্বে সকল অবস্থায় মনে রেখো, আমরা কেউই আল্লাহ্ তা'য়ালার পর্যবেক্ষণের বাইরে নেই। তিনি সবকিছু দেখছেন এবং শুনছেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, 'যখন তুমি একা থাকবে তখন আল্লাহ্ তা'য়ালাকে আরো বেশী ভয় করবে। কারণ, তোমার একাকীত্বের গোপন কাজের যিনি সাক্ষী তিনিই হবেন তোমার বিচারক।' একজন মুমিনের হিদায়াতের জন্য এই একটি কথা যথেষ্ট হতে পারে।

তওবা করা অভ্যাসে পরিণত করবে

তেইশ ঃ মানুষের কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়ে ইচ্ছায়- অনিচ্ছায় পরিবেশের কারণে বা শয়তানের অস্অসায় গোনাহের কাজ ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর গোনাহ্ করলে তার নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালার সে শাস্তি থেকে বাঁচার পথ তওবা করা। 'তওবা' শব্দের অর্থ 'রুজু করা, ফিরে আসা, বিরত থাকা, বন্ধ করে দেয়া'। যারা তওবা করে তাদেরকে 'তায়েব' বলা হয়। অর্থাৎ গোনাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী। আর আল্লাহ্ তা'য়ালার গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে একটি নাম হলো تَوَّابٌ (তাওওয়াব) রুজুকারী। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তওবা করলো, আল্লাহর দিকে ফিরে এলো, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার দিকে অধিকতর 'রুজু'কারী হবেন। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا الرَّحِيْمًا-

'যে ব্যক্তি গোনাহের কাজ করে অথবা নিজের ওপর অবিচার করে, অতঃপর এ জন্যে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন সে অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু হিসেবে পাবে।'

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّى اَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ-
(رواه مسلم)

www.pathagar.com

'রাসূল (সাঃ) বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা করো এবং গোনাহ্ ক্ষমা চাও। আমি দৈনিক একশত বার তওবা করি।' (মুসলিম)

গোনাহ্ করার পর যে ব্যক্তি তওবা করে না, অনুশোচনা করে না, অনুতপ্ত হয় না, বরং অবলীলাক্রমে একের পর এক অপরাধ করতেই থাকে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহ্ তা'য়ালার অসন্তুষ্টির অর্থ তাঁর শাস্তির টার্গেট হয়ে যাওয়া। এ জন্যে শয়তানের চক্রান্তে পড়ে কখনো গোনাহ্ করে বসলে অবশ্যই চোখের পানি ফেলে তওবা করবে, গোনাহ্ মাফ চাইবে, এতে দেরী করবে না। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ–

'তোমরা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে ক্ষমা পাওয়ার কাজে প্রতিযোগিতা করো। আর সেই (জান্নাতের জন্যও প্রতিযোগিতা করো) যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর সমান। আর এই (বিশাল) জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে সেসব (ভাগ্যবান) লোকদের জন্য (যারা আল্লাহ্কে ভয় করে চলে)।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৩)

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ، وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ، وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ–

'(ভালো মানুষ হচ্ছে তারা) যারা কখনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেরা নিজের প্রতি জুলুম করে ফেললে সাথে সাথেই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং কৃত গোনাহের জন্যে আল্লাহর কাছে তওবা করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। কারণ, আল্লাহ্ ছাড়া কে আছেন আর, যিনি গোনাহ্ মাফ করে দিতে পারেন? তদুপরি এরা জেনে বুঝে নিজেদের গোনাহের ওপর অটল হয়ে বসেও থাকে না।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৫)

পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে এরা ভালো মানুষ।

জীবন চলার পথে ভুল-ত্রুটি, গোনাহ্-খাতা মানুষের হতেই পারে, সে জন্যে তওবা করা, ক্ষমা চাওয়া, অনুশোচনা করা, কৃত গোনাহের জন্য চোখের পানি ফেলা এবং

www.pathagar.com

গোনাহ্ করা থেকে ফিরে আসাই হচ্ছে মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে যারা জেনে বুঝে গোনাহ্ করে এবং সে গোনাহের জন্য অনুতপ্ত না হয়ে আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় না করে বারবার গোনাহ্ করতেই থাকে, এ ধরণের দুঃসাহসী নাফরমান ব্যক্তি নিজেকে নিজেই জাহান্নামের প্রচন্ড শাস্তির উপযুক্ত করে গড়ে তোলে।

তওবা কবুল হওয়া সম্পর্কে কখনো নিরাশ হবে না। যত বড় গোনাহই হোক না কোনো, তওবা দ্বারা নিজের আত্মাকে পবিত্র করবে এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট দোয়া কবুলের বুকভরা আশা রাখবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তার প্রিয় বান্দাদের প্রশংসায় একথা বলেননি যে, তাদের থেকে কোনো গোনাহ্ প্রকাশই পায় না। বরং আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'তাদের গোনাহ্ হয়, কিন্তু তারা গোনাহের ওপর হঠকারিতা করে না বরং তারা তা স্বীকার করে এবং নিজে পবিত্র হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়।'

হালাল পন্থায় রুজি উপার্জন করবে

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لاَيُقْبَلُ الاَّ طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَبِه الْمُرْسَلِيْنَ، فَقَالَ يَاَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا وَقَالَ تِبَالى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنٰكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يَطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَقُوْلُ يَارَبِّ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، (رواه مسلم)

চব্বিশ ঃ 'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র, তিনি পবিত্র (আমল ও ধন-সম্পদ) কবুল করেন এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা নিঃসন্দেহে মুমিনদেরকে সেই হুকুম দিয়েছেন, যে আদেশ

www.pathagar.com

দিয়েছেন তিনি নবী রাসূলদের। আর তা হচ্ছে, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য আহার করবে এবং সদা নেক আমল করবে।' সেই সাথে সাধারণ মুমিন বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ করেছেন, হে বিশ্বাসীরা! আমি তোমাদেরকে যে সব রিয্ক দান করেছি তাথেকে পবিত্র খাদ্য আহার করবে।' (মুসলিম)

যারা হারাম খাদ্য বা হারাম পথে উপার্জিত খাদ্য আহার করে তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে নবী করীম (সাঃ) একটি দৃষ্টান্ত দেন। যেমন এক ব্যক্তি দূর্গম পথে দীর্ঘ সফর করে ফিরেছে। তার মাথার চুলগুলো উস্কো-খুস্কো, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট এবং পরিধেয় ধূলো-মলিন। এ অবস্থায় সে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে অসহায় হয়ে বলছে হে আমার রব! হে আমার প্রভু! এ ব্যক্তির আকুতি কিভাবে কবুল হবে যদি তার খাদ্য, পানিয় ও পরিধেয় হয় হারাম পন্থায় উপার্জিত!' (মুসলিম)

مَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يُقْبَلِ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُ صَلٰوةً مَّادَامَ عَلَيْهِ، (رواه احمد)

'নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দিয়ে একটি কাপড় ক্রয় করলো, তার মধ্যে যদি একটি দিরহামও হারাম উপার্জিত হয় তাহলে ঐ কাপড় পরিধানে থাকা অবস্থায় তার নামাজ কবুল হবে না।' (আহ্‌মাদ)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهِ، (رواه الدارمى)

'নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, শরীরের সেই গোস্ত জান্নাতে যাবে না যা হারাম খাদ্যের দ্বারা বর্ধিত হয়েছে, আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত গোস্তের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান।' (দারেমী)

নবী করীম (সাঃ) আরো বলেছেন, 'হারাম পন্থায় উপার্জনকারী ব্যক্তির নামাজ, দান সাদাকাহ্ কোনোটিই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।' (আল হাদীস)

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রাঃ) বলেছেন, 'হারাম উপার্জিত অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করার দৃষ্টান্ত প্রশ্রাব দিয়ে কাপড় পবিত্র করণের পন্থা অবলম্বনের মতো।'

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

www.pathagar.com

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا، وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ–

'যারা আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ভয় করে জীবন-যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের রাস্তা খুলে দেন এবং তাদের এমন অভাবনীয় পন্থায় রিযক্-এর ব্যবস্থা করেন যা তারা কল্পনাও করতে পারে না।' (সূরা তালাক-৩)

عَنْ عُمَرِبْنُ الْخَطَّابْ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تُغْدُرَا خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا– (رواه الترمذى و ابن ماجه)

'হযরত উমার (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'য়ালার ওপর সত্যিকারভাবে নির্ভর করার মতোই নির্ভর করতে পারো তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদেরকে সেভাবেই রিয্ক দান করবেন যেমন রিয্ক দান করেন পাখীদের। পাখীরা প্রত্যহ সকালে বের হয় খালি পেটে আর সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে পেট ভর্তি করে।' (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্)

সুন্দর জীবন গড়ার লক্ষ্যে কোরআন বুঝে তিলাওয়াত করবে

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، (رواه مسلم)

পঁচিশ্ ঃ 'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না।' (মুসলিম)

এ হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে, যে ঘরে নামাজ আদায়ের মতো লোক নেই, কোরআন তিলাওয়াতের মতো লোক নেই, তাহ্লো এমন ঘর যেনো একটি কবরস্থানের মতো মৃত জনপদ, এটি জীবিতদের জনবসতি নয়।

www.pathagar.com

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ الَّا عَلَى اثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ- (رواه البخاری و مسلم)

'হযরত ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ ইর্ষার পাত্র নয়। এক. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'য়ালা কোরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে দিবারাত্রি তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে (অর্থাৎ নামাজে দন্ডায়মান অবস্থায় তিলাওয়াত করে, অথবা তার প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা দেয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকে) দুই. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'য়ালা ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা দিবারাত্রি (সাধ্যানুযায়ী) আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে।' (বোখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اقْرَاءَ الْقُرْاٰنَ فَانَّهُ يَاْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لاصْحَابِهِ- (رواه مسلم)

'হযরত আবি উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলে করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, তোমরা কোরআন পড়ো, কেননা কোরআন তার পাঠকদের জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হয়ে আসবে।' (মুসলিম)

নামাজকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ইবাদাত বানাবে

ছাব্বিশ ঃ আকীদা- বিশ্বাসের দিক দিয়ে 'তাওহীদ' যদি পরিপূর্ণ দ্বীনের মূল উৎস হয় তাহলে আমলের দিক থেকে নামাজ হচ্ছে পরিপূর্ণ দ্বীনের মূলভিত্তি। এর সঠিক বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ দ্বীনের বাস্তবায়ন হিসেবে ধরা যায়। নামাজ মুমিনের কেবল একটি উত্তম আমলই নয় বরং নামাজ মুমিন ব্যক্তির সকল নেক আমলের ফাউন্ডেশন, নামাজ হচ্ছে ঈমান থাকা না থাকার প্রমাণ। পবিত্র কোরআন মজীদের সূরা কিয়ামাহ্

www.pathagar.com

এর ৩২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, 'কিন্তু না সে সত্য মেনে নিলো আর না সে সালাত আদায় করলো, বরং সে সত্যকে মিথ্যা মনে করে ফিরে গেলো।'

কোরআনে করীমের এ বাচন ভঙ্গী প্রমাণ করে যে, মানুষের ঈমান ও নামাজ পরস্পর ওৎপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। পবিত্র কোরআন বলছে মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার বড় কারণ নামাজ আদায় না করা।

يَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ، مَاسَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ–

'সেদিন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে তোমাদেরকে আজ কি কারণে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবে উপনীত করেছে? তারা বলবে আমরা নামাজীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না এবং (ক্ষুধার্ত ও) অভাবী ব্যক্তিদের খাবার দিতাম না।' (সূরা মুদ্দাস্সির-৪০-৪৪)

পবিত্র কোরআন বলছে নামাজ সকল অপকর্মের প্রতিবন্ধক।

اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ–

'হে নবী! এ কিতাব তিলাওয়াত করুন, যা অহীর সাহায্যে আপনার নিকট অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর নামাজ কায়েম করুন, নিঃসন্দেহে নামাজ অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা আন কাবুত-৪৫)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে আরো বলেছেন–

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَنَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى–

'নিজের পরিবার পরিজনদেরকে নামাজ আদায়ের হুকুম দাও এবং নিজেও তা নিয়মিত পালন করতে থাকো। আমি তোমার কাছে রিয্ক চাইনা (বরং) রিয্ক তো আমিই তোমাকে দিচ্ছি। আর শুভ পরিণতি তো তাক্ওয়া (অবলম্বনকারীদের) জন্যই।'

وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِي خَلِيْلِي

www.pathagar.com

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَّ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِعْتَ وَحُرِّكْتَ وَلاَ تَتْرُكَ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِءَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ– (رواه ابن ماجه)

'হযরত আবি দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম (সাঃ) আমাকে অসিয়্যত করেছেন, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক স্থাপন করবে না, যদিও তোমাকে কেটে টুকরা টুকরা করা হয় অথবা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। ইচ্ছে পূর্বক ফরজ নামাজ ত্যাগ করবে না, যে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ত্যাগ করে তার ওপর থেকে আল্লাহ্ তা'য়ালার সেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়, যে দায়িত্ব ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালার রয়েছে। মদপান করবে না, কারণ মদ সকল নিকৃষ্ট পাপের চাবি।' (ইবনু মাজাহ্)

মহিলাদের পর্দার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে

সাতাশ ঃ গৃহে এবং গৃহের বাইরে স্ত্রী- কন্যাদের পর্দার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। স্বামীর মৃত্যুর পর যাদের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ, তারা সবাই পরপুরুষ। কোনো বিশেষ বাধ্যবাধকতা না থাকলে এসব পুরুষ আত্মীয়-স্বজন, অনাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মহিলাদের খোলামেলা দেখা-সাক্ষাৎ শরীয়াতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এতে কোনো আত্মীয়-বন্ধু নারাজ হলেও তাতে কিছুই আসে যায় না। জীবন পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর বিধানকে প্রাধান্য দিবে।

একান্ত প্রয়োজন হলে মহিলারা পর্দার আড়াল থেকে পরপুরুষের সাথে কথা বলতে পারবে এবং এটাও শরীয়াতের বিধান। কন্যা সন্তানদের প্রাইভেট শিক্ষা বা গৃহ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষয়ত্রী প্রাধান্য দিবে। অন্যথায় অনাকাঙ্খিত বিপর্যয়ের সম্ভাবনা শতভাগ। 'দু'জন বেগানা পুরুষ-মহিলা কোথায়ও একত্রিত হলে সেখানে শয়তান হয় তৃতীয়'। (আল হাদীস)

সাংগঠনিক জীবনের প্রতি গুরুত্ব দিবে

عَنِ الْحَارِثِ الاَشْعَرِىْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ

www.pathagar.com

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ الْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ اِلاَّ اَنْ يُّرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَّىءِ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ- (رواه مسند احمد والترمذى)

আটাশ ঃ 'হযরত হারেসুল আশ'আরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি। যা আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে আদেশ করেছেন– সে কাজগুলো হলো, জামায়াতবদ্ধ (সাংগঠনিক) জীবন, (নেতার) আদেশ শ্রবণে (অনুসরণে) প্রস্তুত থাকা ও (সংগঠনের নিয়ম-কানুন) মেনে চলা, (প্রয়োজনে) হিজরত করা, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা এবং নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি জামায়াত (সংগঠন) থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে ইসলামের রশি তার গলদেশ থেকে খুলে ফেললো– যতক্ষণ না সে পুনরায় জামায়াতের (সংগঠনের) মধ্যে শামিল হবে। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াত যুগের কোনো মতবাদ ও আদর্শের দিকে (লোকদের) আহ্বান জানাবে, সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামাজ আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে মনে করে।' (তিরমিযী)

* এ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য রেখেই জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমার পথ চলা। দেশে বেশ কয়েকটি ইসলামী দল সক্রিয় রয়েছে, আমি তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও মুহাব্বত পোষণ করি। কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জামায়াতে ইসলামীর দ্বীনি আকিদা-বিশ্বাস, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও যুগোপযোগী আদর্শ নেতৃত্ব এবং সকল ক্ষেত্রে সততা- স্বচ্ছতার কারণে জামায়াতে ইসলামীই আমার সর্বাধিক পছন্দের। তাই ১৯৭৩ সাল থেকে অদ্যাবধি আমি আমার প্রিয় সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর সাথেই সম্পৃক্ত রয়েছি। এ সংগঠন আমার জীবনের মতো প্রিয়। আল্লাহ্ তা'য়ালার মেহেরবানীতে জামায়াতের সাথে থাকার কারণে তাক্বওয়া ভিত্তিক সুন্দর

www.pathagar.com

জীবনের সন্ধান পেয়েছি। জামায়াত-শিবির আমার হৃদয়ের স্পন্দন। তোমরাও পারিবারিকভাবে জামায়াত-শিবিরের সাথে সক্রিয় থাকো। আমি জীবনে কখনো কোনো ব্যাপারে জামায়াতের আনুগত্য করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিনি। আমার এ অনুভূতির প্রতি মর্যাদা দিয়ে তোমরাও সকলে সংগঠন ভুক্ত হও। তাহলে দুনিয়ার জীবন সুশৃঙ্খল ও সুন্দর হবে এবং পরকালের জীবনও শঙ্কামুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

আমার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি নসিহত

ঊনত্রিশ ঃ আমার সকল আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও মুহিব্বীন (যাঁরা আমাকে ভালোবাসেন) তাঁদের সকলের প্রতি আমার বিশেষ নসিহত, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ভয় করে চলুন, আল্লাহর আদেশ আন্তরিকভাবে অনুসরণ করুন, আল্লাহর নিষেধকৃত সকল বিষয় ঘৃণার সাথে বর্জন করুন এবং নবী করীম (সাঃ)-কে নিজ জীবনের থেকে অধিক ভালোবেসে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করুন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)- তাঁদের প্রতিও যথাযথ মর্যাদা ও ভালোবাসা পোষণ করুন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করুন। আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনাদের মধ্যে যাঁদেরকে আর্থিক সামর্থ্য দিয়েছেন তিনি হজ্জ আদায় করুন।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'মুমিন সেই ব্যক্তি যে নিজের জন্য যা পসন্দ করে অন্য মুমিন ভাইয়ের জন্যও তা পসন্দ করে'। এ হাদীস অনুযায়ী আমি বলছি, আমি জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরকে দুনিয়া আখিরাতে সফল আদর্শ জীবন গঠনের এক পরিকল্পিত বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় মনে করি। আর ঠিক এ কারণেই আমি সারা জীবন জামায়াতের একজন নগণ্য কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালনের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আপনারাও নিজ জীবন, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির জীবনের সংশোধন তথা আত্মশুদ্ধির জন্য জামায়াতে শরীক হোন। পুত্র সন্তানদের শিবিরের হাতে তুলে দিন এবং কন্যা সন্তানদের ইসলামী ছাত্রী সংস্থার সাথে সম্পর্ক গড়ে দিন। ফলে তাদের আমল-আখলাক তথা এমন সুন্দর চারিত্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হবে, যা দেখে আপনাদের চক্ষু শীতল হয়ে যাবে এবং অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে ইক্বামতে দ্বীনের লক্ষ্যে আপনাদের যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু দিয়ে হলেও জামায়াত-শিবিরকে আন্তরিক সহযোগিতা করবেন। আপনাদের এই কোরবানী আপনাদের আমলনামায় 'আল্লাহর পথে ব্যয়' হিসেবেই গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

আমার মৃত্যু যখনই হোক, আমার নিজ পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনেদের জন্য আপাততঃ এগুলোই আমার অসিয়্যত।

هٰذَا مَا عِنْدِيْ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ، وَمَا تَوْفِيْقِي اِلاَّ بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ-

'যা কিছু লিখেছি তা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান, আসল ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের মালিক মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আমার কোনো ক্ষমতা নেই, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করছি এবং তাঁরই নিকট আমাকে ফিরে যেতে হবে।'

পরিশেষে বিশ্ব বিখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা ইবনুল যাওযী (রহঃ)-এর দোয়া দিয়ে আমি আমার অসিয়্যত প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাইঃ-

اَللّٰهُمَّ لاَتُعَذِّبْ لِسَانًا يُخْبِرُ عَنْكَ وَلاَ عَيْنًا تَنْظُرُ اِلى عُلُوْمٍ تَدُلُّ عَلَيْكَ وَلاَ قَدَمًا تَمْشِيْ اِلى خِدمَتِكَ وَ عِبَادَتِكَ وَلاَ يَدًا تَكْتُبُ حَدِيْثَ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَبِعِزَّتِكَ لاَتُدْخِلْنِيْ النَّارِ، فَقَدْ عَلِمَ اَهْلُهَا اَنِّيْ كُنْتُ اَذُبُّ عَنْ دِيْنِكَ-

'হে আল্লাহ্! ঐ সকল জিহ্বা সমূহকে তুমি শাস্তি দিও না, যে সকল জিহ্বা অন্যের কাছে তোমার বাণী পৌঁছাতো। ঐ চোখ সমূহকে তুমি শাস্তি দিও না, যে সকল চোখ তোমার বাস্তব নিদর্শনের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতো। ঐ সকল পা-সমূহকে শাস্তি দিও না, যে সকল পা তোমার দ্বীনের খেদমতে চলাফেরা করতো। ঐ সকল হাতগুলোকে শাস্তি দিও না, যে সকল হাত তোমার রাসূল (সাঃ)-এর বাণীসমূহ লেখার ব্যাপারে নিয়োজিত থাকতো। হে আল্লাহ্! তোমার মর্যাদা ও সম্মানের কসম! আমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করায়ো না, কারণ জাহান্নামের অধিবাসীগণও জানতো যে, আমি তোমার দ্বীনের প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলাম'।

www.pathagar.com

অচেনা গন্তব্যের যাত্রী আমি

ত্রিশ ঃ সবশেষে আবারও বলছি, একদম শূন্য হাতে অচেনা, অজানা, অপরিচিত অন্তহীন এক জগতের পথে নিঃসঙ্গ একাকী অবস্থায় যাত্রা হবে আমার। এই পথ ও জগতের জন্যে যে সম্বল, পুজি ও পাথেয় প্রয়োজন তা আমার নেই। প্রতি বছর রমজানে কা'বা শরীফে গিয়েছি, নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র কবরের পাশে দাঁড়িয়েছি। উভয় স্থানে অঝোরে কেঁদে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছি। আমি আমার মালিকের কাছে বারবার আমার সকল ভুল-ভ্রান্তি ও অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছি। আমি জানিনা, আমার মনিব আমার জন্য ক্ষমা মঞ্জুর করেছেন কিনা। জানার কোনো উপায় নেই, আমার মনিব আমাকে কিভাবে গ্রহণ করবেন। এ প্রচন্ড ভয়-ভীতি, শঙ্কা, আশঙ্কা সেই সাথে এক বুক আশা নিয়ে আমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। মহান মা'বুদ আমার মতো এক ক্ষুদ্র গোলামকে যদি ক্ষমা করে দেন তাতে তাঁর করুণার মহাসমুদ্র থেকে কিছুই কমতি হবে না– এটাই আমার একমাত্র আশা ভরসা। আমার মৃত্যুর পরে তোমরা কেউ-ই তোমাদের দোয়ায় আমাকে ভুলে যাবে না। এ ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত দোয়া এক পরম সান্ত্বনা।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَسْمَعُ كَلَامِىْ وَتَرٰى مَكَانِىْ وَتَعْلَمُ سِرِّىْ
وَعَلَانِيَتِى لَايَخْفٰى عَلَيْكَ شَىْءٌ مِنْ اَمْرِىْ اَنَا الْبَائِسُ
الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ الْوَاجِلُ الْمُشْفِقُ
الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِىْ اِلَيْكَ اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ
الْمِسْكِيْنَ وَابْتَهِلُ اِلَيْكَ ابْتَهَلَ اَلْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ
وَادْعُوْكَ دُعَاَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ
رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ
اَنْفُهُ– اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِىْ بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَكُنْ م بِى

رَؤُفًا رَّحِيْمًا يَا خَيْرَالْمَسْؤُلِيْنَ وَيَا خَيْرَا الْمُعْطِيْنَ–

'হে আল্লাহ! তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, আমি কোথায় এবং আমার অবস্থা তুমি দেখতে পাচ্ছো। আমার প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয় তুমি অবগত রয়েছো। তোমার কাছে আমার কোনো বিষয়ই অজ্ঞাত নয়। আমি বিপদগ্রস্ত, অসহায়, আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি ভীত সন্ত্রস্ত, আমার ভুল-ত্রুটির জন্য আমি অনুতপ্ত লজ্জিত। আমি তোমার দরবারে সেভাবে অসহায়ত্ব পেশ করছি যেভাবে কোনো অপরাধী ব্যক্তি নিজের অপরাধের জন্য বিনয় পেশ করে থাকে। আমি তোমাকে সেভাবে ডাকছি, যেভাবে একজন ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তি নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ডাকতে থাকে। এ ডাক এমন ব্যক্তির, যার গর্দান তোমার দরবারে নত হয়ে রয়েছে। যার চোখের পানি তোমার দৃষ্টির সম্মুখে ঝরে গড়িয়ে যাচ্ছে, যার দেহ-মন (আপাদ-মস্তক) তোমারই সম্মুখে অবনমিত, যার নাক তোমার সম্মুখে ধূলায় ধূসরিত। হে আল্লাহ! তুমি এমনটি করোনা যে, আমি তোমার কাছে চাওয়ার পরেও বঞ্চিত থাকি। আমার জন্য তুমি পরম করুণাময় দয়াবান হয়ে যাও। তুমি সেই মহান সত্তা, যিনি প্রার্থনাকারীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। (কানযুল উম্মাল, তাবারাণী)

فَاطِرَ السَّمٰوتِ وَالاَرْضِ اَنْتَ وَلِىِّ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ–

'হে আকাশসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা! তুমিই একমাত্র আমার অভিভাবক দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও। (তোমার) একজন অনুগত বান্দা হিসেবে তুমি আমার মৃত্যু দিও এবং (পরকালে) আমাকে নেক্কার মানুষদের দলে শামিল করো'। (সূরা ইউসুফ-১০১)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ، وَجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ، وَجْعَلْنَا مِنَ الَّذِيْنَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ–

'হে আল্লাহ! তওবাকারী, পবিত্রতা অর্জনকারী এবং যাদের ভীতিগ্রস্ত ও চিন্তান্বিত হতে হবে না– এমনসব সালেহীন বান্দাহ্দের মধ্যে আমাকে শামিল করে নিও।'

জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) এর দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّى وَتَوَفَّنِى اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًالِّى-

'হে আল্লাহ্! আমাকে ততদিন বাঁচিয়ে রেখো যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, আর তখনই আমাকে মৃত্যু দিও যখন মৃত্যুই আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়।'

نہ شاہی کی تمنّا اِس دل میں ہیں
تخت کی خواہش نہ رکھتا ہوں میں
میں ادنی غلاموں میں تو صحیح
پھر ہو تو تمہارا- کافی ہیے

কাব্যানুবাদ ঃ *প্রভু আমার! নিশ্চয়ই জানো তুমি,*
ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভের কোনো অভিলাষ
ছিল না কোনো কালে মোর অন্তরে।
শুধু বুকভরা আশা
একান্ত দয়া পরবশে
শামিল করে নিও মোরে
তোমার প্রিয় গোলামদের কাতারে।।

www.pathagar.com

افسوس

کهو بلبل کو لیجائے چمن سے آشیانہ اپنا
پڑھےگر صد هزار آفسوں نہ ہوگا باغباں اپنا
ہوئی جب باغ سے رخصت کہا رو روکے یاقسمت !
لکھاتھا کہ یوں فصلِ گل میی چھوڑو آشیانہ اپنا
نِدا آئی!
نہ تو نے گل کیا اپنا نہ بلبل باغباں آپنا
چمن میی کس بھروسے سے بنایا آشیانہ اپنا

আক্ষেপ !

কাব্যানুবাদ ঃ *বুলবুল পাখীকে বলো,*
ফুলের বাগান থেকে যেনো তার বাসা নিয়ে যায়;
কারণ, শত আশা করলেও
এ বাগান তো আর তার নয়!
বাগান থেকে চির বিদায়ের কালে
বলবে শুধু কেঁদে কেঁদে
এই ছিলো অদৃষ্টে মোর?
আওয়াজ এলো গায়েব থেকে
হঠাৎ করেই–
দুঃখ করে এখন কি লাভ!
এ বাগান, এ ফুল, এ সৌন্দর্য অপরূপ
এর কোনোটিই যখন তোমার নয়
এতো ঘটা করে তাহলে হেথায়
নীড় বেঁধেছিলে কোন্ ভরসায়?

www.pathagar.com

فریاد

آہ جاتی ہے فلك پر رحم لانے کیلئے
بادلو ہٹ جادیدو راہ جانے کیلئے
رحم کر اپنانہ عین کرم کو بھولجا
ہم تجھے بھولے ہیں مگر تو نہ همکو بھولجا
خلق کے رندے ہوئے دنیاکی ٹھکرائے ہوئے
اے ہیں اب تیرے درپر ھاتہ پھیلائے ہوئے
خوارہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلّت میں ہیں
ہم سب کچہ ہیں لکین تیرے محبوب کے امت میی ہیں

ফরিয়াদ

কাব্যানুবাদ ঃ *মহান আল্লাহর করুণা লাভের প্রত্যাশায়*
বুকফাটা আর্তনাদ মোর
ধাবিত হচ্ছে আকাশ পানে
মেঘেরা ছেড়ে দাও পথ।
প্রভু হে! দয়া করা বিধান তোমার
আমি না হয় ভুলেছি তোমায়
তুমি ভুলোনা মোরে
যদিও ভেঙ্গেছি শপথ।।
দুনিয়ার সকল দুয়ার থেকে বঞ্চিত আমি
অবশেষে ভিখারীর বেশে
দু'হাত পেতেছি দুয়ারে তোমার।
আমার কৃত অপরাধের জন্য
আমি লজ্জিত আমি অনুতপ্ত
তোমার প্রিয় হাবীবের উম্মত আমি
এটাই শুধু ভরসা আমার।।

www.pathagar.com

সবশেষে আমার মহান রব-এর রহমতের দুয়ারে আমার করুণ মিনতি; কোরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত যাঁদের জন্যে প্রযোজ্য, একান্ত দয়া পরবশে এ অধম গোলামকে তাঁদের মধ্যে শামিল করে নিও।

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِىْ فِى عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ–

'(মৃত্যুর সময় নেককার বান্দাহ্দের বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও সন্তুষ্ট চিত্তে ও তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে; অতঃপর তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যাও (আর) আমার (অনন্ত) জান্নাতে প্রবেশ করো।' (সূরা ফজর, ২৮-৩০)

কলিজার টুকরা সন্তান ও প্রিয় স্বজনেরা!

أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهَ وَالصَّبْرُ عِنْدَ مَرَضِيْ وَمَوْتِيْ وَأَنْ تَقُوْلُوْا خَيْرًا وَتُكْثِرُوْا لِيْ مِنَ الاسْتِغْفَارِ وَالدُّعَاءِ بِالرَّحْمَةِ وَدُخُوْلِ الْجَنَّةَ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ–

'আমি তোমাদের সকলকে তাক্বওয়ার গুণাবলী অর্জন, আমার রোগ-ব্যাধি ও আমার ইন্তেকালে ধৈর্য্য ধারণ এবং কথা বলার ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনমূলক কথা বলার জন্য অসিয়্যত করছি। সেই সাথে অধিক পরিমাণে তাওবা-ইস্তেগ্ফার করা, রহমত ও জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবার জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে বারবার ধর্ণা দেয়ার জন্য অসিয়্যত করছি।'

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার অফুরন্ত দয়ার একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

১০ই মুহ্ররম

১৪২৯ হিজরী

২০শে জানুয়ারী ২০০৮ ঈসায়ী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com